Peer Reviewed

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

৩৩ - ৩৪ যুগ্ম সংখ্যা, ২০২০ - ২১

ISSN - 2320-3633

বাংলা বিভাগ

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

৫৬এ, বি. টি. রোড, কলকাতা-৭০০ ০৫০

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা
তেত্রিশ-চৌত্রিশ যুগ্ম সংখ্যা ২০২০-২১

সভাপতি

অধ্যাপক সব্যসাচী বসু রায়চৌধুরী
মাননীয় উপাচার্য
রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

উপদেষ্টা

অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য
(প্রাক্তন উপাচার্য, অধ্যাপক, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়)

অধ্যাপক সৌমিত্র শেখর
(উপাচার্য, জাতীয় কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ,
অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ)

সম্পাদক

অধ্যাপক সুমনা দাস সুর

সম্পাদক পর্ষদ

অধ্যাপক শ্রাবণী পাল
অধ্যাপক মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়
অধ্যাপক সুরঞ্জন মিদ্দে
অধ্যাপক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী [অধ্যাপক (অবসরপ্রাপ্ত), বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়]
অধ্যাপক অলোক চক্রবর্তী [অধ্যাপক, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়]

Peer Reviewed

DEPARTMENT OF BENGALI JOURNAL

Vol. 33, 34 (Joint) 2020-21

ISSN - 2320-3633

Department of Bengali
Rabindra Bharati University
56A, B. T. Road, Kolkata-700 050

Chairperson:
Professor Sabyasachi Basu Raychaudhury
Honorable Vice-Chancellor
Rabindra Bharati University

Advisors:
Professor Tapodhir Bhattacharya
(Ex Vice-Chancellor, Assam University)

Professor Soumitra Shekhar
(Vice-Chancellor, Jatiya Kaji Najrul Viswavidyalaya,
Maymansingha, Bangladesh, Professor, University of Dhaka)

Editor:
Professor Sumana Das Sur
Head, Department of Bengali

Board of Editor:
Prof. Srabani Pal
Prof. Munmun Gangopadhyay
Prof. Suranjan Midday
Prof. Srutinath Chakraborty [Professor (Retd.) Vidyasagar University]
Prof. Alok Kumar Chakraborty [Professor, University of Burdwan]

BANGLA BIBHAGIO PATRIKA, RABINDRA BHARATI UNIVERSITY
ISSN—2320-3633 (22 January, 2013)
Peer Reviewed Journal

Volume : 33 - 34 / 2020-2021

Editor :
Professor Sumana Das Sur
Head, Department of Bengali

Published by
Registrar
Rabindra Bharati University
56A, B. T. Road, Kolkata-700 050

Printed by
The Saraswati Printing Works
2 Guru Prosad Chowdhury Lane,
Kolkata-700 006
Phone : 23500816, 23604879

Price :
₹ 400/-

সম্পাদকীয়

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের গবেষণা পত্রিকা Peer Reviewed, ISSN: 2320-3633 তেত্রিশ-চৌত্রিশ যুগ্ম সংখ্যা ২০২০-২১ প্রকাশিত হতে চলেছে। মাঝের দুটি বছর অতিমারীর কারণে সবকিছুই স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল, ব্যাহত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠনপাঠন এবং অন্যান্য বিদ্যায়তনিক কার্যকলাপ। ফলত, পত্রিকার বত্রিশতম সংখ্যা, ২০১৯ প্রকাশিত হতে অনেকটা দেরি হয়ে যায়। দুঃসময় কাটিয়ে উঠে আবার ক্রমশ স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে সবকিছু। মধ্যবর্তী ঘাটতি পূরণ করতে মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের পরামর্শে বিভাগীয় পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভায় সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় যে পরবর্তী সংখ্যাটি যুগ্ম সংখ্যা হিসেবে প্রকাশিত হবে। এই সংখ্যার প্রবন্ধগুলি বিন্যাস ও নির্বাচনের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন আনা হয়েছে। ১৭, ১৮ সেপ্টেম্বর ২০২১, বাংলা বিভাগে একটি আন্তর্জাতিক, আন্তর্জাতিক আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়— 'কবির ভুবন, ছবির ভুবন'। সেখানে যাঁরা বক্তা ছিলেন তাঁদের মধ্যে আর্যনীল মুখোপাধ্যায় এবং হিন্দোল ভট্টাচার্য তাঁদের বক্তৃতা লিখিত প্রবন্ধ আকারে দেন এবং অমিতরঞ্জন বিশ্বাসের বক্তৃতার অনুলেখন করা হয়। এই তিনটি প্রবন্ধ 'আমন্ত্রিত রচনা' হিসেবে রয়েছে। বাকি কুড়িটি প্রবন্ধ বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষকদের লেখা, যেগুলি reviewer দের দ্বারা পরীক্ষিত ও অনুমোদিত হওয়ার পর ছাপার জন্য বিবেচিত হয়েছে। পত্রিকার জন্য প্রবন্ধ আহ্বানের পদ্ধতি (call for paper) স্থির করা হয়েছে সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠকে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের website এ সেই বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছে।

বিভাগীয় পত্রিকার কাজ নতুন ভাবে শুরু করার ক্ষেত্রে মাননীয় উপাচার্য মহাশয়ের নিরন্তর উৎসাহ এবং পরামর্শ ছিল আমাদের পাথেয়। কৃতজ্ঞতা জানাই সম্পাদকমণ্ডলীর প্রত্যেক সদস্যকে যাঁদের মধ্যে বিভাগের অধ্যাপকেরা ছাড়াও আছেন অধ্যাপক শ্রুতিনাথ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক অলোক কুমার চক্রবর্তী। অশেষ কৃতজ্ঞতা দুই বিশিষ্ট উপদেষ্টা মহোদয় অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য এবং অধ্যাপক সৌমিত্র শেখরের প্রতি। অধ্যাপক কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী এবং অধ্যাপক সত্যবতী গিরি যেভাবে অত্যন্ত দায়িত্বের সঙ্গে তাঁদের সুচিন্তিত মতামত দিয়ে প্রবন্ধ নির্বাচনে সাহায্য করেছেন তাতে আমরা অভিভূত।

ধন্যবাদ বিভাগের সকল অধ্যাপক, অশিক্ষক সহকর্মী এবং গবেষক ছাত্রছাত্রীদের, তাঁদের সাহায্য না পেলে এই কাজ গুছিয়ে ওঠা সম্ভব ছিল না।

ধন্যবাদ রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকাশনা বিভাগকে সবসময় সবরকমের সহযোগিতার জন্য।

সুমনা দাস সুর
প্রধান, বাংলা বিভাগ

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা

৩৩ - ৩৪ যুগ্ম সংখ্যা, ২০২০ - ২১

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ... ৭

সম্ভাবনাময় উপরিবাস্তব : বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা ও চলচ্চিত্রে ... ১১
আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

গোলাপ এখন রাজনৈতিক ... ২৫
হিন্দোল ভট্টাচার্য

ক্ষিদ্দার কোচিং ... ৩৪
অমিত রঞ্জন বিশ্বাস

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চরিত্রের ছদ্মসাজে
লোকজীবনের উপাদান ... ৪২
মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

রবীন্দ্রসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও সংগ্রাম ... ৫৬
সুরঞ্জন মিদ্দে

ভাঙা-গড়ায় নায়ক—প্রকল্প ... ৯০
দেবলীনা শেঠ

দুটি বই, একটি বিতর্ক এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা ... ১০২
সুমনা দাস সুর

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবিতার শিল্পরূপ ... ১২২
সুব্রত মণ্ডল

'বনপলাশির পদাবলী' : যৌথ কৃষ্টির বিন্যাস থেকে বিপর্যয় ... ১৩৩
সুরজিৎ বেহারা

আবু ইসহাকের ছোটোগল্প (নির্বাচিত) : সমাজের
অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোর সন্ধানে ... ১৪৬
মানিকলাল সাহা

নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে ভাটিয়ালী ... ১৫৬
দীপক কুমার মণ্ডল

যযাতির বাসনা ও তার প্রবহমানতা :
মহাকাব্য থেকে আধুনিক কবিতা ... ১৬৮
বীণা মণ্ডল

অক্ষৌহিণী (১৯৯৬) এবং ফুলের মানুষ (২০০০) :
প্রান্তিক নারীর আর্থিক ও আত্মিক রূপচিত্রের গতিপ্রকৃতি ... ১৮০
মোসা: সারমিন সুলতানা

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত উপন্যাসে নারীর কর্মজীবনের পরিচয় ... ১৯৭
সুনন্দা ব্যানার্জী

আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও—প্রসঙ্গ
বোয়ালের নাট্য-ভাবধারা ... ২১১
নীলাঞ্জন হালদার

মনোজ মিত্রের চোখে সীতা ও তার জীবন :
ভেলায় ভাসে সীতা ... ২২০
তনিমা বিশ্বাস

গল্পকার নারায়ণ দেবনাথ (১৯২৫-২০২২) ... ২৩০
বিদিশা নন্দী

দ্বিজ বংশীদাস ও কেতকদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলাকাব্য : ... ২৩৭
কাহিনি ও বিষয় ভিত্তিক তুলনামূলক পর্যালোচনা
মিজানুর মণ্ডল

বাংলা ছোটোগল্প নকশাল আন্দোলনের বিচিত্র রূপায়ণ ... ২৬২
সৌত্রিক ঘোষাল

গৌড়মল্লার : বাংলার সমাজ—সংস্কৃতি ... ২৮৭
সরমা বিশ্বাস

সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে মাতৃত্বের নতুন রূপ ... ২৯৭
মনীষা নস্কর

বাংলা কথাসাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডপ : নির্বাচিত পাঠ ... ৩০৭
রুমকী মণ্ডল

বাংলা সাহিত্যে রাধা : এক চিরন্তন মানবীসত্তা ... ৩২১
মাধবী বিশ্বাস

Call for Paper ... ৩৩৫
Peer Review (Format) ... ৩৩৬

সম্ভাবনাময় উপরিবাস্তব
বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতা ও চলচ্চিত্রে

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়

অতি সামান্য কিছু শিল্পী/ লেখক/ কবি আছেন যাঁরা উভচর হাঁসের মতো সাবলীলতায় জলে ডাঙায় দিনজীবন অতিবাহিত করতে পারেন তাঁদের রচনায়। এক মাধ্যম থেকে অন্যটায় যেতে কোনো ক্লেশের চিহ্ন নেই তাঁদের। নেই কোনো প্রয়াসের। বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত অনেকটা সেই সৃষ্টিশীল জীবনই কাটিয়েছেন সিনেমা ও কবিতার ডাঙায়-জলে। বুদ্ধদেবের কবিতাকে কেউ কেউ বলেছেন সিনেকবিতা, আবার ওঁর ছবিকেও একই পরিভাষায় বর্ণনা করা হয়। Conepoem (চিত্রকবিতা) ও Poetic Cinema বা Poem-film (কবিতাচিত্র)-এর মধ্যে মস্ত একটা ফারাক রয়েছে। বহু লেখকের লেখনীতে এই শব্দবন্ধদ্বয় আলগাভাবে ব্যবহার হয় প্রায় একই জিনিস বোঝাতে। কিন্তু এদের সংজ্ঞা আলাদা হওয়াই বাঞ্ছনীয়[১]।

সিনেকবিতা/ চিত্রকবিতা ও কবিতাচিত্র —এই দুটি স্পষ্ট বিভাজন প্রথমে ক'রে নেওয়া ভালো যাতে সিনোমা অনুপ্রাণিত কবিতা ও কবিতাধর্মী চলচ্চিত্রের শনাক্তকরণ সহজ হয়। সিনেকবিতা বা চিত্রকবিতা কী? সে কি কবিতা? না ফিল্ম? না কি দুটোই? ভিনসমাজের, ভিনসংস্কৃতির, ভিন ভূগোল ও ইতিহাসের সম্পূর্ণ অচেনা এক ধাপে সিনেমা আমাদের মুহূর্তে নামিয়ে দিতে পারে। সাংস্কৃতিক দূরত্ব নাশ করে, সাংস্কৃতিক গ্রাহকের কাছে নতুন তথ্য পৌঁছে দেয়। নতুন তথ্য নতুন ভাবনা ও অনুভূতির জন্ম দেয়। সিনেপোয়েম বা সিনেকবিতা বা চিত্রকবিতা সাহিত্য পদবাচ্য এক লিখিত, মুদ্রিত বা প্রক্ষিপ্ত (পৃষ্ঠায় বা পর্দায়) রচনা যাকে কবিতাই বলা উচিত, সিনেমা নয়। সে এমন এক কবিতা যা মূলত শব্দ ও ধ্বনিনির্ভর, লিপিনির্ভর এবং যেটা কোনো চলচ্চিত্র বা চলচ্চিত্র-নির্মাণপদ্ধতির প্রভাবে গড়ে উঠেছে।

সিনেকবিতার প্রথম ব্যবহার অত্যন্ত অসমান্তরাল এক ফরাসী কবি ব্লেজ সঁদ্রারের (Blaise Cendrar) হাতে। সিনেকবিতা ও কবিতাচিত্রের এক আদর্শ যৌথ উদ্যোগ নিয়ে এই প্রকল্পের শুরু। ফের্না লেঝের (Fernand Léger) ব্লেজ সঁদ্রারেরই সমবয়সী এক চিত্রশিল্পী। গত শতকের প্রথম ও দ্বিতীয়ার্ধে লেঝের

---

[১] কৌরব পত্রিকা ১১৫ সংখ্যা, ২০১৩। সিনে-কবিতা

সম্পূর্ণ নতুন এক চিত্রকলার জন্ম দিচ্ছেন, পরবর্তীকালে যাকে সমালোচকরা কিউবিজম্ বলবেন। ১৯২৪ সালে লেঝের তৈরি করেন একটি ছোট ফিল্ম— 'বালে মেকানীক' (Ballet Mécanique)। ওই সময়ে বাল্যকালের সিনেমা শিল্পকে দিয়ে যে এমন অদ্ভুত উদ্ভাবনী গ্র্যাফিক নৃত্যনাট্য বানানো যায় সেটাই লেঝের দেখালেন। ছবিটা কল্পনা ও কবিতাবস্তুতে ছাওয়া।

লেঝের ঋণ স্বীকার করেছিলেন। এক দলকবিদের কাছ, যাঁরা ওঁর ওই সময়ের বন্ধু। গীয়ম অ্যাপলিনেয়র, মাক্স ঝাকব, ইভান গ্যোল ও ব্লজে সঁদ্রার। এঁদের মধ্যে সঁদ্রার এক ফরাসী চিত্রপরিচালক আবেল গাঁস-য়ের প্রথম শব্দচিত্র La Fin du Monde (End of the World, 1931)-এ গাঁস-য়ের সহকারী ছিলেন। বালে মেকানীক তৈরি হচ্ছে যখন, সঁদ্রার ও লেঝের এক আত্মিক যৌথতায় বাঁধা পড়েন। ফিল্মটার অনেক বিমূর্ত রূপকের মধ্যে একটা ছিল চাকা ও ঘূর্ণমানতা। এই রূপটাকে গড়ে তুলতে অনেকটাই সাহায্য করেছিলেন সঁদ্রার, যদিও ওই ফিল্মে ওঁর সরাসরি কোনো ভূমিকা ছিল না। অনেক তদানীন্তন আলোচকের মধ্যে এপস্টিন নামে একজন লেখেন— 'This film saw the birth of the first cinematic symbol. The Wheel... It rools along as long as the heart still beats, along tracks predestined by chance, luck that can be good but generally bad. The cycle of life and death has become so jagged that it has had to be retempered lest it break.'

ব্লেজ সঁদ্রারকে বাদ দিলে আরো অনেক ফরাসী কবি সিনেমার সাঙ্গে ঘনিষ্ঠ ছিলেন এবং কম বেশি তাঁদের লেখার মধ্যে সিনেমার প্রভাব কাজ করেছে। আঁতোয়ান আর্তো প্রথম জীবনে ছিলেন ফিল্ম ও মঞ্চাভিনেতা, পরে ছবি তৈরির কাজে ব্রতী ও ব্যর্থ হন। ওঁর লেখার মধ্যে যেমন ছায়াছবির প্রভাব ছিল তেমনি স্বয়ং অ্যাপলিনেয়রের কোনো কোনো লেখার মধ্যেও। এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ উদাহরণ অবশ্যই কবি ও চলচ্চিত্রকার জ্যঁ কখ্তো (Jean Cocteau)। কখ্তো সেই ব্যতিক্রমী শিল্পীদের মধ্যে সম্ভবত প্রথম যিনি সিনেকবিতাও যেমন লিখেছেন তেমনি গড়েছেন কবিতাচিত্র। সাম্প্রতিককালে, বিশেষত ১৯৯০-এ ও একুশ শতকে এসে, হয়তো মাল্টিমিডিয়ার কারণেই সিনেকবিতার উদাহরণ বেড়েছে। ফরাসী কবি অলিভিয়ের কাদিও (Oliver Cadio) ও আরো তরুণতম কবি পীয়ের আলফেরি (Pierre Alferi, যিনি পরীক্ষাসিনেমার রচয়িতাও) দুই উদাহরণ। সাম্প্রতিককালে ইরানের বিখ্যাত পরিচালক আব্বাস কিয়েরোস্তামিও (Abbas Kiarostami) কবি। জর্মানী, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, তুরস্ক, ইরান —সর্বত্রই, সংখ্যায় খুব বেশি না হলেও, সিনেকবিতার প্রচলন বেড়েছে।

বাংলা সিনেমার গোড়ার দিক থেকেই কয়েকজন কবি সিনেমা জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। নজরুল একটি বা একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় উদাহরণ প্রেমেন্দ্র মিত্র। যিনি চিত্রনাট্য লেখা শুধু নয় স্বয়ং ছবি পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এটা ভয়ংকর বিস্ময়কর যে প্রেমেন মিত্তির কবিতা ও চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণ দুঘরে করে রেখেছিলেন— যেন মিশে গেলেই বিপদ। ওঁর ছবিতে কবিতা যেমন নেই তেমনি কবিতায় চলচ্চিত্র। অথচ, প্রেমেন্দ্র মিত্রর একাধিক গল্পের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই (তিনি নিজে কবি বলে) কবিতার প্রবণতা ও চারিত্রিকতা ছিল। এবং তাঁর একাধিক কাহিনিকে ঘিরে বাংলার অন্তত তিনজন চিত্রপরিচালক অসামান্য কিছু ছায়াছবি গড়ে তোলেন। সত্যজিত রায় প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাহিনি অবলম্বনে করেন 'কাপুরুষ', পূর্ণেন্দু পত্রী করেন 'স্বপ্ন নিয়ে', সেই একই কাহিনিকে অবলম্বন ক'রে পরে মৃণাল সেন করেন 'খণ্ডহর'। অথচ প্রেমেন্দ্র নিজে সিনেমা জগতের পুরবাসী হওয়া সত্ত্বেও, নিজে চিত্রনাট্যকার ও কখনো পরিচালিক হওয়া সত্ত্বেও, খুব মোটাদাগের গড়পড়তা রুচির ছবিঘরেই থেকে গেলেন।

সম্ভবত প্রথম সফল বাংলা সিনেকবিতা এসেছে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর হাত ধরেই। একই সঙ্গে এসেছে কবিতাচিত্র। সে অর্থে বুদ্ধদেবকে হয়তো বাংলার কখ্‌তো বললে খুব অত্যুক্তি হয় না। অত্যন্ত সার্থক এক বাংলা সিনে দীর্ঘ কবিতা লেখেন সুব্রত সরকার। ওঁর বইদীর্ঘকবিতা 'ফারেনহাইট ৪৫১ ডিগ্রি' ত্রুফোর ছবির দ্বারা অনুপ্রাণিত। একইভাবে অমিতাভ মৈত্র-র বহু কবিতা চলচ্চিত্র প্রণোদিত। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর পদানুসরণে কোনো কোনো তরুণ কবি পরীক্ষাসিনেমা নির্মাণে নেমেছেন। কম বাজেটের স্বল্প দৈর্ঘ্যের ছবি করলেও এঁদের কাজে কোথাও কোথাও কবিতা ও সিনেমা এক ঘনমিশ্রণে পরিণত হয়।

উল্টোভাবে ভাবলে 'কবিতাচিত্র' —যা মূলত ফিল্ম, কবিতার রেণুমাখা। কিভাবে কোথায় সে কবিতার রেণু সেটা অবশ্য পাঠকের/ গ্রাহকের/ দর্শকের রুচির ওপর নির্ভর করবে। ফলে কারো কাছে অ্যালফ্রেড হিচককের Vertigo স্রেফ থ্রিলার মনে হবে কারো কাছে প্রত্যন্ত কবিতা।

কিন্তু কোন কোন মৌল থাকলে পোয়েম-ফিল্ম? Poetic cinema বা poetic film বলে কিছু বর্ণক চলচ্চিত্রের মানুষজন বারেই বারেই ব্যবহার করেছেন। কিন্তু *পোয়েম-ফিল্মের বিশিষ্টতা এখনো বেশ অস্বচ্ছ। তবে কাকে বলা যায় কবিতাচিত্র?*

(অ) যে ছবি কোনো কবিতাকে অবলম্বন করে?

(আ) কবি বা কবির জীবন বা জীবনের ঘটনা দিয়ে গড়া ছবি?

(ই) যে ছবির চিত্রনাট্যে কবিতার ব্যবহার রয়েছে?

(ঈ) দৃশ্যগত বিমূর্ততা যে ছবির প্রধান উপজীব্য?

(উ) নাকি যে ছবির চিত্রভাষা—তার শটভাগ, দৃশ্যপরিকল্পনা, ক্যামেরা ও লেন্সের আলো ও ছায়া, সঙ্গীত, সংলাপ ও শারীরভাষায় বিশেষ ব্যবহার কবিতার ভাষাকে মনে করায়।

হয়তো এর সবকটাই পোয়েম-ফিল্ম বা হয়তো নয়

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর চিত্রকবিতা

বিশ শতকের মাঝামাঝি, মূলত কৃত্তিবাস ও শতভিষার কবিদের প্রযোজনায় যে নবীকৃত, পুনর্মুক্ত বাংলা আধুনিক কবিতার ঘূর্ণিজল ঘনিয়ে উঠেছিল, ১৯৬০ -এর দশকের কবিতা তারই স্রোতানুসরণে জন্ম নিয়েছিল আরো বহুমাত্রিক রূপে ও প্রণালীতে, শৈল্পিক অভিব্যক্তিতে, বহু সাহিত্য-ঐতিহ্যে। সেই সময়ের কবিরা যেমন দূরতর, অনালোকিত বন্য পশ্চিমের কবিতা থেকে প্রেরণা নিয়েছিলেন, তেমনি ভগ্নপ্রাণ দেশের সামাজিক-রাজনৈতিক ঘনঘটা থেকেও। এই লগ্নেই বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বাংলা কবিতার জগতে প্রবেশ করেন ওঁর প্রথম বই 'গভীর এরিয়েলে'র (১৯৬২) মাধ্যমে। কিছুকাল পরে প্রকাশ পায় 'কফিন কিংবা সুট্যকেস' (১৯৭১)। সে কালের গহ্বরে যে ক্রমবর্ধমান হট্টগোল ও ঊষ্মা দানা বাঁধছিল তারই প্রভাবে একাধারে তীব্র সৃষ্টিশীল, ততোধিক বিচ্ছিন্নতাকামী, ও প্রচলবিরোধী কিছু সাহিত্য আন্দোলন গড়ে উঠছিল। শৈল্পিক মুক্তিকামিতার এই বলবান ও প্রতিযোগী আবহাওয়ার মধ্যেই বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবি-কণ্ঠস্বর এক সুস্থির সমাজসচেতনার বাতাবরণ বহন করে আনে।

একেবারে প্রথম থেকেই সংবেদনশীল চিহ্নবহন বা বিস্ফোরক কথকতার দিকে না ঝুঁকে, এক স্বতন্ত্র, শব্দময় নিস্তব্ধতায় বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত জোর দিয়েছিলেন সাধারণ মৌখিক ভাষার কবিতায়, যা তাঁর সমসাময়িক ভাস্কর চক্রবর্তী, সুব্রত চক্রবর্তী, ও শামশের আনোয়ারের মতোই পাঠককে বুনে দিয়েছিল এক আন্তরিক, বিবেকী আত্মসমীক্ষার আবহ। *কফিন কিংবা স্যুটকেস* বইয়ের একটি কবিতা, যা লাইব্রেরি বা গ্রন্থাগার বিষয়ক, সেখানে লিখছেন—

লাইব্রেরি

গত বছর দিনের পর দিন তুমি ঘুরে বেড়িয়েছ এক
বিশাল লাইব্রেরির ভেতর, অনেক
অনেক, অনেক দিন চারপাশে সারিসারি অজস্র হাসির বই দেখে
হাসতে হাসতে খিল ধরে গিয়েছিল পেটে, শেষে

তুমি বুঝতে পারলে এইসব বইয়ের ঘৃণ্য ভূমিকা, যা মানুষকে
নিজেরই থুতু গিলে ফেলতে শেখায়;
টেকনলজির বই, মিনিবুক, সাইকোলজির বই, হরস্কোপ, চিঠি
মানুষের হাত মেলে ধরল তার চোয়াল, তার ঠোঁট
নড়ে গেল ফরফর করে খাটের ওপর
খাটের তলায়, বন্ধুর সামনে আর
সাংঘাতিক পড়াশোনা করল মানুষ দমবন্ধ করে, তবু
সবকিছুর শেষে তো সেই বিষ

এইমাত্র যা বমি করেই রাস্তার কুকুর সরে যাচ্ছে দূরে

'লাইব্রেরি' যেন এই প্রহসনী দুনিয়ার বিশ্বাসঘাতক অপতথ্যের আধার যা মানুষকে বিষিয়ে আত্মপ্রসাদী করে তোলে। অনলংকৃত সাধারণ গদ্যভাষা বুদ্ধদেবের কবিতার একটি মৌলিক চরিত্র নির্মাণ করেছিল তখনই, যা ১৯৬০-এর দশকের কাব্যভাষার সাঙ্গে সমতা রাখে। রূপকথার সহজ গদ্যধর্মীতায় ও গদ্যছন্দে বুদ্ধদেবের কাব্যস্বর ধ্বনিত করেছিল সমাজ-সমালোচনা, অস্তিত্ববাদী হতাশা, আবার একইসঙ্গে পুনরুত্থিত আশাকে। ওঁর প্রথমার্ধের চলচ্চিত্রভাষার ভেতর এই মৌলগুলিরই আনাগোনা। ওঁর কবিতার প্রথম দুদশকের কাব্যসম্ভার ধরা পড়েছে কিছু অপরিত্যাজ্য কাব্যগ্রন্থে—*গভীর এরিয়েলে, কফিন কিংবা স্যুটকস, হিমযুগ (১৯৭৮), ছাতা কাহিনী (১৯৮২)* প্রভৃতি।

'রোবটের গান' (১৯৮৬) একটা বড় বাঁকবদল নিয়ে আসে বুদ্ধদেবের কবিতায়। পরিবর্ধিত উপমার নভোমণ্ডলে এসে উপস্থিত হয় ওঁর কবিতা; অধিবাস্তবতা (surrealism) ও *উপরিবাস্তবতা*র (hyperrealism) এক সম্ভাবনাময় সমন্বয়ে গলে মিশে যেতে থাকে স্বপ্ন ও বাস্তব, ইঙ্গমার বেয়ারম্যানের ছবি 'পার্সান'র দুই নায়িকা দু-মুখের মতো একীভূত হয়ে। উত্তরাধুনিক সাহিত্যে যে আত্মপ্রতিফলন প্রবৃত্তি দেখা যায়, সেই গুণাবলিরও কিছুটা ধরা পড়ে এই বইয়ের কবিতায়। 'কালকের কথা'য় বুদ্ধদেব লিখছেন—

আশ্চর্য লাগে ভাবতে এত বড় একটা বদল
কীভাবে ঘটল।
জীবনের, স্বপ্নের ওপারে গিয়ে এই জগতকে
মেনে নিতে অনেকটা সময় লাগলো।
ভালো।

এই রোবটের জীবন ভালো।
প্রায়শই আমি ভাবি
কে আমাদের পরিচালিত করে।
আমি তার পদধ্বনি শুনতে পাই। শুনতে পাই তার গান
তার ভয়াবহ, ধাতব কণ্ঠ, তার অদ্ভুত বকুনি।
কিন্তু আমি তাকে কোনোদিন দেখিনি।

পরিবর্তনহীন, একঘেয়ে যান্ত্রিক মূল্যধরা জীবনে মানুষ আর নিজেকে মানুষ ভাবে না, ভাবে সে এক রোবট। অথচ সেই রোবট কিন্তু একঘেয়ে বাস্তব ও মাহুর্তিক, বিমূর্ত স্বপ্নের মিশ্র স্রোতে এক তুরীয় অস্তিত্ব খুঁজে পায়। *রোবটের গান* থেকে যে ধরনের কবিতা বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত লিখতে শুরু করেন তারই ট্রেডমার্ক রয়েছে ওঁর পরবর্তী বহু কবিতার বইতে— শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৯০), ভোম্বলের আশ্চর্য কাহিনী ও অন্যান্য কবিতা (১৯৯২), বেঁচে থাকা জিন্দাবাদ (২০১৮) ইত্যাদি।

প্রতিমা নির্মাণ কবিতাশৈলির এক অন্যতম অভিমুখ। বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের কাছে শৈলির এই দিকটা ছিল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর দুই বৃত্তিতেই, কবিতা ও সিনেমার দুই ভাষাবলয়েই, তিনি এই কাজটা করেছেন পরম যত্নে ও ঈর্ষণীয় স্বকীয়তায়। অধিবাস্তবতা ও উপরিবাস্তবতা, দুয়েতেই লুকোনো ও বর্ধিত রূপকের ব্যবহার রয়েছে। এই ধাঁচের রূপক মূল ও তুল্যের মধ্যে একদিশার সম্পর্ক তৈরি করে না, বরং অবচেতন মনের নানা ফাটলের মধ্যে নানা রূপ ধারণ ক'রে চুঁইয়ে প্রবেশ করে। এর ফলে 'অর্থ' এমন এক বহুগামিতা পায় যা অন্যথায় অসম্ভব। এই প্রবৃত্তি বুদ্ধদেবের দ্বিতীয়ার্ধের কবিতার স্পর্শকাতর জমি আলোকিত করে রেখেছে। বেঁচে থাকা জিন্দাবাদ বইয়ের কবিতা 'একটা বল' যেমন। এখানে একটা বল হয়ে উঠেছে সেইরকম এক বহু-অর্থ রূপক। বল এখানে টেনশনবাহক, আবার একইসঙ্গে এক রহস্যময় পর্যবেক্ষক, অনুসরণকারী, এক নিসর্গচিহ্ন, এমনকি হারিয়ে ফেলা পৃথিবীটার প্রতীকও হয়তো।

একটা বল

একটা বল তোমাকে সারাদিন খুঁজে বেড়ায়
সারাদিন তুমি খুঁজে বেড়াও একটা বল
আর বৃষ্টি পড়তে থাকে জানলার বাইরে
বৃষ্টি পড়তে থাকে ল্যাম্পোস্টের ভেতর
বৃষ্টি পড়তে থাকা বাইশতলার বারান্দায়

হাত মেলে দেওয়া
মুখ মেলে দেওয়া
চুল এলিয়ে দেওয়া
একটা শরীরের ওপর
বৃষ্টি পড়তে থাকে জানালার এপারে
বিছানার ওপর, খাটের তলায় লুকিয়ে থাকা
তোমার চটিজোড়ার ওপর
এসবের মাঝখানেই আলো ফুরিয়ে যায়
অন্ধকারের ভেতর আমি তোমাকে দেখতে পাই না
তুমি কী আমাকে দেখতে পাও?
শুনতে পাও?
শুনতে পাও সেই বলের শব্দ?
আমাকে এখনো খুঁজে বেড়াচ্ছে সেই বল।
শুনতে পাচ্ছ অন্ধকার বৃষ্টির শব্দের মধ্যে
আমার হাত হাতড়ে বেড়াচ্ছে একটা বল।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর কবিতাচিত্র

প্রথাগত নিরিখে বলা যায় কবিতার অনেক কাজের একটা দৃশ্যব্যঞ্জনা তৈরি করা। ছবির বুননের কুশলিতা অনুযায়ী অনেক ছবিকে 'কাব্যিক' আখ্যা দেওয়া হয়। উদাহরণস্বরূপ প্রথমেই মনে পড়বে ল্যুই ব্যুনিউয়েলের ও সালভাদর দালির ছবি 'আঁ শিয়েন আন্দাল্যু'র সেই অতি-আলোচিত দৃশ্য যেখানে চাঁদ ছিঁড়ে যাওয়া মেঘের সমান্তরাল দৃশ্যে একটা ছুরি দিয়ে এক মহিলার চোখ চিরে দেওয়া হয়। আরো মনে পড়বে ইঙ্গমার বেয়ারম্যানের *ক্রাইস অ্যান্ড হুইস্পার্স*-এ এক পরিবারের চার নারীর প্যারাসোল মাথায় হেঁটে যাওয়া; *সেভেন্ত সীল*-এ মৃত্যুর সঙ্গে নাইটের দাবা খেলা, অ্যাঞ্জেলোপুলাসের নানা ছবিতে সাগরপাড়ের দৃশ্যগুলো যেখানে কল্পনা, কবিতা, সঙ্গীত ও দৃশ্যব্যঞ্জনার সনাটিনা চলতে থাকে। ফরাসী আলোকচিত্রী ও চলচ্চিত্রকার ম্যান রে, বন্ধু কবি হ্রবেয়েরা দেনোর কবিতা 'লেতোয়ল দে মের' বা 'দ্য স্টারফিস' নিয়ে একটা ছবি করেন। একই নামের। অধিবাস্তববাদী বা সুররিয়ালিস্টিক কবিতাকে পর্দায় ধরতে গিয়ে ম্যান রে ক্যামেরাকে কিছুটা অফ-ফোকাস ক'রে সমস্ত শটের মধ্যে একটা ঝাপসা চরিত্র আনেন। একটা সীনে ঘরের মধ্যে এক নারী ও পুরুষ সময় কাটায়। তারা কী করে, মোটামুটি বোঝা গেলেও সবটা ধরা যায় না। এই স্বেচ্ছারোপিত চিত্র ও ধ্বনিগত বিমূর্ততা

কবিতার ভাষাকে পর্দায় জীবন দেবার কারণেই। এইরকম বিশিষ্টতার মাধ্যমেই রচিত জিরি মেন্‌জল, ওয়ার্নার হার্জগ, রাইনার ওয়ার্নার ফাসবিন্দার, ক্লাউদিয়া য়োসা, তাসোস ব্যুলমেতিস, আলফানোস আরাউ প্রমুখের ছবির নানা দৃশ্য। এই দৃশ্যিক বিমূর্ততাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? বাস্তবের বয়ান যেখানে তার স্পষ্টতা, অখণ্ডতা ও ক্রমিকতা হারাচ্ছে, যেখানে তাকে সময় ও ভূগোলের মাধ্যাকর্ষণে আর বাঁধা যাচ্ছে না —এমন এক দৃশ্য যার আয়োজন ও প্রেক্ষা দর্শকের কল্পনার ইল্যাস্টিক টানছে —সেখানেই সাধারণ অর্থে সিনেমা 'কবিতা' হয়ে যাচ্ছে। চলচ্চিত্রের কাব্যিক মুহূর্তের কথা আমরা শুনি। বেশিরভাগ সময়েই লক্ষ্য করা যায় যে সমস্ত মুহূর্ত গড়ে উঠেছে তাঁদের-ই ছবিতে যাঁদের অধিকাংশই কবি নন আর সে সমস্ত ছবি কবি যা কবিতাকে অবলম্বন করে না। এ প্রসঙ্গে সত্যজিৎ রায়ের কথা আসবেই। মৃণাল সেনের 'ভুবন সোম', 'খণ্ডহর', ঋত্বিক ঘটক, জন আব্রাহাম, আদুর গোপালকৃষ্ণন, গিরিশ কাসারাভাল্লি, কুমার সাহানি, গুলজার, মণি কাউল, কমল স্বরূপ, জি অরবিন্দন, শ্যাম বেনেগাল প্রমুখ ও আরো কিছু ভারতীয় পরিচালকের কিছু ছবির অংশে কবিতার মুহূর্ত রচিত হয়েছে নিশ্চয়। ছবিতে কবিতার ব্যবহার বিষয়ে বিদেশী পরিচালকদের তালিকা স্বভাবতই আরো দীর্ঘ, কিছু প্রিয় পরিচালকের নাম করলাম—ল্যুই ব্যুনিউয়েল, আলাঁ রেনে, সের্গেই পারাঝানভ, ঝাক রিভেত, জ্যঁ-লুক গোদার, মায়া দেরেন, জ্যঁ ভিগো, স্ট্যান ব্র্যাকেজ, তেও অ্যাঞ্জেলোপুলাস, ক্রিস্তফ কিসেলস্কি, খ্রিস মার্কার, ম্যানোয়াল দি অলিভেরা, উইম ওয়েন্ডার্স, য়ান ট্রোয়েল, মজিদ মজিদি, ক্লাউদিয়া য়োসা, গাই ম্যাডিন, য়োঙ্গ কার ওয়াই, লার্স ফন ট্রিয়ার্স, তাসোস ব্যুলমেতিস প্রমুখ। আমরা তালিকা থেকে স্বভাবতই বাদ পড়লেন পূর্ণেন্দু পত্রী, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, জ্যঁ কখতো, পিয়ের পাসোলিনি, *চিলের কবি আলেহান্দ্রো যদোরস্কি* ও আব্বাস কিয়েরোস্তামি। কারণ এঁরা সকলেই উল্লেখযোগ্য কবি। সেটা এঁদের ছবির চিত্রভাষা থেকেই আমরা বুঝতে পারি। ছবির আধেয়ের চেয়েও ছবির নিজস্ব ভাষাটা *কিভাবে* কবিতার ভাষার সমতুল্য হয়ে উঠতে পারে— রূপক বা মেটাফর বা সিমিলি *কিভাবে একজন* চিত্রনির্মাতা *নির্মাণ* করেন, কিভাবে চিত্রভাষার ব্যকরণ ও শব্দভাণ্ডারকে পাল্টান —এসবের ওপরেই তাঁর কবিতাচিত্রের গুণাগুণ নির্ভর করে অনেকটা।

বাংলা সিনেমার গোড়ার দিক থেকেই কয়েকজন কবি সিনেমা জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখতেন। নজরুল একটি বা একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন। কিন্তু তাঁর চেয়েও বড় উদাহরণ প্রেমেন্দ্র মিত্র। যিনি চিত্রনাট্য লেখা শুধু নয় স্বয়ং ছবি পরিচালনা করেছেন। কিন্তু এটা ভয়ংকর বিস্ময়কর যে প্রেমেন

মিত্তির কবিতা ও চলচ্চিত্রকে সম্পূর্ণ দুঘরে করে রেখেছিলেন— যেন মিশে গেলেই বিপদ। ওঁর ছবিতে কবিতা যেমন নেই তেমনি কবিতায় চলচ্চিত্র। অথচ, প্রেমেন্দ্র মিত্রর একাধিক গল্পের মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই (তিনি নিজে কবি বলে) কবিতার প্রবণতা ও চারিত্রিকতা ছিল। এবং তাঁর একাধিক কাহিনিকে ঘিরে বাংলার অন্তত তিনজন চিত্রপরিচালক অসামান্য কিছু ছায়াছবি গড়ে তোলেন। সত্যজিত রায় প্রেমেন্দ্র মিত্রর কাহিনি অবলম্বন করেন 'কাপুরুষ', পূর্ণেন্দু পত্রী করেন 'স্বপ্ন নিয়ে', সেই একই কাহিনিকে অবলম্বন ক'রে পরে মৃণাল সেন করেন 'খণ্ডহর'। অথচ প্রেমেন্দ্র নিজে সিনেমা জগতের পুরবাসী হওয়া সত্ত্বেও, নিজে চিত্রনাট্যকার ও কখনো পরিচালক হওয়া সত্ত্বেও, ওঁর ছবি আজ দেখা যায় না।

ওঁর কবিতাজীবনের মতোই বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর চলচ্চিত্রজীবন শুরু হয়েছিল সমাজ-রাজনৈতিক এক সচেতনতা, সংবেদনশীলতার মধ্যে দিয়ে। সমাজসচেতন তার যে ধারা সত্যজিত রায়, মৃণাল সেন, ঋত্বিক ঘটক, নিমাই ঘোষ শুরু করেছিলেন তারই এক প্রসারণ ধরা পড়ে প্রথমার্ধের বুদ্ধদেবে। *দূরত্ব* ছবির নায়ক মন্দার এক অস্তিত্ববাদী চরিত্র। সে স্পর্শকাতর, শিক্ষিত, বুদ্ধিজীবী, অধ্যাপক কিন্তু কোথাও যেন ক্রমাগতভাবে বিযুক্ত। সমাজবিচ্ছিন্ন। এখানেই আসছে তার অস্তিত্ববাদীতা। ১৯৬০ থেকে ১৯৮০-র দশকের শেষপর্যন্ত বহু সমান্তরাল আন্তর্জাতিক ছবিতে এই অস্তিত্ববাদী প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। এমনকি এটাও মনে রাখতে হবে যে সত্যজিত রায়ের *প্রতিদ্বন্দ্বীর* নায়ক সিদ্ধার্থও (ধৃতিমান চট্টোপাধ্যায়) কিছুটা সমাজবিচ্ছিন্ন এক চরিত্র। 'দূরত্ব' ছবিতে একটা সূক্ষ্ম নারীবাদের দিকও ধরা পড়ে। মমতাশংকরের চরিত্রে, নিঃশব্দে। সে জারজ সন্তানের জন্ম দেয়, স্বামীকে ঠকিয়েছেন ব'লে অপরাধবোধে নিজেই সরে আসেন, স্বাবলম্বী হতে চাকরির খোঁজ করেন, প্রবঞ্চিত স্বামীর প্রতি গোপন মমতা পুষে রাখেন। অন্যদিকে মন্দারও তার স্ত্রীর সামাজিক অবস্থানের অসহায়তা বুদ্ধি দিয়ে স্বীকার করতে পারে, সহানুভূত হতে পারে, তবু তাকে নিজের কাছে টানতে ব্যর্থ হয়। মন্দারের সঙ্গে আলব্যের কাম্যুর বিখ্যাত অস্তিত্ববাদী উপন্যাস 'ল্যেত্রাঁঝের' বা ইংরেজি অনুবাদে 'দ্য আউটসাইডার'-এর নায়ক মেরসোর একটা মিল পাওয়া স্বাভাবিক। ১৯৮০-র দশকে কলকাতায় আমরা আর একটি ছবি দেখি, কুরান ছবি, তমাস আলেয়ার পরিচালনায় একমুন্দো দেসনোয়েসের প্রথম উপন্যাস— *মেমরিজ্ অফ আন্ডারডেভলপমেন্ট* (ইংরেজি অনুবাদে)। 'অনুন্নয়নের স্মৃতির' নায়ক সের্হিও-ও মন্দারের মতো, মেরসোর মতো সমাজ-বিযুক্ত অস্তিত্ববাদী ব্যবধানে বেঁচে থাকতে চায়। পরবর্তীকালেও কিন্তু আমরা দেখবো, বুদ্ধদেবের প্রায় সমস্ত ছবির প্রায়

সমস্ত কেন্দ্রীয় পুরুষচরিত্ররাও কিছুটা থেকে অনেকটাই সমাজবিযুক্ত থেকে যায়। হয় তারা বিচ্ছিন্নতাকামী, নয় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে সমাজযন্ত্রের চাপে। তারা সংযুক্ত হতে অক্ষম, সংসারে থেকেও সংসারী নয়, কখনো রাজনৈতিক আদর্শে, কখনো সমাজনৈতিক প্রবণতায়, শৈল্পিক আদর্শে, ব্যক্তিগত স্বপ্নে, তারা মূলধারা থেকে পিছলে পড়ে একাকী নির্জনতায়।

চরাচর-এ দেখি পাখিধরা নায়ক বিযুক্ত; পাখি ধরে, ধ'রে ছেড়ে দেয়। স্ত্রীকে ভালোবাসে কিন্তু তার ভরণপোষণ নিয়ে ভাবতে ভুলে যায়। 'তাহাদের কথা'র শিবনাথ আজকের বাস্তবকে মেনে নিতে পারছে না, একে তার ঠগ, জোচ্চর, দুর্নীতিপরায়ণ মনে হয়। আরো পরের ছবি *আনোয়ার কা আজব কিস্‌সা*-র কিছু পূর্বে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর একটা সাক্ষাৎকার নিচ্ছিলাম আমরা ক'জন কৌরব পত্রিকার তরফ থেকে[১]। বুদ্ধদা সেই সাক্ষাৎকারে হঠাৎ বলেন— 'একদিন একটা ডিটেকটিভ গল্প পড়ছিলাম, মনে হল আচ্ছা গোয়েন্দা তে ফ'লো করে অন্যদের, সে কি নিজেকে ফ'লো করতে পারে না?' সেই ভাবনা থেকেই এসে যায় 'আনোয়ার কা আজব কিস্‌সা।' সেই প্রটাগনিস্টও একইভাবে অনেকটাই সমাজবিচ্ছিন্ন তার চিন্তাজগতে। এই একাকীত্ব ও বিচ্ছিন্নতা প্রসঙ্গে আমরা এখানে এক অদ্ভুত দ্বন্দ্বকেন্দ্রে এসে পড়ি। এটা প্রত্যেক চলচ্চিত্রকারের ক্ষেত্রে সত্যি, যাঁরা কবি। কবি কাজ করেন একা, নির্জনে। কবিতা সদলবলে রচনা করা যায় না। যাঁরা বাংলায় কবি হিসেবে জনপ্রিয় ছিলেন, যেমন ধরা যাক শক্তি চট্টোপাধ্যায়, তাঁরা প্রায় সর্বক্ষণই বন্ধুবেষ্টিত, কিন্তু লেখার সময় নির্জন। অথচ চলচ্চিত্র যৌথশিল্প। সেখানে একা কাজ করা যায় না। যাঁদের পীপ্‌ল-স্কিল নেই, প্রশাসনিক দক্ষতা নেই তাঁদের পক্ষে চলচ্চিত্র পরিচালনা অসম্ভব, কেননা সেখানে অনেক লোককে নিয়ে কাজ করতে হয়। কাজেই এইখানেই একটা বিরোধের জায়গা তৈরি হয় কবি-পরিচালকদের। বিশেষত বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর মতো পরিচালকদের যাঁরা অস্তিত্ব বাদীতার বিষয়টার প্রতি আকৃষ্ট। এ বিষয়ে বুদ্ধদেব আমাকে বলেছিলেন তিনি পারতেন ভিড়ের মধ্যেও নিজেকে একা করে নিতে। *গৃহযুদ্ধ, অন্ধি গলি, ফেরা* —এই সমস্ত ছবিতেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের মধ্যে এই বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা আমরা লক্ষ্য করি। ফেরা-র নায়কের চরিত্রের মধ্যে ঘটছে সমাজের পাশাপাশিই এক সমান্তরাল ব্যক্তিগত অবক্ষয়।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর দ্বিতীয়ার্ধের ছবি, আমার মতে, শুরু হচ্ছে ১৯৮৯ সালে নির্মিত *বাঘবাহাদুর* ছবি দিয়ে। এই ছবির ভাষায়, এমনকি কাহিনি নির্মাণে রূপক, বর্ধিত, বিবিধ রূপক (extended metaphor) গড়ে উঠেছে। বর্ধিত রূপক সাধারণত বহু ভাবনা বা অর্থের আধার যা এক প্রত্যন্ত উত্তরাধুনিক ব্যবহার।

উত্তরাধুনিক সাহিত্য-শিল্পচর্চায় একটি সৃষ্টিশীল কাজের গুণাগুণ নির্ধরিত হয় তার অর্থময়তার বিস্তৃতির ওপর। এই চারিত্রিকতা পরবর্তীকালে বুদ্ধদেবের ছবির মধ্যে অনবরত আসতে থাকে। এখানে অন্য এক বুদ্ধদেব—বুদ্ধদেব বসুর একটি বক্তব্যের সারমর্মের অবতারণা করি। রবীন্দ্রনাথের 'সোনার তরী' কবিতা প্রসঙ্গে বু-ব বলেছিলেন যে কোনো পাঠক যদি ধরে নেন নাবিক হলেন মহাকাল, কৃষক কবি এবং শস্য তার সারাজীবনের সাহিত্যসম্ভার, কবিতার অপমৃত্যু হয় সঙ্গে সঙ্গে। বড় সৃষ্টিকে অতিরিক্ত সরলীকৃত করে তার মর্মোদ্ধার করতে গেলে তার নিগূঢ় সম্ভাবনাকে নষ্ট করা হয়।

কবিতাচিত্রের খামির একজন চিত্রপরিচালকদের মধ্যে কীভাবে কাজ করে তার কয়েকটা নমুনা বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের নানা লেখা, সাক্ষাৎকারে পাওয়া যায়। গদ্যধর্মী ছবি নির্মাণের ক্ষেত্রে স্বাভাবিকভাবে গল্পটাই ছবি তৈরির মূল অনুপ্রেরণা। কিন্তু কবি-চলচ্চিত্রকাররা অন্যভাবে অন্য সূত্র থেকে অনুপ্রেরণা পান। সেটা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আসে মাহুর্তিক অনুভূতি ও অনুভব থেকে। যেমন বুদ্ধদেব কৌরব পত্রিকাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন একবার একটি ফাঁকা ফ্ল্যাট দেখতে গিয়ে ফ্ল্যাটের দরজা খুলেই উনি নিজের ছেলেবেলার একটা মাঠ দেখতে পান। সঙ্গে সঙ্গে দরজা বন্ধ করে ফিরে আসেন। আসার পথেই ওই দৃশ্যিক কল্পভাবনা থেকে *চরাচর* ছবির ভাবনাটা মাথায় এসে যায়। একইভাবে খানিকটা, *মন্দ মেয়ের উপাখ্যান*-এ একটা দৃশ্যে একটি গাছের গায়ে লেগে থাকা ঘুণ পরিবারের চলাচল অনেকক্ষণ ধ'রে দেখানো হয়। বুদ্ধদেব এই প্রসঙ্গে বলেছিলেন লাঞ্চব্রেকের সময় ওই গাছ ও ঘুণ ওঁর নজরে আসে এবং তখনই উনি ঠিক করে ফেলেন দৃশ্যটা রাখবেন। এই সমস্ত অনুপ্রেরণার নেপথ্যে সবসময় কোনো যুক্তি কাজ করে না। করে একটা টান, নেশা। কবির যে নেশা শব্দের, ব্যঞ্জনার কাছে দায়বদ্ধ। চিত্রচর্চির কাছে সেটা দৃশ্যের, প্রতিমার। এ প্রসঙ্গে ইঙ্গমার বেয়ারম্যানের কথা মনে পড়ে যাবে। ওঁর *ক্রাইস অ্যান্ড হুইস্‌পারস্‌* ছবির চিত্রনাট্য শুরু হয় একটা চিঠি দিয়ে। চিঠিটা নিজে লিখেছেন ছবির কলাকুশলীদের উদ্দেশ্য করে। লিখেছেন— এ ছবির সমস্ত ঘরের সেট হবে লাল রঙের নানা শেড দিয়ে। কেন? কারণ শৈশবে ওঁর স্কারলেট ফিভার হতো খুব, জ্বরের সময় উনি চোখ বন্ধ করে নিজের শরীরের অভ্যন্তরটা কল্পনা করতেন। দেখতে পেতেন নানা মাত্রার রক্তবর্ণের দেহযন্ত্র। বুদ্ধদেবও বেয়ারম্যানের ছবির দ্বারা অনুপ্রাণিত। একই সাক্ষাৎকারে বলছেন বেয়ারম্যানের একটা লেখার কথা যেখানে সুইডিশ পরিচালক বলেছেন— একদিন একটা ট্রেনে যাচ্ছি; একটা স্টেশন ট্রেনটা সামান্য এক মিনিট থামলো, আমি দেখলাম একটা বেঞ্চে দুই তরুণী একে অন্যের হাত

ধরে বসে আছে চুপ করে। এর থেকেই ওঁর বিখ্যাত ফিল্ম *পের্সোনা*-র ভাবনাটা আসে।

মিসঁ-না-বীম (mis en abyme) বা সৃষ্টির-ভেতর-সৃষ্টি বা ফিল্ম-উইদিন-আ-ফিল্ম ভাবনার ব্যবহার বুদ্ধদেব দাশগুপ্তের ছবিতে এক আশ্চর্য স্বপ্নময় আকার অর্জন করেছে। ওঁর শেষের দিকের দুটো ছবির প্রসঙ্গে আসি— *স্বপ্নের দিন* (২০০৪) ও *আমি ইয়াসিন আর আমার মধুবালা* (২০০৭)। দুটি ছবিরই নায়ক প্রসেনজিৎ। দুটো চরিত্রই সমাজবিচ্ছিন্ন এক স্বপ্নদর্শক। একা থাকে মূলত, বন্ধুসমাজ নেই, জীবনে প্রেম নেই।

স্বপ্নের দিন-এর নায়ক সরকারী চাকুরে। প্রাপ্তবয়স্কদের শিক্ষার প্রসারে সে তার এক সঙ্গীকে নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরে। তার কাছে একটা সিনেমার দেখানোর যন্ত্র রয়েছে— একটা প্রোজেক্টার। চলচ্চিত্রশিল্পের মৌল এখানে এই প্রোজেক্টর বা অভিক্ষেপক। সেই অভিক্ষেপক একসময় চুরি যায়। সরকারী সম্পত্তি চুরি গেলে চাকরী চলে যাবার সম্ভাবনা। তবু নায়ক চিন্তিত হয়ে পড়ে তার মনের এক স্বপ্নবিপর্যয় নিয়ে। যেসব তথ্যচিত্র সে আর তার সঙ্গী গ্রামের মানুষদের দেখায় সেই চিত্রের কোনো একটাতে এক নারীচরিত্র আছে যে নায়কের মনোপ্রেমিকা। তাকে ঘিরেই তার নিজস্ব স্বপ্নের রোমান্স। অভিক্ষেপক হারালে সেই মেয়েটিও হারালো। এখানে রূপালি পর্দা ও চলচ্চিত্রশিল্পকে ঘিরে যে স্বপ্নময়তা সাধারণ দর্শকের মনে দানা বাঁধে সেইস্বপ্নকেই একটি চলচ্চিত্র-যন্ত্রের প্রকোষ্ঠে প্রোথিত করা হচ্ছে। আসছে ছবি ভ্রূণের মধ্যে ছবির অন্য একটি ভ্রূণ। সিনেমার অভ্যন্তরে সিনেমা। মিসঁ-না-বীম।

আমি ইয়াসিন আর আমার মধুবালা-য় একই ভাবনার ব্যবহার কাছাকাছি হলেও আরো অভিনব ও নাটকীয়। এই ছবির নায়কের জীবনে প্রেম আসেনি কখনো অথচ প্রেম ভাবনা জন্মায় প্রতিনিয়ত, রূপালী পর্দার এক নায়িকাকে ঘিরে— মধুবালা। একদিন তার সামনের ফ্ল্যাট ভাড়া নিয়ে এক তরুণী আসেন। তিনি ছবিতে নামার চেষ্টায়। কোনো এক নিম্নরুচি, সস্তা ছবিতে এটা নাচের দৃশ্য নিয়ে শুরু করবে সে। আইটেম সং। তার নিজের ঘরে রোজ সন্ধ্যায় আয়নার সামনে ছবির সেই নাচটা সে অভ্যাস করে। এদিকে নায়ক একদিন তার ঘরের ইলেকট্রিক সুইচবোর্ড সারাই করার ছলে আয়নার ওপর একটা স্পাইক্যাম বসিয়ে দিয়ে গেছে। সেই ক্যামেরার তার দেয়ালের ফুটো দিয়ে চালিয়ে দিয়েছে ওপাশে নিজের ঘরে। মেয়েটিকে সে সারাদিন ওই স্পাইক্যাম দিয়ে নিজের ঘরের ল্যাপটপে দেখে। তার নাচ দেখে। এই আশ্চর্য রূপকিতার মাধ্যমে বুদ্ধদেব এই ছবিতে মানুষের ঈক্ষণকামিতাকে ব্যবহার করেছেন স্বপ্নাকাঙ্ক্ষার জায়গাটা ধরতে। নায়কের

মনের নারী রূপালী পর্দার নায়িকা মধুবালা। আর তার বাস্তব জীবনে যে নারী পড়শি হয়ে এসেছে, সেই নারীপ্রতিমাটাও নিজের কম্প্যুটারে পর্দার ওপর ফেলে সে যেন মধুবালাকেই পুনরুজ্জীবিত করতে চায়। দুই ঘরের মাঝে যে দেয়াল সেটা যেন অস্বচ্ছ হয়ে যায়। ঈক্ষণকামিতার মধ্যে একটা যৌনশোষণ থাকে। কিন্তু নায়ক সেদিকে যায় না। মেয়েটি যখন রাতে যাবে বলে পোশাক খুলতে থাকে, নায়ক স্পাইক্যামটা বন্ধ করে দেয়।

বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত যে এক দশক আগে একসময় 'বুদ্ধদা'য় পরিণত হন আমার কাছে, সেটা সম্পূর্ণই কবি শংকর চক্রবর্তী কারণে। এবং পরে আমাদের তরুণ বান্ধবী বুদ্ধ-সহমর্মিনী সোহিনী দাশগুপ্তর জন্য। মৃত্যুর মাস কয়েক আগে একটা লেখা চাওয়ার ব্যাপারে শেষ কথা হয় বুদ্ধদার সঙ্গে। সেদিন অনেক কথা হয় খুব খোলামনে। ওঁর শরীরটা অপেক্ষাকৃত ভালো ছিল। একসময় জিজ্ঞেস করলেন— বলবার মতো কী ছবি দেখলে সম্প্রতি। তখন ওঁকে প্রবীণ পোর্তুগিজ পরিচালক মানোয়েল দে অলিভেরা-র *'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ অ্যাঞ্জেলিকা'*র কথা বলি। দে-অলিভেরা ছবিটা বানিয়েছেন ১০১ বছরে বয়সে। কাহিনি সারসংক্ষেপ এরকম— তরুণ পেশাদার, আলোকচিত্রী ইসাক একদিন রাত্রে একটা ফোন পায়। বিয়ের রাত্রে এক যুবতী আচমকা মারা গেছে; ফিউনারালের পূর্বে যে ভিসিটেশন হয়, সেই উপলক্ষে মৃতা বধূর ছবি তুলে দিতে হবে। ছবি তুলতে গিয়ে সে দেখে কফিনাবদ্ধ বধূবেশী মৃতার ঠোঁটের কোণে এক আশ্চর্য করুণ, মধুর হাসি। সে ছবি তুলে দিয়ে আসে। একটা ছবি নিজের জন্য রেখে দেয়। মৃতার মুখটা সে ভুলতে পারে না। তার নাম ছিল অ্যাঞ্জেলিকা। সে ইসাকের স্বপ্নে ঘুরে ফিরে আসতে থাকে, তাদের অল্পবিস্তর দেখা হতে থাকে। কাউকে বলেনা ইসাক। এক রাতে তার ঘাম দিয়ে ঘুম ভাঙে, ধুম জ্বর হয়তো, কে যেন তার ছোট্ট ঘর-সংলগ্ন বারান্দার দরজা ধাক্কাচ্ছে। দরজা খুলে দেয় ইসাক। বধূবশী অ্যাঞ্জেলিকা বারান্দায়। সে ইসাকের হাত ধরে তাকে তুলে নিয়ে যায়, ভাসতে ভাসতে তাদের নির্ভর আলিঙ্গনী দেহ আকাশের সুদূর অদৃশ্যে মিলিয়ে যায়। বুদ্ধদা উত্তেজিত হয়ে বলে ওয়েন—'বাঃ! বাঃ! কী সুন্দর আর্যনীল! এই তো, ছবি এই রকম হবে।' দুবার কথাটা বলেন। তারপর এটা-সেটা নিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ ওঁর কিছু কথা মনে পড়ে যায়। সেবার ভেনিস চলচ্চিত্র উৎসবে ওঁর ছবি গেছে। শেষ মুহূর্তে পৌঁছেছেন। জেট-ল্যাগের মধ্যে সেদিন সন্ধ্যায় প্রযোজক, পরিচালক, শিল্পীদের পার্টি। একটা টেবিল বুদ্ধদেব ও কিছু বিদেশী চলচ্চিত্রকার। লাল মদের সরবরাহ সুপ্রচুর। সে মদ খেলে একটু ঘুম ঘুম পায়, তার ওপর জেট-ল্যাগ। বুদ্ধদেব প্রায়ই ঢুলে পড়েছেন। আর সামনে বসা অতিবৃদ্ধ মানোয়েল দে অলিভেরা

বুদ্ধদেবকে অনেক কথা বলছেন *চরাচর* সম্বন্ধে, ওঁর ভালোলাগার কথা। অতীতের সেই সংলাপ দিয়ে বুদ্ধদাকে একটু লিখতে বললাম কৌরবের জন্য। উনি কথা দিলেন। এর কয়েক সপ্তাহের মধ্যে ভর্তি হলেন হাসপাতালে। ফিরে এলেন ঠিক, কিন্তু লেখাটা হল না। আরো দু মাস পর বুদ্ধদেব চলে গেলেন অ্যাঞ্জেলিকার দেশে। হয়তো দে-অলিভেরা ওখানেই ওঁকে ছবিটা দেখিয়েছেন —এ কথা একদিন সোহিনীকে বলছিলাম, সে বিষণ্ণ গলায় বললো— *'দ্য স্ট্রেঞ্জ কেস অফ অ্যাঞ্জেলিকা* আর *'আনোয়ারকা আজব কিস্‌সা'* যেন একই কাহিনি, না?'

লেখক পরিচিতি :

আর্যনীল মুখোপাধ্যায় দ্বিভাষিক কবি, প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সম্পাদক ও আন্তর্জাল-তত্ত্বাবধায়ক। বাংলা ও ইংরেজি মিলিয়ে ওঁর ১৫টি গ্রন্থ।

কৌরব অনলাইন পত্রিকা সম্পাদনা করেন। পেশা- কারিগরি গণিত।

গোলাপ এখন রাজনৈতিক

হিন্দোল ভট্টাচার্য

সকলকে নমস্কার জানিয়ে আমার কিছু ভাবনা রাখতে চলেছি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পর্কে। প্রথমত, এই শিরোনামটি এমন দিলাম কেন, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতেই পারে। শিরোনামটি নেওয়া ২০০৭ সালে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের একটি ছোট এক ফর্মার বই 'গোলাপ এখন রাজনৈতিক' থেকে। মনে হয়, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের আজীবনের যে সাধনা ও জার্নি, তার একটা সারাংশই এই শিরোনাম। 'বন্ধুরা বিদ্রুপ করে, তোমায় বিশ্বাস করি বলে'—যে অলোকরঞ্জনীয় আধ্যাত্মিক চেতনার সংলাপের কাছে আমাদের নিয়ে যায়,তা যেমন সত্য, তেমন সত্য পরবর্তীকালে উপসাগরীয় যুদ্ধের সময় তাঁর আর্তি। শরণার্থী সমস্যায় তিনি বারবার ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ করছেন, অনুরোধ করছেন, পারমাণবিক ভস্মে যে পৃথিবী ডুবে যাচ্ছে, তা নিয়ে সংশয় প্রকাশ করছেন, এবং তাঁর পূর্বের মরমিয়া আধ্যাত্মিক চেতনার সঙ্গে একধরনের দ্বন্দ্বের মধ্যেই অবতীর্ণ হয়েছেন। তাঁর কবি ও ভাবুক সত্তার মধ্যে আধ্যাত্মিক চেতনার অংশ হিসেবেই যে সৌন্দর্যবোধ চিরকালীনতার অংশ, তার সঙ্গে অসুন্দরের বিরোধ হচ্ছে। সেই দ্বন্দ্ব তাঁর 'গিলোটিনে আলপনার' পরবর্তী সময়ের কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে প্রকট হচ্ছে।

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত সম্পর্কে বলতে পারি তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের শেষ ধ্রুপদী পুরুষ। কবিতার ক্ষেত্রে তা বটেই। যে কাব্যভাষার কথা বারংবার তাঁর সম্পর্কে উঠে আসে, তার মধ্যে 'যৌবনে বাউল' থেকে শেষ কবিতার বইটি পর্যন্ত বারবার ভাষা বদলের নজির আমরা পেলেও একটি কথা স্বীকার করতেই হবে, অলোকরঞ্জনের কোথাও একটা ধ্রুপদী এসরাজ বেজে চলত সেই প্রথম থেকে শেষ অবধি। যেমন, প্রথম দিককার কবিতার মধ্যে কারুকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েছিল ভক্তি এক আর্তি, যেমন, প্রথম দিককার কবিতার মধ্যে রিখিয়ার সোঁদা গন্ধের সঙ্গে মিশে গেছিল দীপির দাং-এর মাদল, তেমন ছিল একপ্রকার ঈশ্বরচেতনাও। যে ঈশ্বরচেতনাকে আমরা অলোকরঞ্জনের ব্যক্তিত্বের এক অবধারিত শর্ত হিসেবে ধরতে পারি। স্বাভাবিক ভাবেই, প্রশ্ন আসে, তবে কি অলোকরঞ্জন নিজেই পরবর্তীকালে সরে গেছেন তাঁর এই আস্তিক অনুসন্ধানের রাস্তা থেকে? যে-ভাবে অনেকে ভাবেন 'ভক্তি'-র অলোকরঞ্জনীয় স্থির শান্ত পুকুরের সৌম্য তরঙ্গ থেকে তিনি বেরিয়ে গিয়েছেন পরবর্তীকালে, তা একপ্রকারে তাঁর আধ্যাত্মিক অবনমন, সেক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতেই পারে, তাতে কবিতার কী? কিন্তু তার পাশাপাশি

এ প্রশ্নও উঠে আসে, ভক্তি কি একমাত্রিক চলচ্ছক্তিহীন এক বিষয়? অলোকরঞ্জন তাঁর 'জবাবদিহির টিলা' কাব্যগ্রন্থে তার সাক্ষ্য রেখেছেন বলে মনে হয়, যেখানে, তিনি প্রায় পোস্টমর্টেমের মতো নিজের আস্তিক্যবোধের সঙ্গে কথোকপথন করে গেছেন। শুধু 'জবাবদিহির টিলা' কেন, 'গিলোটিনে আলপনা'-এর পরবর্তীকালের সমস্ত কাব্যগ্রন্থেই এই আত্ম-সন্দর্ভ রয়েছে, যা বাংলা কবিতায় সাধারণ ভাবে অনুপস্থিত। প্রাচীন ও মধ্যযুগের লাতিন সাহিত্য 'Suasoriae' বলে যে কারুকৃতি নির্ভর কাব্যধারা দেখা গিয়েছিল, সেখানে কোনও একটা গৃহীত বিষয়কে নিয়ে কবিরা তাঁদের বাগ্মিতা প্রকাশ করতেন। তাঁরা নিজেদের একটা প্রদত্ত পরিবেশে স্থাপন করে বিশেষ ধরনের একটা বাকভঙ্গিতে নিজ নিজ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতেন। এই বাকভঙ্গি অলোকরঞ্জনের কাছেও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। অলোকরঞ্জনের এই বাকভঙ্গিকে অনুসরণ করলে অনকেই ভাবতে পারেন এটি এক ধরনের রোমান্টিক কাব্যবিস্তার। অর্থাৎ রোমান্টিকতার যে আবহ, তা থেকে কবি তাঁর আবহকে কখনওই আলাদা করেননি। কিন্তু প্রশ্ন এখানে এই যে, এই মনে হওয়াটি কতটা সত্য এবং বাকভঙ্গির আড়ালে বিভ্রান্ত? যেহেতু অলোকরঞ্জন তাঁর ধ্রুপদী অলংকৃত কান্না, অলংকৃত চিৎকার, উপমায় নিমজ্জিত ঘৃণা থেকে না বেরিয়ে, সেই সব প্রকাশভঙ্গিকেই অনেক বেশি তীক্ষ্ণ করে তুলেছেন সুন্দরের অভ্যর্থনায়, তাই, সেই সুন্দর যদি বাহ্যিকভাবে সুন্দর এবং অন্তরে নাশকতা ঘটায়, তাহলেও কি আমরা তাকে রোমান্টিকতার দেব বা দেবীর ভূমিকায় স্থাপন করব? বিশেষ করে যখন আমরা এ কথা জানি যে রাজনৈতিক দর্শন সেই 'যৌবন বাউল' লেখার আগে থেকেই অলোকরঞ্জনের মধ্যে অঙ্কুরিত হয়েছিল। অর্থাৎ নব্বই দশকের আশেপাশে সোভিয়েতের পতন, উপসাগরীয় যুদ্ধ, শরণার্থী সমস্যা অলোকরঞ্জনের সেই অন্তরের অন্তঃস্থলে থাকা সামাজিক সাম্যের স্বপ্ন দেখা একজন পথিকের ভিতরে অনুঘটকের কাজ করেছে মাত্র, তাহলে মনে হয় ভুল বলা হয় না। এ প্রসঙ্গে প্রামাণ্য তথ্যের অবতারণার আগে আমরা আরেকটু দেখে নেব তাঁর এই বিখ্যাত কবিতাটিকে—

"বন্ধুরা বিদ্রূপ করে তোমাকে বিশ্বাস করি বলে;
তোমার চেয়েও তারা বিশ্বাসের উপযোগী হলে
আমি কি তোমার কাছে আসতাম ভুলেও কখনো?

চারিদিকে অন্ধকার, দেখতেও চায়না ওরা কিছু,
কী-যেন দূরে শব্দে মাঝে-মাঝে সামনে গিয়ে পিছু
ফিরে এসে বলে ওরা শোনেনি দূরের শব্দ কোনো!

ওরা কেউ কারো নয়, ওরা ঘরে ঘরে
মৃত্যুর অপেক্ষা নিয়ে প্রতিদিন মরে।

আমি যে কোথায় যাব, কখন...কোথায়...
এই ভেবে আমারো বেলা অবেলায় যায় ডুবে যায়।

এখনো তোমাকে যদি বাহুডোরে বুকের ভিতরে
না পাই, আমাকে যদি অবিশ্বাস দুই পায়ে দলে
চলে যাও, তাহলে ঈশ্বর
বন্ধুরা তোমায় যেন ব্যঙ্গ করে নিরীশ্বর বলে।।" (বন্ধুরা বিদ্রূপ করে)

এইখানে যে আর্তি, তা নিশ্চিত ভাবে একজন আধুনিক মানুষেরই অন্তর্দহন, যিনি তাঁর আস্তিক্যবোধের সঙ্গে কথোপকথনে রত। এখানে 'বন্ধুরা' কি তাঁর নিজের ভিতরেই থাকা সত্তা নয়? পরবর্তীকালে আবার এই আধ্যাত্মিকতার এক সম্পূর্ণ ভিন্ন কারুকৃতিতে (অলোকরঞ্জন কারুকৃতিকেই ধ্রুপদী বলেছেন) লেখা কবিতাও আমরা পাচ্ছি, যাকে এই আস্তিক্যবোধের এক ভিন্ন তলের আর্তি বলতে পারি আমরা—

১

তুমি এসো বার্লিনের দুদিক থেকে
অবিভক্ত শাদা-কালো খঞ্জন আমার
ছৌ-কাবুকির ছদ্মবেশে
চূর্ণ করে দাও যতো অলীক সীমান্ত
আমি যদি কৃত্রিম প্রাচীর গড়ি
মৃদু পক্ষাপাতে ভেঙে দিয়ো
ডানার অটুট রাখো ভাঙে যদি আমাদের প্রেম।

২

উত্তর অতলান্তিকে বৃষ্টি হলে
তোমার-এখানে কেন রৌদ্র হবে
জানি তুমি ডোরাকাটা স্বাতন্ত্র্য কায়েম রাখবে বলে
থেকে-থেকে কীরকম অচেনাসমান হয়ে যাও
এমনকি কেঁপে ওঠা তোমার ডানায় যদি হাত রাখি।।

(মুক্তি, ছৌ-কাবুকীর মুখোশ)

লিরিক্সের মধ্যে দিয়েই যেন প্রাণ পেত অলোকরঞ্জনের ভাষা। তিনি যখন পরবর্তীকালে রূঢ় বাস্তবতার নিপুণ বিস্তারের মধ্যে ডুব দিয়েছেন, তখনও এই

লিরিকাল বিস্তারকেই আমরা খুঁজে পাই অন্ধকারের রূপায়ণেও। এ বড় সহজ কাজ নয়। এইভাবে অন্ধকারকেও লিরিকাল আঙ্গিকে চেতনার রূপ খুঁজে পেতে অমরা দেখেছি রিলকের মধ্যে বা ইয়েটসের মধ্যে, যেখানে এলিয়ট সমস্ত লিরিকাল চেতনাকে ছেড়ে হয়ে উঠেছেন ভীষণ ভাবে রূক্ষ। অথচ ব্যক্তিত্বের মূল সুরটিকে বুঝতে ইয়েটসের চেয়ে এলিয়টের মধ্যেই যেন বা অলোকরঞ্জনকে খুঁজে পাওয়া যায় বেশি। অথচ দুজনের কাব্যকৃতির ব্যক্তিত্ব আলাদা। কিন্তু ভাবনার অন্তর্দ্বন্দ্বের সুরটি এক। এলিয়টও ক্রিশ্চিয়ান দর্শনে প্লাবিত, লেখায় ছত্রে ছত্রে বাইবেলের এক এক প্রসঙ্গ, আবার তিনিই দেখছেন কী নিরাসক্ত ভাবে সন্ধ্যা নামছে অচেতন এক রোগীর মতো। অথবা কীভাবে ইউরোপ থেকে উঠছে ওয়েস্টল্যান্ড। একটি ধ্বংসস্তূপের কবিতা হয়ে উঠেছে 'হলো মেন' যেখান 'দাইন ইজ দ্য কিংডাম' না বললে, 'বিটুইন দ্য আইডিয়া অ্যান্ড দ্য রিয়ালিটি ফলস দ্য শ্যাডোর' জগতের মধ্যে হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে প্রচুর। আবার কবিতাটি শেষও হয় এক ভয়ংকর বিভ্রান্তির মধ্যে 'দিজ ইজ দ্য ওয়ে দ্য ওয়ার্ল্ড এন্ডস, নট উইথ এ ব্যাং, বাট এ হুইম্পার।' এই দোলাচল থেকেই তিনি কোরাসের ফ্রম দ্য রকের কাছে যান। আর এই দোলাচল থেকেই অলোকরঞ্জন লেখেন

"দ্বিতীয় ভুবন রচনার অধিকার
দিয়েছ আমার হাতে—
এই ভেবে আমি যত খেয়াপারাপার
করেছি গভীর রাতে,
প্রতিবার তরী কান্নায় শুরু হয়
কান্নায় ডোবে জল,
হাসিমুখে তবু কেন হে বিশ্বময়
তোমার তরণী চলে?
তারপর তীরে ফিরে আসি নিরালায়
মূর্খনেশায় ভাবি,
দূর থেকে তুমি আসবে অধীর পায়ে
বলবে : 'আমার দেশে
তারো সেই খেয়া উজানে গিয়েছে ভেসে,
ফিরিয়ে আনতে যাবি?'
উত্তর দেব : সেই তরী তুমি নাও,
ছিন্ন সে-পাল তুলে,
আজ তুমি শুধু একবার পাড়ি দাও

এ নদীর কালো চুলে;
দেখি কোন্ ফুলে প্রফুল্ল কর তার
শোকার্ত শর্বরী,
এই পারে আমি বাসী ফুল তুলি আর
বালির পসরা করি।" (অপূর্ণ)

অসুন্দর এবং সুন্দর দুইই ক্ষণস্থায়ী এ আমরা জানি। কিন্তু যদি সেই সুন্দর বাইরের সৌন্দর্য না হয়ে সত্যের সৌন্দর্য হয়, তাহলে তা ক্ষণস্থায়ী হতে পারে না। কিন্তু সত্য তো অনেকরকম। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত একদিকে যেমন সুন্দরের মাধ্যমে সত্যের উপাসক, তেমন, সেই সত্য যদি মানুষের হিংস্র রূপের রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্বে গড়ে ওঠে, তবে তাকে রাজনৈতিক ভাবে মোকাবিলা করতেও জানেন। কিন্তু ঈশ্বরের প্রতি তার যে অভিযোগ সেই সংক্রান্ত বিষয়ে, তা তাঁর নিজস্ব ঈশ্বরচেতনারই এক অংশ। সেখানে তিনি ঈশ্বরের সঙ্গে বাদানুবাদে লিপ্ত হন, এই অমানবিক পরিস্থিতির জন্য দোষারোপও করেন। সেক্ষেত্রেও অলোকরঞ্জনের আস্তিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। কিন্তু এই যে ট্রান্সফর্মেশন, সেটি কি একেবারেই 'গিলোটিন আলপনার' পরবর্তী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের বৈশিষ্ট্য? না কি, তাঁর এই কাব্যিক ও দার্শনিক অভিপ্রায় আগে থেকেই ছিল? এ প্রসঙ্গে আমরা শুনে নিতে পারি, তাঁরই কিছু কথা।

"আমি শুধু এখানে শান্তিনিকেতনের কথাই বলব না, শান্তিনিকেতনের আগের যে পর্বটা, এবং শান্তিনিকেতনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত যে পর্বটা, রিখিয়ার যে পর্ব, সাঁওতাল পরগণা, যেখানে ইভ্যাকুয়েশনের সময় আমরা ছিলাম, আমাকে ভীষণ ভাবে আলোড়িত করেছে, কিন্তু শান্তিনিকেতন সম্পর্কে আমি যখনই লিখেছি, তখনই একটা কথা আমি খুব স্পষ্টভাবে বলতে চেয়েছি যে আমি একজন আশ্রমিক, এরকম কোনও সংস্কার আমার মধ্যে কখনও দেখা দেয়নি, কারণ, শান্তিনিকেতনে যাবার কিছুদিন পরই, বলা যায় গান্ধীজির মৃত্যুর পরেই, আমি মার্কসবাদী হয়ে গিয়েছিলাম। পার্টি তখনই নিষিদ্ধই বলা যায়। আমি তখন পার্টির তরুণতম কর্মী হিসেবে গ্রামগুলি ঘুরে ঘুরে কাজ করতে গিয়ে গ্রামবাংলাকে চিনেছিলাম। কাজেই শান্তিনিকেতনে একটা স্থিতিকেন্দ্র রেখে চারপাশে যে পরিক্রমার মধ্যে দিয়ে আমার দীক্ষা হয়েছে, তা আমাকে পরবর্তীকালে সাহায্য করেছে, একই সঙ্গে জড়ানো যে পর্বটা, কলকাতা—এই শান্তিনিকেতন, রিখিয়া এবং কলকাতার ট্রিলজি হচ্ছে 'যৌবনবাউল'।" সুজিত সরকারকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই

অংশ। এই অংশ থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার, পরবর্তীকালে অলোকরঞ্জন দেশ এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির যে টালমাটাল অবস্থার মধ্যে যাচ্ছিলেন এবং যার প্রভাবে তিনি পরবর্তীকালে ঈশ্বরের দিকে প্রশ্নই ছুঁড়ে দিচ্ছেন বলা যায়, সেই বীজটিও প্রথম থেকেই ছিল। অর্থাৎ তাঁর চিন্তায় যে ঈশ্বর রয়েছেন, তিনি তাঁর চেয়ে আলাদা কেউ নন, আবার আলাদাও। তিনি তাঁর সঙ্গে কথা বলছেন, অভিযোগ করছেন এবং ভেঙেও পড়ছেন তাঁর নিজের ভিতরের সেই ঈশ্বরের প্রতি প্রশ্নহীন বিশ্বাসের ভিত্তি টলে যাচ্ছে বলে। কিন্তু তিনি বলবেন কাকে? বলবেন তো তাঁর নিজের ঈশ্বরকেই। তাই তাঁর সমস্ত কবিতাই হয়ে যাচ্ছে তাঁর নিজের ঈশ্বরের সঙ্গে কথোপকথন। এ ব্যাপারটিকে শঙ্করাচার্য বলছেন 'স্বস্বরূপানুসন্ধান'। 'ভক্তি' প্রসঙ্গে অলোকরঞ্জনেরই 'ভক্তিরসের কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধ থেকে একটি অংশ না তুললে হয়তো তাঁর চিন্তায় ঈশ্বর ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে যাবে—"তাহলে নিজেকে খোঁজা মানেই উপাস্যকেও খোঁজা। আর তার মানেই, নিজেকে যেমন কখনো পাবার উপায় নেই, তেমনি, ঈশ্বরকে পেয়ে যাওয়া কিংবা পেয়ে গিয়ে দ্রবীভূত হয়ে পড়ার মধ্যেও তেমন-কোনও কৃতিত্ব কিংবা গৌরব নেই। নিজেকে যদি একবার কোনও মাহূর্তিক সৌভাগ্যে অর্জন করাও যায়, পরমুহূর্তেই আবার নিজেকে বিভক্ত করে আস্বাদন করার চেষ্টা। ভক্তের কাজই বিভক্ত হওয়া, পুনর্মিলিত হওয়ার বাসনা বা হতে না পারার যন্ত্রণাটা অবশ্যই সেখানে আমাকে জাগিয়ে রাখছে, জ্বালিয়ে রাখছে—কিন্তু সেটা নিঃশর্ত প্রেরণা, মোক্ষ নিয়ে অবশ্য অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে। এইসব কবিতার পর্যায় প্রদর্শন করতে গিয়ে কেউ কেউ এর নাম রেখেছেন অদ্বৈত মরমিয়াবাদ (Unitive Mysticism)। সুফী কবি অত্তারের 'পাখিদের সংলাপ' কবিতাটির কথাই ধরা যাক। যখন উপকূলচর একটি পাখিকে আর-সব পাখিরা প্রশ্ন করলে, রাজার প্রাসাদে যাবার রাস্তাটা কত লম্বা, তখন পাখিটা বললে সাত-সাতটা উপত্যকার মধ্যে দিয়ে সেখানে সকলকে যেতে হয়, কিন্তু যেহেতু কেউ-ই সেখানে গিয়ে আর ফিরে আসে না, আমরা সে-পথের রোমাঞ্চ বা দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে কিছুই জানতে পারি না। অত্তার অবশ্য সপ্তম উপত্যকাটিকে বললেন, 'অহংধ্বংসের উপত্যকা'—যেখানে জীবাত্মা গিয়ে বিশাল অর্ণবে মাছের মতো ডুবে যায়।' কিন্তু ওই সিন্ধুতে না মিশে গিয়েও আরেকরকম মরমী মার্গ থাকতে পারে, আছে। তার নাম 'মারিয়া পরিণয়' (Epithalamium Mysticism)। বিবাহের প্রথম কথাটি হল ব্যক্তিত্বের পার্থক্য এবং অতঃপর এই পার্থক্যের উপরেই একটি অন্বয়ের সাধনা। দু-জন যদি প্রথমত বিচ্ছিন্ন না হয়, মিলবে কিসের ভিত্তিতে? দাম্পত্য সংরাগে যদি অভিমানের লেশমাত্র না থাকে, যদি

ভুল বুঝবার এতটুকু সুযোগ না থাকে, তবে সে কেমন বিবাহ? কোনও মরমী দার্শনিক একেই বলেন 'ব্যক্তিত্বের পুনর্বিন্যাস' অথবা অন্তরের কোরকে (Germtit) পরমের সঙ্গে সসীমের মিলন।" 'ভক্তি' সংক্রান্ত এই ভাবনা যাঁর তাঁকে মিলনের জন্যই যে বিচ্ছিন্ন হতে হবে, এ বিষয়ে তো আর সন্দেহ থাকার কথা নয়। কারণ সাধারণভাবে ভক্তি মানেই যে আমরা কেবল একটা ভাসা ভাসা মরমিয়া ভাবনার কথা আমরা ভাবি, তাকে অলোকরঞ্জন জীবন দিয়ে পালটে দেওয়ার কথাই ভেবেছেন। প্রসঙ্গ আরেকটু জটিল হচ্ছে 'যৌবনবাউল' লেখার আগে তাঁর ভাবনার ভিতর আধ্যাত্মিকতার মার্গের পাশাপাশি মার্কসীয় দর্শন এতে গভীরভাবে ঢুকে পড়ায়। কারণ তাঁর নিজেরই বক্তব্য অনুসারে, পার্টির কাজেই গ্রামবাংলার মানুষের কাছে যাওয়ার লক্ষ্যে তিনি ঘুরে বেরিয়েছেন বিভিন্ন জায়গায়। অর্থাৎ মার্কসবাদ শুধুমাত্র তাঁর বৌদ্ধিক স্তরের ব্যাপারই ছিল না। তিনি তাকে চর্চা এবং লড়াইয়ের একটি কৌশল হিসেবে নিজের মনে ও অস্তিত্বে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। সেই অর্থে সালংকারা কাব্যভাষার অধিকারী অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের কবিকৃতিকে একটু ভিন্নধর্মী বামপন্থী কবি বলতেই পারি, যিনি অনুশাসনের নয়, শুনেছেন চেতনার আহ্বান। এ কথা ভাবা তবে যেতেই পারে, যে নিষিদ্ধ কোজাগরীর আধ্যাত্মিক দ্বন্দ্বের মধ্যে একপ্রকার রাজনৈতিক দ্বন্দ্বও মিশে ছিল।

সুন্দর ও কার্ল মার্কস প্রসঙ্গে একটি প্রবন্ধে অলোকরঞ্জন বলছেন, "প্রচলিত ভারতীয় মার্কসীয় সমালোচকরা প্রায়ই একটা মারাত্মক ভুল করেছেন। তাঁরা ভেবে নিয়েছেন 'ব্যক্তি' ব্যাপারটাই একটি অস্বস্তিকর অলীক ধারণা, যেন তাকে যে করেই হোক না কেন অ্যাবস্ট্র্যাক্ট যূথচারিতায় পর্যবসিত হতে দিলে ভালো। 'ক্যাপিটাল'-এর ভূমিকাশেষে দান্তে থেকে তাঁর উদ্ধৃত সেই পংক্তি— 'যা খুশি বলে বলুক লোকে তোমার আপন পথে চলো', তাঁর 'অর্থনৈতিক ও দার্শনিক খসড়া ১৮৪৪' বইতে এই 'আপন পথ' ও মার্কসীয় মহাযানের মধ্যে একটি যোগাযোগ তৈরি করার উদ্যোগ আছে। তাঁর যুক্তিধারা এই রকম—মনে কর মানুষ হল মানুষ এবং তার সঙ্গে জগতের যোগসূত্রও মানবিক। তাহলেই ভালবাসলে ভালবাসা পাবে, বিশ্বাস করলে বিশ্বাস। যদি শিল্প সম্ভোগ করতে চাও, শিল্পশীলিত হতে হবে; যদি অন্য মানুষের উপর প্রভাব ছড়াতে চাও, তাদের সঙ্গে উদ্দীপিত আচরণ করতে হবে। তোমরা প্রত্যেকে অপরাপর মানুষ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হয়ে উঠবে বিশেষ একটি প্রকাশ তোমাদের যথার্থ কাম্যবস্তু, তোমাদের যথার্থ ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে।"

একদিকে সুন্দরের আহ্বান করেছেন এবং আরেকদিকে এক নিজস্ব ইউটোপিয়া তৈরি করছেন, ঈশ্বর নিজেই তৈরি করছেন এক সুন্দর সাম্যবাদী সমাজ। আর

এই বেলা অবেলা কালবেলা স্বরূপ সন্দর্ভ যখন বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে তখন থেকে শুরু হচ্ছে অলোকরঞ্জনের এক বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহ এক নান্দনিক বিদ্রোহ, সেখানে উচ্চকিত ধ্বংস নেই, বিস্ফোরণের শব্দ নেই, বরং এক সংবেদনশীল আধ্যাত্মিকতা মিশে যাচ্ছে বৃহত্তর চেতনায়। তিনি অবশ্যই ক্রমশ অসহায় হয়ে পড়ছেন (আমার বিশ্বাস কমিউনিজম এবং সোভিয়েতের পতনের পর, মার্কসবাদ অনুসরণকারীদের সাম্রাজ্যবাদী ও ফ্যাসিস্ট হয়ে পড়ার পরিপ্রেক্ষিতে তিনি নিজে একপ্রকার স্বপ্ন থেকেই চ্যুত হয়েছিলেন)। যেন তিনি নিজে স্বয়ং পৃথিবীর প্রতিনিধি, যিনি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন মানুষ, প্রকৃতি এবং পৃথিবীর অপমৃত্যু ঘনিয়ে আসছে। তিনি ডিসটোপিয়ার কবি নন। তিনি এক ইউটোপিয়ার কবি। সে জায়গা থেকে ধরলে আমৃত্যু তিনি কেন লিরিকাল অধ্যাত্মচেতনার সৌন্দর্য থেকে বেরিয়ে আসেননি, পরম অন্ধকারের শিল্প রচনা করতে করতেও কেন আলোর রেখা তাঁর কবিতার মধ্যে ফুটে উঠেছে, তা অনিবার্য এক সত্য হয়ে ওঠে। দীপকরঞ্জনের নেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে অলোকরঞ্জন বলছেন, "দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—'জীবনানন্দ বলছেন, এখন আমার মনে হয় যে মানুষ একটু বেশি ধ্বংসাত্মক আবার অন্যদিকে আমার মনে হয় মানুষের মধ্যে একটা দিব্যত্ব আছে। সব মিলিয়েই মানুষ। আজকে যে দিন যাপন করবে, তুমি যখন পৌঁছোবে তোমার কাজের জায়গায়, তোমার চারপাশে অনেক অমীমাংসিত সমস্যাকে রেখে তুমি পৌঁছবে সেখানে। তুমি যখন দীপকের (কবি দীপক রায়) সঙ্গে বসবে, এটা সমাহিতি তৈরি হবে আজকে সন্ধেবেলা। তুমি দেখবে যেতে-যেতে তোমার পাশের কামরায় লুটতরাজ হচ্চে, ধর্ষণ হচ্ছে, একজন শিক্ষককে ধরে মার দিচ্ছে। তুমি তো সবগুলো সমস্যার সমাধান করতে পার না, ঈশ্বর পারেন কিনা সেটা দ্বিতীয় প্রশ্ন। আমি মানুষের এই সীমাবদ্ধতার কথাটা খুব বেশি ভাবছি। ঈশ্বরকে নিয়ে আমার অভিমান আছে। ঈশ্বর যদি নাও থাকতেন তাহলেও আমার ঈশ্বর দরকার ছিল। একজন বড় অস্ট্রেলীয় কবি লুই মারে, তাকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম, আপনি বইটা ঈশ্বরকে উৎসর্গ করেছেন, তিনি কি আপনার Consturct? তিনি বলেছিলেন, আমি ঈশ্বরের Consturct। তিনি কিন্তু ভক্তির কবি নন। এই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমার এটাও মনে হচ্ছে, মানুষ হয়ে না জন্মালে আমি তো কবিতা লিখতে পারতাম না। ঈশ্বর আমাকে দয়া করেছেন কিন্তু এটাও হতে পারে একদিন আমি আর পারব না। ঈশ্বর পারবেন কিনা জানিনা।" আবার আরেকটি জায়গায় তিনি বলছেন, "আমাদের মধ্যে খাদ থাকেই কিন্তু হাতটা বাড়িয়ে আছি আলোকলতা ফুলের মতো আকাশের দিকে, আমি মানুষকে কখনোই পাতালের দিকে নিয়ে যাব না। এমনও হতে পারে, আমি বিপাকে পড়েছি

জানো, আমি সত্য থেকে সরে গেছি কিছুক্ষণের জন্য, সেটা চলতেই থাকবে কিন্তু কবিতায় আমাকে শুদ্ধ থাকতে হবে, কবিতায় আমকে একটা জায়গায় পৌঁছাতে হবে, যে জায়গাটা মনুষ্যত্বের প্রতিফলন। তার সঙ্গে সুন্দরের সোনার কাঠিটাও থাকবে, নইলে তাকে কবিতা বলে আমি স্বীকার করব না। এটা মধুসূদন দত্তের কবিতায় আছে অনেক সময়। চতুর্দশপদী কবিতাগুলোতে দেখবে, তিনি তাঁর শৈশবের স্মৃতির জায়গাগুলোতে বলেছেন, নবমী এসে গেছে...বোঝা যায় যে, চারপাশ সম্পর্কে তাঁর চেতনটা কাজ করছে। বড় মানুষদের নিয়ে যেমন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এঁদের নিয়ে তিনি অনেকগুলো কবিতা লিখেছেন। ওই কবিতাগুলোই বেশি। তাঁরা যখন তাঁর পিছনে দাঁড়ান, অনেক নৈরাজ্যের দিকে গিয়ে অনেক মদ খেয়ে ফেললেও তাঁদের প্রশ্রয়টা যে থেকে যায়—ওই যে, 'মানুষ কোথাকার!'

সুন্দর, ঈশ্বর এবং ব্যক্তিচেতনার যে জায়গাটি তিনি ধরতে চেয়েছেন, তাঁর কবিতায়, তা তাঁর আজীবনের কবিতার সাধনা। তার রূপ বদলেছে। বলার বিষয় বদলেছে। কিন্তু অন্তর্বস্তু বদলায়নি। আর এই কারণেই, তাঁর কবিতায় সুন্দরের রাজনীতির সঙ্গেই মিশে গেছে বিভিন্ন সময়ের রাজনৈতিক দৃশ্যপট। ভক্তিবাদের সঙ্গে এই যে অনন্য এক সেতু নির্মাণ হয়েছিল অলোকরঞ্জনের রাজনৈতিক বোধের, তাকে এক কথায় কী বলা যায়, তা আমি জানি না। কিন্তু এই চৈতন্যই তাঁকে অন্য সকলের চেয়ে আলাদা করে রেখেছিল। সুন্দরেরও যে রাজনীতি থাকে, হাসির ভিতরে বিষাদ এবং বিষাদের ভিতরে থাকে হাসি, আধ্যাত্মিকতার এক নতুন মাত্রা তিনি হাজির করেছেন তাঁর কবিতায়, ভাবনায়, জীবনদর্শনে।

লেখক পরিচিতি :

হিন্দোল ভট্টাচার্য নয়ের দশকের একজন উল্লেখযোগ্য কবি। ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'জগৎগৌরী' কাব্যের জন্য তিনি বীরেন্দ্র পুরস্কার পেয়েছেন। কবিতা লেখার পাশাপাশি তিনি গদ্য এবং উপন্যাস লেখেন। সম্প্রতি কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের ওপর তাঁর একটি গদ্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে 'শতকসন্ধির অলোকরঞ্জন' নামে। পেশা সূত্রে তিনি বিজ্ঞাপন জগতের সঙ্গে যুক্ত।

ক্ষিদ্দার কোচিং

(বক্তৃতার অনুলিখন)

অমিত রঞ্জন বিশ্বাস

আমি শেষ পনেরো বছর ধরে সৌমিত্রদাকে চিনেছি, জেনেছি অন্তরঙ্গভাবে। সেই সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় আমাদের ক্ষিদ্দা, আমার ক্ষিদ্দা। তবে শুধু আমার ক্ষিদ্দা বা mentor নন, হয়ে উঠেছিলেন অগ্রজপ্রতিম বন্ধু, পিতৃসম, সহযোগী এবং আরও অনেককিছু। পনেরো বছর প্রায় প্রত্যেকদিনই আমার বা আমার স্ত্রী পারমিতার সঙ্গে কথা হত তাঁর। কবি হিসাবে বা অভিনেতা হিসেবে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে সরিয়ে রাখলে, জানতে ইচ্ছা করবে— একেবারে মানুষ হিসেবে তিনি কেমন? কীভাবে তিনি নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছিলেন? আমি কয়েকটি point-এ বিষয়টিকে ধরার চেষ্টা করছি। তার আগে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয়ের কথা বলি।

আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল লন্ডনে। আমি আমার একটা কবিতার বই ওঁকে দিয়েছিলাম। তারপর স্কটল্যান্ডে ওঁর একটা নাটক দেখার আমন্ত্রণ জানান। এমন আহ্বানকে তো 'না' বলা যায় না। আমি আমার কাজ ছেড়ে, প্লেনের টিকিট না পাওয়ায় ট্রেনে করে আমি ও আমার স্ত্রী পারমিতা সেখানে যাই। আমার মনে আছে, সেই একটি রাতের-আড্ডা, একটা life changing experience। সারারাত আমরা আড্ডা মেরেছি। শেষরাতে স্কটল্যান্ডের পাহাড়ের উপর দিয়ে সূর্য উঠছে, উনি অকপটে আবৃত্তি করছেন 'শেষের কবিতা', আর ওঁর চোখ দিয়ে ঝরঝর করে জল পড়তে লাগল। এই স্মৃতিই হচ্ছে, আমাদের আলাপের প্রথম স্মৃতি। এর আগে 'মায়া' নামে একটি মিউজিক্যাল আমি ব্লুমস্‌বেরিতে করেছিলাম। যেখানে দ্বিস্তরীয় নাটকের মধ্যে একটি স্তরে নাটক, নাচ, রবীন্দ্রসংগীত এবং অপর স্তরে visual সব মিলিয়ে একটা multidimensional script। আমরা প্রশ্ন তুলেছিলাম—'Who is normal?' Child Psychiatrist হিসেবে আমার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে, আমরা কাজের অভিজ্ঞতা থেকে এই মিউজিক্যালটা তৈরি করা হল। সকালে breakfast -এর পর, সৌমিত্রদাকে আমি এটার একটা ছোট্ট অংশ দেখাতে পেরেছিলাম। দেখেই ওঁর চোখটা চকচক করে উঠল। উনি বললেন, 'আমায় script টা দাও।' দেওয়ার পরেই উনি বললেন, 'আচ্ছা, বাংলায় তুমি এরকম কিছু লিখতে পারো না?' শুনেই প্রথমে ভাবলাম আমার মতো অপোগন্ড একজনকে উনি এমন বলছেন! খানিকটা ভয় পেলাম, তারপর বললাম, দেখছি। উনি বললেন তিনটি জিনিস—

(ক) মনোরোগ নিয়ে লেখো। আমার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা আছে। শিল্পের মধ্যে দিয়ে আমি এই stigma টাকে challange করতে চাই।

(খ) আমার মেয়ে যেন একটা চরিত্র করতে পারে।

(গ) Multidimensionality script টা লেখো, যা নিয়ে কলকাতায় আগে কাজ হয়নি।

আমি ভেবেছিলাম— এমনিই হয়তো বলেছেন, আমি একটু দেরীই করেছিলাম। কিন্তু উনি ফোন করে করে, ধাক্কা দিতে দিতে শেষে 'হোমাপাখি' লেখা শুরু হল।

এবার আমি প্রথম Point-এ আসতে চাই যে, ক্ষিদ্দার কোচিং-এ আমি কী শিখেছিলাম? Self Development বা Self Growth নিয়ে প্রচুর বই লেখা হচ্ছে, সারা পৃথিবীতে। আমার পরিপ্রেক্ষিতে যদি বলি, Maslow'র 'Self Actualisation'র কথা যার structure টা ঠিক পিরামিডের মতো basic life থেকে স্তরে স্তরে মানুষের উত্তোরণ ঘটে transcendence-এর দিকে, তা আমি এই মানুষটিকে দিয়ে লক্ষ্য করেছি। যার মধ্যে প্রথম ছিল talent, তারপর hard Work, নিরলস, কঠোর, অনুশীলন এবং ক্রমাগত নিজের মধ্যে তার প্রয়োগ। এভাবে কিন্তু আর আমি কাউকে দেখিনি। বলতে গেলে উনি আমায় বহু গল্প বলেছেন। আমরা আমাদের আড্ডা কখনও record করিনি। আমাদের শেষ আড্ডা 'বাংলা Live' থেকে চার ঘণ্টার আলোচনা record করা হয়েছিল। যেখানে আমি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম তাঁর শিকড় কারা? তাঁর কাণ্ড কী? তাঁর ডালপালাই বা কী? তিনি বললেন, 'জানো, ছোটবেলায় আমি insecurity তে ভুগতাম। আমার গলাটা পাতলা ছিল। আমি Voice training করতাম। আমায় শিশিরবাবু শিখিয়েছিলেন অভিনয় মানেই হচ্ছে তিনটে জিনিস 'Voice first, Voice second and Voice third'। এমনকি মজা লাগে শুনতে উনি চুরুট খাওয়া শুরু করেছিলেন voice-এ grain আনার জন্য। 'হোমাপাখি' করার সময় দেখেছি কি পরিশ্রম ও অনুশীলন করেছেন। তিনি বলেছিলেন, 'এটা complex নাটক, নাটক করার আগে আমার নাট্যকারকে জানা দরকার।' তিনি এলেন আমার হাসপাতালে, আমার ছেলেমেয়েদের সঙ্গে খেলেন। দেখলেন কীভাবে আমরা সংযোগস্থাপন করি। কীভাবে সংযোগ ও বিশ্বাসের জমি তৈরি করি। প্রতিটি চরিত্রের খুঁটিনাটি দেখতেন। একটি পাকিস্তানী মেয়ে কীভাবে হিজাব পরবে, একটি মেয়ে কীভাবে নিজেকে উপস্থাপন করবে, যখন সে ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে আত্মহত্যার দিকে। আমার Diagonostic Bibel ICD–10 (International Classification of Disease) থেকে Bipolar Disorder নিয়ে পড়ে ফেললেন। প্রত্যেকটা সংস্কৃত শ্লোক তার মানে ও প্রতিটি কবিতা তিনি পড়ে ফেললেন।

আমার নাচের Perspective থেকে হাত কিভাবে কাজ করবে? পৌলমীর সঙ্গে বসে দেখে ফেললেন কোন নাচ কিভাবে প্রযুক্ত —এই খাটনি আমি তাঁর মধ্যে দেখেছি, নিরন্তর অনুশীলন, যার থেকেই উঠে আসত উৎকর্ষ। 'Bridge' তৈরির সময়েও এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল আমার। এটা আসলে আলাদাভাবে script হিসেবে লেখা ছিল লন্ডনের ভিত্তিতে। কিন্তু উনি শরীরের জন্য আসতে পারলেন না। আমি সেটাকে পরিবর্তন করে নিয়ে কলকাতায় গিয়ে তৈরি করি, উনি যাতে অভিনয় করতে পারেন। যা আজ ভাবলেও কেমন লাগে আমার, উনি বলেছিলেন, 'তোমার প্রথম ছবি আর আমি থাকব না?' এ কথার পর আর কিছু বলা যায় না। এমনই আমাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু সেখানেও আমি দেখেছিলাম কীভাবে নিজেকে ছাপিয়ে যেতেন। ৮৩ বছর বয়স তখন ওঁর, আমার দরকার ছিল বালি ব্রিজের ওপর দিয়ে তিনি ১০০ গজ দৌড়োবেন। তাঁর হার্টের অসুখ, আমার ওপর সম্পূর্ণ ভরসা রেখে বলেছিলেন 'তুমি আছো, আমি দৌড়াব'। ভোর চারটেয় উঠে মেকআপ করে সাড়ে পাঁচটায় বাস ট্রেন শুরু হওয়ার আগেই ব্রিজের উপর দিয়ে দৌড়োলেন এবং একটি শটেই Ok। আমি বারবার দেখেছি কেন একটি বা দুটি Take-এই perfect শট দিতেন। উনি কী চান আমি বুঝতে পেরেছিলাম। আমি যখন script পড়তাম আমার দায়িত্ব ছিল আমার সেটের সমস্ত লোকেই সেই গল্পটা জানবে। সে চাওয়ালা থেকে অভিনেতা হোক বা চিত্রপরিগ্রাহক হোক, তারা বুঝতে চাইবে আমরা আসলে কী করতে চাইছি। প্রত্যেকটা script reading এ প্রায় গোটা কুড়ি বার উনি উপস্থিত ছিলেন এবং এখানেই দেখতাম উনি চরিত্রটাকে ম্যারিনেট করতেন, সম্পৃক্ত করতেন, মাংস যেভাবে ম্যারিনেট হয় তেমনি। তারপর যখন সেটে গিয়ে দাঁড়াতেন তখন আর তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় নন, তিনি ঐ চরিত্র নিরঞ্জনে রূপান্তরিত হয়েছেন। নাটকের সময়ও আমি দেখেছি উনি নিজেকে প্রস্তুত করতেন।

How actor prepares? একটা গল্প আমাকে বারবার বলতেন, ইতালির Salvini'র কথা। সালভিনি প্রবীণ অভিনেতা। এক তরুণ অভিনেতা এসে বৃদ্ধ সালভিনির কাছে চট করে সেজে তরুণ তুর্কীর মতো স্টেজে চলে গেলেন। একজন কুশলী এসে বললেন, 'দেখলেন স্যার, কিরকম চট করে এসে তুর্কীর মতো বেরিয়ে গেলেন।' সালভিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'উনি মনকে প্রস্তুত করার সময় কখন পেলেন?' আমি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কে দেখেছি, বারবার, মনকে প্রস্তুত করতে, ম্যারিনেট করতে। আমাদের নাট্যশাস্ত্রে বলে নাটক আসলে স্টেজে ঢোকার আগে রূপসজ্জা থেকে শুরু হয়। ধীরে ধীরে চরিত্রে ঢুকতে হয়। তিনি এইভাবে চরিত্রে প্রবেশ করতেন। তাঁর script পড়ার দরকার হত না, নাটকের

আগে script দেখতেন। এই হচ্ছে 'Hard work', it's more than talent।

দ্বিতীয়ত, আমি দেখেছি couriosity, অদম্য অপরিসীম ক্ষুধা এবং অনুসন্ধিৎসু মন। তিনি নিজে বলতেন, 'আমি ব্লটিং পেপার, স্পঞ্জের মতো জীবনকে শুষে নিই।' শুধু বলতেন না, কাজেও করতেন। উদাহরণ দিচ্ছি, তিনি এসেছেন লন্ডনে চিকিৎসার জন্য, আমার বাড়িতে ছিলেন প্রায় দেড়মাসের মতো। প্রত্যেকদিন আমি একটি করে বই আর কিছু সিনেমা দিয়ে যেতাম। প্রত্যেকদিন একটা করে ইউরোপীয়ান সিনেমা দেখতেন। একটা বাচ্চা ছেলে candy পেলে যেমন হয়, তেমন হাঁ করে দেখতেন। বিকেলে এসে আমরা আলোচনা করতাম। সে ইল পোসতিনো হোক বা Al Pacino। Al Pacino'র এটি আগে একটি না দেখা সিনেমা 'Scent of a Woman' দেখে বলেছিলেন 'অমিত আমাদের দেশে আমাকে নিয়ে কেন এরকম script লেখা হয় না?' এই অদম্য creative ক্ষুধা ওঁর ছিল। আমরা 'Last Cigarette' নামে একটি থিয়েটার দেখতে গেছি লন্ডনে, ফিরে এসে বলছেন 'কোথায় আমি বইটা পাব? বইটা আমায় অনুবাদ করতে হবে।' তিনি বইটি কিনলেন, কয়েক দিনের মধ্যে অনুবাদ করে ফেললেন। জন্ম নিল তাঁর পরবর্তী নাটক—'তৃতীয় অঙ্ক অতএব'। আমি বহু বই দিতাম পড়ার জন্য, যেগুলো হয়তো কলকাতায় সবসময় পাওয়া যায় না বা প্রথমে পাওয়া যায় না। এরকম একটি James Shapiro'র '1599 : A Year in the Life of William Shakespeare' তারপর দ্বিতীয় বই '1606 : William Shakespeare and the Year of Lear'। বইটা একটু একটু করে পড়তেন কারণ বইটা পড়ে শেষ করে ফেলা তো ওঁর উদ্দেশ্য ছিল না। পড়তেন, আবার পড়তেন। শেষবার কোভিড হওয়ার ঠিক আগে, আমাকে ফোন করেছিলেন, বলেছিলেন 'জানো, বইটা আবার পড়তে শুরু করেছি।' এই ছিল তাঁর ক্ষুধা। বলতেন 'এই Meryl Streep-এর সিনেমাগুলো আমাকে দেখাও তো।' ব্লটিং পেপারের মতো শুষে নিতেন। পরের দিকে আমি সাহস পেতাম তাঁকে প্রশ্ন করার জন্য। আসলে সকলকে মনের জানালা খুলে দিতেন না বা স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। আমি তাঁকে প্রশ্ন করি— 'আপনার জীবনদেবতা কে?' তিনি বলেছিলেন, অনেকেরই তো জীবনদেবতা আছে। এই তো ছোটো করে ভাবতে গেলে, আমাদের সংসারই একটি জীবনদেবতা। আর একটু বড়ো করে ভাবতে গেলে, রবীন্দ্রনাথ আমার জীবনদেবতা। আমি বারবার প্রশ্ন করেছি—'আপনার ধর্ম কী?' তিনি বলেছেন 'ধর্ম যা ধৃত, ধৃতি, যা আমাদের ধারণ করে। কোনো অর্থেই Religion নয়। তিনি মহাভারতের উদাহরণ দিয়েছেন। ন্যায়শিক্ষা, ন্যায়পরায়ণতা, সত্যশ্রায়িতা, মানবধর্মের দৃঢ়তার কথা বারবার গল্প করেছেন, বলেছেন 'দ্যাখো তো যুধিষ্ঠিরকে

ভাবো, শেষযাত্রার কথা ভাবো, বকধার্মিকের প্রশ্নগুলোর কথা ভাবো।' কেউ কেউ ভাবতে পারেন তিনি 'atheist' বা 'communist' কিন্তু তিনি জীবনদর্শন ও জীবনধর্মকে শুষে নিয়ে সম্পূর্ণ, পূর্ণ মানুষ হয়েছিলেন এইভাবে। আবার একদিকে তিনি কিন্তু সাধারণ মানুষও ছিলেন। আমি তাঁকে প্রশ্ন করেছি 'মৃত্যুচিন্তা আপনাকে মথিত করে?' তিনি বলেছেন, 'মৃত্যুকে আমি ভয় পাই না, ভয় পাই যদি আমি বিছনায় পড়ে থাকি। আমার বন্ধু-বান্ধব চারদিকে মারা যাচ্ছে, মৃত্যু আমাকে ব্যথিত করে। মৃতুকে আমি আর Physically নিতে পারি না। আমি জীবনকে তো ভালোবাসি 'that is enough for me' তিনি বারবার বলতেন 'আমি ভীতু'। আমি প্রশ্ন করেছি 'আপনার ভয় কীসের?' তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, 'জানো, বড়ো বড়ো স্টেজে ওঠার আগে এখনও আমার হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কিন্তু যখন আমি স্টেজে একবার উঠি তখন আমি জানি ঈগলপাখির মতো বাঙালির মনকে ছিনিয়ে নিয়ে চলে আসব, তখন আমি রাজা।' আমি দেখেছি তাঁর কোনো কোনো সময়ে Panic attack হত। তিনি শেষের দিকে প্লেনে উঠতে চাইতেন না, claustrophobia হত। তবে বলতেন, 'জীবনের আগে মৃত্যু, জীবনের পরেও আছে সেই এক মৃত্যু, তাহলে তাকে ভয় পেয়ে লাভ কী?' আমার তাঁকে তখন সক্রেটিসের মতো মনে হত। ক্রিটো সক্রেটিসকে প্রশ্ন করেছে 'Are you afraid?' তখন সক্রেটিস উত্তরে বলেছিলেন 'What I don't know why should afraid about?' সৌমিত্রবাবুও তাই বলতেন। এই জায়গায় তিনি ঋদ্ধ এবং প্রাজ্ঞ। আমার দ্বিতীয় নাটক 'ছাড়িগঙ্গা'র সময়ে প্রচুর পড়াশোনা করতে হয়েছিল দুজনকেই। এটি একটি Alchemist এর চরিত্রকে নিয়ে হয়েছিল। বাঙালি হয়তো খানিকটা ভাবতে ভুলে গেছে। চিন্তাশীল, মননশীল, মানুষ ক্রমাগত কমে যাচ্ছে। আমরা একটা philosophical নাটক লিখতে চেয়েছি। এক পাগলাটে scientist-এর চরিত্র। 'আমি সেই জায়গায় আপনাকে জীবন থেকে বড়ো দেখতে চাই' আমি বলেছি। লোকটির spiritual transformation কীভাবে হচ্ছে নাটকে সেটা দেখানো হচ্ছে। তিনি আমার সঙ্গে Quantam Physics নিয়ে, Roger Penrose, মাইক্রো টিউবেলের কাজকর্ম নিয়ে কথা বলতেন। আমি তাঁকে Hermes Trismegitus এর 'The Emerald Tablet' পড়ে শোনালাম। কিন্তু এই ক্ষুধা এবং নিজেকে constant গড়ে তোলার ইচ্ছা তাঁর ছিল।

সব কিছুর মধ্যেও কীভাবে time management এবং discipline maintian করতে হয়, দেখেছি তাঁকে। তিনি বলতেন কোনো জিনিস ভালো রাখতে গেলে সেটাকে অনুশীলন করতে হয়। আমি প্রতিদিন ১৫ মিনিট ধরে দাঁত মাজি সকালে তাই এখনও আমার দাঁতগুলো ভালো আছে।' 'প্রতিভার গৃহিণীপনা', রবীন্দ্রনাথের

ভাষা দিয়ে বলছি, কথাটিকে সঠিকভাবে ব্যবহৃত হতে দেখেছি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বা সত্যজিৎ রায়ের ক্ষেত্রে। এক মিনিট সময়ও নষ্ট করতেন না। শুটিং এর মাঝে বসেই লিখে ফেলতেন কবিতা, অনুবাদ ইত্যাদি। তারপর এসে বলতেন 'দ্যাখো তো অমিত, এটা শুটিং-এর সময় লিখলাম।' বলে কবিতাটি পড়ে অদ্ভুত হেসে বলতেন 'ঠিক আছে তো?' আমি আর কী বলব? ক্রমাগত অনুশীলনের মাঝেও সবকিছু maintain করতেন পরিবার, বন্ধু আড্ডা সব। আমার মনে আছে আমার বাড়িতে একটা Pescription pad-এ অনুবাদ করলেন, কোনো কিছু না পেয়ে। কোন সময় নষ্ট না করা এবং নিয়মানুবর্তিতা এই ক্ষিদ্দাকে দেখেই শেখা যায়।

বিভিন্ন inspiring relationships তাঁকে বড়ো করেছে। রাস্তায় বেরোচ্ছি, অনুমতি না নিয়েই সেলফি তুলে নেয় মানুষ, 'লোকজন এত বিরক্ত করে আপনার খারাপ লাগে না? আপনাকে রূঢ় হতে কম দেখেছি অধিকাংশ সময়েই আপনাকে দেখেছি অমায়িক হেসে প্রশ্রয় দিতে। কীভাবে দেন?' তিনি বলেছিলেন, 'জানো, শামুকের মতো হতে হয়। বাইরে শামুকের খোলাটাকে শক্ত করে নিতে হয় কারণ ভেতরে যে নরম শাঁস আছে, যে sensitivity আছে তাকে বাঁচিয়ে রাখতে গেলে খানিকটা খোল শক্ত করতে হবে। তৈরি হতে হবে নিজেকে। আমি দেখতাম শমীকদা, বিভাসদা, তরুন নাট্যকর্মীদের, কবিতার লোক, ছবির লোক, ফিল্মের লোক এদেরকে কাছাকাছি এনে এমন একটা বৃত্ত তৈরি করতেন, তাদের থেকে অভিজ্ঞতা শুষে নিতেন।

And he was deeply and firmly a Human... তাঁকে পারিশ্রামিক দিয়ে ডাকতে হত। কিন্তু তিনি অনায়াসে আমার সঙ্গে অনেক জায়গায় চলে গেছেন। 'AHEAD' বলে একটি disable school-এর সঙ্গে তিনি ভীষণভাবে জড়িত ছিলেন। কেউ সেগুলো জানে না। তিনি নিজেকে যতটা পারতেন দেওয়ার চেষ্টা করতেন। বলতেন 'আমি কত Awards পেয়েছি বড়ো বড়ো Légion d'honneur ইত্যাদি, কিন্তু আমার কাছে বড়ো পুরস্কার হল সাধারণ মানুষের কথা। যখন এক ভদ্রমহিলা এসে কবিতা পাঠের পর বলেছিলেন এই কবিতা আমার ক্যান্সার আক্রান্ত মা খুব ভালোবাসতেন। এটি একটি life changing কবিতা। আমার কাছে এটাই বড় পুরস্কার।' তিনি তখন খুব ছোটো, শিশির ভাদুড়ীর কাছে অভিনয় শিখছেন— তারপর তিনি একটি নাটকে অভিনয় করেছেন এসে দিদিমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'কি গো, কেমন হল?' 'তোমাকে শিশির ভাদুড়ীর মতোই লেগেছে, ভালোই করেছো' দিদিমা বললেন। এটাই তাঁর কাছে পুরস্কার। এইখানেই তিনি তাঁর মানবিক চেতনা।

আমি বারবার দেখেছি তিনি একজন প্রতিবাদী মানুষ। অন্যায়ের বিরুদ্ধে

বহুবার তিনি দাঁড়িয়েছেন। আমি রাজনীতির মতবাদের দিকে যাচ্ছি না। বরং এখনকার সময় নিয়ে, ধর্ম নিয়ে, fundamentalism নিয়ে, পৃথিবীতে যে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম চলছে, environment নিয়ে বহুবার আলোচনা করেছি। একটা বহুব্যাপী পরিসর ছিল তাঁর মধ্যে, আমার মনে হয়েছিল তা মানবিক। '৪৬-এর মন্বন্তরের কথা বলতে বলতে তিনি কেঁদে ফেলেছিলেন। বলতেন, 'যেন আজও কানে বাজে ভাত দাও, ভাত দাও।' সেই কৃষ্ণনগরের সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক আবহে স্বাধীনতার প্রেক্ষাপটে এই মানুষটির শিকড়, কাণ্ড ইত্যাদি গড়ে উঠেছে। 'Humanity'-র সঙ্গে 'Human'—এই শব্দ দুটি বেশ সুন্দরভাবে যেন জড়িয়ে আছে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের জীবনে। তিনি নিজের বাসন মাজতে এবং কাপড় কাচতে ভালোবাসতেন। It's almost therapeutic। দুঃখ-যন্ত্রণা তাঁকে সারাজীবন পিছু ছাড়েনি, জর্জরিত করেছে। আমি জিজ্ঞাসা করেছি 'How is letting go for you?' 'যেতে নাহি দিব কিন্তু যেতে দিতে হয়' জীবন তো থেমে থাকে না। তারপর তিনি গল্প করেছিলেন 'যখন আমি অভিনয় করি, একবার ঘোড়ার সওয়ার হতে হবে। তখন আমি একটি আরবী ঘোড়ার সহিসকে ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করি আমি কি ঘোড়াটায় চড়তে পারি?' তখন সহিস বলেছিল এ ঘোড়ায় চড়ার জন্য দুটি জিনিস দরকার — এক skill এবং দুই উচ্চা দিল। এই মানসিকতা কিন্তু তাঁরও ছিল। নিজেকে তৈরি করেছেন এবং open hearted mentality তাঁর ছিল। যা তিনি সারাজীবন ধরে তৈরি করেছেন। আমার সঙ্গে শেষ আলাপচারিতায় বললেন 'Universe starts with the word L and ends with E, it is LOVE'। আমি জিজ্ঞাসা করেছি, 'What you stand for?' নির্দ্বিধায় উত্তর দিয়েছেন 'I stand for LOVE'। আমার সঙ্গে মনান্তর কখনো হয়নি, মতান্তর হয়েছে। 'Brdige'-এর শুটিং-এর সময় সারাদিন কাজ করার শেষে একটি লাইট সেটের জন্য কাজ করতে গিয়ে 'না, আমি করব না' বলে চলে গেছেন হয়তো। আমি বললাম 'যে vision নিয়ে কাজটা করতে চাইছি আমরা এভাবে পারব না।' I have to be tough as a director, I said 'NO' shooting next day– এখানেই মানুষটির Humility, সৌমিত্রদা ফোন করে বললেন 'Amit I am really sorry, I am going to come tomorrow' তারপরে আর কিছু বলার নেই। পরের দিন ন'টার সময় সৌমিত্রদা সেটে ঢুকেছেন। This is what, a human being with humility which is really important.

শেষ করব দুটি জিনিস দিয়ে, Hope and Optimism ছিল তাঁর। এই যে দুঃখ, যন্ত্রণা, difficulties, trails and tribulations-এর মধ্য দিয়ে গেলেও he had this resilience, he bounced back। যাকে আমাদের পরিভাষায়

বলা হয় 'Growth Mindest' ছিল তাঁর। হয়তো তিনি ভেঙে পড়েছেন কিন্তু পরের দিন আবার ক্রিয়াত্মক activities, কবিতার মধ্য দিয়ে আবার জেগে উঠেছেন। আপনরা হয়তো বলবেন 'sublimation' in a very freudian way. He is bouncing back with energy, positivity, otpimsm. 'হোমাপাখি'র একটা জায়গায় আমি যেমন চেয়েছিলাম, তিনি তেমনই করেছিলেন, দুই হাত তুলে বলেছিলেন, 'আমি তো অসাধারণ!' সত্যিই তিনি ছিলেন অসাধারণ। তিনি আমাকে ও পারমিতাকে উৎসর্গ করেছিলেন 'স্বেচ্ছাবন্দী আশার কুহকে' বইটি। 'I am as willful prisoner of hope'—আশার কুহকে স্বেচ্ছাবন্দী, আসলে তিনি তাই-ই ছিলেন। এই গভীর জীবনবোধ ও জীবনদর্শন দিয়ে ক্ষিদ্দাকে জেনেছি তাঁর নাটক, সিনেমা ও কবিতার বাইরে। নদীর খরস্রোতা ধারার মধ্য দিয়ে যেতে যেতে এগুলো শিখে আমার মনে হয় আমি ঋদ্ধ হয়েছি। আমার 'মেত্তাবীজ' বইটি তাঁকে উৎসর্গ করা, সেখান থেকে একটি ছোট কবিতা পড়ছি, 'হোমাপাখি', যা দিয়েই তাঁর সঙ্গে সম্পর্কের শুরু, সেই কবিতাটি দিয়েই শেষ করি—

'উড়ে যাও হোমাপাখি
আরও উঁচু
উঁচুতে আরও ছড়িয়ে যাক ডানা
দুরন্ত সূর্যের প্রতিঘাতে
ঝলসে যাক চোখ
পুড়ে যাক নিদাঘ পালক।
এ অসহ্য আবরণ সরে গিয়ে
কোনোদিন ঠিক দেখা দেবে
সত্যের তীব্র আলোক।
উড়ে যাও হোমাপাখি
আরও উঁচু, আরও উঁচুতে।'

লেখক পরিচিতি :

অমিত রঞ্জন বিশ্বাস কবিতা, নাটক লেখেন, 'জানালার খোঁজে জতুগৃহ', 'পাথরে ফোটে ব্রহ্মকমল,' 'মেত্তাবীজ' প্রভৃতি তাঁর লেখা কাব্যগ্রন্থ। 'হোমাপাখি' এবং 'ছাড়িগঙ্গাঁ' অত্যন্ত মঞ্চসফল নাটক। এছাড়া 'ব্রিজ' নামে একটি সিনেমাও তিনি পরিচালনা করেছেন। পেশায় চিকিৎসক, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ, লন্ডনের 'রয়েল কলেজ অফ্ সাইকিয়াট্রি'-র সঙ্গে যুক্ত।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চরিত্রের ছদ্মসাজে লোকজীবনের উপাদান

মুনমুন গঙ্গোপাধ্যায়

সারসংক্ষেপ :

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলতঃ দেব-চরিত্র নির্ভর এবং দেবতাদের মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক। সুতরাং এ কাব্যের গতানুগতিক কিছু বিষয় সাধারণভাবে চর্চিত হয়ে থাকে। তার মধ্যে বৈচিত্র্যের অন্বেষণে এই প্রবন্ধের অবতারণা। কারণ, এ যুগের বাংলা সাহিত্যে লোকসংস্কৃতি তথা লোকজীবনের উপাদান যে বিশেষভাবে আছে, তা আমাদের অজানা নয়। কিন্তু ছলনাপূর্বক কিছু কার্য-সমাধানে, প্রয়োজনের তাগিদে বা আপন ক্ষমতা কৌশলে প্রকাশের জন্য প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে অনেক চরিত্রই ছদ্মসাজ বা ছদ্মবেশ গ্রহণ করেছে। সচেতন অভিনিবেশে দেখা যায়, তাদের এই ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে সে-যুগের আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, লোকজীবন ও সমাজের নানা প্রাসঙ্গিক তথ্যও পরিস্ফুট হয়েছে। যার ফলে এই ছদ্মসাজগুলি শুধু কাব্য-কাহিনিতে বৈচিত্র্য ও হাস্যরস সৃষ্টি করেনি, তা সমাজ-ইতিহাসের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদানের সহায়ক হয়েছে।

মূলশব্দ : ছদ্মসাজ, সচেতন অভিনিবেশ, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট, চরিত্রের মনস্তত্ত্ব, লোকজীবন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চরিত্রের ছদ্মসাজে লোকজীবনের উপাদান:

ছদ্মসাজ বা ছদ্মবেশ এমনই একটা বিষয়, যা মানুষ প্রয়োজনে ব্যবহার করে। এর দ্বারা নিজের প্রকৃত পরিচয় গোপন রাখা যায়। আর তার দ্বারা অভিপ্রেত কার্যসিদ্ধিও সম্ভব হয়। কখনো পেশাগত দিক থেকে যখন এই ছদ্মসাজ গ্রহণ করা হয়, তখন তার স্বতন্ত্র ব্যাখ্যা। সেখানে আনন্দদান ও উপার্জন দুয়েরই ভূমিকা থাকে। কারণ এই সাজগ্রহণকারী ব্যক্তিরা 'বহুরূপী' নামে পরিচিত, যাদের পেশাগত আচরণ কৌতুক ও কৌতূহল-উদ্দীপক হয়ে থাকে। এটা অনেক প্রাচীনকাল থেকেই একটি সামাজিক বৃত্তিমূলক ব্যবস্থা। ছদ্মসাজের ব্যাখ্যায় বলা যায়, "A diguise can be anything which conceals or changes a person's physical appearance including a wigh, glasses, makeup, fake moustache, constume or other itmes...in comic books and films, disguises are often used by superheroes, and in science fiction they may be

used by aliens".[১] কখনো আবার অভিনয় ও নৃত্যের সঙ্গে এর সংযোগ লক্ষ করা যায়। অর্থাৎ আমাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঙ্গে এবং লোকজীবন, বিশেষত লোকসংস্কৃতির সঙ্গে এর ধারাবাহিক যোগসূত্রের সন্ধান আমরা করতে পারি। বহুরূপী যেহেতু ব্যক্তির ছদ্মসাজ বা ছদ্মরূপ, তাই যাঁরা এর দ্বারা জীবিকার প্রয়োজন মেটান, তাঁরা অধিকাংশই গ্রামীণ লোকশিল্পী, নানা রূপসজ্জায় এঁরা লোকসাধারণের মনোরঞ্জন করে উপার্জন করে থাকেন। তবে সাহিত্যে যখন চরিত্রের ছদ্মসাজ আমরা প্রত্যক্ষ করি, তখন তার বহুমাত্রিক ব্যবহার স্বতন্ত্র আলোচনার অবকাশ রাখে। বলাবাহুল্য, এ আলোচনার পরিসর বিস্তৃত। একে সংহত রূপদানের জন্য কিছু নির্বাচিত গ্রন্থের সাহায্যই আমরা গ্রহণ করবো।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন 'চর্যাগীতি'র 'দশ' সংখ্যক পদে চৌষট্টি দল বিশিষ্ট পদ্মের উপর ডোমনী ও বহুরূপী কাহ্ন পা-এর নৃত্যের কথা আছে—"তহিঁ চড়িঁ নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।"[২] এই 'বাপুড়ী' শব্দের উৎস বিচারে বলা যায় বর্পবৃত্তিক > বপ্পউড্ডিঅ > বাপুড়ী। ঋগ্বেদেও 'বর্পস' শব্দ পাওয়া যায়, যার অর্থ 'অভিনীতরূপ'। সেকালে নটবেশ অবলম্বনকারী কাপালিকেরা নানা রূপ ধারণ করে ভিক্ষাবৃত্তি করতেন। 'দশ' সংখ্যক 'চর্যা'তেই কাপালিক কাহ্নর নটের সাজ বর্জনের কথা আছে। টীকায় 'নাট্যং কুরু হেরুকরূপেণ' উদ্ধৃতাংশ থেকেও কাহ্নর হেরুক রূপ ধারণের আভাস পাওয়া যায়। কাজেই 'বাপুড়ী' শব্দের অর্থ 'বহুরূপী' বা 'নাটুয়া' বলে অনুমান করা যেতে পারে।[৩] সুতরাং এখানে 'বহুরূপী' শব্দটি শুধু ভিক্ষা-অর্জন নয়, সংস্কৃতি-চর্চার অঙ্গ হিসাবেও গ্রহণীয়। যাঁরা নটের সাজ করতেন, তাঁদের নানারকম রূপ গ্রহণের জন্য 'নটপেটিকা'[৪] বা 'নড়এড়া' সঙ্গে রাখতে হত, যা 'মেকআপ' বক্স (Box) ও 'কসটিউমের' সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এখান থেকেই 'বুদ্ধনাটক'[৫]-এর বিষয়ে আমরা পৌঁছতে পারি। আধুনিক গবেষকরা 'বুদ্ধনাটকে'র সঙ্গে ছৌ-নাচের সাদৃশ্য অনুসন্ধান করেছেন। বোঝা যায়, আমাদের সাংস্কৃতিক ধারাবাহিকতায় 'বুদ্ধনাটকের' একটা প্রবহমান রূপ আছে।

'চর্যাগান' সম্পর্কে বলতে গিয়ে রূপসজ্জার আর একটি উদাহরণ উল্লেখ করবো। তা হল 'আঠাশ' সংখ্যক 'চর্যা', যেখানে শবর কন্যার অপরূপ সাজে শবর তাকে চিনতে পারে নি। সে অন্য রমণী ভেবে তাকে কামনা করেছে, —"মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ সবরী গিবত গুঞ্জরী মালী।।"[৬] তাই শবর 'এই অন্যরকম সাজে' শবরীকে চিনতে না পেরে কামনাতুর হলে শবরী বলেছে—"উমত সবরো পাগল শবরো মা কর গুলী গুহাড়া তোহৌরী।"[৭] এখানে ছদ্মসাজ নয়, প্রতিদিনের পরিচিত সাজসজ্জার তুলনায় সেদিন শবরীর সাজ অন্যরকম হওয়ায় শবরের এই

বিভ্রম। তত্ত্বের বাইরে এটাই এর বাচ্যার্থ।

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'-এ অবশ্য এই ছদ্মসাজের ছড়াছড়ি এবং এর সবকটিই উদ্দেশ্যমূলক। তবে এর সঙ্গে রোমান্টিক প্রণয় ও মিলন-বাসনাও যুক্ত হয়ে আছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে নারী-পুরুষ উভয়েরই ছদ্মসাজে যথেষ্ট পটুত্ব লক্ষ করা যায়। লোক-সাধারণের জীবনের অন্দর-মহলের সঙ্গে এর নিবিড় সংযোগ এবং লোকজীবনের নানা উপাদানে এর সম্ভার পূর্ণ। পূর্বে উল্লিখিত 'আঠাশ' সংখ্যক 'চর্যায়' শবরী ময়ূর পুচ্ছ এবং গুঞ্জার মালায় নিজেকে সুসজ্জিতা করে অপরিচিতার আভাস সৃষ্টি করেছিল। সঙ্গে ছিল প্রকৃতির পটভূমি, যা হয়তো অনুঘটকের কাজ করেছিল। সব মিলিয়ে এখানেও সেই রোমান্টিক আবেশ। আর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে মিলনের প্রত্যাশায় মহাদানী বা কর-আদায়কারী থেকে শুরু করে নৌকার মাঝি, ভারবহনকারীর ছদ্মসাজ পর্যন্ত গ্রহণ করেছেন। এগুলোর মধ্যে দিয়ে অনেকগুলো বৃত্তি বা জীবিকার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি পাওয়া যায় লোকযানের প্রসঙ্গও। আর একটি বিষয়ও এখানে লক্ষ করার, একটি বৃত্তির সঙ্গে আর এক বৃত্তির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। যেমন হাটে পণ্য নিয়ে যেতে গেলে বিক্রেতাদের কর দিতে হতো এবং কর-আদায়কারী ব্যক্তি রাজা কর্তৃক নিযুক্ত হতেন। পণ্য বিক্রেতাদের পসরার ভার বহনের জন্য ভারী বা 'মুটে' থাকত এবং নৌকাতেও সেই পসরা নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা ছিল বলে মাঝির প্রয়োজন হতো। পসরা বহনের জন্য যে পাত্রগুলি তৈরি হতো তার পদ্ধতিও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে বিবৃত হয়েছে। 'চামর' গাছের ডাল কেটে দুই পাশ সরু করে মাঝখানটা মোটা রাখা হত। এ তো গেল বাঁক নির্মাণ পর্ব। ভারের দু-পাশ চেঁছে পরিষ্কার করে তার শোভা বর্ধনের জন্য 'গুটি' লাগানো হতো এবং ঝামা দিয়ে ঘষে তাকে চক্‌চকে করা হতো। এরপর 'নালিচা' বা পাট কেটে তাকে জলের মধ্যে বারো প্রহর ডুবিয়ে রেখে তুলে এনে তা শুকনো করার পালা। কাব্যে দেখি, সেই পাট চারগুণ করে পাকিয়ে দড়ি তৈরি করলেন কৃষ্ণ, যাতে তা ভারবহনের পক্ষে মজবুত হয়। এ কাজ 'ভার খণ্ডে' কৃষ্ণ ভারীর ছদ্মবেশ নেবেন বলে করলেও যে-কোনো ভারবহনকারীকে এই 'লোককর্ম' করতে হতো, যা অবশ্যই লোকশিল্প। একইভাবে কৃষ্ণের নৌকা তৈরির কথাও বলতে পারি। এটিও লোকশিল্পের অন্তর্গত। চর্যার যুগ থেকেই আমরা নৌ-যানের প্রসঙ্গটি পাচ্ছি। এটিও বেশ পরিশ্রমসাধ্য। তবে নৌ-শিল্পীরা মনে হয় 'ক্ষণ' বিচার করে এ কাজে হাত দিতেন, যেমন আমরা কৃষকদের ক্ষেত্রে দেখেছি। কবি বড়ু চণ্ডীদাস বলছেন—"কাঠ কাটিল গিআঁ বিবিধ বিধানে। শুভক্ষণ বুঝি কৈল দান্ডার পাতনে।।"[৮] অর্থাৎ কৃষ্ণ বিবিধ বিধানে শুভক্ষণ দেখে দণ্ড পত্তন করলেন।

নৌকার মাপ বিচার করে 'চারিপাট তক্তা চিরলেন' এবং তুলাদণ্ড দিয়ে মেপে গুঁড়া যোগ করলেন। ছিদ্রমুখ বন্ধ করার জন্য ফাঁকে ফাঁকে পাটের পলতে গুঁজে দিলেন। এটি অবশ্য মাপে ছোট নৌকা। কানাই বুদ্ধি করে যাতে দুজন সওয়ারির বেশি কেউ নৌকায় উঠতে না পারে সেই ব্যবস্থা করলেন। উদ্দেশ্য—রাধাকে একান্তে কাছে পাওয়া। আর এ কারণে মাঝির ছদ্মসাজ তিনি এমনভাবে নিলেন, যে রাধা তাঁকে চিনতেই পারলেন না! কৃষ্ণের দানলীলা ও নৌকাবিলাস এতটাই জনপ্রিয় ছিল যে, শ্রীচৈতন্যদেব শুধু এর অভিনয়ই দেখেননি, নিজে পার্ষদগণের সঙ্গে এর অভিনয় করতেন। মহাপ্রভু যে অভিনয় দেখেছিলেন পুতুলনাচের মাধ্যমে, নিজে অভিনয়ের সময় কিন্তু তাকে বাস্তবতা দিয়েছিলেন নানা সাজে চরিত্রের অবতারণা ঘটিয়ে এবং এই অভিনয়গুলি ছিল লোকনাট্য বা যাত্রার মতো মুক্ত-মঞ্চ অভিনয়। এতে পুরুষেরা নারীর বেশ পরিধান করতেন। নৃত্য-গীত-সংলাপ—সবই এর অংশ ছিল। চৈতন্যজীবনীগ্রন্থ থেকে এর বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়। তবে একটি বিষয় এখানে লক্ষ করার। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে কৃষ্ণের ছদ্মসাজ-পরিকল্পনা পরবর্তী সময়ে রূপান্তরের মধ্য দিয়ে শিল্পের মর্যাদায় উন্নীত হল। লোকনাট্যের সাংস্কৃতিক প্রবাহ সৃষ্টি করার যথেষ্ট আকর্ষণীয় উপাদান যে এর মধ্যে ছিল তা বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না। সেই উপাদানের অন্যতম হল হাস্যরস এবং ঘটনাগত ও রাধা চরিত্রের মনস্তত্ত্বগত উৎকণ্ঠা-সৃষ্টি। কৃষ্ণের ছদ্মপরিচয় রাধার অজ্ঞতার কারণে তাঁকে শঙ্কিত, ভয়-বিহ্বল করেছে। অথচ কৃষ্ণের কাছে, এমন কি বড়ায়ির কাছেও তা কৌতুকের বিষয়, যা আজকের পাঠকের কাছেও। অর্থাৎ কৃষ্ণের ছদ্মসাজে জানা-অজানার দ্বন্দ্বটি বৈপরীত্য সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে কাব্যের রসাবেদন বৃদ্ধি করেছে, এখানেই এর সার্থকতা। আর একটি কথাও এক্ষেত্রে বলবার অপেক্ষা রাখে। কৃষ্ণ দেবতা, স্বর্গের বিষ্ণু দেবতাদের অনুরোধে কংস নিধনের জন্য মর্ত্যে অবতীর্ণ হন। দেবতাদের সুবিধা এই যে, তাঁরা অলৌকিক উপায়ে ইচ্ছামতো নানা বেশ ধারণ করতে পারেন। কিন্তু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের' কৃষ্ণ একেবারে লৌকিক স্তরে নেমে এসেছেন। তিনি 'নান্দের ঘরের গরু রাখোআল।'[৯] তাই লোকজীবন থেকে উপকরণ নিয়ে লোকসাধারণের মতোই কষ্টসাধ্য প্রয়াসে তাঁর নানাবিধ ছদ্মবেশ গ্রহণ এবং তা রাধার কাছে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণের সাহায্য নেওয়া বা তার যথাযথ ব্যবহার।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘস্থায়ী শাখা অবশ্যই মঙ্গলকাব্য। তা নানা দেবদেবীর মাহাত্ম্যকীর্তনমূলক এবং তাতে স্ত্রী-দেবতার প্রাধান্য কম নয়। মঙ্গলকাব্যের উৎপত্তি ও তার দেবদেবী সম্পর্কিত তথ্য আমাদের সকলেরই জানা। তাই এ বিষয়ে আপাতত নীরব থাকলাম। কিন্তু স্ত্রী দেবতারা আপন-আপন

পূজা প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের জন্য যে কত রকমের ছদ্মবেশ বা ছদ্ম-পরিচয় নিয়েছেন, তার সবগুলির উল্লেখও হয়তো এখানে সম্ভব হবে না। তাঁরা যখন মানবেতর প্রাণীতে নিজেদের রূপান্তরিত করেছেন, তখন অলৌকিকতার চূড়ান্ত আশ্রয় তাঁদের নিতে হয়েছে; কিন্তু সেগুলি লোক-সমাজে প্রচলিত সংস্কার ও বিশ্বাসকে অঙ্গীভূত করে নিয়েছে। আবার আত্মভোলা স্বামী শিবকে গৃহে ফেরানো বা তাঁর সঙ্গে ছলনা করার জন্য পার্বতীকে নানা ছদ্মসাজে নিজেকে সাজাতে হয়েছে। সুতরাং মঙ্গলকাব্যে ছদ্মসাজে নারীর প্রাধান্য আমাদের স্বীকার করতে হয়। মর্ত্যে প্রথমে নিম্নবিত্ত ও পরে উচ্চবিত্ত সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠার জন্য মনসাকে কম চেষ্টা করতে হয় নি। প্রথমে বৃদ্ধার ছদ্মবেশে তিনি রাখালদের গোধন হরণ করেছেন, অর্থাৎ তাদের বৃত্তিতে ঘা দিয়েছেন তিনি। এতে অবশ্য কার্যোদ্ধার অসহজ হয় নি! কিন্তু সূক্ষ্ম বিচারে আমরা বুঝতে পারি, এই কাহিনিতে হাসন-হুসন প্রসঙ্গ যুক্ত করে হিন্দু-মুসলমান সংঘাতের চিত্রটি কবি বিশ্বাসযোগ্যভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। লোকজীবনের সঙ্গে সমাজ-ইতিহাসের সত্যকে বা আমাদের প্রতিবাদী-মনের ইচ্ছাপূরক কল্পনাকে যুক্ত করে দিয়েছেন। আবার মনসা যখন উচ্চবিত্ত বা অভিজাত সমাজের প্রতিনিধি চাঁদ সদাগরের কাছে পূজা পাবার আশায় নটীর সাজ সেজেছেন, তখন তারও পেশাগত দিকটি অনুচ্চারিত থাকে নি। নটীর সাজসজ্জার বর্ণনায় অনুপুঙ্খতা আছে।

যেমন—'সুবর্ণ চিরণী লয়্যা : নারায়ণ তৈল দিয়া : বন্ধানে বান্ধিল কেশভার।
রচিত কনক গাভা : কুসুম-বেষ্টিত খোঁপা : অলি ফিরে উপরে তাহার।।

** ** ** ** **

নানা আভরণ সাজে : কটিতে কিঙ্কিনী বাজে : জগমোহ ফুলের কবরী।
রতন-নূপুর পায় : চলিতে বাজিয়া যায় : রুনুঝুনু শুনিতে মাধুরী।।[১০]

তবে মনসাকে পূজা পাওয়ার জন্য নটীর বেশ পরতে হচ্ছে—এ বিষয়টি দেব-সমাজে হাসির খোরাক হয়েছে। দেবী অবশ্য নিজের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য মালিনীর কাছ থেকে ফুল কিনতেও গেছেন। এতেও নতুন করে সমস্যা ও ঘটনাগত সংঘাত তৈরি হয়েছে। কারণ ছদ্মসাজে মনসাকে চিনতে না পেরে কাজলা মালিনী তাকে ধার-বাকিতে ফুলের মালা বিক্রি করতে সম্মত হয়নি। উপরন্তু তাকে লাঞ্ছনা করেছে এবং চারজন যুবক সেখানে উপস্থিত হয়ে দেবীকে সঙ্গদানের কুপ্রস্তাবও দিয়েছে। এর কোনোটাই মনসার জন্য অভিপ্রেত নয়। তবু ছদ্মপরিচয় যখন গ্রহণ করেছেন, তখন তাঁকে এসব সহ্য করতেই হবে! তবে এই বৃত্তান্তে তৎকালীন সমাজে নারীর অবস্থান ও তার নিরাপত্তাহীনতার বিষয়টিও উঠে আসে। সেইসঙ্গে কাজলা মালিনী ও যুবকদের এই আচরণ মনসাকে আহত

করে। তথাপি নিজের প্রকৃত পরিচয় জানলে এদের অবস্থা যে কী শোচনীয় হবে, তা মনে করে—"এত শুনি মনসা হাসেন মনে মন।/অবশেষে চিনাইব আমি কোন্‌জন।।"[১১] কাজলার প্রতি প্রতিশোধ-স্পৃহায় তার গোপাল ও গোবিন্দ নামের দুই পুত্রকে বিঘতিয়া নাগ দেবীর আদেশে দংশন করে। তবে চৈতন্য-পরবর্তী যুগের কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসা দয়া, করুণা ইত্যাদি মাতৃসুলভ গুণে সমৃদ্ধা। তাই মালিনীর ক্রন্দনে তাঁর চিত্ত আর্দ্র হয়। তিনি বিষ-মুক্তির মন্ত্র উচ্চারণ করে পুত্রদের জীবিত করেন। সভ্যতার প্রাথমিক পর্যায়ে তো বটেই, এখনো প্রত্যন্ত গ্রামে-গ্রামাঞ্চলে সর্প-পূজা, সাপের বিষ নামানো ইত্যাদি বিষয়ে মানুষ লৌকিক-পদ্ধতি মন্ত্র-তন্ত্র ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদির উপর বিশ্বাস করে। মনসা যখন বিষ-নামানোর মন্ত্র পড়তে গেছেন, তখন তাঁর ছদ্মসাজের পরিবর্তন ঘটেছে।—"মায়া পাত্যা হৈলা দেবী অতিশয় বুড়ী।।"[১২] একই ঘটনা-প্রবাহের মধ্যে দুবার ছদ্মরূপের পরিবর্তন বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছে। সেইসঙ্গে বৈপরীত্যও। যুবতী সুন্দরী থেকে অতিশয় বৃদ্ধা—সবই প্রয়োজনের ভিত্তিতে। মনসার বিষমন্ত্র ও বষি-ঝাড়ন পদ্ধতিতে লৌকিক বিশ্বাস-সংস্কার লক্ষণীয়—"দুই শিশু বেড়ি দিল কাপড় কাণ্ডার।/ সঘনে ডাকিল দেবী অস্তিক ভাণ্ডার।।/মনে মনে জপে মাতা মৃত-সঞ্জীবনী।/মনসা আপনে ঝাড়ি বিষ করে পানি।।/শ্বেত শিম্বলের গাছ আগে তার বঙ্ক।/তাহে বস্যা সাপিনীরে ধর‍্যা খায় কঙ্ক।।/ডালে বস্যা কাঁকিনী ঘন পাড়ে ডাক।/উল উল বিষ তোরে দেবী দিল হাঁক।।/জপিয়া মারেন তবে গামছার বাড়ি।/ফণীদ্রে ধরিল যেন খগ তাড়াতাড়ি।।/পাতিয়া যুগল হাত মাগেন গরল।/মনসার মন্ত্রে বিষ হয়্যা গেল জল।।"[১৩] বাংলার গ্রাম্য ছড়াতেও অনুরূপ কথার প্রতিধ্বনি—'বার চার পাঁচ ঝাড়লে পরে বিষ হইবে পানি।"

সর্পদংশনে মৃত ব্যক্তিকে কলার মান্দাসে জলে ভাসিয়ে দিলে মৃতদেহে প্রাণের সঞ্চার ঘটে,—এরকম লোক-বিশ্বাস প্রচলিত আছে। 'মনসামঙ্গলে' লখীন্দরের সর্প-দংশনে মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার কলার-মান্দাসে ভাসমান অবস্থায় ঘটেনি, স্বর্গলোকে মনসার সাপের বিষ-ঝাড়ার মন্ত্রোচ্চারণেই তা সম্ভব হয়েছে। শরীরকে বিষমুক্ত করার জন্য প্রায় একই কথার প্রতিধ্বনি শুনি এখানেও—"মনসা মন্ত্রে বিষ ফুঞে হৈল জল।।...মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রে প্রাণ সঞ্চারিল।।"[১৪] এখানে মনে রাখতে হবে, বেহুলা অবশ্য প্রাথমিকভাবে দেবসভায় ছদ্ম-পরিচয়েই প্রবেশ করেছিল। নেতা তাকে নিজের 'বোন্‌ঝি' বলে পরিচিত করিয়েছিল, যে নাকি ভালো কাপড় কাচতে পারে এবং নৃত্যগীতে পারদর্শী।—"মোর বাড়ি আসিয়াছে মোর বোনি-ঝি।।...দেবতা-সভায় যাবে বেহুলা নাচনী।/তুমি যে নাচিতে পার আমি ভালো জানি।।"[১৫] দেবীর মতো অলৌকিক মায়ায় নয়, প্রকৃত পরিচয়

গোপন করে স্বামীর পুনরুজ্জীবনের জন্য নিজের কাজ দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে হয়েছে বেহুলাকে।

তবে একথাও ঠিক, নানারকম ছদ্মসাজে চাঁদ সদাগরকে জব্দ করার আগেই তার পুত্রদের প্রাণ হরণ করতে পারতেন মনসা। কিন্তু তা তিনি করেন নি। চাঁদকে সুযোগ দিয়েছেন এবং বারবার অপমানিত হয়েছেন। তাঁর 'নটীর সাজ'কে 'বেউশ্যার সাজ' বলা হয়েছে। মনসা নিজেকে নারীর দেহ-ব্যবসার এই আদিম পেশার অঙ্গীভূত করে কেবলমাত্র আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে জিততে চেয়েছেন। কিন্তু এখানে স্পষ্ট হয়ে গেছে নারীর সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান, সেই সঙ্গে চাঁদ বণিকের মতো প্রবল প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী, পুরুষকার ও ব্যক্তিত্বে অনড় অটল একজন মানুষের কামনা-জর্জর রূপ। মানুষের ভিতর-বাহিরের এই তফাত আমাদের অজানা নয়। কিন্তু ধাক্কা লাগে এখানেই, যেখানে দেখি, নটীর সঙ্গলাভের জন্য স্ত্রী সনকা ও পুত্রদের ছোটো করতেও সে এতটুকু দ্বিধান্বিত হয় নি—"ছটি পুত্র মোর কাটি পাএ তোর সনকারে দিব দাসী।।"[১৬] চাঁদের মহাজ্ঞান-হরণের জন্য মনসাকে চাঁদের মুখে বা ঘাড়ে পদাঘাত পর্যন্ত করতে হয়েছে। শুধু তাই নয়, চাঁদ সদাগরকে সব বিপদ থেকে উদ্ধারকারী ধন্বন্তরি ওঝার মৃত্যু-রহস্য জানার জন্যও দেবীকে নানা পেশাভিত্তিক ছদ্মসাজ নিতে হয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল'-এ মনসা প্রথমে মালিনী ও পরে গোয়ালিনীর বেশ নিয়েছেন এবং তাতেও কার্যসিদ্ধি না হওয়ায় ওঝার স্ত্রী কমলার সঙ্গে সখ্য স্থাপন বা সয়লা পাতানোর জন্য শঙ্খিনী নগরে গেছেন। সে যুগে সই পাতানো ছিল এক ধরনের লোকপ্রথা। একে আমরা কৃত্য বা 'ritual' বলতে পারি। উইলিয়ম গ্রাহাম্ সামনার আমাদের জানাচ্ছেন, যে পদ্ধতিতে 'Mores' বেড়ে ওঠে এবং প্রতিষ্ঠিত হয়, তাই 'ritual', আবদুল হাফিজ তাঁর 'লৌকিক সংস্কার ও মানব-সমাজ' গ্রন্থে সামনারকে সমর্থন করেই লিখেছেন—"...এর মধ্যে পড়ে প্রার্থনা, ধর্মীয় সঙ্গীত গাওয়া, দেবতাদের উদ্দেশে নৃত্য-নিবেদন করা,...বলিদান, দান-খয়রাত দেওয়া।" সেদিক থেকে দেখতে গেলে বেহুলার দেবসভায় নৃত্য পরিবেশন, দৌলত উজির বাহরাম খাঁ-এর 'লায়লী-মজনু' কাব্যে মজনু বা কএসের পিতা কিম্বা দৌলত কাজির 'লোর চন্দ্রাণী ও সতীময়না' কাব্যে ময়নাবতীর দান-ধ্যানকে আমরা প্রচলিত লৌকিক প্রথা বা কৃত্য হিসাবে বিচার করতে পারি।

শঙ্কু ওঝা বা ধন্বন্তরি বিষ-বিশেষজ্ঞ। অথচ ভাদ্র মাসের অমাবস্যায় মঙ্গলবারে তার ব্রহ্মতালুতে তক্ষক দংশন করলে নিশ্চিত মৃত্যুর অভিশাপ সে পেয়েছে। এই ভাদ্র মাসেই মনসার পুজো হয়। মনসা পুজোর সঙ্গে পান্তাভাতের সম্পর্ক আছে। এই উৎসবকে বলে 'অরন্ধন'। এটিও অঞ্চলভিত্তিক লোক-অনুষ্ঠান।

রান্নাঘরের পাশে শালুক ও ফণিমনসার ডাল দিয়ে মনসার ঘট সাজিয়ে রাখা হয়। গ্রামাঞ্চলে সাপের উপদ্রব থেকেই সম্ভবত মনসা পূজার উৎপত্তি। একটা বিষয় এখানে লক্ষ করার,—শ্রাবণ মাসকে শিবের মাস বলা হয়। এই মাসে শিবের মাথায় জল ঢালার পর, ভাদ্র মাসে শিবের মানস কন্যা মনসার পূজা হয়। এটি আমাদের টোটেম কৃষ্টির অঙ্গ। চাঁদের ছয় পুত্রের পান্তাভাতে মনসার নির্দেশে সাপ যে বিষ ঢেলে দিয়েছে, একথা আমাদের সকলেরই জানা। সুতরাং এখানেও পান্তাভাতের সঙ্গে নানা ব্যঞ্জনাহারের কথা বলা হয়েছে। আবার সাপকে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খাওয়ার প্রচলনও কোনো কোনো গোত্র বা সম্প্রদায়ের মধ্যে আছে। সর্পপূজক সম্প্রদায় বছরে একবার সাপকে বলি দিয়ে তাকে ভাতের সঙ্গে মিশিয়ে খায় বংশগতির প্রতীক-চিহ্ন হিসাবে। একে বলে 'টোটেম-ভোজ'।[১৭] টোটেম-ভাবনার আদি সাংস্কৃতিক যোগসূত্রের বিচারে ফ্রয়েড যে 'পিতৃপ্রতিম সত্তার হত্যা'র কথা বলেছেন, তার উদ্ভব ঘটেছে অনেক আগেই। তবে যে সকল রাষ্ট্রনৈতিক, আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় কারণে মঙ্গলকাব্যের সৃষ্টি হয়েছে, তার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে মনসার পূজা প্রতিষ্ঠা ও প্রচারের অক্লান্ত চেষ্টার একটা তাৎপর্য আমরা খুঁজে পাবো। এর ওপর ভিত্তি করেই তাঁর ছদ্মবেশ ধারণের নানা পর্যায় তৈরি হয়েছে। দরিদ্র মৎস্যজীবী ঝালু মালু থেকে মনসা-পূজক বেহুলা সকলের কাছেই ছদ্মবেশে পৌঁছে গেছেন তিনি। মনসামঙ্গল কাব্যের মতো মধ্যযুগের আর কেনো কাব্যে চরিত্রের, বিশেষত, দেব-চরিত্রের এত বেশি ছদ্মসাজ আমরা দেখি না। মোট কথা, পূজা আদায় ও অভিশাপ দেওয়ার জন্য কিম্বা নানা উপায়ে ছলনার দ্বারা কার্য-সাধনের জন্য তাঁদের ছদ্মবেশ ও ছদ্মপরিচয় গ্রহণ করতে হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে শুধু লোকসংস্কৃতি নয়, আমাদের সামাজিক, রাষ্ট্রনৈতিক ও অর্থনৈতিক পটভূমিটিও পরিস্ফুট হয়। অপরিস্ফুট থাকে না মনস্তাত্ত্বিক পরিচয়ও। মনসার ছদ্মবেশ ধারণে মনস্তাত্ত্বিক কারণই বিশেষভাবে বর্তমান। কেন শিবের কন্যা হয়েও আমি পুজো পাব না? কেন আমার এই আত্মপরিচয় ও অস্তিত্বের সংকট? সাধারণ মানুষ হয়েও চাঁদ অসম যুদ্ধে আমাকে অসম্মান করবে কেন?—"পরাভব লাগি ওষ্ঠ অধর শুকায়/জিনিবার তরে চান্দ না দেখে উপায়।"[১৮] এইসব নানা প্রশ্নের সমাধানে তাঁর ছদ্মবেশ গ্রহণ। আবার এই মনস্তাত্ত্বিক কারণ দেখি 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যের 'আখেটিক খণ্ডে,' দেবী চণ্ডীর ষোড়শী কন্যার ছদ্মবেশ গ্রহণে কালকেতু-পত্নী ফুল্লরার প্রতিক্রিয়ায়। এর প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে যে চরিত্র ছদ্মসাজ নিচ্ছে, তার মনস্তত্ত্ব অন্য চরিত্রের মনকেও প্রভাবিত করছে। বেহুলার ভাসান-যাত্রা যেমন লোকায়ত সমাজের সৃষ্ট লোকাচার ভিত্তিক, তেমনি নেত বা নেতার শ্বেতকাকের রূপ ধারণ, মনসার শ্বেতমাছির রূপ পরিগ্রহণের

মূলেও আছে লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার কেন্দ্রিক কিছু রূপক-ভাবনা। মনসামঙ্গলে এরকম দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তুলনায় 'চণ্ডীমঙ্গল'-এ তা অনেক কম।

কালকেতুর শিকার-দৃষ্টি হরণের জন্য, এককথায় পশুদের রক্ষা করার জন্য অরণ্যাণী চণ্ডী সুবর্ণ গোধিকা রূপে পথে পড়েছিলেন। তাঁর এই রূপের মধ্যে লুকিয়েছিল আর এক রূপ, যা সুন্দরী ষোড়শী কন্যার। কালকেতু শিকার না পেয়ে সুবর্ণ গোধিকাকেই বাড়ি নিয়ে এলে তা সালংকারা ষোড়শীতে রূপান্তরিত হল। কালকেতু তা জানতেও পারলো না। কারণ, সে তখন গোলাহাটে। এদিকে ফুল্লরা গৃহে ফিরে সুবর্ণ গোধিকা নয়, কাঞ্চন-বর্ণা নারীকেই দেখলো। স্বভাবতই সপত্নী আশঙ্কায় ঈর্ষান্বিত হল সে। দেবীর নিজ পূজা-প্রচারের জন্য এই অভিপ্রায় বা অভিসন্ধিমূলক ছদ্মবেশ আর এক নারীর দাম্পত্যসুখ নষ্টের কারণ হল। পশুদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী অরণ্যাণী দুর্গা, জগৎমাতা। তা বোঝা যায় ঋগ্‌বেদের অরণ্যাণী সুক্তের (১০-১৪৬) প্রথম শ্লোক থেকেই। তিনি গোধিকারূপ ধারণ না করলেও অর্থাৎ ছলনার অবকাশ না রেখে স্বরূপে কালকেতুকে নির্দেশ দিলেও হয়তো সে তা পালন করতো সামান্যতম গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে। সে ব্যাধের সন্তান। শ্রমজীবী, সংগ্রাহক, শিকারজীবী। উৎপাদন শক্তির অন্তর্ভুক্ত নয়। অথচ অরণ্যাণী চণ্ডী অরণ্য ও পশুদের রক্ষয়িত্রী। জগন্মাতা হিসাবে উৎপাদিকা শক্তি বা কৃষির সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক। আবার তিনি কালকেতুকে বন কেটে নগর পত্তনের কথা বলেছেন। একথা স্পষ্ট যে, সুবর্ণ গোধিকা দেবী চণ্ডীর প্রতীক—প্রতিনিধি। গোধিকা তো গোসাপ! অর্থাৎ পশু-প্রতীক বা 'Zoo-morphic' 'ভাববীজ ক্রমে নরাকৃতি ধারণ করেছে।'[১৯] এ বিষয়ে আমাদের নতুন করে বলার কিছু নেই। অধ্যাপক সুকুমার সেন 'বণিক খণ্ডে'র কাহিনি বিষয়ে প্রশ্ন রেখেছেন—'যে দেবী কালকেতুর শিকার লুকিয়ে ফেলেন, যিনি ছাগল-চরানো খুল্লনার হরণ-পূরণের কারয়িত্রী, তিনিই কি কমলে-কামিনী?' কমলে-কামিনীকে গজলক্ষ্মী বলে বহু গবেষণা হয়েছে। কিন্তু গজলক্ষ্মী কেন? কমলে-কামিনী আসলে গণেশজননী। আবার বনের পশুদের লুকিয়ে ফেলা এবং গুপ্তধনের হদিশ দেওয়া একই দেবতার ভূমিকা না হওয়াই সম্ভব। এদিকে খুল্লনাকে যিনি ছাগল ফিরিয়ে দিয়েছেন, তিনি পশু-চারক সমাজেরই চাহিদা পূরণ করেছেন। এরকম কিছু জটিল বৃত্ত বা অমীমাংসিত প্রশ্ন 'চণ্ডীমঙ্গল' কাব্যে দেবীর ছদ্মরূপ ধারণে উঠে এসেছে। দেব চরিত্রের ছদ্মবেশ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই রূপক বা প্রতীকাশ্রিত। লেভি স্ট্রাউসের গঠনবাদী তত্ত্ব বিভিন্ন দেশের পুরাকথার বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়েছে। তাঁর তত্ত্বে দুটি বিপরীতমুখী শক্তির দ্বান্দ্বিকতার কথা আছে। আবার ক্রীড়ার সঙ্গে কৃত্যের তুলনায় বিপরীত দুই শক্তির দ্বন্দ্ব ভারসাম্য রক্ষা করে। আচার-অনুষ্ঠান, প্রথা-সংস্কার, পুরাকথা, ছড়া, ধাঁধা,

লোকসংগীত ইত্যাদি প্রসঙ্গেও তাঁর তত্ত্বের ব্যাখ্যা চলে। লোকসংস্কৃতির অন্য শাখার তুলনায় প্রথা ও আচারকে 'মোটিফ' অনুসারে সাজানো সম্ভব। স্ট্রাউস তাঁর তত্ত্বকে যে গাণিতিক শৃঙ্খলায় সাজিয়েছেন, ড. মযহারুল ইসলাম এবং নির্মলেন্দু ভৌমিকও ফোক্‌লোর চর্চায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেছেন ও ফোক্‌লোর চর্চায় রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ পদ্ধতির উপর গুরুত্ব দিয়েছেন। আমাদের আলোচনা যেহেতু ছদ্মবেশ কেন্দ্রিক, তাই এ বিষয়ের বিস্তৃতির মধ্যে না গিয়ে আমরা সাহিত্য-কেন্দ্রিক উক্ত বিষয়েই পুনরায় মনোনিবেশ করছি।

আমরা প্রায় প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে দেবী পার্বতীকে শিবকে নিজ গৃহে ফিরিয়ে আনার জন্য বা ছলনা করার জন্য ছদ্মবেশ নিতে দেখেছি। দেবীর ছদ্মবেশে অন্ত্যজ সমাজের চরিত্রের রূপায়ণ দেখি। সেখানে জাত-পাত, স্পৃশ্যতা-অস্পৃশ্যতার বিষয়গুলি সম্পূর্ণ অনুচ্চারিত থাকে নি। এক্ষেত্রে পার্বতী 'বাগ্‌দিনী', 'ডোমনী' ইত্যাদি ছদ্মবেশ নিয়েছেন। স্বামীর স্বভাব তাঁর অজানা নয়। তাই তাঁকে ছলনা করাও সহজ। তবে সব কিছুর ঊর্ধ্বে তাঁদের দাম্পত্য-প্রণয়েরই প্রতিষ্ঠা ঘটেছে। পত্নীর কাছে হার মেনেছেন শিব। আবার 'শিবায়ন'-এ তিনি অভিমানিনী স্ত্রীকে কৈলাসে ফেরানোর জন্য নিজে শাঁখারী সেজে তাঁর কাছে পৌঁছে গেছেন। কবিরা যে ছদ্মসাজের প্রসঙ্গগুলি এনেছেন, সেগুলি সবটাই তৎকালীন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরেছে।

আপাতদৃষ্টিতে ছদ্মবেশ বা ছদ্মসাজ চরিত্রকে এমনভাবে উপস্থাপন করে, যার কৌতুককর হাস্যরসাবেদন অস্বীকার করা যায় না। এগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে 'কমিক রিলিফে'র কাজ করে। আবার ড্রামাটিক আয়রনি সৃষ্টির সহায়ক হিসাবেও ছদ্মসাজের ভূমিকা দেখি। তুলনায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের কিছু দৃষ্টান্তের অবতারণাও সম্ভব। লোকসংস্কৃতির দৃষ্টিকোণ থেকেও এর বিচার অসম্ভব নয়। কিন্তু বিস্তৃত পরিসর সেই আলোচনা সংক্ষিপ্ত এই প্রবন্ধে সম্ভব নয় বলে আপাতত মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করছি।

রামায়ণ মহাভারতে ছদ্মসাজ তথা ছদ্মপরিচয়ের নানা প্রসঙ্গ আছে। তা শূপর্নখার মায়াবী সাজ থেকে শুরু করে রাবণের ছদ্মবেশে সীতা হরণ পর্যন্ত বিস্তৃত। শূপর্নখার নাসিকা ছেদন এবং সীতাহরণের ঘটনাকেন্দ্রিক লক্ষ্মণের গণ্ডি মিথে পরিণত হয়েছে। মহাভারতের অজস্র দৃষ্টান্তের মধ্যে পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাস নানা দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ। তাঁরা অজ্ঞাতবাসের সময় তাঁদের অস্ত্রগুলি শমীবৃক্ষে লুকিয়ে রেখেছিলেন। এই শমীবৃক্ষ লোকজ বিশ্বাস অনুযায়ী নবগ্রহের অন্যতম শনির প্রতিনিধি-বৃক্ষ। শমী বৃক্ষের পাতা অর্পণ করলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকার লাভের পাশাপাশি কলহের অবসান হয়। আবার এঁদের অজ্ঞাতবাসকালীন ছদ্মনাম

ও ছদ্মপরিচয়গুলি নিম্নরূপ—যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম কঙ্ক। ছদ্মবেশ-পাশাখেলায় নিপুণ ব্যক্তি। ভীম-ছদ্মনাম বল্লভ। ছদ্মবেশ-পাচক। অর্জুনের ছদ্মনাম—বৃহন্নলা। ছদ্মবেশ—বিরাট রাজকন্যা উত্তরার সংস্কৃতিচর্চার শিক্ষক। নকুল—ছদ্মনাম তন্তিপাল, ছদ্মবেশ—গো-শালর অধ্যক্ষ। সহদেব—ছদ্মনাম গ্রন্থিক, ছদ্মবেশ—অশ্বশালার অধ্যক্ষ। আর দ্রৌপদীর ছদ্মনাম সৈরিন্ধ্রী, বিরাট-রানী সুদেষ্ণার পরিচারিকার ছদ্ম-পরিচয় তিনি গ্রহণ করেছিলেন। এঁদের প্রত্যেকের নামের নিহিতার্থও বর্তমান। এঁরা প্রত্যেকেই বিরাট রাজার গৃহকর্ম ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গে যুক্ত। যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম কঙ্ক। কঙ্ক পক্ষী-বিশেষ। কিন্তু এর রঙ সাদা। এই পাখি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের 'মনসামঙ্গল' কাব্যের শ্বেতকাকের কথা মনে করায়। কারণ শ্বেতকাক সেখানে শুভ্রতা তথা ধর্মের প্রতীক। অর্জুন বৃহন্নলা। সে দীর্ঘ ভুজ-বিশিষ্ট ক্লীববেশী, —তৃতীয় লিঙ্গের ভূমিকায় অবতীর্ণ বললে ভুল হয় না। অর্থাৎ সমাজ-প্রবহমানতার নানা ইঙ্গিত চরিত্রগুলি ধারণ করে আছে। সৈরিন্ধ্রি শৈল্পিক গুণাবলীতে দক্ষ। ভীমের 'বল্লভ' নামের তাৎপর্য সহজে অনুধাবনযোগ্য নয়। তবে অজ্ঞাতবাসের সময় বিরাট-রাজার শ্যালক, সুদেষ্ণার ভাই কীচকের সৈরিন্ধ্রীর প্রতি আচরণে যখন পঞ্চপাণ্ডব দ্যূত-সভার মতোই নীরব ছিলেন, তখন একমাত্র ভীমকেই বিচলিত হতে দেখি। সুতরাং দ্রৌপদী ভীমের কাছে এসেই কীচকের অপমানের প্রতিশোধ বা প্রতিবিধান নেওয়ার কথা বলতে পেরেছিলেন। কারণ দ্রৌপদী জানতেন, এই মধ্যম পাণ্ডবই তাঁকে অসম্মানের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবে। কীচকের দ্রৌপদীকে পাওয়ার বাসনায় উচিত শিক্ষাদানে ভীম দ্রৌপদী অর্থাৎ সৈরিন্ধ্রীর ছদ্মরূপ, ছদ্মকণ্ঠ এবং অসামান্য কৌশল অবলম্বন করে পত্নীর 'প্রাণবল্লভ' হওয়ার উপযুক্ত কাজটিই করেছিলেন। এছাড়া দেহতত্ত্ব অনুযায়ী এদের প্রকৃত নামের আধ্যাত্মিক অর্থও আছে। যেমন—যুধিষ্ঠির আকাশ-তত্ত্ব, ভীম-বায়ু তত্ত্ব, অর্জুন-তেজতত্ত্ব, নকুল-রসতত্ত্ব ও সহদেব-পৃথ্বীতত্ত্ব। সুতরাং ছদ্মনাম ও প্রকৃত নামের বিশ্লেষণ ভারতের লোকমানসের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন নয়। তন্তিপাল ও গ্রন্থিক —এ দুটি ছদ্মনাম ও পরিচয় যথাক্রমে গোশালা ও অশ্বশালায় অধ্যক্ষ হিসাবে উৎপাদন ও রাজত্ব, সম্পদ, পরাক্রম ইত্যাদির বৃদ্ধিমান বিষয়কেই ব্যঞ্জিত করেছে। বলাবাহুল্য, এ আলোচনার পরিসর দীর্ঘ এবং তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়।

অষ্টাদশ শতকের 'শিবায়ন' কাব্যধারার কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্যের কথা পৃথকভাবে না বললেও সামগ্রিকভাবে স্বামী শিবকে ছলনা এবং গৃহমুখী করার জন্য পার্বতীর নানারকম ছদ্মবেশ গ্রহণের কথা আমরা আগেই বলেছি, যার দ্বারা শুধু কৌতুকরস সৃষ্টি হয় নি, সমাজের জাতিগত বিভাজনের বিষয়টিও মূর্ত হয়েছে। প্রসঙ্গত

দেবীর 'ডোম্‌নী' ও 'বাগদিনী' রূপ গ্রহণের কথা আমাদের মনে পড়বে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক কবি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গল'-এর দু-একটি প্রসঙ্গ এখানে উল্লেখ করবো। ব্যাসদেব দ্বিতীয় কাশী নির্মাণের জন্য অন্নদার ধ্যান করলে মহামায়া 'জরতী শরীর' ধারণ করে ব্যাসদেবকে ছলনা করতে এলেন। বললেন—'শাপ দিব বর দিয়া'[২০] তাঁর ছদ্মবেশের বাস্তবানুগ বর্ণনা কবি দিয়েছেন এবং এ বর্ণনা ভারতচন্দ্রের পক্ষেই দেওয়া সম্ভব—"মায়া করি মহামায়া হইলেন বুড়ী।/ ডানি করে ভাঙ্গা লড়ি বাম কক্ষে ঝুড়ি।।...ডেঙ্গর উকুন নীক করে ইলিবিলি।/কুটকুটি কালকোটারির কিলিবিলি।/...শত গাঁটি ছিঁড়া টেনা করি পরিধান।/ব্যাসের নিকট গিয়া কৈলা অধিষ্ঠান।।"[২১] এর পরবর্তী অংশে অন্নদার কথার চাতুর্যে যেমন বুদ্ধির দীপ্তি আছে, তেমনি আছে কৌতুকরস। সেই সঙ্গে ব্যাসের দেবীর প্রতি আক্ষেপোক্তিতে দেবতার মহিমা সংক্রান্ত যে প্রশ্ন উঠে এসেছে, তা আধুনিক জীবন-জিজ্ঞাসারই নামান্তর—"শরীর করিনু ক্ষয় তোমারে ভাবিয়া।/কি গুণ বাড়িল তব ব্যাসেরে ছলিয়া।।"[২২]

এছাড়া অন্নদার 'ভবানন্দভবনে যাত্রা' অংশে দেবী কুলবধূর রূপে ঘাটে গিয়ে ঈশ্বরী পাটুনিকে ডেকেছেন। শুধু ছদ্মরূপ নয়, ব্যঞ্জনাময় বাক্যে নিজের আসল পরিচয়ও সুকৌশলে তিনি জ্ঞাপন করেছেন—"অতি বড় বৃদ্ধ পতি সিদ্ধিতে নিপুণ।/কোন গুণ নাহি তাঁর কপালে আগুন।।"[২৩] ঈশ্বরী পাটুনী অবশ্য অনতিবিলম্বে বুঝেছে, এ মেয়ে সাধারণ নয়। কারণ দেবী সেউতীর উপর পা রাখলে সেটি সোনার সেউতিতে রূপান্তরিত হয়েছে। ঈশ্বরী পাটুনী নিশ্চিতভাবে ভেবেছে—"এ তো মেয়ে মেয়ে নয় দেবতা নিশ্চয়।।"[২৪] দেবী তাকে বর দিতে চাইলে ঈশ্বরী পাটুনী শুধু একটি প্রার্থনাই করেছে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধে-ভাতে।" লক্ষণীয় যে, এখানে দেবীর ছদ্মরূপ ধারণে তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থাটি ফুটে উঠেছে। ঈশ্বরী বেশি কিছু চায় নি, অন্নের হাহাকারের দিনে নিজের সন্তানের জন্য একমুঠো ভাত আর দুধের স্বপ্ন দেখেছে। এ তো যে কোনো মানুষের জন্মগত অধিকারের চাওয়া। কৃষি নির্ভর অর্থনীতির দেশে দরিদ্র মানুষ ছেঁড়া কাঁথায় শুয়ে লাখ টাকার স্বপ্ন দেখে না, তার বাস্তব চাওয়াটুকুই পেতে চায়। আর তার প্রার্থনায় দেশের-দশের সকল মানুষের কথা ব্যক্ত হয় নি, ব্যক্ত হয়েছে শুধু নিজের সন্তানের কথা। পাটুনী দরিদ্র হতে পারে, কিন্তু তার বাস্তব-জ্ঞানের অভাব নেই। সে সেই সময়কালের মানুষ হয়েও বুঝেছে—তার "পরে নহে একা ভুবনের ভার।"

প্রবন্ধের উপসংহারে বলবো অষ্টাদশ শতাব্দীর কবি কৃষ্ণদাসের 'চমৎকারচন্দ্রিকা'র কথা। ইনি কৃষ্ণদাস কবিরাজ নন। বৈষ্ণব দার্শনিক ও কবি

বিশ্বনাথ চক্রবর্তী'র 'চমৎকারচন্দ্রিকা'-নামক সংস্কৃত আখ্যান কাব্যের একটি মূলানুগ ও রসানুকূল অনুবাদ করেন কৃষ্ণদাস। চারটি মনোজ্ঞ মিলন-চিত্রে রাধা-কৃষ্ণের কথা যে ভাবে প্রকাশ করেছেন কবি, তাতে চমৎকার হাস্যরস ও কৌতুকরস সৃষ্টি হয়েছে। কবি কৃষ্ণদাস চারটি 'কুতূহলে' এর কাহিনিকে বিন্যস্ত করেছেন, যদিও প্রতিটি 'কুতূহল'-এ স্বতন্ত্র কাহিনি আছে। এর বৃত্ত নিটোল, সুস্পষ্ট। এই গ্রন্থের কাহিনির বৈশিষ্ট্য হল, যাঁরা রাধা-কৃষ্ণের মিলনের বিরোধী, তাঁরাই এতে নিজেদের অজান্তে, সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ। আর এই সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হওয়ার মূল কারণ কৃষ্ণের নানারকম ছদ্মবেশ গ্রহণ। দ্বিতীয় 'কুতূহলে' কৃষ্ণ অভিমন্যু বা আয়ান ঘোষের ছদ্মবেশে কুঞ্জে রাধার সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। তৃতীয় 'কুতূহলে' তিনি বিদ্যাবলীর বেশ ধরে সর্প-দংশনে কাতর রাধার (যদিও এটা রাধার ছলনা) বিষ নামাবার উদ্যোগ নিয়েছেন। অর্থাৎ তিনি এখানে সাপের ওঝার ছদ্মবেশ নিয়েছেন। আর চতুর্থ 'কুতূহল'-এ তিনি কলাবতীরূপে রাধাকে সংগীত শুনিয়ে মুগ্ধ করেছেন। বলাবাহুল্য, প্রতিটি 'কুতূহলে'র ঘটনায় লোক-সমাজ, লোক-বিশ্বাস তথা লোক-মানসের পরিচয় অব্যক্ত থাকে নি। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে চরিত্র, বিশেষত দেব-চরিত্রের নানা ছদ্মবেশের মধ্য দিয়ে সাধারণ লোকসমাজ ও লোকজীবনের বাস্তব রূপ চমৎকার প্রকাশিত হয়েছে, যার সামাজিক, কাব্যিক এবং নাট্য-আবেদন অনস্বীকার্য।

উল্লেখপঞ্জি

১। Disguise.wikipedia.en.m.wikipedia.org

২। 'দশ' সংখ্যক চর্যা, 'চর্যাগীতি পরিক্রমা', নির্মল দাশ, তৃতীয় সং, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা: ১৩৭

৩। তদেব পৃষ্ঠা: ১৩৯

৪। তদেব পৃষ্ঠা: ১৩৭

৫। 'সতেরো' তদেব পৃষ্ঠা: ১৫৯

৬। 'আঠাশ' তদেব পৃষ্ঠা: ১৮০

৭। তদেব পৃষ্ঠা: ১৮০

৮। 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', বড়ু চণ্ডীদাস, অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য সম্পাদিত, প্রথম সংস্করণ ১৯৬৬, দে'জ পাবলিশিং পৃষ্ঠা: ২৬৫

৯। তদেব, তাম্বূল খণ্ড, তদেব পৃষ্ঠা: ১৯৫

১০। মনসামঙ্গল, কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ, অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত, প্রকাশক, লেখাপড়া, কলকাতা পৃষ্ঠা: ১৫৩

১১। তদেব পৃষ্ঠা: ১৫৪

১২। তদেব পৃষ্ঠা: ১৫৫

১৩। তদেব পৃষ্ঠা: ১৫৬
১৪। তদেব পৃষ্ঠা: ২৭৭
১৫। তদেব পৃষ্ঠা: ২৭৩
১৬। তদেব পৃষ্ঠা: ১৬১
১৭। 'কবি বিজয়গুপ্তের মনসামঙ্গল', অচিন্ত্য বিশ্বাস সম্পাদিত, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৪২৬, প্রকাশক. নিউ বইপত্র, পৃষ্ঠা: ৪৮
১৮। তদেব পৃষ্ঠা: ১৮৮
১৯। তদেব পৃষ্ঠা: ১৫
২০। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, জয়িতা দত্ত সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮, রত্নাবলী, কলকাতা
পৃষ্ঠা: ৯৭
২১। তদেব পৃষ্ঠা: ৯৭
২২। তদেব পৃষ্ঠা: ৯৮
২৩। তদেব পৃষ্ঠা: ১০৯
২৪। তদেব পৃষ্ঠা: ১০৯

লেখক পরিচিত:
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

রবীন্দ্রসাহিত্যে সাঁওতাল জীবন ও সংগ্রাম

সুরঞ্জন মিদ্দে

সারাংশ :

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের শান্তিনিকেতন গড়ে উঠেছে—সাঁওতাল পল্লির চারপাশে। সাঁওতাল জনজাতির শ্রমশীল জীবনকে দেখেছেন,—খুব কাছ থেকে। তাই স্বাভাবিকভাবে রবীন্দ্র সাহিত্যে সাঁওতাল জীবন এসেছে—অনিবার্য ভাবে। রবীন্দ্র নাটক, রবীন্দ্রপ্রবন্ধ,রবীন্দ্রকবিতায় সাঁওতাল জীবনের প্রতিচ্ছবি ধরা পড়েছে। মাত্র ২২ বছর বয়সে তিনি 'ইংরাজের আতঙ্ক' (১৮৯৩) নামক প্রবন্ধে সাঁওতাল বিদ্রোহের (১৮৫৫) গুরুত্ব নিয়ে আলোচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথই প্রথম ভারতীয় যিনি, এই বিদ্রোহের অবদান নিয়ে অসাধারণ মূল্যায়ন করেছেন।

'অচলায়তন' ও 'রক্তকরবী' নাটকে 'মাদল' শব্দটি ব্যবহার করে রবীন্দ্রনাথ এক ভিন্নমাত্রা দিয়েছেন। 'শেষকথা' নামক আধুনিক ছোটগল্প সাঁওতাল জীবনের সবুজ প্রকৃতির অসামান্য বর্ণনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথ গেছেন সাঁওতাল পরগনার শালবীথির সাম্রাজ্য। লিখেছেন 'ছোটনাগপুর' (১৮৮৫) নামক ভিন্নধর্মী প্রবন্ধ। 'মহুয়া' (১৯২৯) কাব্যের 'মহুয়া' কাব্যের 'ক্যামেলিয়া' কবিতায় এক অনামা-অখ্যাত সাঁওতাল মেয়ের প্রেমের এক সারল্য পর্যায়কে অসামান্য দক্ষতায় চিত্রিত করেছেন। প্রাণশক্তির উচ্ছ্বল সরলতায় নামহীন সাঁওতাল নারীর অপার্থিব সৌন্দর্যের আলোকবর্তিকা সামনে এনেছেন।

সাঁওতাল পাড়ার খেলার নদী 'খোয়াই' কিংবা 'কোপাই' এর কথা আছে। 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বাসা'য় আছে সাঁওতালি ছেলের বাঁশির করুণ সুর যেন নদীর কলতানের সঙ্গে মিশে একাকার। 'বীথিকা' কাব্যের 'সাঁওতাল মেয়ে' (১৯৩৪) কবিতাটি এক ব্যতিক্রমী শ্রমিক সাঁওতালি মেয়ের মহিমা চিত্রিত হয়েছে। 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থেও সাঁওতালি মেয়ের রূপ ও শ্রমের প্রশংসা আছে। শুধু বাইরের নয়—ভেতরের অনন্ত ঐশ্বর্য, সাঁওতাল নারীকে যেন এক আশ্চর্য সৃষ্টিতে পরিণত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'কৃষ্ণকলি'রা—সবুজ প্রকতির এক স্বতঃস্ফূর্ত সৃষ্টি—যা মনোরম সব চিত্রকল্পে এক ভিন্নমাত্র দিয়েছে। 'ওগো সাঁওতাল ছেলে' গানটিও প্রকৃতি পর্যায়ে এক অসামান্য মাত্রা। সবমিলিয়ে রবীন্দ্রসাহিত্যে সাঁওতাল জীবনের পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন নবদিগন্তের উন্মোচন করেছে।

মূল শব্দ : সাঁওতাল বিদ্রোহ, মাদল, শালবীথি, মহুয়াবন, সাঁওতাল শ্রমিক, সাঁওতাল নৃত্য-গীত-বাদ্য।

ইংরাজের আতঙ্ক : 'কলদানবের চাকা'

কবি তখন পঁচিশ বছরের যুবক। ১২৯২ বঙ্গাব্দের ফাল্গুনের শেষে হাজারিবাগে গেলেন। দুদিনে তিনি কবিতা লিখলেন। সেগুলি এখন 'উৎসর্গ' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত। কবিতাগুলিতে বেদনার রূপ আছে—ব্যক্তিগত বেদনার আভাস সামান্যই। প্রকৃতি-বন্দনা সৌন্দর্য-প্রতীকে মূর্তি গ্রহণ করেছে। ছোটনাগপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য কবির মনকে কাব্যের নতুন কল্পলোকে উন্মোচিত হয়েছে। হাজারিবাগের কবিতায় মরমিয়া উপাদান নতুন কাব্যধারায় উৎসারিত করেছে সবুজ প্রকৃতির নতুন ভুবনে। পাশাপাশি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'বিচিত্র প্রবন্ধ' গ্রন্থের 'ছোটনাগপুর' রচনাটি। কবিতার সঙ্গে প্রবন্ধের আশ্চর্য মিল যেন এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। এ শুধু ভ্রমণবৃত্তান্ত নয় কবির মানসলোকের এক মনোরম মরমিয়া সুর উচ্চারিত হয়েছে।—

—"চারিদিকে যেন রাঙা মাটির ঢেউ।...শুষ্ক শূন্য সুবিস্তৃত প্রান্তরের মধ্যে সাপের মতো আঁকিয়া-বাঁকিয়া ছায়াহীন সুদীর্ঘ পথ রৌদ্রে শুইয়া আছে।...আশেপাশে পাহাড়। লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছ। স্থানে স্থানে এক-একটা পাহাড় আগাগোড়া কেবল দীর্ঘ সরু পত্রলেশ-শূন্য গাছে আচ্ছন্ন।...এই পাহাড়গুলোকে দেখিলে মনে হয়, যেন ইহারা সহস্রতীরে বিদ্ধ, যেন ভীষ্মের শরশয্যা।"

বৃহত্তর সাঁওতাল পরগনার সবুজ ভুবন নয়। চৈত্রের খরতাপের নীরস নীরব পত্রহীন গাছের বিরহের বর্ণনায়, অলস মহিচেবা জলে অর্ধেক শরীরে মনুষ্যতর প্রাণীর চিত্র, না দেখা উষর ছোট নাগপুরকে মানসভ্রমণে মুগ্ধ করে। শুধু দিনের বর্ণনা নয় রাত্রির বর্ণনায় ছোটনাগপুর এক অপরূপ মাত্রা পেয়েছে।—

—"যেখানেই চাহি, চারিদিকে লোক নাই, লোকালয় নাই, শস্য নাই, চষা মাঠ নাই, চারিদিকে উঁচু নিচু পৃথিবী নিস্তব্ধ কঠিন সমুদ্রের মতো ধূ ধূ করিতেছে। দিক-দিগন্তেরর উপরে গোধূলির চিক্‌চিকে সোনালি আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িয়াছে।"

এ তো গেল নিসর্গ প্রকৃতির চিত্র। আর মানুষের দেখা পেয়েছেন কি! **'পাথরের মতো কালো ঝাঁকড়া-চুলের-ঝুঁটি-বাঁধা মানুষ হাতে একগাছা লাঠি লইয়া দাঁড়াইয়া'**—ভারতশিল্পী নন্দলাল বসুর তুলিতে জীবন্ত হয়েছে, ছোটনাগপুরের সেই সাঁওতাল মানুষটি যার হাতেও ঐ লাঠি। দাঁড়িয়ে আছে যেন কত যুগ থেকে যুগান্ত পর্যন্ত। যারা পাথরশরীর পাথর কাটবে। তৈরী করবে আধুনিক রেলপথ। লুপ লাইন। আসবে বিদ্যুতের আলো। 'ছোটনাগপুর' প্রবন্ধটি অনবদ্য নান্দনিকতায় উদ্ভাসিত হয়েছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ পাকাপাকি ভাবে বীরভূমে আসার আগেই সাঁওতাল জনজাতির বীরগাথা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। সাঁওতাল জাতির মর্মবেদনা

ও ব্রিটিশ শাসকদের নির্মমতার কথা প্রথম তুলে ধরলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ১৮৯২ খ্রিস্টাব্দে তিনি 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে 'ইংরাজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে ব্রিটিশ শাসকদের নিষ্ঠুরতার কথা তীব্র শ্লেষাত্মক ভাষায় তুলে ধরেছেন। এই সময় ভারতবর্ষের বিশেষ করে মহারাষ্ট্র, বিহার, ও উত্তরপ্রদেশের নানা জায়গায় হিন্দু-মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে তীব্র বিরোধ দেখা দেয়। এই সুযোগে ইংরেজ সরকার হিন্দু-মুসলমান বিরোধের ইন্ধন জোগায়। পরবর্তী সময়ে এই ইংরেজ সরকার 'বঙ্গ-ভঙ্গ' করে বাংলাকে ভাগ করার চক্রান্ত করবে। ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান সাম্প্রদায়িক উত্তেজনার পটভূমিতে লিখলেন 'ইংরাজের আতঙ্ক'। সাঁওতাল গণআন্দোলনের কথা ভারতের চিন্তা-নায়কদের মধ্যে সর্বপ্রথম রবীন্দ্রনাথই কলম ধরেন।—

"১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু মহাজনদের দ্বারা একান্ত উৎপীড়িত হইয়া গবর্মেন্টের নিকট নালিশ করিবার জন্য সাঁওতালগণ তাহাদের অরণ্য-আবাস ছাড়িয়া কলিকাতা-অভিমুখে যাত্রা করিয়াছিল। তখন ইংরাজ, সাঁওতালকে ভালো করিয়া চিনিত না।...অবশেষে গবর্মেন্টের ফৌজ আসিয়া **তাহাদিগকে দলকে-দল গুলি করিয়া ভূমিস্মাৎ করিতে লাগিল**।

...উপরিউক্ত সাঁওতাল উপপ্লবে কাটাকুটির কার্যটা বেশ রীতিমত সমাধা করিয়া এবং **বীরভূমের** রাঙামাটি সাঁওতালের রক্তে লোহিততর করিয়া দিয়া তাহার পরে ইংরাজ-রাজ হতভাগ্য বন্যাদিগের দুঃখ নিবেদনে কর্ণপাত করিলেন। যখন বন্দুকের আওয়াজটা বন্ধ করিয়া তাহাদের সকল কথা ভালো করিয়া শুনিলেন তখন বুঝিলেন, তাহাদের প্রার্থনা অন্যায় নহে। তখন তাহাদের আবশ্যকমত আইনের সংশোধন, পুলিশের পরিবর্তন এবং যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করা হইল।

কিন্তু অ্যাংলো ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের উষ্মা তখনও নিবারণ হইল না। বিদ্রোহীদের প্রতি নিরতিশয় নির্দয় শাস্তিবিধান না করিয়া তাহারা ক্ষান্ত হইতে চাহে না। তাহারা বলিল, বিদ্রোহীরা যাহা চাহিয়াছিল সকলই যদি পাইল তবে তো তাহাদের বিদ্রোহের সার্থকতাসাধন করিয়া একপ্রকার পোষকতা করাই হইল। ক্যাল্‌কাটা রিভিয়ু পত্রের কোনো ইংরেজ লেখক এই শান্তিপ্রিয় নিরীহ **সাঁওতাল দিগকে বনের ব্যাঘ্র, রক্তপিপাসু বর্বর** প্রভৃতি বিশ্লেষণে অভিহিত করিয়া এক প্রবন্ধ লিখিলেন। তাহাতে কেবল দোষীদিগকে নহে, বিদ্রোহী জেলার অধিবাসীবর্গকে একেবারে সর্ব-সমেত সমুদ্রপারে দ্বীপান্তরিত করিয়া দিবার জন্য গবমেন্ট্‌কে অনুরোধ করিলেন।"

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'আত্মশক্তি' গ্রন্থে 'ইংরেজের আতঙ্ক' প্রবন্ধে (১৮৯৩) সাঁওতাল বিদ্রোহের কথা গুরুত্ব সহকারে আলোচনা করেছেন প্রথমেই। সাঁওতাল

জনজাতির আত্মশক্তির জাগরণে স্বতঃস্ফূর্ত চেতনায় মুগ্ধ কবি। সাঁওতাল জনজাতির প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলিকেও উল্লেখ করেছেন। শান্ত, নিরীহ, সাঁওতাল জনজাতিকে ইংরেজ সরকার যে খুব ভয় পেয়েছিল, তাদের নৃশংস কার্যকলাপে তা চিহ্নিত হয়েছে। সমস্ত ইংরেজ শাসক গোষ্ঠীকে রীতিমত একটা বড় ধাক্কা দিয়ে, সাঁওতাল গণউত্থান ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথকে সুগম করেছে। বীরভূমের লাল মাটি আরও লাল হয়ে গেলে, সাঁওতাল মহাজাতির রক্তে। হাজার হাজার সাঁওতাল জনজাতির জীবনের বিনিময়ে ব্রিটিশ আইন সংশোধন করতে বাধ্য হল। শুধু তাই নয়, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর পরিবর্তন করতে বাধ্য হন। সেইসঙ্গে ব্রিটিশ শাসককে ন্যায়বিচারের জন্য যথোপযুক্ত বিচারশালার প্রতিষ্ঠা করতে বাধ্য হল। ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল বিদ্রোহ বিরাট ব্রিটিশ শাসকবর্গের ভয় ধরিয়ে দিয়েছিল—'ইংরাজের আতঙ্ক' রচনায় রবীন্দ্রনাথ খুব স্পষ্ট করে লিখেছেন। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের ঐক্যের গুরুত্ব সাঁওতাল জনজাতির কাছ থেকে—সেই পথের ঠিকানা সমগ্র দেশের দিশা হয়ে রইল।

১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের সাঁওতাল গণউত্থান যা বীরভূমের কৃষক সমাজের প্রথম অভ্যুত্থানও বটে। ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ তথা সিপাই বিদ্রোহের (১৮৫৭) প্রাক্কালে বীরভূমের সাঁওতাল জনজাতি কৃষক ও তাদের সহযোগী গরীব কৃষকদের আত্মত্যাগ; সাঁওতাল পরগনা সহ বৃহত্তর বীরভূমের এক গণসংগ্রামের অমরকাহিনি। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনকে স্বাধীনতা সংগ্রামের রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত তা পেরেছিলেন কি? তিনি কালীমোহন ঘোষ থেকে রানী চন্দ, শ্রীকৃষ্ণ কৃপালিনী সহ অনেক স্বাধীনতার রাজনৈতিক কর্মীকে শান্তিনিকেতন—শ্রীনিকেতনে আশ্রয় দিয়েছিলেন। বীরভূম জেলার কৃষক আন্দোলন গাড়ির সাথে প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন কালীমোহন ঘোষ। শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু ভারত ছাড়ো আন্দোলনের পোস্টার এঁকেছেন। বীরভূম কংগ্রেস-সমাজতন্ত্রী দলের মূল কেন্দ্র শ্রীনিকেতন ও শান্তিনিকেতন। আসলে রবীনন্দ্রনাথ যে স্বদেশপ্রেমিক। ভারতের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী যুবশক্তিকে আন্তরিকভাবে সমর্থন করতেন।

বীরভূম জেলার আদিবাসিন্দা কারা? বীরভূমের বর্তমান জনগোষ্ঠীর মধ্যে অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ী—উভয় জনগোষ্ঠীর উত্তরপুরুষ বিদ্যমান। যেমন—সাঁওতাল জনগোষ্ঠী অস্ট্রিক। আবার বাগদী, মুচি, ডোম প্রভৃতি অধিকাংশই দ্রাবিড়ী ধারার উত্তরপুরুষ। বীরভূম এখনও একটি কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রোটো টাইপ বলে গ্রহণ করতে পারা যায়। এককালে অরণ্য ছিল। 'বীরভূম' নামতো তা থেকেই এসেছে। রবীন্দ্রনাথের দুটি অভিভাষণ 'পল্লীপ্রকৃতি' গ্রন্থে সংযোজিত হয়েছে।

ভাষণ দুটিতে সাঁওতাল জীবন নিয়ে মর্মস্পর্শী মতামত আছে। কবির মনোলোকে পিছিয়ে পড়া মানুষের প্রতি মমত্ববোধ প্রতি ছত্রে ছত্রে উদ্ভাসিত হয়েছে। শুধু মমতাবোধ নয় কবির একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ স্বচ্ছভাবে চিত্রিত হয়েছে। নৃতত্ত্বের আলোয় এক বিশিষ্ট ঋজু নিদর্শন হিসাবে আজও সমান প্রাসঙ্গিক। প্রথম ভাষণটির নাম—'গ্রামবাসীদের প্রতি' (১৯৩০) যা 'শ্রীনিকেতন বাৎসরিক উৎসবে কথিত' হয়েছিল। আর দ্বিতীয় ভাষণটি 'বাঁকুড়ার জনসভায় কথিত' (১৯৬৯) হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথের এই দুটি মূল্যবান অভিভাষণই গ্রামকেন্দ্রিক। শুধু গ্রাম উন্নয়ন নিয়ে যা গ্রামের জনসভায় পঠিত হয়েছিল। স্বাভাবিক ভাবেই গ্রামীণ সাঁওতাল জীবনের সংকট এক নতুন মাত্রায় পরিবেশিত হয়েছে। বিশেষ করে গ্রামের মানুষের সামাজিক সম্বন্ধ সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ প্রবল আশাবাদী ছিলেন। তিনি পল্লীপ্রকৃতি সম্পর্কে লিখেছেন—

"গ্রামে আমাদের দেশের প্রাণপ্রতিষ্ঠা ছিল, তার কারণ গ্রামে মানুষের সঙ্গে **মানুষের যে সামাজিক সম্বন্ধ** সেটা সত্য হতে পারে। শহরে তা সম্ভব নয়। অতএব সামাজিক মানুষ আশ্রয় পায় গ্রামে। আর সামাজিক মানুষের জন্যই তো সব।"

মানুষের মধ্যে শক্তি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ ক্রমশ সংকীর্ণ হতে থাকে। শক্তিশালী মানুষের শক্তিসেল মানুষকে মারার অস্ত্র তৈরী করে। মানুষ মানুষের সর্বনাশকরার জন্য বিষবৃক্ষের বীজ বপন করে সমাজে। তখন মানুষের মধ্যে দরদ উবে যায়। মানুষ তখন মানুষকে দেখে ভোগের উপকরণ হিসেবে। শক্তিশালী মানুষ তখন দুর্বল মানুষকে দেখে যন্ত্র, অর্থের বিনিময়ে শ্রমিক কে পেতে চায়। মানুষ হয়ে ওঠে মানুষের প্রয়োজনের সামগ্রী।

—"শান্তিনিকেতনে চালের কল আছে। **সেই কল-দানবের চাকা সাঁওতালের ছেলেমেয়েরা**। ধনী তাদের কি মানুষ মনে করে। তাদের সুখ-দুঃখের কি হিসেব আছে। প্রতিদিনের পাওনা গুণে তার কাছে কষে রক্ত শুষে কাজ আদায় করে নিচ্ছে।"

রবীন্দ্রনাথ এখানে জরুরী প্রশ্ন তুলেছেন। মানুষই মানুষকে শোষণ করে বড়লোক হয়। সুখীও হয়। কিন্তু মানুষের মধ্যে থেকে হারিয়ে যায় শ্রেষ্ঠ গুণ মানবত্ব। কিন্তু এখানে লক্ষণীয়—শ্রমিক শিশু হিসাবে সবচেয়ে বেশি বলি হচ্ছে সাঁওতাল ছেলে মেয়েরা। সহজে এবং সস্তায়, কম মজুরিতে পাওয়া যায় দরিদ্র সাঁওতাল ছেলেমেয়েদের। রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে সাঁওতাল জীবনের অবহেলিত, শোষিত অবস্থাকে পর্যবেক্ষণ করেছেন অত্যন্ত সহমর্মিতার সঙ্গে। সাঁওতাল শ্রমিকরা সস্তায় বেশি শ্রমদান করতে পারে। তারা ফাঁকিবাজ নয়, তারা

কম মজুরিতে বেশি শ্রম স্বীকার করতে পারে। শান্তিনিকেতনের চারপাশের সাঁওতালদের সম্পর্কে কবির পর্যবেক্ষণ ছিল একেবারে সঠিক। সভ্যতার পিলসুজ সাঁওতাল শ্রমিকেরা অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে আধুনিক সভ্যতাকে গড়ে তুলেও তারা নিজেরা অবহেলিত থেকে গেছে। পল্লী সঞ্জীবনে সাঁওতালকে অবহেলা করে দেশের অগ্রগতি হতে পারে না। শ্রীনিকেতন পল্লীপুনর্গঠনে সাঁওতালদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি করে ভেবেছিলেন রবীন্দ্রনাথ।

'বাঁকুড়ার জনসভায় অভিভাষণে'ও (১৯৩৯) তিনি সাঁওতালদের প্রসঙ্গ উল্লেখ করেছে। রবীন্দ্রনাথ গভীর বেদনার সঙ্গে আক্ষেপ করেছেন শিলাইদহের সেই গ্রামীণ জীবন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছেন বলে। খ্যাতির শীর্ষে এসে কবির গ্রাম জীবনের পরিদর্শন কমে গেছে বলে, দুঃখ করেছেন। তিনি স্মরণ করেছেন, শহর থেকে নির্বাসিত হয়ে শান্তিনিকেতনের নির্বাসিত হয়েও মানবরসে জারিত হয়েছেন। চারদিকের রুক্ষ্ম শুষ্কতার মধ্যেও জীবনের মাধুর্যরসে ভরিয়ে দিয়েছিল সাঁওতাল জীবন। মানুষের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ গুণ তিনি খুঁজে পেয়েছেন—সত্যবাদী, শক্তিশালী সাঁওতালদের মধুর ব্যবহারে। মানবিকতায় সেই শক্তিসম্পদ সাঁওতালদের স্বভাবজাত। তাদের তিনি ভালোবাসেন অন্তর থেকে। হতে পারে তারা গরিব, হতে পারে হতদরিদ্র-নিরক্ষর। কিন্তু মানবসম্পদে ভরপুর সাঁওতাল জনজাতি রবীন্দ্রনাথের মনোলোকে গভীর ভাবে প্রভাবিত করেছিল। তা তিনি অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে স্বীকার করেছেন।

—"শান্তিনিকেতনের চারপাশে একটা রুক্ষ্ম শুষ্কতা আছে, সেই শুষ্ক আচরণের মধ্যে আছে মাধুর্যরস; সেখানকার মানুষ যারা—সাঁওতাল—সত্যপরাতায় তারা ঋজু এবং সরলতায় তারা মধুর।"

সভ্যতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ সেই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ গুণগুলি তিনি খুঁজে পেয়েছেন—মাধুর্যমণ্ডিত সাঁওতালদের মধুর ব্যবহারে। তারা বিনয়ী, প্রয়োজনে তারা বিদ্রোহী কিন্তু সামগ্রিক মহিমায় তারা ঋজু। পরিশ্রমের বিনিময়ে মজুরি পেতে চান। চৌর্যবৃত্তি তাদেরকে স্পর্শ করেনি। একইসঙ্গে তারা শ্রমশীল ও সত্যশীল। সাঁওতালদের নিজগুণে রবীন্দ্রনাথের হৃদয়হরণ করে নিতে পেরেছিলেন—অবজ্ঞাত সাঁওতাল মানুষেরা।

হতভাগ্য সাঁওতালদের দুঃখ কেউ দেখল না। তাদের নালিশ কেউ বুঝলো না। যখন নিতান্ত অসহ্য হয়ে তারা দাবানলের মতো অরণ্যভূমি ছেড়ে বাইরে এলো। তখন ইংরেজ তাদের অজস্র গুলিবর্ষণে ধূলিসাৎ করে দিল। জীবনের প্রথম পর্যায়ে রবীন্দ্র ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহকে কেন্দ্র করে প্রথম প্রবন্ধ লেখেন। অসহায় অরণ্যবাসী শোষিত সাঁওতালদের উপর ইংরেজদের

নির্মম গুলিবর্ষণ, কবিকে অত্যন্ত বিচলিত করেছিল। 'ইংরাজের আতঙ্ক' (১৮৯৩) লেখার পাঁচ বছর পরে ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে সেই তিনিই একই প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন।

সাঁওতাল বিদ্রোহের প্রসঙ্গ তুলে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজদের একটি রাজনৈতিক দর্শনের কথা বিশ্লেষণ করতে চেয়েছেন। তিনি সরকারি ইংরেজদের সহিষ্ণুতা বিষয়ে আশাবাদী ছিলেন অথচ 'ধৈর্যশীল' সেই সরকারি ইংরেজরা ১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দে তাদের ঐতিহ্যকে বিসর্জন দিয়ে সরকারি ইংরেজরা অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করেছে। ইংরেজদের সুশাসনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আস্থা ছিল। কিন্তু শেষ বয়সে 'সভ্যতার সংকটে' সেই আস্থা ভেঙে চুরমার হয়ে গিয়ে ছিল। রবীন্দ্রনাথের আশাভঙ্গের সূত্রপাত হয়েছিল ১৮৯৩ ও ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে 'রাজা প্রজা-সমূহ' প্রবন্ধের পরিশিষ্ঠে। তখন তিনি সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজদের ভূমিকা নিয়ে সরব হয়েছিলেন। আশাভঙ্গের বিবর্তনে তা স্পষ্ট হয়েছে। প্রশ্ন উঠেছিল সাঁওতাল বিদ্রোহে ইংরেজ কেন আতঙ্কগ্রস্ত হলো? ইংরেজদের তরফে বলা হয়েছিল—সংখ্যালঘু ইংরেজদের নিরাপত্তার তাগিদে, দ্রুত চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের প্রবৃত্তি জন্মায়।

সত্যদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, ইংরেজদের এই রাজনৈতিক দর্শনকে উপহাস করেছিলেন। তিনি বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন, ইংরেজ রাজপ্রভুদের নির্মম বন্দুক ব্যবহারের উৎস হচ্ছে, ভয় থেকে। কেননা, মনে একবার ভয় প্রবেশ করলে দয়া থাকে না। থাকে না বিচার বোধ। সাঁওতাল বিদ্রোহ এবং সাঁওতালদের প্রতি নিষ্ঠুর গুলিবর্ষণ কবিকে যন্ত্রণাবিক্ষুব্ধ করে তুলতে বাধ্য করেছিল। সাঁওতাল জনজাতির সৌজন্যবিচার, ভদ্রতাবোধ, পরিচ্ছন্নতা, সততাকবিকে মুগ্ধ করেছিল। সাঁওতাল কঠোর পরিশ্রমী। পরিশ্রমের বিনিময়ে জীবিকা পেতে চায়। করুণা বা ভিক্ষা নয়, চায় কাজ। গরিব কিন্তু মর্যাদাবোধ দৃঢ়। কিন্তু সরল নিরীহ বিনয়ী সাঁওতাল যখন প্রতিরোধে সামিল হয়—তখন সামনে মৃত্যু ছাড়া আর কোনো বিকল্প ব্যবস্থা থাকে না। এই গভীর উপলব্ধি থেকেই রবীন্দ্রনাথ তাদেরকে ভালোবেসে ছিলেন।

'মাদল' : 'অচলায়ন' থেকে 'রক্তকরবী'

'অচলায়তন' আমাদের ভারতবর্ষ। 'অচলায়তন' আমাদের নাটকেরও নাম। ভারতবর্ষের তপোবনের পরিবর্তে মঠ-মন্দির এলো। এলো তান্ত্রিকতাও নিয়ম সর্বস্ব ধর্মের যুগ। এলো বিদেশী জাতি—শক, হুণ, পাঠান মোগল এবং সবশেষে ইংরেজ। এই বিদেশী শোনপাংশুর দল বার ভারত-অচলায়তনের প্রাচীর ভেঙে প্রবেশ করেছে। তারপরে ভারতীয় স্থাবিরকদের রক্তের সঙ্গে শোণপাংশুদের রক্ত মিশে গেছে। শোনপাংশুরা বিদেশী জাতির প্রতীক হলে—দর্ভকেরা কি? দর্ভকেরা আমাদের দেশের পিছিয়ে পড়া শোষিত শ্রেণি, অনার্য তথাকথিত

নিম্নবর্ণের—নিম্নবর্গের মানুষ। যাদের নাম কোল, ভীল, ব্যাধ, শবর, সাঁওতাল নামে অবহেলিত। তারা জ্ঞানের বড়াই করে না। ধর্মের ভণ্ডামি জানে না। আচার-সর্বস্ব ধর্মীয় লোক দেখানো নিয়ে মাতামাতি করে না। কেবল সহজ-সরল ভক্তিতে ঈশ্বরের নামগান করে। দর্ভকরা শুধু নামগান করে না বাদ্যসহ নৃত্যগীতও করে। সেই বাদ্য তালিকায় একমাত্র 'মাদল' আছে। আর তাদের ডালিতে আছে পুষ্পরাজি। পুষ্পদ্রোণি দর্ভকদের বাদ্যসহ প্রবেশ এক ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। 'মাদল' বাজিয়ে দর্ভকদল নৃত্য-গীতের এক আনন্দধারা বহিয়ে দিয়েছে।

—"ওগো বঁধু দিনের শেষে
এলে তুমি কেমন বেশে।
আঁচল দিয়ে শুকাব জল
মুছাব পা আকুল কেশে।
নিবিড় হবে তিমির রাতি,
জ্বেলে দেব প্রেমের বাতি।।"

ভক্তিভাবে বন্যায় দর্ভকেরা সবার চেয়ে এগিয়ে আছে। তাদের প্রেমের আলোয় অন্ধকার দূরে চলে গেছে। দর্ভকরাই প্রথম আবিষ্কার করেছে—'দাদাঠাকুর' আসলে তাদের গোঁসাই। নিজেদের কাছের মানুষ। 'গুরু'র আগমনে দর্ভকেরা অতিথি আপ্যায়নে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আন্তরিকতার অকৃত্রিমতায় দর্ভকদের সরল প্রাণের আকুতি ধরা পড়েছে।

—"তৃতীয় দর্শক। ঘরে কী আছে রে ভাই সব বের কর্।
দ্বিতীয় দর্ভক। বনের জাম আছে রে।
চতুর্থ দর্ভক। আমার ঘরে খেঁজুর আছে।
প্রথম দর্ভক। কালো গোরুর দুধ শিগগির দুয়ে আনো দাদা।"

রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় আর্যদের সাধনবৈশিষ্ট্যকে মান্যতা দিয়েছেন। মর্যাদা দিয়েছেন দর্ভকদের ভক্তিমার্গকে। অনার্য-সাঁওতালদের বাদ্যসহ নৃত্য-গীতকে মান্যতা দিয়ে 'অচলায়তন' (১৯১১) নাটককে বিশেষ মাত্রা দিলেন। দাদাঠাকুর গুরু অচলায়নের পুনর্গঠন করলেন। 'অচলায়তন' নাটকে দর্ভকরা 'অন্ত্যজ পতিত জাতি' হয়েও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। নৃত্যগীত প্রিয় মাদলবাদক হিসাবে এই দর্ভকদেরকে সাঁওতাল জীবনের অনুষঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়। রবীন্দ্রনাথ 'অচলায়তন' নাটকে দেখালেন প্রেম ছাড়া কর্ম ও জ্ঞান পরিপূর্ণ নয়, সর্বার্থ সার্থকও নয়। প্রেমই জ্ঞান ও কর্মকে সরস, শ্রীমণ্ডিত ও পরম রমণীয়া করে তোলে। দর্ভকদের মাধ্যমে সেই প্রেমের সঞ্জীবনকে সামনে এনেছেন। কেউ অন্ত্যজ নয়, নয় কেউ ব্রাত্য। পঞ্চক স্বীকার করেছে—'দর্ভক জাতের একটা

গুণ—ওরা একেবারে স্পষ্ট করে নাম নিতে জানে।' রবীন্দ্রনাথের দাদাঠাকুর-গুরু দর্ভকদের বাড়িতে পিঠে খেয়ে এসেছে। পতিত জনদের কাছে গিয়ে গুরু সমস্ত অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। বাইরের বাহ্যিক আড়ম্বর নয় অন্তরের অন্তহীন সৌন্দর্যের পরীক্ষায় গুরুর মন জয় করেছে দুর্ভাগা দর্ভকদল—

—"প্রথম দর্ভক। আমরা আজ শুধু মাষকলাই আর ভাত চড়িয়েছি।

দাদাঠাকুর। আমারও তাতেই হয়ে যাবে।"

সহজে অভিনয়ের অভিপ্রায়ে 'অচলায়তন' নাটকটি 'গুরু' (১৯১৭) নামে রূপান্তরিত করেন রবীন্দ্রনাথ। এখানে দর্ভকদের প্রকাশ্যে স্বীকার করে তারা শাস্ত্র জানে না মন্ত্র মানে না শুধু মনের আনন্দে নাম-গান করতে পারে। দর্ভকপল্লীতে পঞ্চককে ঠাকুর মান্যতায় তারা জীবনের গান শুনিয়েছে। দর্ভকরা নিজেরা নীচ জাতি হিসাবে নিজেরাই খুব সচেতন আছে। পঞ্চক ঠাকুরের প্রবেশে দর্ভকপল্লীতে আজ আনন্দের আলোকঝরনা মাতোয়ারা হয়েছে। প্রাণ শক্তিতে ভরপুর হয়ে প্রাণের আত্ম নিবেদনের গান গেয়েছে দর্ভকদল।

—"ও অকূলের কূল, ও অগতির গতি,
ও অনাথের নাথ, ও পতিতের পতি।
ও নয়নের আলো, ও রসনার মধু,
ও রতনের হার, ও পরাণের বঁধু।।"

মন-প্রাণ উজাড় করে ব্রাত্য-অন্ত্যজ দর্ভকের দল পঞ্চক ঠাকুরকে পরাণের সখা হিসাবে পেতে চেয়েছে। পঞ্চক ঠাকুরেরও পতিত দেরও পেয়ে সমস্ত আচার-নিয়ম ভাঙ্গতে চেয়েছে। পঞ্চকও তাই উদাত্ত কণ্ঠে বলতে পেরেছে—"আমার মন্ত্রতন্ত্র সব ভুলিয়ে দে,...দে আমাকে তোদের গান শিখিয়ে দে।" 'কালের যাত্রা'য় (১৯৩২) রবীন্দ্রনাথ সেই পিছিয়ে পড়া নবজাগ্রত শূদ্রশক্তির জয়গানে ইঙ্গিত করেছেন—শোষিত জনগণের ন্যায্য অধিকার লাভের দিন সমাগত। শ্রমশীল সাঁওতাল জনজাতি সারাদিন কাজ করার পর, সারারাত নাচ-গানে ভরিয়ে দিতে পারে। ক্লান্তিহীন সাঁওতাল জনজাতি প্রাণ-প্রাচুর্যে ভরপুর—এই শ্রান্তিহীন শক্তি তাদের স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্য, যা নাগরিক মানুষকে অবাক করে দেয়। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে লেখা 'রক্তকরবী' নাটকের মধ্যে যন্ত্রদানবের শোষণের চিত্রায়ন, আমাদের শ্রমিক সাঁওতাল জনজাতিকেই মনে করিয়ে দেয়। যারা চালের কলে নিরন্তর পরিশ্রম করে চলে। সেই কল-দানবের চাকায় তাদের ঘাম আর রক্তের বিনিময়ে—সভ্যতার খাদ্য উৎপাদন করে নিরন্তর। রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রতিবেশী সাঁওতালদের দেখেছেন, চলমান শ্রমের কালের যাত্রায়। বিশ্বখ্যাত 'রক্তকরবী' নাটকে প্রাণপ্রাচুর্যে সমৃদ্ধ রঞ্জনের দল কাজের চাপ কমাতে চায়

নাচ-গানের স্নিগ্ধ পরশে।—

সর্দার। ওকে সুড়ঙ্গের মধ্যে দলে ভিড়িয়ে দিলে না কেন।

মোড়ল। দিয়েছিলুম, ভাবলুম, চাপে পড়ে বশ মানবে। উল্টো হল, খোদাইকরদের উপর থেকেও যেন চাপ নেমে গেল। তাদের মাতিয়ে তুললে, বললে, **'আমাদের খোদাইনৃত্য হবে।'**

সর্দার। খোদাইনৃত্য? তার মানে কী?

শ্রমশীল জীবনের আনন্দে ভরপুর কাজের মধ্যেই সৃষ্টির আনন্দ। এই গভীর জীবনবোধ সর্দার-মোড়লদের পক্ষে উপলব্ধি করা কখনই সম্ভব নয়। যারা অর্থের বিনিময় শ্রম খরিদ করে, তারা সৃষ্টির আনন্দধারা কিংবা আনন্দের মধ্যেই সৃষ্টি-শ্রমের ফল্গুধারা থেকে চিরবঞ্চিত থাকে। যারা শুধু অর্থ চান কিংবা শুধু কাজ চান, তারা নিরানন্দেই ধীরে ধীরে পার্থিব জীব শেষ হয়ে যায়। রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধুমাত্র কবি নয়, কবির অন্তর্দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে সমাজ-বিজ্ঞানের সহজ পাঠ। কাজের চাপকে হালকা করে দিতে প্রাণ-সংগীতের প্রয়োজন। ক্লান্ত শরীরকে কর্মঠ করে তোলার জন্য কাজের সঙ্গে শ্রম-নৃত্যের জয়গান করা হয়েছে। শ্রম-সংগীত কষ্টকর একটানা কাজকে প্রাণশক্তির জোগান দেয়। কাজে ফাঁকি না দিয়ে দলগত, সম্মিলিত শ্রম সংগীত লোকজীবনের আদিম জনজাতির এক চিরন্তর বৈশিষ্ট্য। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ রূপকের আড়ালে শোষক আর শোষিত মানুষের নিরন্তর যুদ্ধে শ্রমশীল মানুষের পক্ষেই কলম ধরেছেন। রঞ্জনের কোনো পদবী নেই। রঞ্জন মঞ্চেও উপস্থিত নেই। মানব সভ্যতার চিরন্তন আলোয় শাশ্বত রঞ্জনদের কর্মের প্রতি নিষ্ঠাই রঞ্জনদের এগিয়ে দিয়েছে। রঞ্জনেরা শ্রমচুরির কথা ভাবতে পারে না। সে পাঠ তারা কখনো রপ্ত করেনি। কাজের মধ্যেই যাদের জীবন শেষ হয়ে যায়, তাদের কাছে কোন জোর খাটে না। চলে না কোনো কৌশল-কারসাজি। 'রক্তকরবী', 'খোদাইনৃত্য' শ্রমশীল সাঁওতাল জনজাতির অনুষঙ্গকে মনে করিয়ে দেয়। শোষক ইংরেজ কিংবা কারখানার বিত্তবান প্রভু বন্দুক দিয়ে দমাতে পারেনি সাঁওতাল বিদ্রোহ কিংবা মুণ্ডা আন্দোলনকে।—

মোড়ল। রঞ্জন ধরলে গান, ওরা বললে, **'মদন পাই কোথায়?'** ও বললে, **'মাদল না থাক, কোদাল আছে।'** তালে তালে কোদাল পড়তে লাগল; সোনার পিণ্ড নিয়ে সে কী লোফালুফি। বড়ো মোড়ল স্বয়ং এসে বললে, 'এ কেমন তোমার কাজের ধারা।' রঞ্জন বললে, **'কাজের রশি খুলে দিয়েছি, তাকে টেনে চালাতে হবে না, নেচে চলবে।'**

সর্দার। লোকটা পাগল দেখছি।

এবার একেবারে নিশ্চিত হওয়া গেলো—'মাদল' শব্দটি দু-দুবার ব্যবহৃত

হয়েছে। দলগত বা সম্মিলিত নৃত্য-গীতের জন্য মাদল আনন্দপ্রিয় সাঁওতাল জনজাতির অবসর-বিনোদনের মোক্ষম হাতিয়ার। কিন্তু গভীর খনির অতলতলে, পাতালরাজ্যে 'মাদল' থাকার কথাও নয়। যা আছে তাদের সকলের হাতে, তা কোদাল। সোনার খনিতে তাদের জীবন-মরণ কাজ। মৃত্যু গহ্বরে মৃত্যুর মুখোমুখি জীবনের কোনো মূল্যও নেই। সোনা-কারবারীদের কাছে স্বর্ণ-অর্থ ছাড়া মানুষের জীবনের কোনো গুরুত্ব নেই। তাই চিরাচরিত কাজের ধারার ব্যতিক্রমীতে প্রভুকে শুধুই উদ্বিগ্ন হতে হয়েছে। সৃজনশীল শ্রমিক রঞ্জনদের টেনে, জোর করে কাজ আদায় করার কৌশল বিত্ত-প্রভুদের জানা নেই। কাজের মধ্যেও এক ছন্দ আছে, থাকাও উচিত। বিশ্ব প্রকৃতিরও এক নিজস্ব ছন্দে প্রবাহিত হয়। অনন্ত প্রকৃতির সন্তান মননশীল রঞ্জনেরা, অত্যন্ত দৈহিক শ্রমের কর্মভুবনে শ্রমছন্দ তৈরি করে নিতে পেরেছে। এখানে ব্যক্তি রঞ্জন নয়, দলগত শোষিত মানুষদের আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য নেই কিন্তু মানসিক সুর-ঝরনায় তারা উদ্ভাসিত হয়েছে। নাট্যকার রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত সু-পরিকল্পিতভাবে দলগত শ্রকিমদের নিষ্পেষণের চিত্রায়ণে এক নতুন মাত্রা দিয়েছেন। শ্রম ছাড়া সভ্যতা যেমন চলবে না, আবার শ্রম থাকলে শোষক থাকবে। তাই রবীন্দ্রনাথ শোষিত শ্রমশীল মানুষের সৃজনশীলতাকে এক ভিন্ন মাত্রায়, বহুমাত্রিক রঞ্জনকে সু-রঞ্জিত করেছেন। 'মাদলে'র বিপরীতে 'কোদাল'কে সামনে এনে বৈপরীত্যের মাঝে এক নতুন মেলবন্ধন ঘটিয়েছেন। সামান্য সাধারণ শ্রমিক রঞ্জনদের স্বর্ণপ্রভুদের উপরে স্থান দিয়েছেন। রঞ্জনেরা এখানে শুধু দুখুজাগানিয়া নয় শাশ্বত বিবেক জাগানিয়ায় পরিণত করেছেন। কারণ শ্রমশীল রঞ্জনেরা না থাকলে বিশ্ব-সভ্যতা অচল হয়ে পড়বে। যাদের হাতে 'কোদাল' থাকে, সঙ্গে থাকে দৈহিক শ্রম; তবে মনের মাধুর্যে 'কোদাল' পরিণত হয় 'মাদলে।'

মোড়ল। ঘোর পাগল। বললুম, 'কোদাল ধরো।' ও বললে, 'তার বেশী কাজ হবে যদি একটা **'সারেঙ্গি এনে দাও।'**

সর্দার। ও কি। ওই-না রঞ্জন রাস্তা দিয়ে চলেছে গান গেয়ে? একটা **ভাঙা সারেঙ্গি** জোগাড় করেছে। স্পর্ধা দেখো, একটু লুকোবারও চেষ্টা নেই।

মনে পড়ে, ১৯৫০ খ্রিস্টাব্দে ভারতশিল্পী নন্দলাল বসুর একটি বিখ্যাত ছবি। কাগজে জলরঙে আঁকা—'ফসল কাটার, সাঁওতালি নৃত্য'। আর 'সারেঙ্গি বাদনরত সাঁওতাল যুবকের স্কেচটিও এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। রবীন্দ্র রচনায় সাঁওতাল যুবকের বাঁশীবাদনের সুর পেয়েছি। রঞ্জনের ভাঙা সারেঙ্গি বাদনের সঙ্গে এক বিন্দুতে মিলিত হচ্ছে। শিল্পী নন্দলাল, কবি রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টির চিত্রাঙ্কন করেছেন এক অনবদ্য আত্মমগ্নতায়।

বাইরের দৈহিক শক্তির থেকে মনের সুর অনেক বেশি শক্তিশালী। 'কোদালে'র

থেকে বেশি সম্পদশালী 'ভাঙা সারেঙ্গি'। 'ভাঙা সারেঙ্গি'তে উতলা মনকে প্রাণবন্ত গতিশীল করতে পারে। কোদালকর্তাদের কদাকার মনকে 'ভাঙা সারেঙ্গি'র আঘাত দেওয়ার প্রয়োজন আছে। হয়তো কোদালকর্তাদের প্রাণশক্তির অনুশীলনের জন্য সারেঙ্গি সম্পদ প্রয়োজন আছে। রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের শান্তিনিকেতন আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রাণময়ী প্রকৃতির প্রেরণায় শুধু নয় সুরের সাধনায় প্রকৃতি রঙমহলে আনন্দধারার আস্বাদ পেয়েছেন। শুধু দৈহিক খেলাধূলায় চর্চা নয়। সুরের সাধনায় মনকে প্রকৃতি প্রাণমহলে রাঙিয়ে দিতে হবে। সারেঙ্গি সাধক মনের শক্তি সঞ্চয় করেন সৃষ্টি সুরের অনুশীলনে। শ্রমশীল শ্রমিকও শেষপর্যন্ত একজন সৃষ্টিশীল মানুষ। তার ভালো বাদ্য না থাকতে পারে, ভাঙা বাদ্যেও সবল মন-প্রাণে জোর আনতে পারে। সভ্যতার আলাকে প্রত্যেক মানুষই সৃষ্টি সুধা ঝরাতে পারে, বলেই সে স্পর্ধিত হতে পারে। শ্রমিক বলেই সে মালিককে ভয় পাবে কেন? ধনবানদের যদি সু-রঞ্জনে উদ্‌ভাসিত করা যেত তবে, সভ্যতার পিলসুজরাও হতে পারত দীর্ঘস্থায়ী মানব-সম্পদ।

'শেষ কথা' : মহুলবনের গান :

আন্তর্জাতিক মানের গল্পকার রবীন্দ্রনাথ। বলাবাহুল্য তিনি কবিতা-নাটক-উপন্যাসের ক্ষেত্রে প্রায়শই পরিবর্তন-পরিবর্জন করলেও কোন ছোটগল্পেই তিনি দ্বিতীয়বার কলম চালাননি। রবীন্দ্রনাথের গল্প নিজস্ব দায়ে বৃহত্তর সাঁওতাল পরগনাসহ ভারতবর্ষের প্রায় সর্বত্রই গেছে, কিন্তু গল্পের গ্রন্থিমোচনের সঙ্গে সঙ্গেই গল্প ফিরে এসেছে পরিচিত বাংলার পল্লীজীবনে। 'তিন সঙ্গীর' 'শেষকথা' (১৯৩৯) গল্পটি এক্ষেত্রে একটি উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রম। বৃহত্তর সাঁওতাল পরগনার ছোটনাগপুর অঞ্চলকে নিয়ে গল্পটির অসামান্য পটভূমি রচিত হয়েছে। আধুনিক নারী-পুরুষের জৈবিক আকর্ষণ-বিকর্ষণ ও প্রেম নিয়েই গল্পটির কেন্দ্রীয় রস পরিবেশিত হয়েছে। 'শেষকথা' গল্পের প্রধান চরিত্র নিশ্চয়ই বাঙালি, কিন্তু তথাকথিত বাঙালিয়ানা এখানে নেই, পরন্তু বাঙালিয়ানাকে অম্লমধুর কটাক্ষ শ্লেষের আঘাত আছে।

নায়ক আন্দামান-আফগানিস্তান-ইংল্যাণ্ড ঘুরে শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছে সাঁওতাল পরগনার দেশীয় রাজার 'স্টেটে'। জিওলজিক্যাল সার্ভের ভূতাত্ত্বিকদের কাজ নিয়ে ফিরে এসেছে—সবুজ আরণ্যক প্রকৃতির কোলে। সূর্যাস্তের রাঙা আলোয় নির্জন শালবীথির বনে।—

"পলাশফুলের রাঙা রঙের মাতলামিতে তখন বিভোর আকাশ। শালগাছে ধরেছে মঞ্জরি, মৌমাছি ঘুরে বেড়াচ্ছে ঝাঁকে ঝাঁকে।...**সাঁওতালরা কুড়োচ্ছে মহুয়া ফল**। ঝিরঝির শব্দে হালকা নাচের ওড়না ঘুরিয়ে চলেছিল একটি ছিপ্‌ছিপে

নদী,...যেখানে একলা মন পেলে প্রকৃতি-মায়াবিনী তার উপরেও রংরেজিনীর কাজ করে—যেমন যে করে সূর্যাস্তের পটে।"

সূর্যাস্তের রক্তিম আলোক রেখায় নির্জন অরণ্যে প্রেমিকা অচিরাকে দেখে নায়কের আবেগ প্লাবিত হয়েছে। বৈজ্ঞানিক ননীমাধব সেনগুপ্ত বিজ্ঞানের বিশ্লেষণে 'আদিম প্রাণের গূঢ় প্রেরণা' বলে চিহ্নিত করে তৃপ্তি পেয়েছে। বস্তুত 'শেষ কথা' গল্প যেমন পটভূমি হিসেবে নিয়ে চলেছে অরণ্যকে, গল্পের প্রাণসত্তাও তেমন ঊর্ধ্ববাহু হয়ে উঠেছে আরণ্যক জৈবতাকে নিয়ে। যদিও 'শেষ কথা' আরণ্যক জীবনের আদিমতায় শেষ হয়নি। তাই শেষপর্যন্ত 'জন্তুর পর্যায়' থেকে 'ভালোবাসার ইম্পার্সোনালভাবে' নায়িকা অচিরা উদ্বোধিত হয়েছে।

জনজীবনহীন সাঁওতাল পরগনার সবুজ অরণ্য পরিবেশকে রবীন্দ্রনাথ আশ্চর্যনৈপুণ্যে চিত্রিত করেছেন। রোমান্টিকতার প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও নীরব প্রকৃতিকে প্রাণহীন পটভূমি রূপে ব্যবহার করেননি। পরন্তু সূচিমুখে সূক্ষ্মতায়, সুগভীর ইঙ্গিত ধর্মিতায় মানবজীবনের বিস্তারে সবুজ প্রকৃতিকে ছড়িয়ে দিয়েছেন, অরণ্য আর আরণ্যক জীবন হয়ে উঠেছে একে অন্যের পরিপূরক।—

"অচিরার দুই চোখ কৌতুকে স্নেহে জ্বল্‌জ্বল্‌ ছল্‌ছল্‌ করে উঠল। ইচ্ছে করছিল, স্নিগ্ধ কণ্ঠের এই আলাপ শীঘ্র যেন শেষ হয়ে না যায়। দিনের আলো ম্লান হয়ে এল। সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে। **"সাঁওতাল মেয়েরা জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে নিয়ে যাচ্ছে ঘরে, দূর থেকে শোনা যাচ্ছে তাদের গান।"**

কর্ম আর সংগীত মানব জীবনে একসুরে বাঁধা। যা রবীন্দ্রনাথের কবি হৃদয়ে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। জীবনের শেষপ্রান্তে এসে 'শেষ কথা' গল্পে অসামান্য দক্ষতায় উদ্ভাসিত করেছেন। সাঁওতাল মেয়ের কর্মময় জীবনের সঙ্গে সাঁওতালি গানের যুগ্ম সম্মিলনে নবীন-অচিরার প্রাণয়বৃত্তান্ত এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। অচিরা জ্ঞান তপস্যায় ক্রমশ পিছিয়ে যাচ্ছিল—সেই চাঞ্চল্য ক্রমশগাঢ় হয়ে যাচ্ছিল ছায়াছত্র বনের নিশ্বাসের মধ্যেই, সেই আদিম প্রাণের শক্তি খর্ব হয়ে যাচ্ছিল। আবার সেই উদাত্ত প্রকৃতির ঝরনার মধ্যে ঝাঁপিয়ে ম্লান করে মুক্তি চেয়েছে অচিরা। নীরব প্রকৃতির মধ্যে মানব জীবনের রহস্য সবুজ প্রকৃতির মধ্যে একসঙ্গে বাঁধা আছে। যে সবুজ অরণ্য প্রেমকে জাগিয়ে তোলে। সেই নির্জন নিসর্গ অরণ্য আবার নিরাসক্ত করে তোলে।

শাল-মহুয়া-পলাশের গহন আরণ্যক প্রকৃতি, স্ফটিক-কঠিন শিলাময় পর্বতের বিস্তার রবীন্দ্রনাথের কাছে নিয়ে আসতো নীরব প্রার্থনার স্বর্গীয় সান্ত্বনার এক স্পর্শ। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে স্বতন্ত্র প্রদেশরূপে 'নতুন বিহার'-এর সৃষ্টিকে ইতিহাসের

অনিবার্য বাস্তব বলেই মেনে নিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ। প্রবাস জীবনকে সংকীর্ণ ভাবে না দেখে, সর্বতোভাবে নতুন লোকজীবনের সঙ্গে সংস্রব রেখে বাংলা সাহিত্যের ভৌগোলিক বিস্তার ঘটাতে বলেছেন। বৃহত্তর সাঁওতাল পরগনা তথা অখণ্ড বিহার, রবীন্দ্রজীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেওয়া সত্ত্বেও কথা সাহিত্যের সৃষ্টির মধ্যে তেমন স্থান হতে পারেনি। গল্পের ক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ কিছু স্থান হলেও উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাও পায়নি। শেষ জীবনের 'শেষ কথা' তাই উল্লেখযোগ্য ব্যতিক্রমও বটে।

'হে তপস্বী শাল' :

কবি যখন সাঁওতাল পরগনায় গেছেন শালবীথি দেখে মুগ্ধ হয়েছেন। ২৫ বছরের কবি 'ছোটনাগপুর' (১৮৮৫) প্রবন্ধেও 'লম্বা লম্বা সরু সরু শালগাছের' বর্ণনা করেছেন। 'শেষ কথা' (১৯৩৯) গল্পেও 'সন্ধ্যার প্রথম তারা জ্বলে উঠেছে শালবনের মাথার উপরে'। কবি জীবনের ১৮৮৫ থেকে জীবনের কথা প্রায় শেষ জীবন পর্যন্ত (১৯৩৯) শালবীথির আকর্ষণ অটুট ছিল। কবির 'বনবাসী' (১৯৩১) কাব্যে প্রকৃতির রূপ-বৈচিত্র্যের রস-রহস্য উদ্‌ভাসিত হয়েছে। প্রকৃতির অন্তর ও বাইরের উপলব্ধি এক ভিন্নমাত্রা দিয়েছে। কবির অনুভূতিতে নিখিল প্রাণতরঙ্গের সৌন্দর্য বৃক্ষের মধ্যেই ফুটে উঠেছিল। বিশেষ করে 'শাল' (১৯২৭) নামক কবিতায় বিশ্ববাউলের একতারা, পাতায় পাতায় একতালা ছন্দের নাচন চিত্রিত হয়েছে। ভাষাহীন বাণীতেও মানবমনে অব্যর্থ ভাব বহন করে আনে। একতারার গান বিশ্বসংগীত কেই প্রতিধ্বনিত করে।

শান্তিনিকেতনের শালবীথিতে কিশোর কবিবন্ধুকে পাশে নিয়ে দিন-রাত্রির পদচারণাকে স্মরণ করেছেন কবি। আশ্রমবাসের চিরন্তন স্মৃতিগুলি শালবীথির প্রাচীন ছায়ায় স্নাত হয়েছিলেন আলাপগুঞ্জরণে। কবি 'শাল' (১৯২৭) নামক কবিতায় সেই উজ্জ্বল স্মৃতির কথা উল্লেখ করলেন।—

"আমরা চলে যাব কিন্তু কালে কালে বারে বারে বন্ধুসংগমের জন্য এই ছায়াতল রয়ে গেল। যেমন অতীতের কথা ভাবছি—তেমনি ও শালশ্রেণীর দিকে চেয়ে বহুদূর ভবিষ্যতের ছবিও মনে আসছে।"

কবি রবীন্দ্রনাথ শাল গাছকে 'হে তপস্বী শাল' নামে সম্বোধনে সম্মানিত করেছেন। 'আত্মসমাহিত তুমি, স্তব্ধ তুমি' যুগ যুগ ধরে বিশ্বের প্রকাশযজ্ঞে 'অফুরান পুণ্যগন্ধী প্রাণধারা' বিতরণ করে যাচ্ছে। 'ওগো মহাশাল' পাতাঝরা বীথিকায় বসন্তের আগমনী সুরকে আহ্বান করে। 'বনবাসী' কাব্যের 'শাল' নামক কবিতায় বসন্তঋতুর বন্দনায় বসন্ত চিরনতুন ও চিরযৌবনের প্রতীককে আবাহন করেছেন। 'শাল' কবিতায় শালগাছকে ধ্যানগম্ভীর তপস্বী বলে কল্পনা করেছেন।

যখন দক্ষিণী মদির পবনে শিমুল, বকুল, কিংসুখ সর্বাঙ্গে উচ্ছ্বলতা প্রকাশ করে, তখন কিন্তু শালের অন্তরে সে চঞ্চলতা স্পর্শ করে না। তপস্বী মহা শাল নীলাকাশে মহিমা প্রকাশ করে অন্তরের নিগূঢ় গভীরে ফুল ফোটাবার ধ্যানে নিবিষ্ট থাকে। ষড়্ঋতুর নতুন নৃত্যে শালের সৌরভ সুষমাকে কবি, প্রকৃতির মধ্যে অন্তরের প্রাণের রহস্যকে মিলিয়ে দিয়েছেন। শালবীথিকার 'বসন্ত-কল্লোলে পূর্ণিমার পূর্ণতায়', 'দেবতার অমৃতের দানে মর্ত্যের বেদনা' মিলে-মিশে একীভূত হয়ে গেছে। কবি রবীন্দ্রনাথের 'বনবাসী' কাব্যের 'শাল' নামক কবিতাটি এক ব্যতিক্রমী কবিতা শুধু নয় শালগাছকে এক অনন্যতায় চিত্রিত করেছেন। 'শাল' যুগান্তের চিরন্তন অতিথি 'মৈত্রী পল্লবের মর্মর-সংগীতে' মানব জীবনে সুরে-গাঁথা মালা পরিয়ে দেয়। মনে পড়ে যায—রবীন্দ্রনাথের প্রিয় সাঁওতাল পরগনার সারি সারি সরু সরু শালবৃক্ষের মনোরম দৃশ্যপটের সবুজ ভুবন।

বস্তুত শালগাছ সাঁওতালদের সবচেয়ে প্রয়োজনীয় প্রিয় উদ্ভিদ। প্রকৃতির পূজারী, সর্বপ্রাণবাদী সাঁওতাল জনজাতি শাল গাছেই পেয়েছিল জীবনের ধ্রুব সত্যকে। যা তাদের কাছে 'সারি সারজম' নামে খ্যাত। আর তাদের পবিত্র 'জাহের থানে' শালগাছ থাকা আবশ্যিক। সাঁওতাল জনজাতির সঙ্গে 'করম' পূজা আর 'বাহা' পরব-এর সঙ্গে শালগাছের ব্যবহারিক গুরুত্ব মিলেমিশে একীভূত হয়ে গেছে। সাঁওতাল বৃক্ষ শালগাছকে নিয়ে রবীন্দ্রনাথের 'শাল' কবিতাটি সেই প্রকৃতির উপাসকদের কথাই সবার আগে মনে পড়ে। কবি এখানে শুধু দিনের শালবীথি নয়, অপরূপ রাত্রির বর্ণনাতেও এক নতুন মাত্রা এনেছেন। শুধু দিনের ছায়াতল নয় 'পূর্ণিমার পূর্ণতায়' শালবীথির অমৃত সৌন্দর্যকে প্রকাশ করেছেন। সাঁওতাল পরগনার প্রাচীন শালসারির ঐশ্বর্যকে শান্তিনিকেতনে শালবীথির মাধুর্যকে বরণ করেছেন। সেই অপার্থিব বরণডালা প্রচীনের সঙ্গে নতুনের মহামিলন ঘটিয়েছেন। কবি রবীন্দ্রনাথ বিশ্বসাহিত্য ইংরেজ রোমান্টিক কবিদের অতিক্রম করে গেছেন। শান্তিনিকেতনের সবুজ ভুবন শালবীথির সৃজনে, 'সৌহার্দ্যের সুধারসধারা' এক নবমাত্রা দিয়েছে। 'শাল' কবিতটি আমাদের ভাবের নতুন ভুবনে চালিত করে।—

"প্রসন্ন করিতে তব পুষ্পবরিষণ। সে উৎসবে
আজিকার এই দিনে পথপ্রান্তে লুণ্ঠিত নীরবে।
দোঁহে দোঁহে মুখ চেয়ে বদল করিয়া নিল মালা,—
নূতনে ও পুরাতনে পূর্ণ হল বসন্তের পালা।"

'সুরাপাত্র হতে বন্যনারী'

কাব্য হিসাবে 'মহুয়ার' (১৯২৯) পরে 'বনবাণী'র (১৯৩১) স্থান। কিন্তু কবিতার সময়ানুসারে 'শাল' (১৯২৭), 'মহুয়ার' (১৯২৮) অবস্থান। 'মহুয়ার' কবিতাগুলি প্রেমের কবিতা। বিবাহ উপলক্ষ্যে উপহার দেবার জন্য ফরমাসের তাড়া থাকলেও কল্পনার আন্তরিক তড়িৎ-শক্তির প্রবাহ আছে। কবি রবীন্দ্রনাথ 'মহুয়া' কাব্যের কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন—

"কবিতাগুলি ঋতু-উৎসব পর্যায়ের। দোল-পূর্ণিমার আবৃত্তির জন্য রচনা করা হয়েছিল। কিন্তু নব-বসন্তের আবির্ভাবই মহুয়া কবিতার উপযুক্ত ভূমিকা বলে নবীবের কাজে এই গ্রন্থে আহ্বান করা হয়েছে।...মহুয়া বসন্তের অনুচর, আর ওর রসের মধ্যে প্রচ্ছন্ন আছে উন্মাদনা।"

'মহুয়া' নামক কবিতায় প্রেমের ত্রি-ধারার স্রোত একই ভাবতরঙ্গে মিলিত হয়েছে। প্রথমত প্রেমের নবতর উদ্বোধন, দ্বিতীয়ত, প্রেমের বিচিত্র মায়াজাল, তৃতীয়ত, প্রেমের দুরূহ সাধনা। প্রেম অমৃত তীর্থের চিরন্তন সম্পদ। রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া'র প্রেমেরসঙ্গে কবি ব্রাউনিঙের সাদৃশ্য থাকলেও চিত্ত-সংযমে রসোতীর্ণ হয়ে গেছে।

কবির সবুজ গাছের সন্ধানে তাই শালবীথির পরে গ্রাম্য মহুয়ার স্থান। শাল, সপ্তপর্ণের সঙ্গে মহুয়াও বনস্পতির মাঝে তপস্বীর সাধনায় মগ্ন। কিন্তু নিজে মগ্ন থেকে অন্যকে মদিরায় অধীর করে তোলে।—

"ফাল্গুনের ফুলদোলে কোথা হতে জোগাস
মদিরা পুষ্পপুটে;
বনে বনে মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে।
তোর সুরাপাত্র হতে **বন্যনারী**।

মনে পড়ে যায়—সাঁওতাল জীবনেও মহুয়ার ফুল-ফল এক অবিচ্ছেদ্য উপাদান। আদিম প্রকৃতির সঙ্গে মানবমনের গভীর সম্পর্কের বন্ধনে এক মনোমুগ্ধকর মোহময় মহুয়ার রূপ-রস-গন্ধের সম্মিলন ঘটেছে। 'তরল যৌবনবহ্নি', 'তোর সুরাপাত্রে হতে বন্যনারী' যেন নিত্য 'নৃত্যমত্ত তারি'। 'বনে বনে শুধু মৌমাছিরা চঞ্চলিয়া উঠে' না মহুয়ার ফুল ও ফলের মাদকরসে উজ্জীবিত হয়েও সংযত। 'মহুয়া' এখানে বহুমুখী কর্মধারায় বিস্তৃত হয়েছে। 'কালবৈশাখীর ক্রুদ্ধ কলরোলে' ও 'শঙ্কিত বিহঙ্গ অতিথিরে' আশ্বাস দান করে। আবার 'অনাবৃষ্টি ক্লিষ্ট দিনে বিশীর্ণ বিপিনে', 'বন্য বুভুক্ষুর দল'কে 'ভিক্ষাথলিতে' ভরিয়ে দেয়। সাঁওতাল জীবনের অনুষঙ্গে 'মহুয়া' কবিতাটি এক ভিন্ন মাত্রা দিয়েছে। 'মহুয়া' শুধু নববধূর

মাতাল করা নাম নয়, প্রেমের সর্ব পরিবর্তনকারী এক অলৌকিক দীপ্তসম্পদে চিহ্নিত হয়েছে।

'ক্যামেলিয়া'র সাঁওতাল মেয়ে :

শুধু ছন্দে নয় ভাবের দিক দিয়েও 'পুনশ্চ' (১৯৩২) কাব্য, রবীন্দ্র কাব্যে একটি মৌলিক পরিবর্তন। 'পুনশ্চ' কাব্যে সর্বপ্রথম কবিতার আঙ্গিকের পরিবর্তনে গদ্য-কবিতা আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অবশ্য রবীন্দ্রনাথের গদ্য-কবিতার প্রকৃত সুর—পুরোপুরি গদ্য কিংবা পদ্য নয়। গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ের একটি পরীক্ষা। 'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্য-কবিতার মধ্যে গভীর কল্পনার বিস্ময়কর লীলা নেই। কেবল চোখে দেখা ঘটনার উদ্ভাস। আমাদের আলোচ্য 'ক্যামেলিয়া' (১৯৩২) কবিতাটি একটি আখ্যান কবিতা। একটি দীর্ঘ প্রেমের আখ্যানে ব্যর্থ প্রেমিকের অসাধারণ ব্যঞ্জনা ফুটে উঠেছে। একজন প্রেমিকের তিনজন নারীর বিচিত্র রূপকে চিত্রিত করেছেন কবি। প্রেম আখ্যানটি এমন পরিবেশন করেছেন—দীর্ঘ কবিতাটিতে পাঠককে শেষ পর্যন্ত ধরে রাখে।

প্রথম নারীর নাম 'কমলা', দ্বিতীয়জন 'তনুকা' আর শেষ নারী—নামহীন এক 'সাঁওতাল মেয়ে।' ব্যর্থ প্রেমিক 'কমলা'কে ভালোবেসে অনেক সময় নষ্ট করেও শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ মনোরথে ফিরে গেছেন। দ্বিতীয় প্রেমিক 'তনুকা'-র দেওয়া দামি দুর্লভ গাছ 'ক্যামেলিয়া' নামের সঙ্গে মনে পড়ে গেলো কমলার কথা। একদিন ক্যামেলিয়া ফুল ধরল সেই গাছে। হতাশ প্রেমিক ক্যামেলিয়া ফুলটি কমলাকে পাঠাবে স্থির করে সাঁওতাল মেয়েকে ডেকে পাঠালো। আখ্যান কবিতাটির শেষ হয় চরম উপভোগ্যতায়। নামহীন সাঁওতাল মেয়েটি বাবুর অনুমতি ছাড়া ক্যামেলিয়া ফুলটি ছিঁড়ে তার কানে পরেছে। এখানে প্রেমিক ব্যর্থ হলেও সৌন্দর্য-সাধক হিসাবে নামহীন সাঁওতাল মেয়ের পুষ্প-প্রেমের স্বীকৃতি দিয়ে—এক অসামান্য ব্যঞ্জনায় উদ্ভাসিত হয়েছে।

'ক্যামেলিয়া' কবিতাটিতে তিনজন নারীর কথা থাকলেও শেষপর্যন্ত নামহীন সাঁওতাল মেয়েটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। নামহীন নিরক্ষর, শ্রমিক সাঁওতাল মেয়েটি এখানে নায়কের চোখে এক অনন্যা নারীতে পরিণত হয়েছে। সহজ সরল প্রাণবন্ত সৌন্দর্যের সাধনায় নামহীন সাঁওতাল মেয়েটি শহরের বাবুর প্রেমিক মনটি, সাময়িকভাবে হলেও জয় করে নিয়েছে। হতে পারে নামহীন সাঁওতাল মেয়েটি কালো, হতে পারে ডিগ্রীহীন নিরক্ষর নারী। কিন্তু সরলতায়—প্রাণশক্তির উচ্ছ্বলতায় নামহীন সাঁওতাল নারীর অপার্থিব সৌন্দর্যের আলোকবর্তিকা সভ্যসমাজকে বিস্মিত করেছে।—

—"সাঁওতাল মেয়ের কানে,
কালো গালের উপর আলো করেছে।

...'ডেকেছিল কেনে।'

...'এই জন্যেই।''

'ক্যামেলিয়া' কবিতাটি সাঁওতাল নারী এসেছে—সরাসরি। 'সাঁওতাল মেয়ে' শব্দটি অন্তত পাঁচবার ব্যবহার করে কবি। 'কমলা' নাম টি ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র তিনবার। 'তনুকা' দুবার মাত্র। 'ক্যামেলিয়া' সাঁওতালমেয়ে' শব্দ দুটি পাঁচবার ব্যবহার করে কবি রবীন্দ্রনাথ সমার্থক অনুষঙ্গে ভরিয়ে দিয়েছেন। এখানে শুধু সাঁওতাল মেয়ে নয় 'সাঁওতাল ছেলে'র কথা আছে। আর আছে সাঁওতাল পরগনার কথা। সাঁওতাল পরগনার সেই অখ্যাত স্থানটির নাম কি? বায়ুবদলের বায়ুগ্রস্ত দলেরা এই অখ্যাত জায়গাটির খবর জানে না। কবিও জায়গাটির নামও লেখেন কি। কিন্তু 'ক্যামেলিয়া' কবিতাটির সন-তারিখ থেকে জানা গেছে অখ্যাত স্থানটির নাম। অভিমানী বিদ্যাসাগর শেষ জীবনের প্রায় কুড়ি বছর এই অখ্যাত সাঁওতাল গ্রামে, ছিলেন। বিদ্যাসাগরের সেই প্রিয় জায়গাটার নাম ছিল 'কার্মাটাঁর।'

'ক্যামেলিয়া' কবিতার সূত্রপাত কলকাতায়। কলকাতায় কমলাকে প্রথম ভালোবাসেন ব্যর্থ প্রেমিক। সেই কমলার জন্য ব্যর্থ প্রেমিক দার্জিলিং পর্যন্ত চলে যান। ক্যামেলিয়া গাছটি দার্জিলিঙে পেয়েছিলেন ব্যর্থ প্রেমিক। তনুকার ভালোবাসার স্মরণচিহ্ন ক্যামেলিয়া গাছটি নিয়ে ব্যর্থ প্রেমিক সাঁওতাল পরগনার কার্মাটাঁরে গিয়েছিলেন। কবিতা শেষ পটভূমি সাঁওতাল গ্রাম তাই এক অনবদ্য ভ্রমণতীর্থ হিসাবে রবীন্দ্রজীবনে উল্লেখযোগ্য।

'ক্যামেলিয়া' কবিতাটিতে মানবিকতার আবেদন এক অসামান্য মাত্রা দিয়েছে। তুচ্ছ, অবহেলিত সাধারণ মানুষের জন্য কবির গভীর অনুভূতিতে প্রেম ও সৌন্দর্যের ভাবসম্মিলন ঘটেছে। যে শ্রমিক সাঁওতাল মেয়েটি রান্নার কাঠ এনে দেয়। যাকে ক্যামেলিয়া বাহক করার জন্য ডাকা হয়েছিল। সেই সামান্য সাঁওতাল মেয়েটির মধ্যে কবির গভীর জীবন-বেদনা প্রকাশিত হয়ে সামান্য তুচ্ছ ঘটনা অসামান্যতায় পর্যবসিত হয়েছে। আবার সামান্য সাঁওতাল মেয়ের চিত্রটি আনার জন্য সাঁওতাল গ্রামের অনুষঙ্গ এসেছে অনিবার্য পরম্পরায়। যেমন—'শালবনের ছায়ায় কাঠবিড়ালিদের পাড়ায়', হর্তকি গাছের তলায় মহিষের পিঠে উলঙ্গ সাঁওতাল ছেলের এক আশ্চর্য বর্ণনা।

'ক্যামেলিয়া' কবিতাটি এক জনপ্রিয় ও বহুপঠিত কবিতা হিসাবে রবীন্দ্রসাহিত্যে সমাদৃত হয়েছে। প্রেম এবং অপ্রেমের দ্বন্দ্বে শহর এবং সাঁওতাল গ্রামের তুলনায় এক উপভোগ্য কবিতায় পরিণত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নারী শেষ পর্যন্ত 'সাঁওতাল মেয়ে', সেই সৌন্দর্যসাধনায় 'ক্যামেলিয়া' কবিতা দিয়ে তার শুরু। কলকাতা শহরের মেয়ে 'কমলা' যেখানে শ্বেতজবার পাপড়ি ছিন্নভিন্ন করে তুচ্ছ করেছে; সেখানে সাঁওতাল গ্রামের নিরক্ষর নারী দুর্লভ দামি ক্যামেলিয়া ফুলের

মান্যতায় এক নতুন মাত্রা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথের নারী বলয়ে—নিরক্ষর সাঁওতাল নারী প্রধান স্থান করে নিয়েছে।

'সাঁওতালপাড়ার' 'খেলার নদী', 'খোয়াই' :

'পুনশ্চ' কাব্যের 'খোয়াই' (১৯৩২) কবিতায় এক অনুপম প্রকৃতির রূপচিত্র প্রকাশিত হয়েছে। বীরভূমে প্রকৃতির অপরূপা এক খেয়াল, খেলার ছলে উদ্‌ভাসিত হয়েছে। তাই তার নাম হয়েছে 'খোয়াই'। বীরভূমের বৃহৎ অংশ জুড়ে আছে এই খেয়ালী খোয়াই। বর্ষার প্লাবিত জলে ক্ষয়ে যাওয়া—'ঊমিল লাল কাঁকরের নিস্তব্দ' পটভূমি; এই খেলার খেয়ালী খোয়াই। বর্ষার বারিধারায় রচিত হয়েছে অজস্র হাতের লক্ষ-কোটি আঙুলের কীর্তি। চারপাশে ধূসর,রক্তিম, গহ্বর দেখা যায়। মাঝে মাঝে মাঝারি কঙ্করের গিরিমালার মতো, 'মরচে ধরা কালো মাটি মহিষাসুরের মুণ্ড।' নীচে বালুর শয্যার একান্তে কোথাও কোথাও স্বচ্ছ ক্ষীণ জলরেখা। যেখানে মাটি আছে, সেখানে আছে হৈমন্তিক ধানের ক্ষেত। শরৎকালে মাঠের পাশেপাশে কাশের ফুল ফোটে। শরৎ প্রকৃতির দিগন্তে 'সবুজ মাঠের সঙ্গে রাঙামাটির মিতালি' মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে।

প্রকৃতি প্রেমিক কবি রবীন্দ্রনাথ 'খোয়াই' কবিতায় বীরভূমের এক আশ্চর্য বর্ণনা দৃশ্যগ্রাহ্য মুগ্ধতা নয় উদাসী মনকে উদ্‌ভ্রান্ত করে দেয়।—

—"দূর বনান্তে বেগুনি বাষ্পরেখায়;
আম জাম তাল তেঁতুলে ঢাকা

সাঁওতাল পাড়া।

...এই শালবন, এই একলা-মেজাজের তালগাছ,
...এখানকার বাদল-দিনে আর আমার বাদল-গানে
তারা কেউ আছে কেউ গেল চলে।
আমরাও যখন শেষ হবে দিনের কাজ,
...তারপরে?"

'খোয়াই' আর কিছুই নয়, জলহীন, জনহীন, জীবহীন নিস্তব্ধ পটভূমি মাত্র নয়; প্রকৃতির খেয়াল 'বুকফাটা ধরণীর',জীবনের দীর্ঘশ্বাসকে মনে করিয়ে দেয়। রুক্ষ কঠিন সৌন্দর্যের অন্তরালে ভূমি-অবক্ষয়ের এক নিষ্করুণ ইতিহাস পুঞ্জিভূত করেছে কোপাই।

সাঁওতালপাড়ার সবুজ শালবনের সঙ্গে ক্ষয়ে যাওয়া রাঙামাটির সম্মিলনকে কবি নিপুণ শিল্পীর রঙ-তুলিতে এঁকেছেন। শান্তিনিকেতনের চারপাশকে ভালোভাবে উপলব্ধি করতে 'খোয়াই' দর্শন এক অপরিহার্য উপাদান। 'খোয়াই'-এর যাওয়া পথিক 'খোয়াই' কবিতা পাঠে, সেই মনোরম প্রাকৃতিক খেয়ালী পটভূমিকে আশ্চর্যরকম

গ্রহণ করে। বিচিত্র 'খোয়াই' কবিতাটি রবীন্দ্র কাব্যের ভুবনে নতুন দিক চিহ্নকে স্মরণ করিয়ে দেয়। সাঁওতাল পাড়ার প্রকৃতির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে গেছে।

সাঁওতাল মেয়ের মতো 'কোপাই' :

"কোপাই আজ কবির ছন্দকে আপন সাথি করে নিলে,
সেই ছন্দের আপোস হয়ে গেল ভাষার স্থলে জলে।"

'পুনশ্চ' কাব্যের 'কোপাই' (১৯৩২) নদীতে মিশে গেছে কবির নতুন গদ্যকবিতার নতুন ছন্দ। সাঁওতালপাড়ার ছোটনদী চলেছে বাঁকে বাঁকে—"নদী সামনের দিকে সোজা চলতে হঠাৎ বাঁক ফেরে। সাহিত্যও তেমনি সিধে চলে না যখন সে বাঁক নেয়, তখন সেই বাঁকটাকেই বলতে হবে মডারন্।" সাহিত্যও আসলে প্রকৃতির মহৎ দান। 'কোপাই' কবিতা আর কোপাই নদীকে মিলিয়ে দিয়েছেন কবি। 'পুনশ্চ' কাব্যের গদ্য-কবিতার রীতিতে গদ্য-পদ্যের সমন্বয়ে ভাষার স্থল-জলের মিলন ঘটেছে, কবিতার মহাসঙ্গমে। কবিতার ভাষার স্তব্ধতা ও নদীর চলমানতাকে একসঙ্গে, এক সুরে বেঁধেছেন কবি রবীন্দ্রনাথ।

কোপাই বিশেষভাবে বীরভূমের নদী। বীরভূমের অজয় নদীর সঙ্গে প্রায় সমান্তরালভাবে প্রবাহিত। কোপাই-এর উৎসমূলে কোনো পাহাড় বা নদী নেই। এক ভূমবির থেকে কোপাই নদীর সৃষ্টি। উৎসথেকে জল পায় না কোপাই। কিন্তু কোপাই পথে চলতে চলতে জল পান করে পথের শেষে পৌঁছে যায়। প্রমথনাথ বিশী তাঁর 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' (১৯৪৪) গ্রন্থে লিখেছেন—

—"তৃতীয় বছরে আমরা কোপাই নদীর উৎসে গিয়ে পৌঁছিলাম। জায়গাটার নাম খেজুরি, সাঁওতাল পরগনার প্রায় সীমান্তে; উচ্চ মালভূমি ধৌত জল হইতে ইহার উদ্ভব, উৎস বলিয়া বিশেষ কিছু নাই।"

কোপাই-এর সঙ্গে শান্তিনিকেতন অধিবাসীদের নানান ঘটনার সাক্ষ্যমালা স্মৃতি হয়ে আছে। বনভোজনে কোপাইয়ের তীর, বনভ্রমণে কোপাইয়ের তীরে জীবনের নানা স্মৃতিমালা হয়ে আছে। কবি রবীন্দ্রনাথের স্মৃতিতেও কোপাইয়ের তীরে পদ্মার স্মৃতি উজ্জ্বল হয়ে ফুটে উঠেছে। 'কোপাই' কবিতার প্রথমাংশটি সেই পদ্মানদীর কথা। জীবনের দুই প্রান্তে দুই নদীরপ্রবাহ কবিকে, কবিতাকে প্রবাহিত করেছে নতুন ছন্দের আবাহনে। আর শেষাংশে সাঁওতাল গ্রামের উজ্জ্বল জলছবির আলপনা। শুধু সাঁওতাল গ্রাম নয়, আছে 'ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে', এবং 'সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর কলভাষা।' 'কোপাই' কবিতায় শুধু গদ্য-পদ্যের সমন্বয় নয়। অসাধারণ চিত্রকল্প কোপাই-পারের অপরূপ প্রকৃতিকে মায়াময়

মহিমায় চিত্রিত করেছে। কবির প্রতিবেশিনী কোপাই নদী যেন 'হাস্যমুখর' 'সাঁওতাল নারী।' 'তার ধন নয় উদ্ধত, তার দৈন্য নয় মলিন'—দুই তার শোভায়, কবির কাছে কোপাই এক ভিন্নমাত্রায় অলঙ্কৃত হয়েছে।—

—"বর্ষায় ওর অঙ্গে অঙ্গে লাগে মাতলামি
মহুয়া-মাতাল গাঁয়ের মেয়ের মতো-
ভাঙে না, ডোবায় না,...
যেমন নটী যখন অলংকারের ঝংকার দিয়ে নাচে,
আর যখন সে নীরবে বসে থাকে ক্লান্ত হয়ে,
চোখের চাহনিতে আলস্য,
একটুখানি হাসির আভাস ঠোঁটের কোণে।।"

বীরভূমের নদী কোপাই নয়, মাটির প্রকৃতিতেও আছে দ্বৈত লীলা। একদিকে নগ্নতা, অন্যদিকে আচ্ছাদন। একদিকে নিঃস্বতা, অন্য দিকে সম্পদ। পশ্চিমে শাল পিয়াল মহুয়া, পূর্বে আম, জাম, কাঁঠাল। একদিকে সন্ন্যাস, অন্যদিকে গার্হস্থ্য। 'কোপাই' নদীর প্রাকৃতিক মাধুর্য নয় 'কোপাই' কবিতার আলংকারিক ভাস্কর্য, সহজ-সরল গদ্য-পদ্য ছন্দে প্রকাশিত হয়েছে। যেন একই জীবনের,পদ্মা ও কোপাই নদীর মহামিলনের স্রোত প্রবাহিত হয়েছে। এর ছন্দ নদীর মতো দ্বৈত লীলার প্রকাশ। সৃষ্টি ও ধ্বংসের মতো কোপাই নদীর মতো, গদ্য ও পদ্যের সমন্বয়।

'কোপাই' কবির সেই অসামান্য কবিতা, যেখানে একই সঙ্গে 'সাঁওতাল ছেলে' ও 'সাঁওতাল মেয়ে' কে চিত্রিত করেছেন। বিপরীতধর্মী চরিত্রের পুরুষ ও নারীর বৈশিষ্ট্যে এক বিশেষ মাত্রায় স্মরণীয় করেছে। ধনুক হাতে সাঁওতাল ছেলে আর মহুয়া-মাতাল সাঁওতাল নারীর হাস্যমুখর কলভাষার কলতানে কবিতাটি নদীর মতো বাঁক নিয়েছে।

কবি রবীন্দ্রনাথ পূর্ববঙ্গের শিলাইদহ পর্বে 'পদ্মা' নদীর কথাস্মরণ করেছেন। আবার পশ্চিমবঙ্গের শান্তিনিকেতন পর্বে 'কোপাই' নদীর সঙ্গে একই সঙ্গে তুলনা করেও সাচুর্য এনেছেন। পদ্মা স্বতন্ত্র। লোকালয়েরপাশ দিয়ে চলে গেলেও, তাদের সহ্য করে স্বীকার করে না। আর কোপাই-এর ধন নয় উদ্ধত,তার দৈন্য নয় মলিন। একজনের উদাসীন ধারা, অন্যজন উচ্চ হেসে ধেয়ে চলে। 'কোপাই' এখানে একটি চরিত্রে পরিণত হয়েছে। সেই চরিত্র অবশ্যই চলমান জীবন্ত। শুধু বহমান জলধারা নয়, নদী ও নারী যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে 'সাঁওতাল

নারী'র উপমায় এক অসামান্য ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে।

করুণ সাঁওতালি বাঁশি :

জন্ম-রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের 'পুনশ্চ' কাব্যের 'বাসা' কবিতা (১৯ আগস্ট ১৯৩২) এক অনবদ্য সংযোজন। শান্তিনিকেতনের সবুজ স্থাপত্য অনুধাবন করতে 'বাসা' কবিতার ভালো-বাসা অপরিহার্য। দু'বছর আগে জার্মান থেকে প্রতিমা দেবীকে লেখা একটি চিঠি 'বাসা' কবিতার পূর্বাভাস আছে।—

—"ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে, শালবনের ছায়ায়—
খোলা জানালার কাছে।...নদীর ধার দিয়ে একটা ছায়াবীথি।
...বাতাবি নেবুর ফুলের গন্ধে বাতাস ঘন হয়ে উঠছে।...
—আমার জানালার কাছপর্যন্ত উঠেছে চামেলিলতা।...
একজন—যখন খুশি সে গান করবে, আমার ঘর থেকে
শুনতে পাব।...নদীর উপর দুটি সাঁকো থাকবে—নাম
দিতে পারব জোড়াসাঁকো—।।"

শান্তিনিকেতনর সবুজ স্থাপত্যের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে মানবিক পরিবেশ দর্শন। অন্তরের সঙ্গে বাইরের একাত্মতা নির্মিত হবে কবির 'বাসা' ভালো-বাসা। 'পুনশ্চ' কাব্যে আধুনিক গদ্য ছন্দ প্রবর্তন করলেও প্রকৃতি প্রেমিক রোমান্টিক রবীন্দ্রনাথের 'বাসা' কবিতায় প্রকৃতির প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশিত হয়েছে।—

"ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে।
এ বাসা আমার হয়নি বাঁধা, হবেও না।
ময়ূরাক্ষী নদী দেখিও নি কোনো দিন।
ওর নামটা শুনি নে কান দিয়ে,
নামটা দেখি চোখের উপরে—"

রবীন্দ্র কাব্যদর্শনে 'আধুনিক বিজ্ঞান নিরাসক্ত চিত্তে বাস্তবকে বিশ্লেষণ করে, আধুনিক কাব্যে সেই নিরাসক্ত চিত্ত বিশ্বকে সমগ্র দৃষ্টিতে দেখতে হবে; সেইটাই শাশ্বতভাবে আধুনিক।' নদীর বহমান কলতান কল্পনার সাম্রাজ্যে এক নতুন বোধের জন্ম দেয়। ময়ূরাক্ষী নদীর চলমান সুর ও সংগীতকে কল্পনা-বাস্তবকে একসূত্রে মিলিত করতে চেয়েছেন। রোমান্টিক কবির মন সব কিছু থেকে ছুটি নিয়ে চলে যেতে চায় উদাস প্রাণের সখা—সেই ময়ূরাক্ষী নদীর ধারে। শুধু 'নদী' কিংবা 'প্রতিবেশিনীর' গান নয়। 'বাসা' কবিতায় জড়িয়ে আছে নিসর্গ প্রাকৃতিক এক অনাবিল আস্বাদ। আবার শুধু অপার্থিব প্রকৃতির সৌন্দর্য নয় মনুষ্যেতর প্রাণীর মেলবন্ধনে পুরুষ ও প্রকৃতির আশ্চর্য চিত্র আছে। পোষা হরিণে বাছুরের সঙ্গে

শালবনের মহুয়ার সংক্ষিপ্ত সহাবস্থানে এক অপূর্ব প্রকৃতি-চিত্রকল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে। শুধু বৃহৎ বৃক্ষরানি নয়, বনলতার সৌরভে আস্‌শেওড়ার বেড়ার আপাত তুচ্ছকে গভীর সহানুভূতিকে চিত্রিত হয়েছে। সম্ভবত শ্রাবণ মাসের বর্ষাকালে 'বাসা' লেখা হলেও এসেছে অন্য ঋতুর অনুষঙ্গ। এসেছে পাটল রঙের গাই, মিশেলরঙের বাছুর আর শীতের যাযাবারী বেদেদের কথা। 'বাসা' কবিতায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য চিত্রকল্প হচ্ছে 'সাঁওতালের বাঁশি'—

—"নদীর ওপারে রাস্তা,
রাঙা ছাড়িয়ে ঘন বন;
সে দিক থেকে শোনা যায় সাঁওতালের বাঁশি।"

মনে পড়ে যায়, 'পুনশ্চ' কাব্যের অন্য একটি কবিতা 'বাঁশি' (২৫ আষাঢ়, ১৩৩৯)। যেখানে বাঁশির করুণ আহ্বান মিলিয়ে দেয় ঘর ও বাহিরকে। বাঁশিরকরুণ বেদনায় স্নাত করে 'ছেড়া ছাতা' আর 'রাজছত্র'কে। থাকেনা বাদশার সঙ্গে কেরানির কোনো ভেদ। শুধু নদীর চলমান স্রোতধারা নয়, নদীর দুপারের আবহসংগীত। যা দেখা যায় না, কানে শোনা যায় মাত্র। দূরের শালবীথি থেকে উদাস সাঁওতাল যুবকের বাঁশির তান। ভেসে আসছে রাধার বিরহ-বেদনা। অনন্তকাল সেই বিচ্ছেদসুর কবিমনকে চিরজাগরুক রাখে। সাঁওতাল প্রকৃতির সন্তান। সাঁওতাল জন্ম বাঁশিবাদক। প্রকৃতি আর মানুষের সম্মিলনে 'বাসা' কবিতা মানবজীবনের চিরন্তন ভালো-বাসায় মনে করিয়ে দেয়।

বেদেরা যাযাবর। তাদের বাসাও স্থায়ী নয়। আর স্থায়ী বাসিন্দার মালিক মানুষ কি স্থায়ী। মানুষ তার স্থায়ী বাসস্থান ছেড়ে চলে যাবে 'সাড়ে তিন হাত' ভূমিতে। আর প্রকৃতির সৃষ্টি সাঁওতাল বাঁশিবাদকের করুণ সুরে 'জীবনদেবতার' অন্বেষনে! 'বাসা' কবিতায় স্থায়ী সুখী দম্পতির কথা আছে। দিনের বর্ণনা আছে। আর আছে 'রাতের শালবনের' অনুভব। কৃষক ঘরণী গুন গুন করে গাইতে গাইতে মাখন তোলে দই থেকে। স্বামী যায় টাট্টু ঘোড়ায় চড়ে খেতে কাজে। প্রকৃতি, মানুষ আর মনুষ্যতর প্রাণীদের নিয়ে যে বিশ্ব চরাচর সেখানেই কবির বাসা। ছন্দের বিন্যাস আর বৃত্তবন্দনের অন্ত্যমিল 'বাসায়' ত্যাগ করলেও ভাবের গভীরতায় গদ্য ছন্দই বাংলার সত্যকার মুক্ত ছন্দ। 'পুনশ্চে'র 'বাসা' কবিতাই সেই মুক্তির সন্ধান দিয়েছে।

শ্রমিক 'সাঁওতালি মেয়ে' :

'বীথিকা' কাব্যের (১৯৩৫) 'সাঁওতাল মেয়ে' (১৯৩৪) কবিতাটি ব্যতিক্রমী কবিতা। গদ্য কবিতার 'পুনশ্চ' কাব্য (১৯৩২) আর 'পত্রপুট' (১৯৩৬) কাব্যের মাঝে

আছে 'বীথিকা' (১৯৩৫)। গদ্য-কবিতার যুগে 'বীথিকা' যেমন ব্যতিক্রমী। তেমনই অভিনব 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতাটি। ছন্দপ্রবাহের আবেগের মধ্যে এক আশ্চর্য নির্মম কবিতা-গদ্য আখ্যান এই 'সাঁওতাল মেয়ে'। শান্তিনিকেতনে (৪ মাঘ ১৩৪১) 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতাটি লেখার অন্তত ১৮ বছর আগে (২৭ বৈশাখ ১৩২৩) 'জাপানযাত্রী' গ্রন্থে সাঁওতাল মেয়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন। 'তোসামারু জাহাজে' বসে জাপানি মেয়েদের কথা লিখতে গিয়ে সাঁওতাল মেয়ের অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছেন—যুক্তির সৃষ্টি লাবণ্যে।

—"রমণীর লাবণ্যে যেমন তারা প্রেয়সী, শক্তির মুক্তিগৌরবে তেমনি তারা মহীয়সী। কাজেই যে মেয়েদের যথার্থ শ্রী দেয়, **সাঁওতাল মেয়েদের দেখে** তা **আমি প্রথম বুঝতে পেরেছিলুম**।"

রবীন্দ্রনাথের 'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতায় কবির সৃজনী কলমে এক অপরূপ ছবি আছে। শ্রাবণ মেঘের ঘন মায়ায়-ঘেরা লাবণ্যের দীপ্তিতে যৌবনের উচ্ছ্বলতা ধরা পড়েছে। একই সঙ্গে 'বীথিকা'র ছন্দ চলমানতার সঙ্গে সাঁওতাল মেয়ের চলার ছন্দের দ্রুতি আশ্চর্য দক্ষতায় উদ্ভাসিত হয়েছে। সাঁওতাল মেয়ের 'তনু কালো দেহে'র মধ্যে আলোকের দীপ্তিচ্ছটায় বিধাতার হাতে গড়া ও বিদ্যুতের স্পর্শ। 'সাঁওতাল মেয়ের' দৈহিক বর্ণনা রবীন্দ্রনাথের হাতে এক নতুন মাত্রা পেয়েছে।—

"ওর দুটি পাখা
ভিতরে অদৃশ্য আছে ঢাকা,
লঘু পায়ে মিলে গেছে চলা আর ওড়া।
নিটোল দুহাতে তার সাদারঙা কয় জোড়া।।"

সবার চেয়ে আলাদা এই সাঁওতালী নারী। সাঁওতাল নারী ভেতরের অদৃশ্য অদম্য প্রাণশক্তিকে বাইরের দিক থেকে বোঝা গেলে ভালো লাগে না। বাহিরের বাহ্যিক প্রকাশ নেই। কিন্তু ভেতরের সেই অনন্ত ঐশ্বর্য সাঁওতাল নারীকে আশ্চর্য সৃষ্টিতে অনন্য করে তুলেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ 'সাঁওতাল মেয়ে'কে এক সহজ সরল অকৃত্রিমরূপে অঙ্কন করেছেন। 'গিরগিটির' সঙ্গে তুলনা করে শহরের আধুনিক নারীর জটিলতার,ছদ্মবেশের আড়ালে ভয়ঙ্কররূপ কে দেখেছেন। শহরের কৃত্রিম ছদ্মবেশের নিষ্ঠুরতার বিপরীতে সাঁওতাল নারী এক আশ্চর্য ব্যতিক্রম। সাঁওতাল নারী গিরগিটির মতো বহুরূপী নয়। সে স্বচ্ছ, স্পষ্ট ও অকপট, ঋজু। স্বাভাবিক সৌন্দর্যে সাঁওতাল নারীর 'যথার্থ শ্রী' প্রকাশিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ 'জাপানযাত্রী'তে আরও লিখেছেন—

"**সাঁওতাল নারী কঠোর পরিশ্রম করে**, কিন্তু

কারিগর যেমন কঠিন আঘাতে মূর্তিটিকে
সুব্যক্ত করে তোলে তেমনি এই **পরিশ্রমের**
আঘাতেই এই সাঁওতাল মেয়েদের দেহ এমন
নিটোল, এমন সুব্যক্ত হয়ে ওঠে; তাদের সকল
প্রকার গতিভঙ্গিতে এমন একটা মুক্তির মহিমা প্রকাশ পায়।"

পরিশ্রমের আঘাতে-প্রত্যাঘাতে সারাদিন-রাত প্রাণশক্তির উচ্ছ্বলতায় সাঁওতাল নারী হয়ে সুব্যক্ত। সমস্তরকমের গতিভঙ্গিতে, মুক্তির মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে ওঠে। সাঁওতাল নারী যেন "আঁকাবাঁকা বনপথে আলোছায়া গাঁথা, অকস্মাৎ ঘুরে ঘুরে ওড়ে ঝরা পাতা'। প্রকৃতির সন্তান সাঁওতাল নারী যেন 'চিকন চঞ্চল পাতা ঝলমল করে, শীতের রোদ্দুরে।' শুধু নিটোল শরীরভঙ্গি নয়, সাঁওতাল নারীর স্বল্প 'মোটা শাড়ির' 'আঁচলের প্রান্ত তার, লালরেখা দুলাইয়া, পলাশের স্পর্শমায়া আকাশেতে দেয় বুলাইয়া।'

কবি রবীন্দ্রনাথের প্রিয় নারী, মাথায় মাটি ভরা 'ঝুড়ি নিয়ে বারবার সাঁওতাল মেয়ে যায় আসে।' শ্রমের ভুবনে শ্রমিক সাঁওতাল নারীর চির শোষণের ছবি চিত্রিত হয়েছে। যা সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্যে শ্রমিক নারীর এক ব্যতিক্রমী চালচিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। শুধু শ্রমিক নারীর শ্রমঋদ্ধ রূপ নয়, শোষিত সাঁওতাল নারীর নির্মম চিত্রপট ফুটে উঠেছে। বিধাতা-প্রকৃতির আশ্চর্যসৃষ্টি সাঁওতাল নারী, সমাজের অর্থনৈতিক পরিহাসে নির্মম বলি হয়ে যাচ্ছে। কঠোর বাস্তবতার অমানবিক পরিস্থিতির জন্য সাবেক জমিদার রবীন্দ্রনাথ নিজেকেও দায়ী করেছেন। শান্তিনিকেতনের গড়ে ওঠার অন্তরালে সাঁওতাল জনজাতিদের অন্যতম ভূমিকা আছে। রবীন্দ্রনাথের নিজের থাকার 'মাটির ঘর' নির্মাণে দিন মজুর হিসাবে যুক্ত হয়েছে, আলোচ্য সাঁওতাল নারী। কবিতার সাঁওতাল নারী এক কিশোরী মেয়ে; শিশু শ্রমিকও বলা যেতে পারে। চরম দারিদ্র্যে অবহেলিত কিশোরী সাঁওতাল নারীরও পরিত্রাণ নেই। যে কিশোরী নারীর সহজ শক্তি আত্মনিবেদনপরা, শুশ্রূষার স্নিগ্ধসুধাভরা—সেই নিরক্ষর সাঁওতাল কিশোরী শ্রমিকে পরিণত হয়েছে।—

—"আমি তারে লাগিয়েছি কেনা কাজে করিতে মজুরি,—
মূল্যে যার অসম্মান সেই শক্তি করি চুরি
পয়সা দিয়ে সিঁধকাঠি।
সাঁওতাল মেয়ে ওই ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।।"

সবচেয়ে পরিশ্রমের কাজ মৃত্তিকা বহন। সবচেয়ে ভারীপদার্থ মাটি। সেই ভারী মাটি কিশোরী সাঁওতাল মেয়ে একা একা সারা দিন 'ঝুড়ি ভরে নিয়ে আসে মাটি।'

সুদীর্ঘ প্রাচীন কাল থেকে ভারতবর্ষের সমাজব্যবস্থার উৎপাদনমূলক শ্রমে; পুরুষের সঙ্গে সমান দক্ষতায় কাজ করে আসছে, 'স্নিগ্ধসুধাভরা' এই সাঁওতাল নারী। সাঁওতাল সমাজব্যবস্থা নারীকে অন্তঃপুরে ভরে রাখতে শেখাননি। অথচ আধুনিক সভ্যতার স্বাক্ষর সমাজ শ্রমের লিঙ্গ বিভাজন করে, নারীকে সস্তা মজুরে পরিণত করেছে। কবি রবীন্দ্রনাথ সমাজ বিজ্ঞানীদের মতোই অর্থের বিনিময়ে শ্রমকেনার জরুরী প্রশ্ন তুলেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'সাঁওতাল নারী' কবিতায় শ্রমশক্তির উপর অর্থের অমানবিক শক্তির প্রসঙ্গটি এনে দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছেন। এখানে আরও একটি জরুরী জিজ্ঞাসা প্রতিফলিত হয়েছে কেন শ্রমিক সাঁওতাল নারী। উত্তর খুবই সহজে উপলব্ধি করা যায়। সাঁওতাল নারীর মজুরি খরচা তুলনামূলক কম। কিশোরী সাঁওতাল নারীর দিন মজুরি খরচা আরও কম। আরও প্রধান কারণ হচ্ছে—শ্রমিক নারী শ্রমচুরি না। সুদূরে রেলের বাঁশি বেজে গেলেও, বেলা চলে গেলেও সাঁওতাল নারী তখনও একান্ত নিবিষ্টচিত্তে মৃত্তিকা বহন করে স্বাক্ষর আধুনিক জীবনের 'শুশ্রূষা' করে চলেছে। স্বাধীন ভারতে সংবিধানে নিয়ম করেও আজও শিশুশ্রম শেষ করা যায়নি। আসলে শিশুশ্রমিকের সঙ্গে তার সমগ্র পরিবার জড়িত। সামগ্রিকভাবে শুধু একটি সাঁওতাল পরিবার, সমগ্র সাঁওতাল গ্রাম দারিদ্র্য জজরিত পীড়িত, সেখানে একজন কিশোরীকে ছাড় দিয়ে সমগ্র সমাজকে উন্নয়ন সম্ভব নয়। উন্নয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করেছিলেন। ১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ রাশিয়া থেকে ফিরে এসে সমবায় সিস্টেমে গ্রাম উন্নয়নের কর্মসূচি নিতে বলেছিলেন পল্লীসেবক কালীমোহন ঘোষকে (১৮৮২-১৯৪০)। পল্লীসেবক কালীমোহন গ্রাম সমীক্ষায় দেখিয়েছেন সমবায় প্রথার প্রয়োগে সাঁওতাল গ্রামগুলিই এগিয়ে আছে।

'সাঁওতাল মেয়ে' কবিতায় শ্রমের ব্যক্তি নিরপেক্ষ সামাজিক ব্যবহারের বিরোধিতা আছে। শ্রম মূল্য, উৎপাদনের বৈষম্যের বিরোধিতা আছে। আসলে প্রকৃতির সৃষ্টি সাঁওতালরা অরণ্য থেকে বিতাড়িত হয়ে নিঃস্ব হয়ে গেছে। রেলপথ বানাতে, বন্ধুর পর্বত-পাথর কাটতে, বীজ বানাতে সাঁওতাল শ্রমিকরাই সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে। কিন্তু সাঁওতাল নারী শ্রমিকেরা 'রৌদ্রে পিঠ পেতে' ধীরে ধীরে ঘরের ভিত তোলে গেঁথে। চোর স্বভাবে এবং অভাবে রাতের বেলায় গৃহস্থের ঘরে সিঁধ কাটে। আর অর্থবান মানুষ, বিলাসী বাবু পয়সার শক্তিতে নারীরগ্রাম চুরি করার কঠোর অমানবিকতাক সামনে এনেছেন নোবেল প্রাপক কবি রবীন্দ্রনাথ। সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে—কবি নিজের শ্যামলী বাসগৃহ বানাবার সময়ের অভিজ্ঞতাকে চিত্রিত করেছে। পাতাকুড়োনি হিসাবে যে সাঁওতাল নারীকে আমরা শান্তিনিকেতনের চারপাশে পেয়েছি; তার থেকে

তারতম্যে শ্রমিক সাঁওতাল নারী সম্পূর্ণ ভিন্ন শ্রম চিত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কবি এখানে মানবিক সহানুভূতিতে সাঁওতাল নারীর জীবন শিল্পকে, শ্রম শোষণকে, বিশ্লেষণ করেছেন। কবিতাটি একুশ শতকেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক। শরৎচন্দ্রের 'সাধারণ মেয়ের' জীবন বদলানোর আবেদন করেছিলেন, রবি ঠাকুরকে। আর রবীন্দ্র ঠাকুরের 'আত্মনিবেদন পরা' স্নিগ্ধসুধাভরা' সাঁওতাল নারীর শোষণ শেষ হয় না। বর্ষা শেষ হয়ে বসন্ত আসে। ঋতুর পরিবর্তন হয় কিন্তু 'ঝুড়ি নিয়ে **বারবার সাঁওতাল মেয়ে** ঘরে আসে।'

কালো মেয়ের কালো চোখ :

সত্তর বছর বয়সে রবীন্দ্রনাথ একটি গান লিখলেন। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি' (১৮ জুন ১৯৩১) নামের এই গানটি রবীন্দ্রসংগীতের জগতে বেশ জনপ্রিয়। গীতবিতানের 'বিচিত্র' অংশে ৭৫ সংখ্যক এই গানটি একটি ব্যতিক্রমী সংগীত হিসাবে খ্যাতি পেয়েছে। এখানে 'কৃষ্ণকলি ময়না পাড়ার এক সাঁওতাল মেয়ে। 'কৃষ্ণকলি' নামে কবি তাকে অভিহিত করেছেন। কবির কৃষ্ণকলির শুধু দেহের চিত্রপট নয় মনের চিত্রপট এমনভাবে চিত্রিত করেছেন, যা এক কথায় অনবদ্য। কবি কৃষ্ণকলিকে প্রকৃতির মধ্যে এমনভাবে মিশিয়ে অঙ্কন করেছেন, যেখানে প্রকৃতি আর কৃষ্ণকলিকে আলাদা করা যায় না। নিসর্গ প্রকৃতির মায়ার রাজ্যে কৃষ্ণকলি তাই মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। মেঘলা দিনে মেঘের সঙ্গে শ্যামা মেয়ের যুগল ভুরু একাত্ম হয়ে গেছে। মাথায় তার ঘোমটা নেই। মুক্ত লম্বা চুলের গোছা পিঠের উপর লুটিয়ে পড়ছে। তার শরীর সঙ্গে, চুলের সঙ্গে মেঘের সঙ্গে, এক মনোরম চিত্রকল্পে অসামান্য মাত্রা দিয়েছে।

—"মেঘলা দিনে দেখেছিলাম মাঠে
কালো মেয়ের কালো হরিণ চোখ।
ঘোমটা মাথায় ছিল না তার মোটে,
মুক্তবেণী পিঠের 'পরে লোটে।"

এখানে শুধু নিসর্গ প্রকৃতির কালোমেয়ের কালোহরিণ চোখের তুলনায় দেখানো হয়েছে, সাঁওতাল মেয়ে প্রকৃতির অনবদ্য সৃষ্টি। প্রকৃতি ছাড়া কালো সাঁওতাল মেয়ে, অন্য কোথাও তাকে বেমানান। কবি তার কালো হরিণ চোখের ভালোবাসায় মুগ্ধ হয়েছেন। সহজ সরল মায়াময় কাজল কালো কোমল ছায়ার যেন এক স্নিগ্ধ কায়ার দিকে না দেখে থাকা যায় না। যেখানে কবির সঙ্গে দেখা হচ্ছে, সেখানে আর কেউ নেই। দুজন দুজনকেই পরস্পরের চোখাচোখি নিশ্চয় হয়েছে। এই দেখার মধ্যে কোনো কামনা নেই, ভোগের বাসনা নেই। আছে

সৌন্দর্যগ্রাহ্য অপরূপ মাধুর্য দেখার পরমপ্রাপ্তি। সেই দেখা কোনো পরবর্তী সময়ে স্মৃতির সরণিতে সুধা হয়ে ঝরে পড়েছে।—

"আমার পানে দেখলে কি না চেয়ে
আমি জানি আর জানে সেই মেয়ে।
কালো? তা সে যতই কালো হোক,
দেখেছি তার কালো হরিণ-চোখ।।"

সাঁওতাল মেয়ের কালোরঙের দৈহিক চেহারার মধ্যে মন-মাতানো এক মাদকতা আছে। সহজ সরল অকপট অকৃত্রিম ব্যবহারের মধ্যে ভালোবাসার মায়া-জাদুর স্পর্শ আছে। যা সৌন্দর্যপিয়াসী মানুষের বা কবির কাছে বড়ই নান্দনিক। যতই কালো হোক সে, তার কালো হরিণ চোখের মধ্যে মায়াবী ভালোবাসার এমন আন্তরিক আকর্ষণ আছে,তাকে ভালো না বেসে পারা যায় না।

ঋতুরাজ বর্ষার নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে মিশেআছে কালো হরিণ-চোখ। সারল্যে ভরা মায়াবী চোখের তুলনা, কালো সাঁওতাল মেয়ের মুখ আর চোখ মিশে স্বর্গীয় সুধা রচনা করেছে।—

"এমনি করে কালো কাজল মেঘ 'জ্যৈষ্ঠ মাসেআসে ঈশাণ কোণে। এমনি করে কালো কোমল ছায়া আষাঢ় নামে নামে তমাল বনে।"

প্রকৃতি এখানে সবুজ ভুবন শুধু নয়, সময়ের নবধারায় বর্ষাকালের জলধারার সঙ্গে কাজল কালোর মেঘের সঙ্গে কালো সাঁওতাল মেয়ের গভীর একাত্মতা সৃষ্টি করেছেন কবি। আবার জৈষ্ঠ আষাঢ় মাসের মেঘের জলধারার পর, পরিচয়ের পর, দেখার পর, শ্রাবণ রজনীতে, বৃষ্টিস্নাত রাতে স্মৃতিপটে কালো মেয়ের পটচ্ছবি বার বার কল্পনার চোখে ভেসে আসছে। বাস্তবের দেখা সেই স্মৃতিপট বারবার প্রতিধ্বনিত হচ্ছে কল্পনায় কালো হরিণ-চোখের মায়া।

রবীন্দ্রনাথ 'জাপানী মেয়ে' প্রসঙ্গে সাঁওতাল মেয়ের শ্রী ও সৌন্দর্যের প্রশংসা করেছিলেন। কবি রবীন্দ্রনাথ এখানে শুধু একজন রোমান্টিক কবি নয়, একজন প্রেমিকও বটে। কিন্তু এই প্রেমের মধ্যে আছে সৌন্দর্যের সাধনা। দৈহিক বা জৈবিক ভোগ নয়। মানসিক ঐশ্বর্যের এক নান্দনিক প্রার্থনা। সমাজের মানুষ কে কি বললো, তাতে কবির কিছুই যায় আসে না। হতে পারে 'কৃষ্ণকলি' নিরক্ষর নারী, গৃহের গোপালিকা কিন্তু তার দেহের ও মনের সৌন্দর্যকে কবি দূর থেকে উপভোগ করেছেন মাত্র। অপার স্বর্গীয় সৌন্দর্যকে ভোগ করার চেয়ে উপভোগ করাই চরম সার্থকতা।

'ওগো সাঁওতালি ছেলে'

রবীন্দ্রনাথের অজস্র গানের মাঝে ঠাঁই পেয়েছে 'কৃষ্ণকলি' বা সাঁওতাল মেয়ে।

রবীন্দ্র সংগীতে শুধু সাঁওতাল মেয়ে নয় এসেছে সাঁওতালি ছেলে। 'ওগো সাঁওতালি ছেলে' নামে একটি গান গীতবিতানের 'প্রকৃতি' পর্যায়ের ১২৫ সংখ্যকে প্রকাশিত হয়েছে। প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় (রবীন্দ্র জীবনীকার) এ শুধু একটি তথ্য দিয়েছেন—'ওগো সাঁওতালি ছেলে' গানটি ১৩৪৬ বঙ্গাব্দে প্রবাসীতে প্রকাশিত হয়েছিল। 'ওগো সাঁওতালি ছেলে' গানটি প্রকৃতি পর্যায়ে স্থান পেয়ে সার্থক হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, আশ্রমের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রকৃতির মন মহলে সংযুক্ত করেছেন তাঁর গানকে। তাঁর প্রকৃতি পর্যায়ের গানগুলোয় ছড়িয়ে আছে পলাশের ডালে, শিউলি তলায়, বকুলের গন্ধে, ঘাসের শিশিরে। শুধু শান্তিনিকেতনের স্বর্গসুধায় নয়, জ্যোৎস্নায় ভরে আছে শালবীথি। শালের মঞ্জরীতে প্লাবিত পথে। মহুল বনের গহনে। সাঁওতাল গ্রামের সবুজ ভুবনে। সাঁওতালি বাঁশির করুণ সুরে সুরে ঝরে পড়েছে রাধার অশ্রুধারা। শুধু বসন্তে নয় চণ্ডীদাসের বর্ষায়। ঋতুর সোহাগে বর্ষার গান সবচেয়ে জীবন্ত।

'ওগো সাঁওতালি ছেলে' গানটি শ্যামল সঘন নববরষার সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে এক ভিন্ন মাত্রা এনে দিয়েছে। সাঁওতাল ছেলে এখানে নববরষার কিশোর দূত। বর্ষা-বিরহের সঙ্গে একাত্ম হয়ে তার বাঁশির সুর ভেসে যাচ্ছে সুদূর বিরহী হৃদয়ের কাছে। প্রকৃতির অনাবিল মাধুর্যের সঙ্গে বিরহী মানবমনের এক অসামান্য মূর্চ্ছনা নবদিগন্তের স্বাদ এনে দিচ্ছে।—

—"ওগো সাঁওতালি ছেলে,
শ্যামল সঘন নববরষার কিশোর দূত কি এলে।
ধানের ক্ষেত্রের পারে শালের ছায়ায় ধারে
বাঁশির সুরেতে সুদূর দূরেতে চলেছে হৃদয় মেলে।।"

একদিকে সবুজ ধানক্ষেত (বর্ষার সময় ধানক্ষেত সবুজ থাকে) অন্যদিকে শালবীথির মায়াময় ছায়া। এখানে কিশোর সাঁওতালি ছেলের বাঁশির সুর মিলিয়ে দিচ্ছে মানুষ ও প্রকৃতিকে। সাঁওতালি ছেলে এখানে নববরষার কিশোরদূত হিসাবে এক নতুন বার্তা নিয়ে আসছে। আমাদের মনে করিয়ে দিচ্ছে বর্ষামঙ্গলকে। স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে হলকর্ষণকে, তারপর বৃক্ষরোপণে উৎসবকে আর সাঁওতাল গ্রামের কৃষিপার্বণকে। জানিয়ে দিচ্ছে বর্ষার আগমনের কেয়াফুলের সৌরভকে।—

—"পুব-দিগন্ত দিল তব দেহে নীলিমা লেখা,
পীত ধড়টিতে অরুণ রেখা,
কেয়াফুলখানি কবে তুলে আনি
দ্বারে মোর রেখে গেলে।।"

সীমাহীন দিগন্তে উদ্ভাসিত হচ্ছে নীলিমলেখার সঙ্গে পীত অরুণ রেখা। বর্ষাফুলের সৌরভে স্নাত হয়ে যাচ্ছে মুক্তধারে উন্মুক্ত পুষ্পাঞ্জলির নন্দনসুধারস। কবির প্রিয় রঙ নীলিমলেখা। কবির প্রিয় ঋতু সেই বর্ষণমুখর বর্ষাক্রন্দন। মানুষের চিরন্তন বিরহ-বেদনা এক অপূর্বসুর মনকে প্লাবিত করে দিচ্ছে। বর্ষার সঙ্গে মন-প্লাবনের কল্পনা এক নতুন সৃষ্টির উল্লাসে মনকে উদাসীন করে দিচ্ছে।—

"আমার গানের হংসবলাকাপাঁতি
বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি।"

কবির 'বিশ্বচিত্তলোক' যা ইংরেজ কবি শেলির 'burning fountain'। সাঁওতালি ছেলে, সে হতে পারে কিশোর, হতে পারে সে নিরক্ষর। কিন্তু সে যে, জন্মবাদক বাঁশির সুর এখানে সামান্য নয়। সীমাহীন অসীম 'বিশ্ব চিত্ত লোকে' বিস্তৃত হয়ে নবচেতনার ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে। উড়ে যাওয়া মুক্ত বলাকার দল অসীমের বার্তা দিয়ে যাচ্ছে—'হেথা নয়, অন্য কোথা, অন্য কোনখানে।' 'বাদল-দিনের তোমার মনের সাথি' হিসাবে সাঁওতালি কিশোরের বাঁশি প্রেমের স্বজনকে একাসনে বসিয়ে দিচ্ছে—দূরপ্রবাসী প্রেমিক মনকেও। কৃষ্ণকলির কালো হরিন চোখ আর সাঁওতালি ছেলের বাঁশির সুর, বাদ-লা-দিনে কিংবা শ্রাবণ-রজনীতে 'মনের সাথি' 'ঘনিয়ে আসে চিতে'।

সাঁওতাল কিশোর-কিশোরীদের কবিতা-গানে প্রকাশ নয়, কবি শ্রীনিকেতনে তাদের জন্য অভিনব শিক্ষাপ্রণালী শুরু করেছিলেন। সাঁওতালপ্রেমি পিয়র্সনের মৃত্যুর পর সন্তোষ মজুমদারকে সেই দায়িত্ব দিয়েছিলেন কবি রবীন্দ্রনাথ। হতভাগ্য সাঁওতালদের দুঃখ এবং বিদ্রোহ উপলব্ধি করলেন—একমাত্র রবীন্দ্রনাথ।

সাঁওতালি 'উৎসব' :

রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণের চতুর্থ খণ্ডে 'বিবিধ কবিতা'র অংশে একটি ব্যতিক্রমী কবিতার নাম 'উৎসব'। যা 'চিত্র-বিচিত্র' রচনার চিত্র অংশে 'পৌষমেলা' কবিতার পরেই 'উৎসব' কবিতাটি স্থান পেয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল বিদ্রোহ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। অনুশীলন করেছেন, উপলব্ধি করেছিলেন তাদের অভিযোগ। পেয়েছেন 'কৃষ্ণকলিকে', সাঁওতালি কিশোরকে। বারবার গেছেন কার্মাটাঁড় থেকে সাঁওতাল পরগনায়। দেখেছেন সহজ-সরল ছন্দময় সাঁওতাল সংস্কৃতিকে। ছড়ার ছন্দে লিখে ফেললেন 'উৎসব' নামের অভিনব কবিতাটি। মনে পড়ে যাবে সাঁওতাল গ্রামের হলকর্ষণ, বর্ষামঙ্গল ও বৃক্ষরোপণ উৎসবকে। চিঠি লিখবেন রানি নির্মলকুমারী মহালনবিশকে। সাঁওতাল গ্রামে হলকর্ষণ উৎসব

হয়েছিল ১৪ আগস্ট ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় এক সপ্তাহ আগে আগস্ট মাসের ৮ তারিখে রবিবার (১৯৩৭) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন সেই ঐতিহাসিক পত্র।—

"**সাঁওতাল পাড়ায়** হলকর্ষণ-বৃক্ষরোপণ হবে।
ব্যাপারটা সম্পূর্ণ নতুন রকম হবে। **সাঁওতালিরা**
নাচবে, গাইবে, অনুষ্ঠানে যোগ দেবে।
নিশ্চয় এসো।।"

রবীন্দ্রনাথ উপেক্ষিত পল্লীর, অবহেলিত সাঁওতালদের গ্রামে গিয়ে হলকর্ষণ উৎসব করে 'হতভ্যাগ্যের গানে (১৩০৪)র শরীক হতে চাইলেন। 'দীনের সঙ্গী' (১৩১৭) 'সবার পিছে, সবার নীচে/সবহারাদের মাঝে' তথাকথিত উচ্চ-বর্গ শিক্ষিতগণের কাছে তারা চিরকাল অবমানিত। 'হতভাগ্যের গানে' (১৩০৪) গলা মেলালেন---'রিক্ত যারা সর্বহারা/সর্বজয়ী বিশ্বে তারা;/সর্বময়ী ভাগ্যদেবীর/নয়কো তারা ক্রীতদাস।'

গীতাঞ্জলির 'ধূলামন্দির' (১৩১৭) কবিতায় রবীন্দ্রনাথ মেহনতি মানুষের গান গাইলেন—'তিনি গেছেন যেথায় মাটি ভেঙে করছে চাষা-চাষ-/পাথর ভেঙে কাটছে যেথায় পথ, খাটছে বারো মাস।' তিনি অস্পৃশ্যতা বিরোধী কবিতা লিখলেন। ভেঙে দিলেন শিলাইদহের শেখ-সাহাদের ভেদাভেদ। সবার সঙ্গে একাসনে বসলেন তরুণ জমিদার রবীন্দ্রনাথ। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে লিখলেন 'ওরা কাজ করে' (১৩৪৮)। কৃষক-শ্রমিকদের অবহেলিত শ্রমশীল সাঁওতালদের জয়গানে মুখর হলেন।—

—"ওরা চিরকাল/টানে দাঁড়, ধরে থাকে হাল;
ওরা মাঠে মাঠে,/বীজ বোনে, পাকা ধান কাটে।
ওরা কাজ করে/নগরে প্রান্তরে।।"

কবি রবীন্দ্রনাথ বার বার ব্রাত্য বলেছেন নিজেকে। নিজে মন্ত্রহীন বলে দেবতার মন্দিরে নৈবেদ্য পৌঁছাতে পারেনি বলেই—'কবি আমি ওদের দলে—' 'অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।'

রবীন্দ্রনাথ জীবনের শেষ প্রান্তে আহ্বান করলেন—প্রান্তজনের মিলন উৎসবে। 'সাঁওতাল পল্লী'র সাঁওতাল উৎসবে প্রিয় স্বজনদের নিমন্ত্রণ করলেন। অন্যসমস্ত উৎসবের থেকে আলাদা—শুধু সারাদিন নয় সারারাত ধরে চলবে প্রাণশক্তির উচ্ছলধারা। আসবে বাদ্য, আসবে সাঁওতাল পুরুষ, আসবে সাঁওতাল নারী; সব বয়সের সাঁওতাল মানুষ আসবে। প্রকৃতির বুকে আরণ্যক সন্তানেরা নিসর্গ-সৌন্দর্য-সৌরভ এক নতুন মাত্রায় নতুনবার্তা আনবে শহুরে স্বজনদের।—

"সন্ধ্যা বসুন্ধরা
তন্দ্রা হারায়।
আমের মঞ্জুরী
গন্ধ বিলায়।
পূর্ণিমাচন্দ্রের
জ্যোৎস্নাধারায়।"

সাঁওতাল উৎসবপ্রিয় জনজাতি—রবীন্দ্রনাথ তা ভালো করেই জানতেন। সাঁওতাল উৎসবে মাতোহারা হবে—নৃত্য-গীত-বাদ্যের মহাসম্মিলনে। শুধু ঢাক-ঢোল, মাদল-ধামসা নয়, গম্ভীর শব্দের সঙ্গে মিষ্টি বংশীর সুর।—

—"দুন্দুভি বেজে ওঠে
ডিম ডিম রবে,
সাঁওতাল-পল্লীতে
উৎসব হবে।"

স্বতঃস্ফূর্ত সাঁওতাল উৎসবে, সাঁওতাল গ্রামের 'পথে পথে হৈ হৈ ডা ক, /বংশীর সুরে তালে/বাজে ঢোল ঢাক।' স্বাভাবিক জীবনের ছন্দে সাঁওতালদের অংশগ্রহনের সমস্ত গ্রামে ব্যাপক সাড়া জাগিয়েছে। সাঁওতাল গ্রামের পথে পথে তাই আনন্দের কলোরোল। হাসিভরা মুখগুলির মধ্যে দেখা যাচ্ছে প্রাণের উচ্ছলতা। শুধু হাসিভরা মুখ নয় উচ্চ-হাস্যরোলের শব্দে মুখরিত সাঁওতাল গ্রাম। দলে দলে সাঁওতাল বালক-কিশোরদের চরম উৎসাহ উৎসবকে সার্থক করে তুলবে। উৎসব প্রিয় সাঁওতাল জীবনে আনন্দ এক বিশেষ তাৎপর্য এনে দেয়। দারিদ্র্য আর অভাবের মধ্যে প্রবল উৎসাহে উৎসবে সামিল হয়ে পরাভবের গ্লানিকে মুছে দেয় তারা।

সাঁওতাল গ্রামে উৎসব হবে, আর সাঁওতালকন্যা থাকবে না; তা ভাবা যায় না। প্রকৃতি-কন্যা সাঁওতাল মেয়ে তাই সেজে ওঠে বনফুলের অপরূপ সজ্জায়। মনোরম প্রকৃতির পুষ্পবনে সুগন্ধ ছড়ায় 'কুসুমিত কিংশুক বন।' সাঁওতাল কন্যাকে তাই প্রকৃতির পুষ্পবন থকে আলাদা করে উপলব্ধি করা মনে হয় যায় না। কিংশুকবন আর সাঁওতাল-কন্যা মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে।

—"দান করে কুসুমিত
কিংশুকবন
সাঁওতাল-কন্যার
কর্ণভূষণ।"

উৎসব শুরু হয় নাচ-গান বাদ্যের ত্রিবেণী সঙ্গে। তার সঙ্গে সংলিপ্ত হয় 'উল্লাসদোল' আর 'হাস্যের রোল'। সারারাত ধরে চলতে থাকে মহুলবনের মাতাল

গান। ক্রমশ রাত শেষ হয়ে সকালের আলো ফুটতে থাকে। পাখির ডাকে সেই পবিত্র সকালের শুরু হয়। সাঁওতালি নৃত্য ছাড়া সাঁওতালি উৎসব হয় না। সাঁওতালি নৃত্য, অবশ্যই দলগত বা সমবেত সম্মিলিত সাঁওতাল কন্যাদের অংশগ্রহণ। পাশাপাশি হাতে হাত রেখে সাঁওতালি নৃত্যের সহজতালে, মনমাতানো, বিশেষ সাঁওতালি সুরে সাঁওতালি উৎসব শেষ হয়। সাঁওতালি-কন্যাদের নাচও গান আর সাঁওতালি-কিশোরদের বাদ্যবাদন, সংগীত—মূখর উৎসব সার্থক হয়।—

"ধীরে ধীরে শর্বরী
হয় অবসান,
উঠিল বিহঙ্গের
প্রত্যুষগান।"

উৎসব মানুষকে সম্মিলিত করে। উৎসব মানুষকে বড় করে তোলে। নিজের আনন্দকে ভাগ করে দেয় সকলের সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের 'উৎসব' কবিতাটি সাঁওতাল উৎসবকে কেন্দ্র রচিত হয়েছে, তা বলাইবাহুল্য। কবি রবীন্দ্রনাথ সাঁওতাল জীবনকে শুধু ভালোবাসতেন না, শ্রদ্ধাও করতেন। এত কাছে তাদেরকে পেয়েও তিনি সাঁওতালি সুর কিংবা সাঁওতালি নৃত্যকে তাঁর সৃজনভুবনে ব্যবহার করেন নি। প্রকৃতির সন্তান সাঁওতাল জনজাতির অসাধারণ বৈশিষ্ট্য মৌলিকভাবে বাঁচিয়েরাখার জন্য শ্রীনিকেতনে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। রবীন্দ্র কবিতার সাম্রাজ্যে 'উৎসব' কবিতা ছড়ার ছন্দে সাঁওতাল জীবনের স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ ঘটিয়েছেন। সাঁওতালপল্লির উৎসব তাই বাঙালির বারোমাসের তেরো পার্বণের মধ্যে স্মরণীয় করে তুলেছেন। 'উৎসব' কবিতাটি তাই নাগরিক সমাজের পাঠকের কাছে বহুপঠিত হয়েছে।

সূত্র নির্দেশ

১। 'ছোটনাগপুর' বিচিত্র প্রবন্ধ, রবীন্দ্র রচনাবলী (চতুর্দ্দশখণ্ড : প্রবন্ধ/জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাক ১৩৬৮, পৃষ্ঠা : ৭২০-৭২২।

২। 'ইংরাজের আতঙ্ক'—আত্মশক্তি গ্রন্থের পরিশিষ্ঠ অংশ (দ্বাদশ খণ্ড)—রবীন্দ্র রচনাবলী : জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা : ৮৩৮-৮৪১।

৩। গ্রামবাসীদের প্রতি—পল্লীপ্রকৃতি, রবীন্দ্ররচনাবলী (ত্রয়োদশ খণ্ড)—জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ : ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা :৫২১-৫২৪।

৪। অচলায়তন—ঐ ষষ্ঠ খণ্ড : পৃষ্ঠা : ৩৬৩-৪১৮।

৫। রক্তকরবী—ঐ : পৃষ্ঠা : ৬৪৭-৬৯২।

৬। 'শেষ কথা' : তিনসঙ্গী'—ঐ, সপ্তম খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৯৬০-৯৭৬

৭। 'শাল' : বনবাণী—ঐ, পৃষ্ঠা : ৮৪৯
৮। 'মহুয়া' : 'মহুয়া'—ঐ, পৃষ্ঠা : ৭৯৬
৯। 'ক্যামেলিয়া' : 'পুনশ্চ'—ঐ, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৭
১০। 'খোয়াই' : 'পুনশ্চ'—ঐ, পৃষ্ঠা :১১-১২
১১। 'কোপাই'—ঐ—পৃষ্ঠা : ৫
১২। 'বাসা'—ঐ—পৃষ্ঠা : ২০
১৩। 'সাঁওতাল মেয়ে'—বীথিকা, ঐ, পৃষ্ঠা : ২৯৪-২৯৫
১৪। 'কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি'—গীতবিতান বিচিত্র অংশের ৭৫ সংখ্যক গান—ঐ, চতুর্থ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৪২।
১৫। 'ওগো সাঁওতালি ছেলে', গীতবিতানের প্রকৃতি পর্যায়ের ১০০ সংখ্যক গান—গীতবিতান : বিশ্বভারতী, ১৩৪৮, পৃষ্ঠা : ৪৭৫।
১৬। 'উৎসব'—বিবিধ কবিতা', চতুর্থ খণ্ড—রবীন্দ্র রচনাবলী জন্মশত বার্ষিক সংস্করণ : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, ২৫ বৈশাখ ১৩৬৮, পৃষ্ঠা : ৯৪৪-৯৪৫।

লেখক পরিচিত :
অধ্যাপক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাঙা-গড়ায় নায়ক-প্রকল্প

দেবলীনা শেঠ

সারাংশ :

সুপ্রাচীন কাল থেকে পূবে কি পশ্চিমে সংস্কৃত কিংবা গ্রীক বা রোমক সাহিত্যে 'নায়ক' বলে চিহ্নিত হয়ে এসেছেন বিশিষ্ট গুণাবলীর কিছু মানুষেরা। তাঁরা সকলেই জয়ী, কৃতী, বীর, অভিজাত এবং অবশ্যই আমাদের মতো সাধারণ মানুষের কাছে প্রতিনিধিস্থানীয়। সম্মোহক। মধ্যযুগের ইংরাজি বা সংস্কৃত সাহিত্যেও সুপ্রাচীন এই প্রকল্পেরই অনুসৃতি। কিন্তু এই মূর্তিখানা আক্রান্ত হল, বাংলা সাহিত্যের উদ্ভবের পর—বাংলার সীমান্তে এসে। আলঙ্কারিকদের নির্দেশনামা সরাসরি অস্বীকার করে এল নায়ক—বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণ বা কবিকঙ্কণের কালকেতু। আর উনিশ শতকের প্রারম্ভে বাংলাগদ্যের জন্মলগ্নেও একই নিয়মভাঙার আয়োজন। কিন্তু কেন? প্রবন্ধে তারই অনুসন্ধান।

মূল শব্দ : নায়ক প্রকল্প, সুমহান, অলঙ্কারশাস্ত্র, বিবর্তন, শাস্ত্রবিরোধী।

১

'See the conquering hero, comes :
Sound the trumpets, beat the drums'.[১]

১৯৪৭ সালে জর্মন-ব্রিটিশ সুরকার G. F. Handel যশুয়ার (Joshua) নায়কোচিত বিজয় চিহ্নিত করে এই ধর্মগীতিটি সুরসংযুক্ত করেন। যুদ্ধের জনপ্রিয় মার্চিং টিউন ছিল এটি। সেই সুরে কথারূপ দেন Edmond Louis Budry ১৯২৩-এ। আর Richard Hoyle এর অনুবাদে হাতে আসে কবিতাটি। বা বলা যায়, ইংরেজি গানটি। এ তো গেল। একশো বছর পরে নায়ক কে—তা চিহ্নিত করে H. W. Longfellow ১৮৩৮সালে লিখলেন—

'In the world's broad field of battle
In the bivouac of life
Be not like dumb driven cattle,
Be the hero in the strife'.[২]

দুটি কবিতাতেই কিন্তু সরাসরি প্রকাশিত 'hero'র একই চারিত্র্য—আকাশ ছোঁয়া বীর্য আর সব প্রতিকূলতাকে জয় করার সস্পর্ধ দম্ভ। এমনকি চেনাপরিচিত অভিধানে 'hero' শব্দটিকে আভিধানিকভাবে খুঁজতে গিয়েও ঐ 'Conquering hero'র আদলই মিলবে। 'The New Oxford Illustrated Dictionary'

'hero' শব্দটিকে বিশ্লেষণ করছে তিনটি ধাপে :

1. 'Man of super-human strength, courage or ability, favoured by the Gods; later regarded as intermediate between Gods and men and immortal'.

2. 'Illustrious warrior, man of extraordinary bravery, fortitude, or greatness of soul'.

3. 'Man forming subject of epic, chief male character in poem, play or story'.[৩]

বলাই বাহুল্য, 'hero' পুরুষবাচক বিশেষ্য শব্দ, যিনি কিনা অমিতবিক্রম এবং দেবানুগৃহীত—দেবতা এবং মানুষের সেতুবন্ধ স্বরূপ। তিনি বীর যোদ্ধা, মহাত্মা। তাঁকে নিয়েই মহাকাব্যের পরিকল্পনা। কাব্য, নাটক বা কাহিনির তিনিই কেন্দ্রীয় পুরুষ। Webster যে 'Hero' কে খোঁজে তাদের অভিধানে, প্রায় একই গুণাবলী তাঁরও।—

1. 'A mythological or legendary figure endoured with great strength, courage or ability favoured by the Gods and often believed to be divine or descent'.

2. 'A man of courage and nobility famed for his military achievements : an illustrious warrior'.

3. 'A man admired for his achievements and noble qualities and considered a model or or ideal'.

4. 'The principle male character in a drama, novel, story or narrative poem : protagonist'.

সব মিলিয়ে 'Hero' তাঁর বীর্য, ঔদার্য, মহত্ত্বের গুণে প্রায় এক সম্মোহক শব্দ, যে শব্দের সম্মোহনে একা কবি নন্—আভিধানিকও শ্রদ্ধাবনত। আবার বছর পঞ্চাশ আগের এক সমালোচক গবেষক, Jenni Calder-এর কণ্ঠও কোমল, সশ্রদ্ধ হয়ে আসে 'Hero' বন্দনার আবেশে।—

'We should not worship the hero because he is better than we are, but we should be open in our response to him because he represents the best that is in ourselves. We have to greet him with recognition as well as admiration.'[৫]

ক্যালডারের অভিমত, hero আমাদের মতো গড়পড়তা সাধারণদের প্রণম্য তো বটেই—তিনি নানা মানুষের নানাবিধ গুণসমন্বিত। মোটকথা, গ্রীক শব্দভাণ্ডার থেকে আমদানি করা, লাতিনের হাতফেরতা হয়ে ইংরেজি শব্দভাণ্ডারে আগত এই শব্দটির সঙ্গে মিলেমিশে একাকার, অতিমানবিক বীর্যবত্তা এবং রাজকীয় নানা গুণাবলীর শর্ত। গ্রীক 'heros' কিংবা লাতিন 'heroes' শব্দের ব্যাপক প্রচলন

ছিল প্রত্ন গ্রীক এবং লাতিন শব্দভাণ্ডারে। আর এদেশে সেই বৈদিক যুগ' থেকে প্রায় সমার্থক প্রয়োগে চলে এসেছে প্রায় সমবয়স্ক অথবা প্রবীণতর শব্দ—'নায়ক'।

অবশ্য দেশভেদে, মানসিক গঠন আর দর্শনভেদে দুটি শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থে ফারাক তৈরি হয়েছে অনেকটাই। প্রাচীন গ্রীক বা রোমে কিংবা ইংরাজি শব্দভাণ্ডারে 'hero' শব্দটি মূলত কিন্তু চরিত্রদ্যোতক। পরিণামবাদী ভারতীয় দর্শন, কাহিনিপ্রবাহের পরিণামের দিকে তাকিয়ে তবেই গাঁথে 'নায়ক' শব্দটি। অভিধান বলবে, √নী + ণক্ (অক্) = নায়ক। ব্যুৎপত্তি অনুসারে তাহলে নায়ক বলব কাকে?—কাহিনিকে যে পরিণতির দিকে বইয়ে নিয়ে যায়, সেই কর্ণধারই নায়ক। একটু ঘুরিয়ে বলতে পারি, যার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব ছাড়া কোনো কাহিনি অচল হয়ে পড়ে, সেই-ই নায়ক। পশ্চিমী 'hero'র মত 'নায়ক' শব্দটিও পুংলিঙ্গবাচক। তবু তফাত আছে। পশ্চিমী অভিধানে 'hero' প্রথম পরিচয়েই যেমন পুরুষ, সংস্কৃত শব্দভাণ্ডারে তার সংজ্ঞা কিন্তু কাহিনির কর্ণধার হয়ে ওঠার যোগ্যতা। অভিধান ছেড়ে আসুন, 'নায়ক' শব্দটিকে খুঁজি সাহিত্যতত্ত্ব ভাণ্ডারে। পশ্চিমে এবং প্রাচ্যে।

২

'Poetics' গ্রন্থের পঞ্চদশ অধ্যায়ে অ্যারিস্টটল্ নায়কের প্রাথমিক চতুর্গুণের উল্লেখ করেছিলেন কবে, কোন্ কালে! কী কী?—গোড়াতেই, তাদের ভালো হতে হবে। 'The first and foremost, that they shall be good'. 'The second point is to make them appropriate'. তৃতীয় গুণটি কিন্তু বেশ গোলমেলে। 'The third is to make them like the reality, which is not the same as their being good or appropirate, in our sense of the term'. আর চতুর্থ গুণ বা চারিত্র্য প্রসঙ্গে অ্যারিস্টটল্ বলছেন, 'The fourth is to make them consistent'.[৬] বাইওয়াটার অনুবাদে যাকে বলেন 'reality' বুচারের ভাষান্তরে তা 'true to life'। আর যাই বলিনা কেন 'like the reality' কিংবা 'ture to life'—অ্যারিস্টটল কিন্তু স্পষ্টতই তার কতগুলো মান নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই নির্বাচিত মানাঙ্ক, অভিধানের সংজ্ঞা এবং তাত্ত্বিক আলোচনার সাপেক্ষে নায়কের গুণাবলীর সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে যায় আবশ্যিক কয়েকটি শব্দ—'highly renowned', 'prosperous', 'illustrious man' এবং 'consistent'। মোটকথা, এই গুণগুলির সমন্বয় না হলে কাব্যতত্ত্ব কাউকেই নায়কের মর্যাদা দেবে না। তাই বলে জীবন কি ছড়িয়ে নেই এই ধরাবাধা প্রকল্পের বাইরেও?—কাব্যতত্ত্বের নিগড় বলে, নায়ককে অর্জন করতেই হবে নির্দেশিত সুমহান ব্যক্তিত্ব যাতে এই সাড়ে চার হাতের কাঠামোয় বন্দি আমরা আকাশছোঁয়া

সেই আভিজাত্যের কাছে প্রণত হতে পারি। পাশ্চাত্যের কাব্যতত্ত্ব বলে, তিনিই নায়ক। পরবর্তী সময়, বিশেষত এলিজাবেথিয় যুগে অ্যারিস্টটলের ট্র্যাজেডি পরিকল্পনার নানা বিরুদ্ধতার মধ্যেও কিন্তু নায়কের ঐ 'prosperous', 'illustrious', ভাবমূর্তিটি ছিল অনাক্রান্ত।

আর সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব?---পূর্ব ভারতীয় তাত্ত্বিক সাগর নন্দী তাঁর 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ' গ্রন্থের শুরুতেই নাটকের পরিচয় প্রসঙ্গে বলেছেন :

'নায়ক ইতি বীজবিন্দ্বাদিসম্বলিতস্য নাটকস্য নাট্যমন্তং নয়তীতি নায়ক:।' অর্থাৎ সেই √নী + ণক্ (অক্) = 'নায়ক' এর ব্যুৎপত্তিগত পরিচিতি। নায়কের বাকি গুণাগুণ উল্লেখে সাগরনন্দী কিংবা বিশ্বনাথ একনিষ্ঠভাবে 'নাট্যশাস্ত্র' অনুগামী। সংস্কৃত সাহিত্যতত্ত্ব নির্দেশিত নায়ককে খুঁজতে আমরা বেছে নিতে পারি, এ বঙ্গে সবচেয়ে সমাদৃত দুই সাহিত্যশাস্ত্র—সাগরনন্দীর 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ' এবং বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ'। খুব সম্ভব প্রাচী ভারতের অধিবাসী বলেই বঙ্গে এই দুই আলঙ্কারিকের আধিপত্য। ভরতকে শিরোধার্য করে সাগরনন্দী নায়কের চারটি রূপভেদে নির্দেশ করলেন—'ধীরোদ্ধত', 'ধীরললিত' 'ধীরোদাত্ত' এবং 'ধীরপ্রশান্ত'। আর তৃতীয় পরিচ্ছেদের সাঁইত্রিশতম শ্লোকে বিশ্বনাথ কবিরাজ বললেন হুবহু একই কথা!—

'ধীরোদাত্ত ধীরোদ্ধতস্তথা ধীরললিতশ্চ।
ধীরপ্রশান্ত ইত্যয়মুক্তঃ প্রথমশ্চতুর্ভেদঃ।।' (৩/৩৭)

এক একটি স্বতন্ত্র শ্লোকে দেওয়া হল চারটি শ্রেণীবদ্ধ রূপের সংজ্ঞা ও উদাহরণ। শেষ নয় এখানেই। নাট্যশাস্ত্র অনুসরণে দর্পণকার শৃঙ্গাররসবিষয়ে এই চার ধরণের নায়কের প্রতিটির আবার চতুর্ভাগ করলেন—দক্ষিণ, ধৃষ্ট, অনুকূল এবং শঠ। ব্যক্তিভেদে কতই না প্রকারভেদ! তাই আচার্য ভরতকে মান্যতা দিয়ে বিশ্বনাথ থামলেন না এখানেও। এরপরেও এই ষোলো প্রকার নায়কের মধ্যে উত্তম-মধ্যম-অধমভেদে তিনি দেখালেন নায়কের সর্বমোট আটচল্লিশটি প্রকারভেদ। এই আটচল্লিশ রকম নায়কের চরিত্রগত নানা বৈষম্য—কিন্তু গুণগত বেশ কয়েকটি সাদৃশ্যের কথা আচার্য ভরত কিংবা বিশ্বনাথ কবিরাজ কিংবা সাগরনন্দী—তিনজনেই বলছেন। 'নাট্যশাস্ত্র' নির্দেশ করছে, সব ধরণের নায়ককেই অর্জন করতে হবে আটটি 'মহাগুণ'। কোন্ গুণরাজি?---শোভা-বিলাস-মাধুর্য-স্থৈর্য-গাম্ভীর্য -লালিত্য-ঔদার্য-তেজ—এইগুলি নায়কের অনিবার্য সত্ত্বগুণ এবং

'ইত্যষ্টৌ মহাগুণাঃ পুরুষাণাং তে নায়কে দর্শয়িতব্যাঃ।' (নাট্যশাস্ত্র/২২-৩৩)

এরই আদলে 'সাহিত্যদর্পণ' নায়কের অষ্ট মহাগুণ চিহ্নিত করে স্পষ্টভাবে বলছে—

'ত্যাগী কৃতী কুলীনঃ সুশ্রীকো রূপযৌবনোৎসাহী।
দক্ষোহনুরক্তলোকস্তেজোবৈদগ্ধ্যশীলবান নেতা।' (সাহিত্যদর্পণ/৩-৩৬)

মোটকথা,কাহিনি, কাব্য, আখ্যান কিংবা নাটকের যে ধরনের নায়কই হোন না কেন, অষ্টসত্ত্ব পৌরুষগুণ কিংবা ত্যাগী-কৃতী-কুলীনের অভিজাত আভরণ তাঁর চাই-ই। আমাদের অবশ্য জানা নেই, ধীরোদ্ধত-শঠ-অধম কোনো নায়ক কেমন করে অর্জন করতে পারে অষ্ট মহাগুণ কিংবা কেমন করেই বা তিনি বিদগ্ধ-শীলবান হয়ে উঠতে পারেন। কোনো স্রষ্টার পক্ষে এমন বিচিত্র নায়ক পরিকল্পনা আদৌ সম্ভব কিনা—জানা নেই। নাট্যশাস্ত্র কিংবা 'সাহিত্যদর্পণে' এরকম বিচিত্র কোনো নায়কের উদাহরণও মেলে না। কিন্তু আলঙ্কারিকরা সহমত, এই আটচল্লিশ প্রকার নায়কেরই অত্যাবশ্যক ভূষণ ঐ অভিজাত 'মহাগুণ' রাশি।

৩

মনে পড়ছে নাকি, অ্যারিস্টটল নির্দেশিত নায়কচরিত্রের আভিজাত্য? আসলে প্রাচীন কিংবা মধ্যযুগে, পশ্চিমে কিংবা পূর্বী ঐতিহ্যে অনভিজাত নায়কের কোনো স্থানই নেই। এ শুধু তাত্ত্বিকের রক্তচক্ষু নির্দেশই নয়—সাহিত্যতাত্ত্বিক আর স্রষ্টার মধ্যে সেই সময়ে ভাবনার আর প্রয়োগে বেশ অন্তরঙ্গ সমঝোতা ছিল।। অনভিজাত নায়ক—এমন কল্পনাই ছিল রীতিমত সাহিত্যশাস্ত্রবিরোধী। এমনকি হালের পশ্চিমী সমালোচককেও বলতে শোনা যায়,—

—'There is no way the hero can survive without being elitist, in the sense that he is special, that he has qualities, even if only an unidentifiable charisma, that the rest of us don't share."[৭]

মোটকথা, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে পর্যন্ত ঐ 'Special' heroর বিগ্রহটি ছিল সযত্ন রক্ষিত আর পাঠকের কাছেও তাঁরা ছিলেন প্রণম্য। 'Always respective'.

সংস্কৃত সাহিত্যের ত্যাগী-কৃতী-কুলীন-অভিজাত নায়ক প্রকল্পের চিরকেলে ভাবনা তো আমরা জানিই। নায়ক কেমন যেন একই ছাঁচে ঢালা। বৈচিত্র্য যা কিছু, সব ঐ পার্শ্বচরিত্র পরিকল্পনায়। আসলে সংস্কৃত ভাষার মতই সংস্কৃত সাহিত্য তো চিরকালই ছিল নাগরিক বৈদগ্ধ্য-কেন্দ্রিক! তাই উচ্চকোটির ভাষায় লেখা সাহিত্যের নায়ক হয়ে আসে অনিবার্যভাবেই দম্ভী রাজসিক চরিত্র। সংস্কৃত ভাষার উন্নাসিকতা তো আমাদের জানা। রাজপুরুষ ছাড়া অন্যান্য চরিত্রের মুখে সংস্কৃত সংলাপ বসাতেও সেকালের নাট্যকারেরা নারাজ ছিলেন! সাধারণ মানুষের মুখে বসাতে হবে প্রাকৃত সংলাপ আর শীলিত, বিদগ্ধ, অভিজাতরাই একমাত্র কথা বলবেন সংস্কৃতে—এইটেই ছিল তখনকার নাট্যসংলাপ রীতি। প্রথম সারির সমস্ত

সংস্কৃত কবি, নাট্যকারেরা ছিলেন রাজসম্মানিত—এও তো আমাদের জানাই। তাই সংস্কৃত সাহিত্যর প্রায় সবটুকুই আসলে রাজসভার সাহিত্য। আর সে সাহিত্যের ঐশ্বর্যের মতো সীমাবদ্ধতাও আমাদের অজ্ঞাত নয়। রাজসভার সাহিত্যের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে জর্মন সাহিত্যতাত্ত্বিক Levin L. Schucking 'The Sociology of Literary Taste' গ্রন্থের দ্বিতীয় অধ্যায়ে তো লিখছেনই—'The history of literture is in large part the history of the beneficence of individual princes and aristocrats...In the middle ages much of the principal art kept entirely within the general outlook of the breadgiver....The world is seen through the spectacles of the feudal lords.'[৮]

পূবে বা পশ্চিমে মধ্যযুগের সাহিত্যের ইতিহাস আসলে রাজতন্ত্র অনুশাসিত। তাহলে ঐ রাজারাজড়ারা যা চাইবেন, সরবরাহ করতে হবে ঠিক তেমনটাই! স্বভাবতই রাজপুরুষদের মনোরঞ্জক, তাঁদেরই সগোত্রের কৃতী-সম্ভ্রান্ত-বিদগ্ধ-তেজস্বী মূর্তিই ফিরে আসে বারবার নায়ক হয়ে। মনে প্রশ্ন জাগতেই পারে, ধৃষ্ট, শঠ, অধম মানুষ সবযুগের মতো সেই সময়েও সমাজে ছিলই। তারা কি তবে কবি-নাট্যকারের দৃষ্টি এড়িয়ে যেত?—রাজকার্যের জটিল আবর্ত আর যুদ্ধ বাধলে রক্তক্ষয়ী অস্ত্রের ঝনাৎকারের অবকাশে কাব্যচর্চার সুযোগ যদি বা মেলে, কোন্ রাজপুরুষ বা তখন ধৃষ্ট, শঠ কিংবা পরম দুঃখীর কথা শুনে সময়ের অপচয় করবেন? বরং রাজসিক গুণসমন্বিত চেনাজানা সুমহান ব্যক্তিত্বের কথাই শোনা যাক না! একদিকে রাজা আর রাজসভার চাহিদা, অন্যদিকে সমাজবাস্তব—এ দুয়ের মধ্যে সংস্কৃত কবি-নাট্যকারেরা আপোস করলেন খানিকটা এভাবেই। ধৃষ্ট শঠ-মধ্যম-অধমেরা চাহিদা আর অভিজ্ঞতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এল পার্শ্বচরিত্র হয়ে। গহন জটিল আবর্ত সৃষ্টির মধ্য দিয়ে কাহিনিকে করে তুলল আকর্ষক। তাই বলে নায়ক বা কাহিনির অঙ্গীরসের আলম্বন নয় তারা কোনোভাবেই।

মোটকথা, খল-শঠ কিংবা অনভিজাতকে নায়কের উচ্চাসন দেওয়ার ব্যাপারে সংস্কৃত সাহিত্য বরাবর রীতিমত সংস্কারবদ্ধ। প্রশ্ন জাগে নাকি, সুবিপুল সংস্কৃত সাহিত্যে কেন দরিদ্র নায়ক মেলা ভার?—চারুদত্ত! তিনি গরীব বটে কিন্তু মনের দারিদ্র্য নেই তাঁর এতটুকুও। আর অনভিজাত বলার তো উপায়ই নেই। পাঠক এবং শ্রোতা অভিজাত নাগরিক বলেই সংস্কৃত সাহিত্যসম্ভারে কোনো গ্রাম্য নায়ক নেই। মোটকথা, কোনোভাবে সংস্কৃত সাহিত্য উচ্চ এবং নিম্নকোটির মানুষের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করতে পারেনি। তাই সংস্কৃত সাহিত্যও চিরকালই সামগ্রিক জীবনচিত্র বিচ্ছিন্ন মার্জিত নাগরিক সাহিত্য হয়ে থেকেছে। নাগরিক আড়ম্বর, নাগরিক বৈদগ্ধ্য, নাগরিক প্রণয়কলা, বিলাস-ব্যসন আর নাগরিক অস্ত্রশস্ত্রের

ঝনাৎকার। শুসকিংএর পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থের ভাষাতেই বলা যায়, 'There is no feeling for the little man and no respect for physical labour'.[৯] এভাবেই মধ্যযুগের সাহিত্য পূর্বে-পশ্চিমে খুঁজে নিয়েছে তার নিজস্ব রূপ।

৪

বলাইবাহুল্য, কবি বা নাট্যকারের মতো সেকালে পশ্চিমী বা ভারতীয় কাব্যতাত্ত্বিকেরাও ছিলেন ষোলো আনা নাগরিক। যেমন, বঙ্গে সবচেয়ে সমাদৃত আলঙ্কারিক বিশ্বনাথ কবিরাজ ছিলেন উড়িষ্যার রাজা গজপতি ভানুদেবের সভারত্ন। তাঁর নায়ক পরিকল্পনা স্বাভাবিক ভাবেই রাজসভা-নিয়ন্ত্রিত। একা বিশ্বনাথ নন্—সংস্কৃত কাব্যতত্ত্ব এবং সাহিত্যের এটাই ঐতিহ্য ছিল। আভিজাত্য, বৈদগ্ধ্য, পরিশীলন যেখানে নায়কচেতনার ভিত্তি, সাধারণ বা অনভিজাত সেখানে ব্রাত্য। 'নায়কোচিত নায়ক' ছাড়া ধ্রুপদী সাহিত্যে কারুরই তাই ছাড়পত্র মেলেনি।

আর ঐ নায়ক হিসেবে উপেক্ষিত, সেইসব সাধারণ বা প্রান্তিক মানুষের মুখচল্‌তি প্রাকৃত ভাষার ঐতিহ্যে পাওয়া লোকায়ত ভাষাধারায়? মাগধী অপভ্রংশ ছেড়ে নব্যভারতীয় আর্যভাষার স্তরে জন্ম নিল যখন আমাদের এই বাংলাভাষা, সেই প্রথম প্রহরে মুখর হয়ে উঠেছিলেন কবিরা গীতিকবিতার সুরে—চর্যাগানে। আঞ্চলিক লোকায়ত সেই ভাষার প্রশ্রয়ে—লৌকিক ধর্মতত্ত্ব প্রকাশিত হল আর চলে এল একে একে এতাবৎ কাব্যে উপেক্ষিত, উচ্চবর্ণের কাছে অস্পৃশ্য অশুচি বলে ঘৃণিত অন্ত্যজ শ্রেণীর মুখচ্ছবি। অবশ্য সে ছিল খণ্ডকবিতা। প্রথম আখ্যান কাব্য লেখা হল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকের সীমানায়—'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'। দেবদেবীর প্রসঙ্গ আর গোলক-বৃন্দাবনের উল্লেখ থাকলেও গোপসমাজের মুখচল্‌তি গালগল্প অবলম্বনে লেখা এই নাট্‌গীতি, ভেঙে চুরমার করে দিল প্রথাবদ্ধ নায়কের মূর্তি।

বড়ুর কাব্যে নায়ক শ্রীকৃষ্ণ, নায়িকা শ্রীরাধা। কিন্তু এ কেমন নায়ক? মধ্যে মধ্যে সে নায়ক দেবত্ব ঘোষণা করে বলে বটে 'অহোনিশি যোগ ধেয়াই' কিংবা 'ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ' কিংবা 'এ তিন ভুবন রাধা মোর মহাদানে'—কিন্তু যাপনে সে কৃষ্ণ ষোলো-আনা লম্পট গ্রাম্য নাগর। যেমন তার অশালীন ভাষা, তেমনি অনিভজাত তার কামনার প্রকাশভঙ্গি। অমার্জিত গ্রাম্য সেই গোপযুবকের অশোভন, অনিয়ন্ত্রিত দৈহিকতা আর কামোন্মত্তার নিদর্শন ছড়িয়ে রয়েছে কাব্য জুড়ে। রাধা যে গ্রামসম্পর্কে কৃষ্ণের মামিমা, একথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে প্রত্যাখ্যান করলেও নাছোড়বান্দা সেই নাগর-নায়ক বলে কিনা—

'মদনবাণে চিত্ত বেআকুল।
কিবা ঘোসসি মামী মামী'!

মনে পড়বেই 'বৈষ্ণব পদাবলী' গ্রন্থে কালিদাস রায়ের সেই প্রবাদপ্রতিম মন্তব্য—'এ তো সে গোবিন্দ নয়, এ যে গোঁয়ার গোবিন্দ!'—কোথায় গেল ভরত কিংবা বিশ্বনাথের সুমহান সেই নায়ক পরিকল্পনার বিধিবদ্ধতা?—এ যে প্রাচীন ও মধ্যযুগের অভ্যস্ততায় পাওয়া 'ধীরোদ্ধতঃ' 'ধীরললিত' ইত্যাদি ইত্যাদি নায়ক-প্রকল্পকে সরাসরি অস্বীকার এবং প্রত্যাখ্যান! আর সেটাও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের উৎসমুখেই! এই বড়ুর কৃষ্ণই পারে অনাগ্রহী প্রেমিকাকে আয়ত্তে আনার জন্য নৌকা, ভার, কিংবা ছত্রখণ্ডে অমার্জিত যে কোনো ছলাকলার আশ্রয় নিতে। শুধু আচরণ নয়—প্রসাধনেও এই নায়ক গ্রাম্য গোপকিশোর। হাতে তার বাঁশি আবার লগুড়ও। একমাথা চুল আর পায়ে এককালে বাংলায় প্রচলিত মগর খাড়ু। অর্থাৎ কিনা সম্পূর্ণ রাখালবেশ। এ গ্রাম্য নাগরনায়ক যে অভিজাত নাগরিক নায়ক পরিকল্পনার ঐতিহ্যে মূর্তিমান বিদ্রোহ!

বুঝতে বাকি থাকে না, সাহিত্যের অধিকাংশ সূত্রের মতো বিশ্বনাথ কিংবা ভরতের নায়কতত্ত্ব কোনো দেশ-কাল অনালিঙ্গিত সত্য নয়। নইলে মাত্রই শ'আড়াই বছরের ব্যবধানে জয়দেবের প্রত্যক্ষ প্রেরণায় মোটামুটি একই আখ্যান অবলম্বনে লেখা নাট্‌গীতিতে নায়ক প্রকল্প এতটাই বদলে যায় কেমন করে? আসলে জয়দেবের কাব্যের মতো এ যে রাজসভার মনোরঞ্জনের জন্য—'bread giver' এবং 'aristocrats' দের জন্য লেখা কোনো কাব্য নয়। গোপসমাজের প্রচলিত গালগল্প অবলম্বনে সাধারণ মানুষের জন্য লেখা। আর গ্রামীণ বা শহুরে—যে কোনো মানুষই চায় তার চেনাজানা পরিসর, আচরণের প্রতিফলন কাব্যকবিতায় আস্বাদ করতে। আসলে ভাষা এবং শ্রোতা যে কাহিনিপরিকল্পনা এবং চরিত্র চিত্রণের অমোঘ নিয়ন্তা, জয়দেবের ধীরললিত নাগরিক প্রসাধনকলা শোভিত শ্রীকৃষ্ণের, বড়ুর কাব্যে অনভিজাত গ্রাম্যতায় রূপান্তরের মধ্যে রয়েছে তারই অভ্রান্ত নিদর্শন।

আর কালকেতু?—এমন এক লোকপ্রিয় আখ্যান কাব্যের নায়ক কিনা কিরাতনন্দন? এমনই দারিদ্র্য তার, বুনো ফলে আর জলে পেট ভরাতে হয়। 'বিষম উদরের জ্বালা' মেটাতে গোসাপ ভক্ষণের কথাও ভাবতে হয়। এ কেমন নায়ক, খিদের জ্বালায় যে কিনা 'ধড়ার আঁচলে পোছে নয়ানের নীর?' না ত্যাগী, না কৃতী, না কুলীন, না সুশ্রী—বিদগ্ধ, শীলবান তো নয়ই। সংস্কৃত সাহিত্য ভাবতে পারত, কিংবা পশ্চিমী সাহিত্য—কোনো ব্যাধ হবে কাহিনির নায়ক? চণ্ডীর কৃপায় শেষে যতই রাজা হোক্ না কেন, আদতে কালকেতু অনভিজাত, অর্ধভুক্ত, প্রান্তিক ব্যাধ—নায়ক হিসেবে গোত্রছাড়া। শয়ন-ভোজন তার অতি কদর্য—'শয়ন কুচ্ছিত বীরের ভোজন বিটকাল।' কী ভাবে খায় সে?—

'মুচড়িয়া গোঁফ দুটি বান্ধে নিঞাঁ ঘাড়ে।
এক শ্বাসে তিন হাণ্ডি আমানি উজাড়ে।।"

এমন মূর্তিমান নায়কের আঘাতে সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্র নির্দেশিত নায়ক ভাবকল্প ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়।

মোটকথা মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের নায়ক, উত্তরাপথে প্রচলিত নায়কমূর্তির সরাসরি বিরোধিতা করছে। আসলে ফারাক ভাষাগত এবং দেশকালগত। সে ছিল মহৎ গম্ভীর রাজসিক সংস্কৃত ভাষা আর এ হল লোকায়ত মুখ চল্‌তি ভাষা। সে ছিল ভারতের ইতিহাসের গৌরবময় অধ্যায়, স্বর্ণযুগ—আর এ হল বৈদেশিক শাসনে আক্রমণে জর্জর অবক্ষয় পীড়িত বঙ্গভূমি। তাই এ হেন বঙ্গের নায়কও সংস্কৃত সাহিত্যের নায়কের আদলে গড়া সুমহান বা শিষ্ট নয়। বরং সাহিত্যশাস্ত্র বিরোধী নায়ক।

৫

আসলে বাঙালি স্বভাবে ব্রাত্য। আমরা জানি বটে গুপ্তযুগ থেকে এ বঙ্গে আর্যভিগমনের সূচনা, তেমনি এও জানি, উত্তরাপথের সভ্যতা, সংস্কৃতিকে না গ্রহণের দিকটাও ছিল অত্যন্ত সক্রিয়। অর্থাৎ আর্যভারতের সাহিত্য শিল্পকলা শাস্ত্র ধর্মের বিরোধিতার ইতিহাস ছিল বাঙালির রক্তেই। হয়তো তাই-ই আর্যাবর্তের জনপ্রিয় আলঙ্কারিকদের সরিয়ে দিয়ে বাঙালি বেছে নিয়েছিল উড়িষ্যাবাসী কবি তাত্ত্বিক বিশ্বনাথ কবিরাজকে। যে 'সাহিত্যদর্পণ' আর্যাবর্তের আলঙ্কারিকদের কাছে ছিল মোটের ওপর নিন্দিত, বাংলায় সেটাই সবচেয়ে সমাদৃত। আর নবদ্বীপও প্রাচী ভারতের তত্ত্ব আলোচনার যত বড় কেন্দ্রই হোক্ না কেন, বাংলা সাহিত্যের শ্রীক্ষেত্রে চিরকালই তাত্ত্বিক বাঙালির চেয়ে স্বাধীন স্রষ্টা বাঙালির কদর বা প্রাধান্য ছিল বেশি। তাই-ই হয়তো সাহিত্যের তাত্ত্বিক নিগড়কে সরাসরি অস্বীকার করে বাংলাসাহিত্যের চালচিত্রে অনায়াসে চলে আসে গ্রাম্য নাগর নায়ক কৃষ্ণ কিংবা ব্যাধ কালকেতু। আর বাংলা লিখিত গদ্যের উৎসমুখেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। প্রচলিত নায়ক প্রকল্পের বিরুদ্ধতার দীপ্তি। ভবানীচরণের 'নববাবু' কিংবা প্যারীচাঁদের 'আলালের ঘরে দুলাল'টির দিকে তাকিয়ে অন্তত সেটাই মনে হয়। উত্তরাপথের তত্ত্বের নিরিখে দুজনেই অশাস্ত্রীয় বা শাস্ত্রবিরোধী নায়ক।

অবশ্য শুধু আর্যাবর্তের নায়ক প্রকল্পই বা কেন, আমরা গোড়াতেই তো বলেছি, পশ্চিমী আলঙ্কারিদের নায়ক পরিকল্পনা নিয়ে নানা নিষেধাজ্ঞা ছিল বরাবর। আর ইংরেজি সাহিত্যের ক্ষেত্রে সেই নির্দেশের অনুসৃতি চলে এসেছে মোটামুটি বিগত শতকের দ্বিতীয় দশক পর্যন্ত। মোটকথা প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। ততদিন 'hero' মানেই, অভিধানে কিংবা সাহিত্যতত্ত্বে, 'larger than life'—মস্ত কেউ। হয় 'Gothic hero'—নয় 'Romantic hero'। যেমনটাই হোক না কেন, অভিজাত

সেই নায়কের সম্মোহক গুণ চাই-ই। বিশ্বযুদ্ধ চুরমার করে দিল দীর্ঘদিনের সেই সশ্রদ্ধ নায়ক পরিকল্পনা। ভার্জিনিয়া উল্‌ফ বলেছিলেন, ১৯১০-এ মানবচরিত্র বদলে গেল—'On or about December 1910 human nature changed...All human relations shifted'.[১০] আর ১৯২৩ সালে প্রকাশিত 'Kangaroo' উপন্যাসে D. H. Lawrence আরো স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করলেন যুদ্ধের মুখোমুখি দাঁড়ানো পৃথিবীর বদলে যাওয়া যাপন, মানসিকতা। পরিবর্তিত মূল্যবোধ। উপন্যাসের ভাষায়—'It was in 1915, the old world ended. In the winter 1915-16, the spirit of London collapsed, the city...became a vortex of broken passions, lusts hopes and fears'.[১১]

ভাঙা আশা, অবিশ্বাস, ভগ্নছিন্ন মূল্যবোধের দীর্ঘশ্বাস। আর এই নষ্ট ভ্রষ্ট সময়ে সব ভাঙনের মধ্যে দিয়েই জনি ক্যালডারের ভাষায়—

'The idea of hero changed. Because the hero as an embodiment of accepted values could no longer exist. War was everywhere....the old values had been shattred. Precisely, the standards that Victorian heroes embodied and represented, seemed to be destroyed'.[১২]

শুধু তো ভিক্টোরিয়ান নায়ক নয়—গ্রীকো-রোমান ঐতিহ্য থেকেই নায়ক মানেই 'যস্মিন জীবতি বহবো জীবন্তি' গোছের সুমহান ব্যক্তিত্ব। পূবে-পশ্চিমে সব ছবি সেই একই। পশ্চিমী তাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিকেরা স্পষ্টই জানাচ্ছেন, বিশ্বযুদ্ধই প্রথম বেপথু করেছিল সেই মূর্তিখানি।

তার পাশাপশি প্রাচ্য সাহিত্যতত্ত্বের নায়কোচিত নায়কের সব নির্দেশিকাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মধ্যযুগেই বড়ুর গ্রাম্যনায়ক কিংবা কবিকঙ্কণের কালকেতুর বিচিত্র পরিকল্পনা! এমনকি নবজাগ্রত, ঔপনিবেশিক বরদানে স্নাত বাঙালি, উনিশ শতকে যখন কথার ভুবনে প্রথম পা রাখল, তখনো লেখায় এল নববাবু কিংবা আলালের ঘরের দুলালের মতো নায়ক। নায়ক প্রকল্পের ধারায় মূর্তিমান অপনায়ক। শুধু তাই-নয়, ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'কল্পতরু' উপন্যাসের নায়ক নরেন্দ্র (১৮৭৩) কিংবা যোগেন্দ্রনাথ বসুর ১৮৮৫ তে প্রকাশিত 'চিনিবাস চরিতামৃতের' চিনিবাস। এমনি আরো। কোনো আলঙ্কারিক অনুশাসন নয়। বাংলা কথাসাহিত্য তার প্রথম প্রহরে অঙ্গীকার করে নিল শুধুমাত্র সমাজসত্য। হঠাৎ ব্যবসায় গেঁজিয়ে ওঠা 'গুলজারানারের'র নানা মুখ চলে আসছে নক্‌সা বা নভেলের কেন্দ্রীয় চরিত্র হয়ে। সেই মুখ, যার প্রসঙ্গে শিবনাথ শাস্ত্রী, লিখলেন, 'মুখে ভ্রূপার্শ্বে ও নেত্রকোলে সে অত্যাচারের চিহ্নস্বরূপ কালিমারেখা, শিরে তরঙ্গায়িত বাউরি চুল, দাঁতে

মিশি, পরিধানে ফিন্‌ফিনে কালাপেড়ে ধুতি, অঙ্গে উৎকৃষ্ট মসলিন...' ইত্যাদি ইত্যাদি বিচিত্র প্রসাধন। 'রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করে কাটানোতেই এই মূর্তিমান অবতারেরা' দিব্যসুখ লাভ করত।[১৩]

গোড়ার দিকে ঐ নববাবু কিংবা আলালের দুলাল মতিলালেরা ছিলেন সেকেলে কলকাতার প্রামাণ্য প্রতিনিধি। আর পরে নরেন্দ্র, চিনিবাস কিংবা চন্দ্রনাথ বসুর 'পশুপতি সম্বাদের' (১৮৮৪) পশুপতিদের সঙ্গে আবার জড়িয়ে গিয়েছিল, উনিশ শতকের ধর্মীয় সংঘাতের আরেক সমাজবাস্তব। ঐ শতকের বড় একটা অংশজুড়ে ছিল হিন্দু আর ব্রাহ্মদের বিরোধ-বিতর্কের ইতিহাস। ব্রাহ্মধর্মের বিরুদ্ধে ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো একদল রক্ষণশীল ঔপন্যাসিক সেকালে কলম ধরলেন। আর সেই একমুখী ধর্মীয় আক্রমণের সূত্রে আমরা দেখা পেলাম বেশ কয়েকজন শাস্ত্রবিরোধী নায়কের। হিন্দু শিবিরের এই যোদ্ধা কথাকারেরা, কাহিনির কেন্দ্রে রাখছেন কোনো এক অত্যাধুনিক ব্রাহ্ম যুবককে। উদ্দেশ্যই যেখানে ব্রাহ্মধর্মের স্খলন-পতন, ত্রুটি-বিচ্যুতি প্রদর্শন, সেখানে ঐ কেন্দ্রীয় নরেন্দ্র, চিনিবাস, পশুপতিদের অপনায়ক বা শাস্ত্রবিরোধী নায়ক যে হতেই হবে!

সকলেই এরা মূর্তিমান অপনায়ক—তা সে কেউ লেখকের সহানুভূতি সিঞ্চিত হোক্ বা না-ই হোক্। লেখকের শোধনবাদী মনের ছোঁয়ায় কোনো কোনো সাহিত্যশাস্ত্র বিরোধী নায়ক আবার মতিলালের মতো আমূল পরিবর্তিত। আসলে সমাজচিত্রণ আর সমাজ হিতৈষণার টানাপোড়েন রূপায়িত ঐ শাস্ত্রবিরোধী নায়কের ভাঙা-গড়া, বিকৃতি-শুদ্ধির মন্থনের সূত্রেই কালক্রমে বাংলার অলঙ্কারশাস্ত্র নির্ধারিত শ্রেয়োনৈতিক নায়কের আবির্ভাব। মোটকথা পশ্চিমে 'Death of Hero'র লগ্ন বলে চিহ্নিত হয় যদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর বিপন্নতার বেপথু সময়, বাংলা সাহিত্যে তাহলে অপনায়ককে নায়কের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে কবে কোন্ কালে! সেই মধ্যযুগ থেকে। অ্যারিস্টটল কথিত, ভারতীয় অলঙ্কারশাস্ত্র নির্ধারিত সুমহান নায়ক প্রকল্পের মৃত্যু ঘটিয়েই বাংলা সাহিত্যের পথচলা। মধ্যযুগে কিংবা উনিশ শতকের উৎসমুখে। শাস্ত্রের নিগড় ভেঙে সমাজবাস্তবকে মান্যতা দেওয়ার মধ্য দিয়েই বাঙালির নায়ক-অনুসন্ধান।

উল্লেখপঞ্জি :

১। প্রচলিত ধর্মসংগীত, 'Thine Be the Glory, রচয়িতা Edmond Budry, ১৭৪৭, অনুবাদক Richard Hoyle, ১৯২৩। তথ্যসূত্র : https://lyrics.on.net

২। 'A Pslam of Life', H. W. Longfelow, Bendiction Classics, 2011, pg.-136.

৩। 'The New Oxford Illustrated Dictionary', Vol.-I, Bay Books is

association with Oxford University Press, 1981, pg.-788.

৪। 'Webster's Third New International Dictionary, Vol-II, 1981, pg.-1060.

৫। 'Heroes : From Byron to Guevara', Janni Calder, Hamish Hamilton, 1977, Introduction.

৬। 'Aristotle on the Art of Poetry', Ingram Bywater, Oxford University Press, Delhi, 1992, pg.-55-57

৭। 'Heroes' : From Byron to Guevara', Jenni Calder, Hamish Hamilton, 1977, Introduction.

৮। 'The Sociology of Literary Taste', L. L. Schucking, translated by Ernest Walter Dickes, Trubner & Company, 1957, pg.-52.

৯। ", pg.-56.

১০। 'Mr. Benett and Mrs. Brown', Virginia wolf, Norwood Editions, 1978, pg.-7.

১১। 'Kangaroo'. D. H.Lawrence, Penguine,1950, pg.-33.

১২। 'Heroes : From Byron to Guevara', Jenni Calder, Hamish Hamilton, 1977, pg.-38.

১৩। 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ', শিবনাথ শাস্ত্রী, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮৩, পৃষ্ঠা : ৫৮।

সহায়ক গ্রন্থ :

১. 'নাটকলক্ষণরত্নকোষ', সাগরনন্দী, বঙ্গানুবাদ টিপ্পনী : শ্রী সিদ্ধেশ্বর চট্টোপাধ্যায়, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার।

২. 'সাহিত্যদর্পণ' : শ্রীরামচরণ তর্কবাগীশ-কৃত টীকা সহ, অনুবাদ ও সম্পাদন অধ্যাপক ড: বিমলকান্তি মুখোপাধ্যায়, পুস্তক প্রকাশনা।

ই-বুক : ভারত নাট্যশাস্ত্র, সম্পাদনা ড. সুরেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, granthagar.com

লেখক পরিচিতি :

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

দুটি বই, একটি বিতর্ক এবং প্রাসঙ্গিক কিছু ভাবনা

সুমনা দাস সুর

সারসংক্ষেপ :

বিগত শতকের আটের দশকে প্রকাশিত হয়েছিল রবীন্দ্রনাথ এবং ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোকে নিয়ে কেতকী কুশারী ডাইসনের দুটি বই। প্রকাশ মাত্রই সমালেচনার ঝড় উঠেছিল, কারণ এই দুজন বিখ্যাত, আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন মানুষের সম্পর্ককে লেখিকা তাঁদের চিঠিপত্র, ডায়রি, আত্মজীবনী আলোয় নতুন ভাবে দেখতে চেয়েছেন। যাতে একভাবে হয়তো তাঁদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হয়েছিল বলে মনে করেছিলেন অনেকে। আপত্তি ছিল কেতকীর মিশ্র জঁরের বাংলা বইটি নিয়েও। কারণ সেখানে গবেষণার সঙ্গে বেণীর মতো গাঁথা হয়েছে এক অভিবাসী নারীজীবনের নানা দ্বন্দ্ব সংঘাত ও জটিলতাকে। সমালোচনাগুলির অন্যতম গৌরী আইয়ুবের লেখা দুটি গ্রন্থসমালোচনা। যার জবাবও দিয়েছিলেন কেতকী। দুটি বই, তার সমালোচনা, উত্তর প্রত্যুত্তর মিলিয়ে নারী পুরুষসম্পর্ক, সতীত্ব, ব্যক্তিস্বাধীনতা, সর্বজনমান্য কোনো ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বের জীবনের ব্যক্তিগত পরিসরে প্রবেশের অধিকার, অনধিকার ইত্যাদি বেশ কিছু জরুরি প্রশ্ন উঠে এসেছে যা তিন দশক পেরিয়ে এসেও প্রাসঙ্গিক।

মূল শব্দ : রবীন্দ্রনাথ, ভিক্তোরিয়া ওকাম্পো, নারী স্বাধীনতা, প্রেম, সতীত্ব।

আজ থেকে প্রায় দশক তিনেক আগে, ১৯৯১-৯২ সালে ‘চতুরঙ্গ’ পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল দুটির গ্রন্থসমালোচনা, লেখকের প্রত্যুত্তর এবং তার পরিপ্রেক্ষিতে সমালোচকের পালটা জবাব। কোনো সাহিত্য পত্রিকার ক্ষেত্রে বিষয়টি নতুন কিছু নয়। কিন্তু এত বছর পরে সেগুলিকে ফিরে দেখার কারণ প্রধানত তিনটি। প্রথমত, যে দুটি বইয়ের সূত্রে এই সমালোচনা এবং লিখন মাধ্যমিক তর্কবিতর্কের সূত্রপাত, তাদের কেন্দ্রীয় বিষয় রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সম্পর্ক,যার সূত্রপাত ১৯২৪ সালে এবং ১৯৩০-এ তাঁদের শেষ সাক্ষাতের পরেও যা স্থায়ী হয়েছিল ১৯৪১ এ রবীন্দ্রনাথের এবং ১৯৭৯ তে ভিক্তোরিয়ার মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের স্মৃতিতে, যার প্রমাণ রয়েছে রবীন্দ্রনাথের জীবনের শেষ পর্যায়ের কবিতায়, ছবিতে, ভিক্তোরিয়ার মৃত্যুর পরে প্রকাশিত আত্মজীবনী পাতায় এবং যে সম্পর্কের প্রকৃতি নিয়ে বঙ্গদেশে এবং আর্জেন্টিনায় মানুষের কৌতূহল আজও জাগ্রত। দ্বিতীয়ত, রবীন্দ্রনাথ এবং ভিক্তোরিয়া সম্পর্কিত বই দুটির লেখক অভিবাসী সাহিত্যিক তথা গবেষক কেতকী কুশারী ডাইসন।

প্রথম বইটি বাংলায় লেখা, মিশ্র আঙ্গিকের উপন্যাস *রবীন্দ্রনাথ* ও *ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে*, যেখানে তিনি একটি আধুনিক নারীর জীবনের নানা ঘাত প্রতিঘাতের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার সম্পর্কের আলো আঁধারিকে বেণীর মতো করে বেঁধেছেন। দ্বিতীয় বইটি ইংরেজিতে, যেটি শুরু হয়েছিল বিশ্বভারতীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার চিঠিপত্র সম্পাদনার কাজ দিয়ে। শেষ পর্যন্ত এটি একটি পূর্ণাঙ্গ গবেষণাপত্রের রূপ নেয়, গ্রন্থাকারে যার নাম *In Your Bossoming Flower Gurden*। রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়াকে নিয়ে কেতকী কাজ শুরু করেছিলেন ১৯৮০-৮১ সাল নাগাদ, বাংলা বইটি প্রকাশিত হয় ১৯৮৫-তে, ইংরেজিটি ১৯৮৮ তে প্রকাশের পর বিস্তর চর্চা, আলোচনা, সমালোচনা হয় বইদুটি নিয়ে। প্রশংসা, নিন্দা দুইই হয়, বাংলা বইটির জন্য 'আনন্দ পুরস্কার'লাভ করেন কেতকী, তারপর বছর কয়েক বাদে যখন সেই প্রাবাল্য কিছুটা থিতিয়ে এসেছ তখন 'চতুরঙ্গে'র পরপর দুটি সংখ্যায় প্রকাশিত গৌরী আইয়ুবের দীর্ঘ দুটি সমালোচনা স্তিমিত বিতর্ককে উস্‌কে দেয় নতুন করে। বলাবাহুল্য গৌরী আইয়ুবের বক্তব্যকে প্রশংসাসূচক বলা চলে না, তাঁর ভাষাও যথেষ্ট তীব্র, বইদুটির প্রতি তাঁর অপছন্দ ও আপত্তিকে যথাসম্ভব স্পষ্ট ভাষাতেই ব্যক্ত করেছেন তিনি। কেতকী এর জবাব দেন 'চতুরঙ্গ'র সম্পাদককে চিঠি লিখে, ততোধিক শাণিত ভাষায়, গৌরীর বক্তব্যগুলিকে পয়েন্ট বাই পয়েন্ট ধরে। সেই জবাবের পাল্টা জবাবও দেন গৌরী, সেটিও ছাপা হয় 'চতুরঙ্গে'। কিন্তু তারপরই হঠাৎ থেমে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন দুজনেই। যেন উপলব্ধি করেন তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কেবল কিছু বক্তব্যে নয়, পার্থক্যটা জীবনবোধের, দৃষ্টিভঙ্গির। যেন উদ্যত তলোয়ার নামিয়ে সরে আসেন দুজনেই, মসীযুদ্ধ তাঁদের কোথাও পৌঁছে দেবে না একথা বুঝতে পেরে। আমাদের এই আলোচনার সূত্রপাতের তৃতীয় কারণটি এখানেই। কেতকী কুশারী ডাইসন এবং গৌরী আইয়ুব দুজনেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে স্বনামধন্য। বিশেষত, তাঁদের আমরা জানি সংস্কার ও প্রথাভাঙা মুক্তচিন্তক হিসেবে। সমবয়সী না হলেও সমপ্রজন্মের বলা যেতে পারে তাঁদের, গৌরীর জন্ম ১৯৩১ সালে, কেতকীর ১৯৪০—সুতরাং প্রজন্মের ব্যবধানে দৃষ্টিভঙ্গির হেরফেরের প্রশ্নও এক্ষেত্রে ওঠে না। তবে কী তাঁদের এমন ক্রুদ্ধ, বিরক্ত করে তুললো! কোন্ বিরোধের পাথরে পাথরে ঘর্ষণে ছিটকে উঠলো এমন বিতর্কের স্ফুলিঙ্গ? কুড়ি বছর পরে সেটাই আমরা ফিরে দেখতে চাইবো, নিভে যাওয়া আঁচের তলায় অঙ্গারের উৎস সন্ধানে, হয়তো তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির ভিন্নতা, আধুনিকতার প্রশ্নে মাত্রাগত স্বাতন্ত্র, নতুন কোনো দিকনির্দেশ দিতে পারে আমাদের।

এই ভাবনা যখন মাথায় আসে তখন এঁদের দুজনের বিভিন্ন লেখাপত্রের

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা আশ্চর্য বিষয় চোখে পড়ে। অমিল নয়, বরং বেশ কিছু মিল আছে তাঁদের চিন্তাভাবনায়। নানা সময়ে এঁরা যেসব বিষয় নিয়ে লেখালিখি করেছেন, সামাজিক বিভিন্ন ঘটনায় যে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, দেশকালের পরিবর্তন সম্পর্কে, বিশেষত মেয়েদের অবস্থা সম্পর্কে এঁদের যে মনোভঙ্গি, তাতে কিন্তু অনেক সাদৃশ্য নজরে আসে, তাঁদের চিন্তার অনেকগুলি সাধারণ পরিসর রয়েছে বোঝা যায়। যেমন, তাঁরা দুইজনেই মনে করেন গর্ভনিরোধের ব্যবহার মেয়েদের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে, এ নিয়ে সুচিন্তিত প্রবন্ধও লিখেছেন তাঁরা ('জন্মশাসন ও স্ত্রী স্বাধীনতা' গৌরী আইয়ুবের লেখা এবং 'গর্ভনিরোধ: একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা' কেতকীর লেখা)। মেয়েদের, বিশেষত বাঙালি মেয়েদের জীবনের বিবর্তন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যাওয়া মুখচ্ছবির দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়েছেন, সামাজিক-অর্থনৈতিক-ঐতিহাসিক পটভূমিতে তাকে স্থাপন করে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন দুজনেই (গৌরী আইয়ুবের লেখা 'মেয়েরা আজ কতটা অবলা', 'গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা, কেতকী কুশারীর 'একালের বাঙালী মেয়ে: কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিত', 'বাঙালী মেয়ে—যুগান্তরে', 'বাঙালী মেয়ের রূপান্তর')। পড়তে পড়তে কৌতুক বোধ হয় যখন দেখি নীরদ চন্দ্র চৌধুরীর কুখ্যাত 'পুরুষবাদী' মন্তব্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন দুজনেই, কেতকী আপত্তি জানিয়েছেন বাঙালি মেয়েদের পোশাক নিয়ে তাঁর বক্তব্যের বিরুদ্ধে আর গৌরী জানান, চাকুরিরতা মেয়রা তাদের নারীসুলভ কোলমতা হারিয়ে ফেলে, নীরদবাবুর এই বক্তব্য তিনি মোটেই মানতে রাজি নন। আবার ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হয়েও এবং জীবনে ও বাচনে স্বাধীনতাকে মূল্য দিলেও সলমন রুশাদির Satanic Verses-এর ওপর ভারত সরকার যখন নিষেধাজ্ঞা জারি করে, তখন সেই নিষেধকেই নৈতিক সমর্থন জানান উভয়েই। কেন? কারণ তাঁরা দুজনেই মনে করেছেন আগাগোড়া ব্যাঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে লেখা বইটির মধ্যে সৎ সাহিত্যের উপাদান তেমন কিছু নেই, যা আছে তা হল সাহিত্যের চতুরতায় ঢাকা ধর্মীয় উস্কানি, যার পেছনে রয়েছে বিশ্বব্যাপী নব্য উপনিবেশবাদের পরোক্ষ মদত। এই উদাহরণগুলি দেওয়ার কারণ একথাই বোঝাতে যে এঁরা দুজনেই মননশীল, এবং শিবনারায়ণ রায়ের ভাষায় 'বিবেকী', অর্থাৎ, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে নিজস্ব মত প্রকাশের দায়বোধ এড়িয়ে যান না। তাছাড়া আমরা জানি যে তাঁরা দুজনেই মিশ্র বিবাহের দাম্পত্য জীবন কাটিয়েছেন, জাত-ধর্মের বিভেদকে জীবনের বেসিক থেকে বাদ দিয়েছেন বহুকাল আগেই। অপিচ, কেতকী তাঁর পূর্বোক্ত জবাবি প্রবন্ধে জানাচ্ছেন, কলকাতা দূরদর্শন আয়োজিত মিশ্র বিবাহের ওপর একটি আলেচনা সভায় তাঁরা দুজনেই অংশ নিয়েছিলেন।

আমাদের কৌতূহলের বিষয় এটিই যে এতটাই সাদৃশ্য যাঁদের চিন্তা ভাবনা এবং জীবনযাপনে তাঁদের মধ্যে এমন তীব্র বিরোধিতার সৃষ্টি হল কী কারণে!

কেতকীর বইদুটি সম্পর্কে গৌরী নানাবিধ প্রশ্ন তুললেও তাঁর আপত্তি মূলত দুটি জায়গায়। এক, প্রথম বইটি, অর্থাৎ বাংলা বইটিতে গবেষণার সমান্তরালে যে উপন্যসাটি উপস্থাপিত হয়েছে সেই উপন্যাসের বিষয়বস্তু নিয়ে। এবং দুই, ইংরেজি বইটিতে ওকাম্পোর আত্মজীবনীর ফরাসি ভাষায় লেখা খসড়া থেকে উদ্ধার করা অংশবিশেষ এবং তৎসম্পর্কিত বিশ্লেষণ নিয়ে। কেন আপত্তি, তার পেছনে সমালোচকের যুক্তি কী, লেখকই বা কোন প্রতিযুক্তি খাড়া করেছেন, তাতে আপত্তির জবাব মিলল, নাকি মিলল না—এইসব প্রশ্নে যাওয়ার আগে বিষয়বস্তুর ওপর কিঞ্চিৎ আলোকপাত প্রয়োজন।

রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে-এর উপন্যাস অংশের কেন্দ্রে রয়েছে অনামিকা নামে একটি অভিবাসী বাঙালী মেয়ে, যে তার মনোবিজ্ঞানী স্বামী রঞ্জনের সুবাদে ব্রিটেন নিবাসী হলেও তার নিজস্ব একটি ভাবনা এবং কাজের ক্ষেত্র রয়েছে। ধরাবাঁধা কোনো চাকরি সে করে না কিন্তু কঠিন ও শ্রমসাধ্য গবেষণায় আত্মনিয়োগ করে। অনামিকার এই গবেষণাই উপন্যাসের অন্য অংশ। অর্থাৎ, কেতকী দেখান রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া সংক্রান্ত গবেষণাটি অনামিকাই করে—যেটা কোনো বানিয়ে তোলা বস্তু নয়, কেতকী নিজেই এই কাজটি করেছেন, উপন্যাস লেখার সময়েই তা করেছেন—সেই হয়ে ওঠার পর্যায়গুলিই উপন্যাসে ধরানো আছে। এই গবেষণার প্রয়োজনে স্প্যানিশ শেখে অনামিকা, ছেলেবেলায় পড়া ফরাসি কিছুটা ঝালিয়ে নেয় কারণ ভিক্তোরিয়ার অধিকাংশ লেখা ফরাসিতে আর নয়তো স্প্যানিশে; ডেভনশায়ারের ডার্টিংটন হলে যায় প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহে কারণ সেখানে রয়েছে রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়ার বন্ধু, রবীন্দ্রনাথের যাত্রাসহযোগী ও সাম্মানিক সচীব এল্‌ম্‌হার্স্টের জীবনের যাবতীয় তথ্য, চিঠিপত্র, নথি। এর পাশাপাশি চলে অনামিকার ব্যক্তিগত জীবনের প্রবাহ যাতে অনেক ছোট বড়ো ঢেউ ওঠে। শুরুতেই রঞ্জনের আকস্মিক মৃত্যুতে তার জীবন কিছুটা টালমাটাল হলেও সে তা সামলে ওঠে একদিকে দুই কিশোর পুত্রকন্যার মুখ চেয়ে আর অন্যদিকে তার সেফার্দিক ইহুদি বান্ধবী এমিলিয়ার নিরন্তর সহযোগিতায়। এমিলিয়াই তাকে উৎসাহিত করেন গবেষণা চালিয়ে যেতে যেমন, তেমনই চেনা চৌহদ্দির বাইরে নতুন সম্পর্ক তৈরিতে। এইভাবেই অশনির সঙ্গে অনামিকার পুরোনো পরিচয় পুনঃস্থাপিত হয়। জার্মান কেমিস্ট কোম্পানিতে পাবলিক রিলেশনস্‌-এর ভারপ্রাপ্ত, রবীন্দ্রসংগীত এবং বাংলা কবিতার চর্চা করা অশনির সঙ্গে অনামিকার আলাপ ছিল পারিবারিক পরিসরে যেখানে

রঞ্জন এবং অশনির মৃৎশিল্পী ওলনদাজ স্ত্রী এল্‌সও ছিল উপস্থিত। তাদের আলাপের দ্বিতীয় পর্যায়ে রঞ্জনের মৃত্যুসংবাদ এবং অশনির সঙ্গে তার স্ত্রীর সম্পর্কের ভাঙনের খবরে পারস্পরিক সহানুভূতি বিনিময়, সেইসঙ্গে সাহিত্য-শিল্পী-সঙ্গীত প্রভৃতি সাধারণ আগ্রহের ক্ষেত্রগুলি তাদের কাছাকাছি নিয়ে আসে। তারপর ছেলেমেয়েকে এমিলিয়ার জিম্মায় রেখে ডেভনশয়ারে গবেষণার কাজ করতে যায় যখন অনামিকা তখন ঘটনাচক্রে অশনির সঙ্গে তার দেখা হয়। এক সন্ধ্যায় স্প্যানিশ রেস্তোরায় খাওয়া দাওয়া এবং নানা বিষয়ে আলাপ আলোচনার পর অশনি যখন তার সঙ্গে রাত্রিযাপনের প্রস্তাব দেয় তখন অনামিকা আপত্তি করে না। কারণ অশনির নানা বিষয়ে পড়াশোনা এবং বুদ্ধিদীপ্ত কথাবার্তা, বিশেষত, রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া বিষয়ে তার আগ্রহ অনামিকার মনে তার প্রতি আকর্ষণ জাগিয়েছিল ইতিমধ্যেই। কেতকী লেখেন, "অনামিকার বোধ হইল সে সত্যিই স্বাধীন ও আধুনিক নারী কিনা, সহসা তাহার কঠিন পরীক্ষালগ্নে উপস্থিত হইয়াছে। সে তাহার অন্তরের মধ্যে অনুসন্ধান করিয়া পরম্পরাগত কোনো নিষেধের সংকেত খুঁজিয়া পাইল না।"[১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সেই রাত্রির প্রতিটি অনুপুঙ্খের গ্রাফিক বর্ণনা রয়েছে উপন্যাসের ছাব্বিশ ও সাতাশ অধ্যায়ে এবং তা দেওয়া হয়েছে সাধুভাষায়। কেতকী পরে ব্যাখ্যা করেছেন ভাষাটাকে তিনি এনেছেন একটা টেকনিক হিসেবে, লয় বদলের জন্য। অনামিকা আশা করেছিল বন্ধুত্বে-প্রেমে-সাহচর্যে মিলিয়ে তাদের সম্পর্ক হবে দুজন পরিণত নারী পুরুষের সম্পর্ক। সবরকম দায়িত্ব মেটানোর পরেও তাদের পরস্পরের জন্য থাকবে একখণ্ড নিভৃত সান্নিধ্য। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় রাত্রিশেষের পর থেকেই অশনি কিছুটা বেসুরো বাজতে থাকে। ক্রমশ তার অনেক আচরণে বা চিঠিতে লেখা কিছু কথায় মনে মনে ধাক্কা খেলেও অনামিকা ধৈর্য ধরে প্রতীক্ষা করে। এমনকি সম্পর্কটাকে পারিবারিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে অশনির আহ্বানে ছেলে সৌগতকে নিয়ে ব্রাইটনে গিয়ে দেখে কন্যা বাঁশি ছাড়াও অশনির সঙ্গে এসেছে তার নতুন বান্ধবী মারগ্রিট। অশনি একা তারই বন্ধু হবে এমন দাবী অনামিকা কোনোদিনই করেনি, তাছাড়া সে এমন কথা মনে করে না যে পরিণত বয়সের সম্পর্কগুলি ওয়ান অ্যাট এ টাইম-এর হিসেব মেনে গড়ে ওঠে। তাই মারগ্রিটের অস্তিত্ব জেনেও সে অশনির সংঙ্গ সংলাপ চালানোর চেষ্টা করে। কিন্তু অশনির সেই আগ্রহ আর নেই, চিঠিতে সম্পর্কের ইতি টানে।

অশনি এবং অনামিকার পাশাপাশি এমিলিয়ার চরিত্রটিও গুরুত্বপূর্ণ, উপন্যাসের গতিপথকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ না করলেও যার অনেকখানি প্রভাব রয়েছে অনামিকার উপর। এমিলিয়ার জীবন যেন ইতিহসের একটি অধ্যায়ের ওপর থেকে পরদা

তুলে দেয়। তুরস্কের স্পেনীয় সেপার্দিক ইহুদি পরিবারে জন্ম এমিলিয়ার কিন্তু বাল্য থেকেই উচ্ছিন্ন, প্রথমে সপরিবার, তারপর একা। প্রথমে মিশরে, সেখানে থেকে নাৎসী বাহিনীর চোখে ধূলো দিয়ে নানা শহর ঘুরে প্যারিসে। প্রথম যৌবনে এক আরব মুসমলান যুবকের প্রেমে পড়েছিলেন, পরিবার তা মেনে নেয়নি। তাঁর বিয়ে দেওয়া হয় স্বজাতে। কিন্তু এমিলিয়া যখন দ্বিতীয় বার সন্তানসম্ভবা তখন একদিন তার ইহুদি স্বামী প্যারিসের রাস্তা থেকে নিখোঁজ হয়ে যান, জার্মানদের চোখে ধুলো দেওয়ার মতো ফরাসি জ্ঞান তাঁর ছিল না। এমিলিয়া কিন্তু হেরে যান নি, একা লড়াই করে টিকে থেকেছেন, মেয়েদের মানুষ করেছেন। প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে তাঁর জীবনে আসেন ক্রিস্টোফার, ভারত ফেরত এই ইংরেজকে সর্বান্তকরণে ভালোবেসেছিলেন এমিলিয়া, কিন্তু বিবাহিত ক্রিসকে কোনোদিনই একান্ত করে পাওয়া সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষে।

এমিলিয়ার সঙ্গে অনামিকার আলাপ রঞ্জনের সূত্রে। মানসিক ভাঙনের কারণে রঞ্জন ও তার সহকর্মীদের চিকিৎসাধীনে ছিলেন এমিলিয়া। সারা জীবনই তো নিজের দিকে তাকানোর কোনো সুযোগ পাননি, সায়াহ্নবেলায় সেই অবকাশ যখন কিছুটা মেলে তখনই জীবনভোর না পাওয়াগুলি তাঁকে ঠেলে দেয় বিষাদের কুয়োয়। থেরাপি চলাকালীনই রঞ্জন বুঝতে পারে এমিলিয়া একজন অসাধারণ মহিলা, তাঁর মধ্যে রয়েছে সহজাত ভাষাজ্ঞান, শিল্পবোধ, যা সুযোগের অভাবে এবং অবস্থার চাপে অবদমিত থেকে গেছে। রঞ্জন তাই নিজের সাহিত্যপ্রেমী, সংস্কৃতিমনস্ক স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেয় এমিলিয়ার। অনামিককে তার গবেষণার কাজে স্প্যানিশের পাঠোদ্ধার সাহায্য করেন এমিলিয়া আর অনামিকা তার এমিদির মুখে শোনা তাঁর মাতৃভাষা লাদিনোর কিছু গান এবং কবিতা অনুবাদ করে নিজের মাতৃভাষা বাংলায়। হারানো মাতৃভাষার গানগুলি পুনর্জাত হয়ে এমিলিয়াকে যেন নতুন করে ফিরিয়ে দেয় তাঁর আত্মপরিচয়। এমিলিয়ার জীবন যেন আমাদের জানায় মানুষও বুঝি গাছেরই মতো, রিক্ত নিষ্পত্র ডালগুলি দেখে একসময় বোঝার জো থাকে না যে তাতে প্রাণ আছে, কিন্তু সেই ডালই আবার সবুজ পাতায় ভরে যায়, বসন্ত সমাগমে তাতে ফুল আসে, ফল ধরে। এমিলিয়া চান অনামিকা রঞ্জনের বিধবা স্ত্রীর খোলসটা ছেড়ে বেরিয়ে আসুক, জীবনের দান অঞ্জলি পেতে গ্রহণ করুক। কিন্তু অশনির সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে যাওয়ার পরে তিনি খুঁটির মতো দাঁড়ান তার পাশে।

অনামিকার জীবনের অপর একটি অবলম্বন তার গবেষণা। এ তো নিছক একটি অ্যাকাডেমিক কাজ নয়, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে রবীন্দ্রনাথ, ভিক্তোরিয়া ও এল্‌ম্‌হার্স্টটের লেখা কিছু চিঠি, স্মৃতিকথা, ১৯২৪-এর সান ইসিদ্রোতে কাটানো

দিনগুলিতে তিনজনের পরস্পরের উদ্দেশ্য লেখা চিরকুট, হাতচিঠি, রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও গানে রেণু রেণু হয়ে ছড়িয়ে থাকা নানা অনুষঙ্গ, ছবির আলো আঁধারিতে ভেসে ওঠা কোনো আধোচেনা মুখ—একটির সঙ্গে একটি জুড়ে ক্রমশ যেন মানুষী অবয়ব লাভ করে অনামিকার চেতনায়। উপন্যাসের শুরুতেই দেখা যায় ডরিস মায়ার রচিত ভিক্তোরিয়া-জীবনী রিভিউ করে অনামিকা। এই বইটি পড়েই সে এই অসামান্য মহিলার ব্যক্তিত্বের স্বরূপ সম্পর্কে অবহিত হয়, জানতে পারে তিনি কেবল বাঙালির চেনা কবির প্রেরণাদাত্রী 'বিজয়া' ছিলেন না, তাঁর জীবন ও কর্মের ব্যাপকতা ছিল বহুদূর প্রসরিত। অনামিকা দেখে অতি অল্প বয়সে ভিক্তোরিয়া পৌঁছেছিলেন এক পরিণত নারীর অস্মিতায়—"তাঁর যখন মাত্র আঠারো বছর বয়স, তখনই ভিক্তোরিয়া বুঝতে পেরেছিলেন যে কোনো মেয়ের মধ্যে যদি বিদগ্ধ আত্মবিকাশের উচ্চাকাঙ্ক্ষা থাকে, তাহলে তার ঐ উচ্চাকাঙ্ক্ষার সঙ্গে তার প্রেমসম্পৃক্ত ও বিবাহসম্পৃক্ত ব্যক্তিগত জীবনের দ্বন্দ্ব বাঁধতে পারে। যে মেয়ে বিদগ্ধ আত্মবিকাশ খোঁজে তারও তো প্রেমের প্রয়োজন থাকে। কিন্তু প্রেমের দাবি মেটাতে গিয়ে তাকে যদি নিজস্ব অস্মিতাকে বর্জন করতে হয়, তাহলেই তো ঘুচে যায় আত্মবিকাশ।"[২] এর সঙ্গে অনামিকা নিজের অভিজ্ঞতাকে মেলাতে পারে। কেবল তার একার নয়, সাধারণ ভাবে বাঙালি সমাজে একজন শিক্ষিত মেয়ের অবস্থানকেও—"বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজে গত কয়েক দশক ধরে নারীশিক্ষার যতটা প্রসার ঘটেছে, মেয়েদের আত্মপ্রকাশ তথা আত্মবিকাশও সেই অনুপাতে ঘটেছে কি? মনে হয় না অনামিকার। আরও অনেক বেশি ফসল খামারে তোলা উচিত ছিল।...বাঙালী যেখানে ভোগবিলাসী, সেখানে আধুনিক বাঙালি মেয়ের চাকরি-করে আনা বাড়তি আয়টুকু সমাদর পায়; যেখানে সে সৌন্দর্যবিলাসী সেখানে বঙ্গললনার রূপ টিপ-শাড়ি-চুড়ি-চোলির কদর অবধারিত; যেখানে সে ভোজনরসিক, সেখানে মা বোনেদের শ্রীহস্তে প্রস্তুত লুচি, আলুর দাম বা মাছের ঝোল অবশ্যই প্রশংসা পাবে; কিন্তু যেখানে সে 'আঁতলেমি' দ্বারা আক্রান্ত, নিজেকে মনে করে বুদ্ধিবিলাসী, স্বাধীনতার সম্‌ঝদার, সেখানে বাঙালী মেয়ের স্বাধীন আত্মপ্রকাশ ও আত্মবিকাশের অধিকার মোটেও ততটা স্বীকৃতি পায় নি, সেদিকে তার উচ্চাকাঙ্ক্ষা সমানুপাতিক সমর্থন পায় না।...বৈদগ্ধের জগতে সে এখনও বিপজ্জনকভাবে সংখ্যালঘু।"[৩] চিন্তাটা কেতকীরই সন্দেহ নেই কিন্তু অন্য কারও হতেও তো বাধা নেই! অশনির সঙ্গে অনামিকার সম্পর্কে সমস্যাটার শুরুও এখানেই। অশনির রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া বিষয়ে আগ্রহ বা অনামিকার কাজের প্রশংসা যে খানিকটা অগভীর স্তর থেকে করা এবং বাঙালি মেয়ের আর্কেটাইপ তার মনের মধ্যে যে দৃঢ়প্রোথিত, যেখান থেকে সে বেরোতে

পারে না, সম্ভবত বেরোতে চায়ও না, সম্পর্কের শুরুতে অনামিকা তা বুঝতে পারেনি। যদিও কিছু কিছু ক্ষেত্রে তার খটকা লেগেছিল। অনামিকার সাজপোশাক থেকে বিভিন্ন স্বাদের খাবার চোখে দেখার আগ্রহ, এক দেশের সবজি দিয়ে অন্য দেশে খাবারের পদ বানানো, বা পরদা সরিয়ে এ ঘর থেকে ওঘরে যাওয়ার মতো এক ভাষা থেকে আর এক ভাষার অবাধ সঞ্চার দেখে অশনির সহাস্য মন্তব্য—'তোমার মধ্যে হাইব্রিডিজ্‌মের একটা পার্ভাসিটি আছে।"[৪] প্রাথমিকভাবে অনামিকা একে প্রশংসা হিসেবেই নিয়েছিল। বা ভিক্তোরিয়া সম্পর্কে অশনি যখন বলে, 'আমার কাছে তাঁর সব থেকে বড় পরিচয় রবীন্দ্রনাথের বিজয়া হিসেবেই; অন্য কোনো পরিচয়ই এত বড় নয় বা জরুরি বলে মনে করি না। তিনি ফেমিনিস্ট ছিলেন কিনা,তাঁর ফেমিনিজমের স্বরূপ কী, ওসব নিয়ে আমার মাথাব্যথা নেই...' তখন অনামিকা তর্ক করে, তাকে বোঝাবার চেষ্টা করে যে এটাই এই গবেষণার অন্যতম প্রয়াস—ভিক্তোরিয়ার সামগ্রিক সত্তার অনুসন্ধান, কিন্তু মতান্তরকে মনান্তর হিসেবে দেখে না। বরং আলোচনা করার,তর্ক করার জন্য রবীন্দ্রসাহিত্য পড়া একজন বাঙালিকে পেয়ে সে উৎসুক বোধ করেছিল। লক্ষণীয়, অনামিকা তর্কটা কিন্তু কেবল অশনির সঙ্গে নয়, চলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গেও। ভিক্তোরিয়ার সঙ্গে পরিচয়ের মাত্র কয়েক সপ্তাহ আগে দক্ষিণ আমেরিকাগামী জাহাজে বসে রবীন্দ্রনাথ যে *পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি* লিখতে শুরু করেছিলেন, নতুন করে সে বইয়ের পাতা ওল্টাতে গিয়ে মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর কিছু মন্তব্য বেশ সমস্যাজনক মনে হয় অনামিকার। সেখানে ক্রমাগত নারী- পুরুষের স্বভাবকে, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে আদর্শায়িত করার একটা চেষ্টা রবীন্দ্রনাথ করেছেন বলে তার মনে হয়। যেখানে পুরুষ কর্মী, শিল্পী, সাধক, কুঁড়েমি করলেও সে নেহাতই আর্টিস্টের কুঁড়েমি। আর মেয়েরা নিয়োজিত পুরুষের সেবায়, মঙ্গল কামনায়। আপন স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে তিনি বলেন, নারী জীবনধাত্রী, তার ধর্ম হলো, 'প্রাণধর্ম', আর পুরুষের ধর্ম 'চিত্তধর্ম'। 'প্রাণধর্মে'র ক্ষেত্রে তার ভূমিকা অল্প বলেই চিত্তকে সে অভিনব সৃষ্টির ক্ষেত্রে মুক্তি দিতে পেরেছে। বিজ্ঞান, সাহিত্য, ধর্ম,দর্শন প্রভৃতি সভ্যতার যা কিছু অর্জন সবই 'প্রাণপ্রকৃতির পলাতক ছেলে পুরুষের সৃষ্টি'। অনামিকার ভিতরকার তার্কিক মেয়েটি প্রশ্ন না করে পারে না, "হায় হায়, প্রাগৈতিহাসিক থেকে ১৯২৪ সালের মধ্যে পৃথিবীর যত মেয়ে সার্থকতার সন্ধানে দুর্গম পথে ছুটেছে তাদের কারোর নামই কি রবীন্দ্রনাথের জানা ছিল না? আর সভ্যতা কি শুধু পুরুষের সৃষ্টি?"[৫] আগাগোড়া *পশ্চিমযাত্রীর ডায়রি* সম্পর্কে তার বক্তব্য, "রবীন্দ্রনাথ এখানে অ্যান্টি ফেমিনিস্ট তো বটেই,

অত্যন্ত আনরিয়ালিস্টিকও।" তার মনে প্রশ্ন জাগে এইসব ঐতিহ্যিক মডেলের সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার ব্যক্তিত্বকে তিনি কীভাবে খাপ খাওয়ালেন! শুধুমাত্র তো লক্ষ্মী কিংবা সাবিত্রীর প্রসঙ্গ টেনে কল্যাণময়ী, প্রেরণাদাত্রী, সতীত্বের পরাকাষ্ঠা হিসেবে রবীন্দ্রনাথ দেখাননি মেয়েদের, নারী-পুরুষ সম্পর্কের মধ্যে এক দূরত্ব প্রার্থিত এমন কথাও বলেছেন। বোঝা যায় জৈবিক সম্পর্কের কথাই তিনি বোঝাতে চাইছেন। তাকে 'মাংসের হাটে' এনে ফেললে যে পতন অনিবার্য, সেকথা দ্রৌপদী কিংবা ক্লিওপেট্রার উদাহরণ টেনে তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। কিন্তু অনামিকা ভিক্তোরিয়ার ব্যক্তিগত জীবনের যেটুকু আভাস পায় তাতে বোঝে যে তিনি মোটেই লক্ষ্মী বা সাবিত্রীর মডেলের মহিলা ছিলেন না, অসুখী দাম্পত্যের বাইরে একাধিক সম্পর্কে জড়িয়েছেন এবং 'ভালোবাসার জীবন' ও 'জীবনের ভালোবাসাগুলি' দুই-ই তাঁর কাছে ছিল সমান গুরুত্বপূর্ণ। অনামিকার তাই প্রশ্ন, "আসল আর্জেন্টাইন মেয়েটি এবং রবীন্দ্রমানসী, এই দুইয়ের মধ্যে যেসব অমিল ছিলো, সেগুলি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ কি অবহিত ছিলেন?"[৬] তখনো পর্যন্ত তার হাতে যেসব নথি এসেছে তার ভিত্তিতে অনামিকার অনুমান, ভিক্তোরিয়ার স্বাধীনচেতা, মুক্তিকামী নারীসত্তাকে পুরোপুরি না চিনলেও তাঁর যে একটি সংবেদী, সাহিত্যক মন আছে তা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। তাঁদের সম্পর্কের মধ্যে একটা আলো আঁধারি ছিলই, বয়সের ব্যবধান, সংস্কৃতির ব্যবধান, ভূগেলের ব্যবধানের দূরত্ব ছিল তাঁদের মধ্যে। সেটা যদি না থাকত, যদি দিনের আলোর মতো স্পষ্ট হত সবটা তাহলে হয়ত দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য আরও তীব্র হয়ে ধরা পড়তো, দ্বন্দ্বটা আরও প্রকট হয়ে উঠতো। কিন্তু পনের ষোল বছর ধরে ভিক্তোরিয়ার সঙ্গে আদান প্রদান রবীন্দ্রনাথের নারীসম্পর্কিত ভাবনায় একটা জলবায়ু পরিবর্তন এনেছিল বলে বিশ্বাস অনামিকার। কারণ *Personality*-র প্রবন্ধমালায় তারপর *কালান্তরের* 'নারী' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ মেয়েদের আর শুধুমাত্র প্রেরণাদাত্রী বা শুশ্রূষাকারিণীর ভূমিকায় দেখছেন না। তিনি স্বীকার করছেন নতুন সভ্যতা গঠনের কাজে মেয়েরাও এগিয়ে আসবে এবং সেখানে একটি বৌদ্ধিক ভূমিকা থাকবে তাদের এই নতুন উপলব্ধিতে 'নতুন নারী' হিসেবে ভিক্তোরিয়ার একটি বিনিশ্চয়ক ভূমিকা আছে বলে মনে করে অনামিকা।

বাংলা বইটি যখন লিখেছেন তখন রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া বিষয় অনেক তথ্যেই হাতে আসেনি কেতকীর। এরপর ইংরেজি বইটির জন্য গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহ করতে শান্তিনিকেতনে গিয়ে রবীন্দ্রনাথকে লেখা ভিক্তোরিয়ার এবং বুয়েনোস আইরেসে গিয়ে ভিক্তোরিয়াকে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠিগুলি দেখার এবং ভিক্তোরিয়ার মৃত্যুর পরে খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর আত্মজীবনীর

পাতায় বিস্ফোরক সব স্বীকারোক্তি পড়ার পর অনেক অজানা, অন্ধকার যা ঈষৎ আভাসিত অধ্যায়ের ওপর থেকে যেন পরদা উঠে যায়, অনেক অস্পষ্ট, দদুল্যমান অনুমানের তলায় বাস্তবের ইট গাঁথা সম্ভব হয়।

১৯২৪ এ যখন প্রায় জোর করে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর সম্মানিক সেক্রেটারী এল্‌মহার্স্টকে নিজের আতিথ্যে এবং তত্ত্বাবধানে নিয়ে আসেন ভিক্তোরিয়া সেই সময় তিনি সদ্য নিজের অসুখী দাম্পত্য থেকে বেরিয়ে এসেছেন, যার আভাস অতিথিদের কিছুটা দিলেও তাঁদের ঘূণাক্ষরেও জানাননি তাঁর প্রেমিক হুলিয় মার্টিনেজের কথা, যে সম্পর্কের সূচনা স্বামীর সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটার আগেই। হয়ত ভয় ছিল এতে অতিথিদের চোখে তিনি হীন হয়ে যাবেন। এই দোলচলতাটা বরাবর ভিক্তোরিয়ার মধ্যে লক্ষ করছেন কেতকী। রবীন্দ্রনাথ আর্জেন্টিনা ছেড়ে যাওয়ার পর আবেগঘন চিঠি লিখেছেন তাঁকে, জানাচ্ছেন একা লাগার কথা, মন খারাপের কথা। জানাচ্ছেন কীভাবে তিনি 'মিস্' করছেন সেই দিনগুলিকে, সেই সান্নিধ্যকে।[৭]—

I hoped I could gather some crumbs of my recent hapiness in the house where you lived. But things can't comfort. They only make everythig worse. There arose in my heart such a terrible longing for you, such a yearning (that could not be quieted) for all that I had had and all that I had lost,that I coulc not bear it.

(San Isidro Jan 6/25)

এর পরের চিঠিতেও[৮]—

Gurudev (a thousand times dear...)

I must admit that I miss you too much. In is becoming quite uncomfortable, quite inconvenient, becasue I can't think of anything else.

এই চিঠিরই শেষে তিনি সরাসরি লিখছেন,

...And though it will make you still more conceited than you already are, let me tell you Gurudev, that I love you.

(San Isdiro Jan 15/25)

একে প্রেম নিবেদন ছাড়া আর কোনো কিছু বলা যায় না বলে মনে করেন কেতকী। অথচ এই পত্রস্রোত ১৯২৬ এর ফেব্রুয়ারির পর হঠাৎ বন্ধ হয়ে যায়। কেতকী তাঁর অনুসন্ধান এবং বিভিন্ন উৎস থেকে পাওয়া সূত্র মিলিয়ে মনে করেন সম্ভবত ভিক্তোরিয়াকে দুটি চিঠি লিখে সাড়া না পেয়ে রবীন্দ্রনাথ লেখা বন্ধ করে দিয়েছিলেন। আর ভিক্তোরিয়ার তরফে নীরবতার কারণ একের পর এক সম্পর্কে জড়িয়ে পড়ে অন্তর্জীবনের টানাপোড়েন— এমনটাই অনুমান কেতকীর।

প্রায় সাড়ে তিন বছরের নীরবতা ভেঙে বুয়েনোস আইরেস থেকে যখন চিঠি লেখেন আবার ভিক্তোরিয়া তখন তিনি সদ্য কাইজারলিঙের প্রণয়পাশ থেকে বেরিয়ে এসেছেন, তাঁর মোহভঙ্গ হয়েছে। হয়তো দুই বিশাল মাপের মানুষের ব্যক্তিত্বের বৈপরীত্যই তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কথা পুনরায় মনে করিয়েছিল। ১৯৩০ এ প্যারিসে তাঁদের দ্বিতীয় সাক্ষাতের সময় চল্লিশ ছোঁয়া ভিক্তোরিয়া অনেকটাই বদলে যাওয়া মানুষ। তখনো তিনি ফরাসি লেখক দ্রিয় রাশেলের প্রণয়ে আবদ্ধ। চিত্রপ্রদর্শনীর সব বন্দোবস্ত করে দিলেও রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছানুসারে তাঁর সফরসঙ্গী হন নি ভিক্তোরিয়া। কবির একান্ত আহ্বান সত্ত্বেও একাধিকবার আসবেন বলে আসেননি শান্তিনিকেতনে। হয়তো চাইলে আসতে পারতেন তিনি। অথচ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠিতে তিনি যখন দুঃখপ্রকাশ করে বলেন—আমরা মনে করি সময় আছে, কখনো না কখনো করে উঠতে পারবো, কিন্তু জীবন আমাদের সবসময় সেই সুযোগ দেয় না—তখন সেই আন্তরিকতায় কোনো খাদ আছে বলে মনে হয় না। আসলে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সম্পর্ক বিষয়ে এই টানাপোড়েনটা ভিক্তোরিয়ার মধ্যে বরাবর ছিল। কেতকী লক্ষ্য করেন, ভিক্তোরিয়া তাঁর জীবনের তথ্য সমন্বিত অনেক নথি নষ্ট করে ফেললেও রবীন্দ্রনাথ-এল্‌ম্‌হার্স্ট এর সান্নিধ্যের তুচ্ছাতিতুচ্ছ কাগজও সযত্নে সংরক্ষিত আছে। যেন তিনি প্রাণে ধরে কিছু ফেলতে পারেন নি, যেন তিনি চেয়েছিলেন আগামী পৃথিবী জানুক তাঁদের প্রকৃত সম্পর্কের কথা। শুধু তাই নয়, ষাটোর্ধ বয়সে লেখা আত্মজীবনীর পাতায় রেখে গেলেন নিভৃত কিছু মুহূর্তের সাক্ষ্য। ওকাম্পোর আত্মজীবনীর ফরাসি সংস্করণের একটি অংশ উদ্ধার করে কেতকী দেখান রবীন্দ্রনাথ অন্তত একবার অত্যন্ত কোমল ভাবে হলেও তাঁকে স্পর্শ করেছিলেন। এই স্পর্শকে ভিক্তোরিয়ার হাত বাড়িয়ে গাছের ফল ছোঁয়ার মতো বলেছেন।—"...he told me that he was translating. I leaned towards the page which was on the table. Without lifting his heads towards me he streched his arms, and in the same way as one gets hold of a fruit on a branch he placed his hand in one of my brests...the hand left the branch after that almost incorporeal cares, and I read the poem...he never did it again. (p-272)."[৯]

এখান থেকে স্পষ্ট যে খুব সূক্ষ্ম হলেও তাঁদের পারস্পরিক আকর্ষণের মধ্যে একটা দৈহিকতার মাত্রা ছিল। অন্যদিকে রবীন্দ্রনাথের তরুণ সেক্রেটারিও আকৃষ্ট হয়েছিলেন এই রূপবতী রহস্যময়ী লাতিন আমেরিকান নারীর প্রতি, তেমন ইঙ্গিতও কেতকী খুঁজে পেয়েছেন ভিক্তোরিয়ার আত্মজীবনীতে এবং এল্‌ম্‌হার্স্টের স্মৃতিচারণায়। সেই অনুভূতি প্রকাশের ফলে ভিক্তোরিয়ার প্রতিক্রিয়া খুব তীব্র হলেও এল্‌ম্‌হার্স্টের ব্রিটিশ সংযমবোধ তাঁকে শান্ত রেখেছিল। যদিও

ভিক্তোরিয়ার আবেগের নানা ধাক্কা তাঁকে বরাবর সহ্য করতে হয়েছে। সব মিলিয়ে ১৯২৪ এর নভেম্বর, দক্ষিণ গোলার্ধে যখন সোনাঝরা বসন্তকাল, সেই সময় মিরালরিওর দিনগুলি শুধু বন্ধুত্বের নির্মল মাধুর্যে কাটেনি, বরং, তিনজনের মধ্যে কাজ করেছিল অনেক চোরাস্রোত, গোপন ঈর্ষার টানাপোড়েন যাতে ছিল অ্যাসিডিয় ঝাঁঝ, খোলা তলোয়ারের ওপর হাত রাখা কখনোবা। কিন্তু পরবর্তী বছরগুলিতে তাঁরা যখন পৃথিবীর সামনে আত্মপ্রকাশ করেছেন তখন 'finished product' এর মতো শান্ত সমাহিত বন্ধুত্বের রূপটিকেই তুলে ধরেছেন।

কিন্তু এই সমাহিত রূপটিতে পৌঁছতে বহু পথ পার হতে হয়েছে তাঁদের, যেমন ভাবে বহু যুগ ধরে বাহু বৃষ্টিপাতে পৃথিবীর উপরিভাগ শান্ত ও শীতল হয়েছে। ভিক্তোরিয়ার বিভিন্ন সময়ের প্রণয় সম্পর্কগুলি বিশ্লেষণ করে কেতকীর মত সেগুলির মধ্যে যৌনতা অবশ্যই একটি নির্ণয়ক মাত্রা হিসেবে ছিল। বস্তুত, যৌনতা ও আধ্যাত্মিকতা উভয় তৃষ্ণাই ছিল তাঁর মধ্যে। এই প্রসঙ্গ ১৯৩৫-এ ইতালিতে দেওয়া ভিক্তোরিয়ার একটি বক্তৃতার উল্লেখ করেন কেতকী যেখানে তিনি বলেছিলেন লাতিন আমেরিকার চরিত্র হল, 'The supremacy of the soul and of blood over the spirit and the intelligence' (p-247)[১০]। কেতকীর প্রশ্ন, এই ভাষাতেই কি তিনি নিজেকে প্রকাশ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ও এল্‌ম্‌হার্স্টের কাছে, একই সঙ্গে যাতে মিশে আছে প্যাশঅন্তড় এবং আধ্যাত্মিকতায় তৃষ্ণা, যাকে তাঁরা 'ডি-কোড' করেছিলেন প্রেমের ভাষা হিসেবে! কেতকীর মত, ওকাম্পো ধীরে ধীরে দূরে থেকেও প্রভাবিত হয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধারা দ্বারা। ১৯২৫ এর ১৩ই জানুয়ারির চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে লেখেন ভবিতব্যকে মেনে নিলে তাঁরা চিরকাল বন্ধু থাকতে পারেন। সেই বন্ধুত্বকেই শেষ পর্যন্ত স্বীকৃতি জানিয়েছেন, ভিক্তোরিয়া, শুধু রবীন্দ্রনাথ নয়, এল্‌মহ্‌হার্স্টের ক্ষেত্রেও। সেই বন্ধুত্বের স্বীকৃতিতেই তাঁর রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বইটি তিনি উৎসর্গ করেন এল্‌ম্‌হার্স্টকে, যার উৎসর্গপত্রটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ—'To an Englishman/ to a friend of Tagore/to a friend of India/to a friend LeonardK. Elmhirst' এর মধ্যে যেন ধরানো রইল তাঁদের সম্পর্কের অকথিত ইতিহাস।

ফিরে আসি গৌরী-কেতকী বিতর্কের প্রসঙ্গে। এখানে বলে নেওয়া দরকার গৌরী আইয়ুব তাঁর সমালোচনায় ছোট বা মাঝারি অনেকগুলি বিষেয়েই আপত্তি তুলেছেন এবং কেতকী কুশারী তার উত্তরও দিয়েছেন। কিন্তু আমরা এখানে বড় বা প্রধান আপত্তিগুলি নিয়েই আলোচনা করব। আগেই বলেছি, কেতকীর দুটি বইয়ের সমালোচনায় গৌরী দুটি প্রবন্ধ লেখেন, 'রবীন্দ্র গবেষণার অভিনব ধারা' ১ এবং ২। প্রথমটি বাংলা বইটিকে নিয়ে। গৌরী তাঁর আলোচনার শুরুতেই

বলেন গবেষণার সঙ্গে উপন্যাসকে মিলিয়ে 'কেন যে এমন একটি শ্যামদেশীয় যমজ প্রসব করা তাঁর নিতান্ত প্রয়োজন হল বুঝতে পারলাম না।"[১১] এরপর উপন্যাসের কাহিনি নিয়ে নাতিদীর্ঘ আলোচনার শেষে তিনি আবার লিখছেন, "...যেমন করে 'দোস্তী রোটি'র পরত দুটি সাবধানে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া হয় তেমনি করে এই গবেষণাকর্মকে উপন্যাস থেকে পৃথক করে যখন দেখি মুগ্ধ হই।...কী বস্তু যে এই গবেষণার গায়ে লেপ্টে দেওয়া হয়েছে...পাঠককে ওই বস্তু গলাধঃকরণ করিয়ে লেখক কৃতজ্ঞতাভাজন হন নি।"[১২] দ্বিতীয় প্রবন্ধে তিনি বলেন রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়াকে নিয়ে একটি কৌতূহল, বহুদিনই ছিল তাঁর ঘনিষ্ঠমহল তো বটেই এমনকি বাঙালি পাঠক সমাজেও। "উদ্যমী গবেষক কেতকী কুশারী ডাইসন সেই পথে আরও অনেকটা অগ্রসর হয়েছেন।...কিছু প্রসঙ্গে 'ফাঁস' করে প্রমাণ করে দিয়েছেন যে রবীন্দ্রনাথ নামধারী পবিত্র 'দেবপ্রতিম' সত্তাটিও আসলে রক্তমাসেরই মানুষ ছিলেন।"[১৩] ভিক্তোরিয়ার আত্মজীবনীতে স্পর্শের যে প্রসঙ্গ আছে সে বিষয়ে গৌরীর বক্তব্য, "...তাঁর বইয়ে এই ঘটনার বর্ণনা—ভিক্তোরিয়ার জবানিতে হলেও অত্যন্তই মর্মহত করেছে অনেককে।...কোনও মানুষই মানুষী দুর্বলতার উর্ধ্বে নন একথা আমরা জানি বটে, তবু যাঁকে আমরা শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি,তাঁর কোনো মানুষী দুর্বলতার কথা—বিশেষত তা যদি অন্য কারও কোনো ক্ষতি না করে থাকে—তাহলে তার প্রকাশ্য আলোচনা করতে আমরা কুণ্ঠা বোধ করি।"[১৪] এই উদ্ধৃতিগুলিই বোধকরি গৌরী আইয়ুবের বক্তব্যকে স্পষ্ট করবে। এর বাইরেও এই গবেষণার উদ্দেশ্য কী, সে সম্পর্কে তিনি সন্দেহ প্রকাশ করেছেন, এবং কেতকী হীরে এবং কাচের তফাত বোঝেন না এমন মন্তব্যও করেছেন। উত্তরে কেতকীর বক্তব্য, গৌরীর কথায় এক ধরনের শুচিবায়ুগ্রস্ততা প্রকাশ পেয়েছে। মিশ্র জঁরের উপন্যাস সম্পর্কে যেমন, তেমনই রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ পাছে কোনো স্পর্শদোষে দুষ্ট হয় এই ভয়। উপন্যাস ও গবেষণাকে মেলানোর সপক্ষে কেতকীর যুক্তি, "বইটা এক অর্থে মিশ্রতার উৎসব। একজন বাঙালী, একজন ইংরেজ, আর একজন আর্জেন্টাইনের ত্রিকোণ আন্তর্জাতিক বন্ধুত্বকে বুঝতে হলে হাইব্রিডিজ্‌মের সমঝদার হয়ে উঠতে হবে।...শুদ্ধতাবাদীরা যতই চটুন না কেন, অনামিকাকে যে কল্পনা করতে পেরেছে, হয়তো কেবল সে-ই ঐ ত্রিকোণ বন্ধুত্বকে নিয়ে গবেষণা করতে পারতো।"[১৫] এবং রবীন্দ্রাথ-ভিক্তোরিয়া অন্তরঙ্গ মুহূর্তটি প্রসঙ্গে কেতকীর উত্তর—"না গৌরী দেবী, কবির ঐ হাত বাড়িয়ে দেওয়াটাকে আমি তাঁর 'মানুষী দুর্বলতা' বলে মনে করি না। ওটা আমার কাছে তাঁর সবলতারই চিহ্ন, তাঁর পৌরুষের মাধুর্যের অভিজ্ঞান।...রবীন্দ্রনাথ কোনো অন্যায় করেন নি। ঘটনার সময় তিন নাবালক

নন। মহিলাটিও নাবালিকা ছিলেন না। ওটি নিয়ে কারও লজ্জা পাবার কারণ তো নেইই, লজ্জা পাবার অধিকারও নেই। যাঁরা লজ্জা পাচ্ছেন তাঁরা কোন সাহসে লজ্জা পাচ্ছেন? তাঁদের কুণ্ঠা তাঁদের স্পর্ধার নামান্তর। তাঁরা কি ঐ মৃত মহাকবির 'নৈতিক অভিভাবক' যে শরমে মরে যাচ্ছেন?...তিনি আপনাদের বালক সন্তান নন, সম্পত্তি নন। তাঁকে আঁচলে বেঁধে রাখবেন না। তাঁকে যেতে দিন।"[১৬] কেতকীর জবাবের উত্তরে একটি পালটা জবাবও লেখেন গৌরী। সেখানে তাঁর বক্তব্য প্রধানত দুটি। এক, সংকরায়ণের বিরোধী না হলেও এক্ষেত্রে গবেষণা এবং ফিকশন্‌কে মেলানোর কোনো যৌক্তিকতা তিনি খুঁজে পান না। তিনি মূলত রবীন্দ্র কৌতূহলী, কেতকী কেন অনামিকার মতো একটি চরিত্র সৃষ্টি করলেন তা জানার বা তাঁর সাহিত্যিক বিবর্তন সম্পর্কে কোনো আগ্রহ গৌরীর নেই। দুই, কেতকীর গবেষণা থেকে উঠে আসা রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া সম্পর্কের উদ্ঘাটন তাঁর রবীন্দ্র সাহিত্য পাঠকে তো কোনো ভাবে সমৃদ্ধ করেই না বরং একজন মানুষ জীবিতাবস্থায় যাকে আড়ালে রেখে গেছেন, মৃত্যুর পর সেসব সামনে টেনে আনা মৃত মানুষটিকে নগ্ন করে অপমান করার সামিল বলে মনে করেন গৌরী। তাঁর বক্তব্য—"কোনও কোনও পরিস্থিতি আছে যে পরিস্থিতিতে অন্য কেউ আমাদের দেখুক এটা আমরা চাইনা—যদি না আমরা প্রদর্শনকামী বা Exibitionist হই। প্রিয়জনের, শ্রদ্ধেয়জনের এই না-চাওয়াটাকে অনুভব করতে পারা এবং তাকে মান্য করা কি তাঁদের উপর নৈতিক সর্দারি করা?"[১৭] কেতকী অবশ্য এর উত্তরে আর কিছু লেখেন নি *চতুরঙ্গের* পাতায়। তবে তাঁর জবাবি প্রবন্ধটি যখন তাঁর দ্বিতীয় প্রবন্ধসংকলনের *চলন্ত নির্মাণের* অন্তর্গত হয়, তখন তার ফুটনোটে কেতকী লেখেন, তাঁর কিছু অনুরাগী পাঠকের বিশেষ অনুরোধ সত্ত্বেও এর উত্তর তিনি দেন নি কারণ, "এটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছিলো, যে তাঁর সঙ্গে তর্ক চালিয়ে কোনো লাভ নেই, আমাদের মানসিক তরঙ্গদৈর্ঘ্যকে কখনো মেলানো যাবে না।"[১৮]

এই তরঙ্গদৈর্ঘ্যের পার্থক্যটাই আমরা বোঝার চেষ্টা করছি। একথাতো আমাদের সকলেরই জানা যে ভিন্ন তরঙ্গদৈর্ঘ্যের আলো যখন একই বস্তুর ওপর পরে তখন তার রং বা রূপ সবই যায় বদলে। জীবনদর্শন এবং মনোভঙ্গির এই পার্থক্যকে বুঝতে জীবনেরই দিকে একবার ফিরে তাকানো বোধহয় জরুরি। গৌরী বড় হয়েছেন পাটনার রক্ষণশীল শিক্ষিত হিন্দু পরিবারে। তাঁর প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তিধারী, গান্ধীবাদী, দর্শনের অধ্যাপক বাবা মেয়ের কম্যুনিস্ট বনে যাওয়া ঠেকাতে শান্তিনিকেতনে পড়তে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। উনিশ বছরের গৌরীর জীবনে যেন জন্মান্তর ঘটিয়ে দিয়েছিল ১৯৫০ এর শান্তিনিকেতনের খোলামেলা মুক্ত

পরিবেশ, ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে আসা ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকদের সঙ্গে আদানপ্রদান, সর্বোপরি আবু সয়ীদ আইয়ুবের সঙ্গে আলাপ। আইয়ুব তখন সদ্য বিশ্বভারীততে যোগ দিয়েছেন দর্শনের অধ্যাপক হিসেবে, গৌরী ছিলেন তাঁর প্রথম ব্যাচের ছাত্রী। প্রথম দিন সুদর্শন অধ্যাপকের ক্লাসে এসে সসঙ্কোচে ছাত্রীর কাছ থেকে আসন চেয়ে নিয়ে বসা থেকে শুরু করে তাঁদের পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ ও অনুরাগের মনোজ্ঞ বিবরণ দিয়েছেন গৌরী 'আমাদের দুজনের কথা'[১৯] সংকলনের অন্তর্গত টুকরো টুকরো স্মৃতিচারণায়। ১৯৫৬ তে তাঁরা যখন বিয়ে করেন তখন গৌরীর বয়স পঁচিশ, আইয়ুব পঞ্চাশোত্তীর্ণ। তার আগের পাঁচ-ছয় বছরের সম্পর্ককে প্রেমপর্ব না বলে সংগ্রামের ইতিবৃত্ত বলাই বোধহয় ভালো। মাত্র উনিশ বছর বয়সে গৌরী জেনেছিলেন আইয়ুব টিউবারকিউলোসিসে আক্রান্ত, যা তাঁর পুরোনো রোগ, আবার হানা দিয়েছে। আইয়ুবের শান্তিনিকেতনের থাকা অনিয়মিত হয়ে পড়ে, একসময় তিনি চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। গৌরী নানা বাহানায় কলকাতায় যেতেনে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে, পরিচর্যা করতে, কখনো টি.বি হাসপাতালে কখনোবা তাঁর পার্ল রোডের বাড়িতে। তাঁদের ঘনিষ্ঠতার কথা জানাজনি হওয়ার পর গৌরীর বাবা মেয়ের সঙ্গে সম্পর্ক কার্যত ত্যাগ করেন। যে সম্পর্কের ভবিষ্যৎ নিয়ে তাঁরা নিজেরাই নিশ্চিত নন তার জন্য আপন পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়াও মেনে নেন গৌরী। নিশ্চিত না হলেও গৌরী কিন্তু নিজেকে তৈরি করেছেন ধীরে ধীরে, অনার্সপাশ করে বিটি পড়েছেন, বাবার শাসন এড়াতে উষাগ্রামের মিশনারি স্কুলে চাকরি নিয়েছেন, কলকাতায় ফিরতে পারবেন এই আশায় বন্ধুদের থেকে ধার করে হস্টেলে থেকে এডুকেশনে এম.এ করেছেন। এসবই প্রস্তুতি, ভাবী সংসারের দায়িত্ব একার কাঁধে নেওয়ার এবং গৌরী এম.এ পাশ করে সাউথ পয়েন্ট স্কুলে চাকরি পাওয়ার পরই তাঁরা বিয়ের সিদ্ধান্ত নেন। গৌরীর স্মৃতিচারণা পড়তে পড়তে তাঁর সাহস এবং দৃঢ়তাকে কুর্নিশ জানাতে ইচ্ছে করে। কিন্তু বর্তমান প্রেক্ষিতে তাঁর জীবনের ইতিহাসকে টেনে আনার কারণ তাঁর মনের ধাঁচটিকে চেনা। প্রেম তাঁর কাছে এক ব্রতপালনের মতো, এক আত্মনিবেদন। আইয়ুবের অসুস্থতা, বয়সের ব্যবধান, অনিশ্চিত উপার্জন—এসব কিছু জেনে বুঝেই তিনি তাঁর সঙ্গে নিজের ভাগ্যকে জড়িয়েছিলেন, পরবর্তীকালে আইয়ুব পারকিন্‌সেন্সে আক্রান্ত চলচ্ছক্তিহীন, হুইলচেয়ারে বদ্ধ হয়ে পড়েছেন যখন, তখনো গৌরী অবিচলিত ভাবে পাশে থেকে তাঁর পরিচর্যা করে গেছেন, একা হাতে সন্তান পালন থেকে চাকরি, সংসার সব সামলেছেনে। এমন আত্মত্যাগের দিনযাপনের মধ্যে কোথাও কোনো ক্লান্তি জমা হয়েছিল, অন্য কোনো তাগিদ বা ইচ্ছার উদয় হয়েছিল দিগন্তে—সেরকম কোনো আভাস

তাঁর স্মৃতিচারণার কোথাও মেলে না। মনে হয় তেমন যদি কিছু থেকেও থাকে তিনি তা সবলে দমন করেছেন। তেমনটাই ছিল তাঁর মনের তথা ব্যক্তিত্বের প্রোগ্রামিং। গৌরীর লেখা থেকেই জানতে পারি তিনি 'রিলিজয়ন' অর্থে ধর্মকে না মানলেও নারীর পাতিব্রত্যের আদর্শে বিশ্বাস করতেন। সেই কারণে তিনি মুগ্ধ হয়েছিলেন মানবেন্দ্রনাথ রায়ের পত্নী এলেন রায়কে দেখে, স্বামীর অবর্তমানেও যিনি প্রকৃত সহধর্মিনীর মতো তাঁর আরব্ধ কাজ করে চলেছিলেন। গৌরীর মুগ্ধতা প্রকাশ পেয়েছে কান্তিচন্দ্র ঘোষের স্ত্রী হাঙ্গেরিয়ান কন্যা এটা ঘোষ বা অন্নদাশঙ্করের স্ত্রী আমেরিকান মহিলা লীলা রায় সম্পর্কেও। শান্তিনিকেতনের দিনগুলির প্রসঙ্গে তিনি লেখেন, "এই দুই বিদেশীনি মহিলার যে নিঃস্বার্থ স্বামীপরায়ণতা দেখেছিলাম, তেমনটা আমি আমার দেশের কোনো সতী-স্বাধীকে দেখিনি।"[২০] এ থেকে বোঝা যায় কেন তিনি ভিক্তোরিয়া রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের প্রসঙ্গে মীরা বেন বা সিস্টার নিবেদিতার কথা এনে ফেলেন। যদিও স্বীকার করেন 'ভিক্তোরিয়া অন্য জাতের মহিলা'। কিন্তু সেই 'অন্য' কে জানতে তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। ভিক্তোরিয়ার 'লাভ লাইফ' কে পাশ কাটিয়ে তিনি তাঁর 'লাভস্ অফ্ লাইফ'কে গুরুত্ব দেন বেশি। এবং সেই প্রসঙ্গে টেনে আনেন রবীন্দ্রনাথের 'স্ত্রীর পত্র'র মৃণাল এবং অপর্ণা সেনের সিনেমা 'পরমা'র কথা— "...কোনও মহিলার বেলাতেও ব্যক্তিসত্তার পূর্ণবিকাশের জন্য আরও যে কিছু ভালোবাসার যোগ্য বস্তু—'লাভস্ অব লাইফ্' থাকতে পারে বা থাকা প্রয়োজন একথা এখনও দেশের 'পরমা'র ভুলেই থাকেন যেন। তবে কি নারীর মুক্তিযুদ্ধে শয্যাটাই প্রথম, এবং প্রায়সই শেষ রণক্ষেত্র হয়ে থাকবে? 'মৃণাল'কে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্য ধাতু দিয়ে গড়েছিলেন। বাঙালি মেয়েদের আধাআধি গড়ে ছেড়ে দিয়েছেন বলে বিধাতার বিরুদ্ধে তাঁর যে নালিশ ছিল তারই সুবিচার করতে গিয়ে বোধহয় 'মৃণাল'কে একটা পূর্ণ ব্যক্তি করতে চেয়েছিলেন তিনি।"[২১] এই তুলনাটা কেন করছেন গৌরী? কারণ বোধহয় এই যে মৃণাল এবং পরমা দুজনেই তাদের স্বামীর ঘর, সাজানো, স্বচ্ছল সংসার ভেঙে বেরিয়ে আসে, জীবনের একটা মুহূর্তে পৌঁছে তারা উপলব্ধি করে তাদের তথাকথিত সুখের বসত কতো ঠুনকো, কতো অন্তঃসারশূন্য। কিন্তু যে কারণে তারা এই উপলব্ধিতে পৌঁছায় তা সম্পূর্ণ আলাদা। বিন্দুর মতো একটি অসহায়, বাহ্যিক রূপহীনা মেয়ের জীবন নিয়ে ছিনিমিনি খেলা মৃণালকে চিনিয়েছিল 'জগতে মেয়েমানুষের স্থানটা' আসলে কোথায়। কিন্তু পরমার জীবনের নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ ঘটিয়েছিল একটি তথাকথিত অসম প্রেম, সামাজিক পারিবারিক দায়বদ্ধতার ট্যাবুগুলিকে যা খড়কুটোর মতো ভাসিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর তারই মধ্যে থেকে জেগে উঠে একসময় পরমা 'আবিষ্কার' করে নিজেকে। বোঝাই যাচ্ছে এর মধ্যে

কোন মডেলটি গৌরীর পছন্দের, এবং কেন। মৃণালের 'আত্মত্যাগ' তাঁর নিজের জীবনের ছাঁচের সঙ্গে মেলে বৈকি কিছুটা। কিন্তু সমস্যা তখনই হয় যখন ভিক্তোরিয়াকেও তিনি সেই ছাঁচে ফেলার চেষ্টা করেন—"কথা হচ্ছিল ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর জীবনবৃত্তান্ত নিয়ে। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রেম, বিবাহ, পুরুষ-সংসর্গ ইত্যাদি ব্যাপারগুলিকেই ভদ্রমহিলা শক্ত হাতে মোকাবিলা করার পর সেসবকে অতিক্রম করে চলে যেতে পেরেছিলেন দূর-দূর ক্ষেত্রে।"[২২] গৌরীর এই 'শক্ত হাতে মোকাবিলা'র ধারণাটাই কি নয় একেবারে নিজস্ব, তাঁর নিজের জীবন থেকে নেওয়া! না, ভিক্তোরিয়ার জীবনটা মোটেই তেমন ছিল না, জানান কেতকী', "...প্রেমের বেদনায় ছিন্ন হতে হতেই তিনি কাজ করেছেন, ব্রহ্মচারিণী হয়ে নয়। একেকজন পুরুষের সান্নিধ্য তাঁর আত্মবিকাশ ও কর্মজীবনের একেকটি নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এটাই তাঁর জীবনের প্যাটার্ন।"[২৩] সেইসঙ্গে তিনি এও বলেন, "নারীর মুক্তিযুদ্ধে শয্যা কখনোই একমাত্র রণক্ষেত্র হতে পারে না, তবে তা অন্যতম রণক্ষেত্র। প্রেম ও কর্ম দুয়েরই প্রয়োজন থাকে জীবনে, এবং দুয়ের মধ্যে একটা নিগূঢ় যোগও থাকে। অন্তর্লীন প্রেমজীবন থেকে জীবনের সৃষ্টিশীলতা প্রবাহিত হয়।"[২৪]

কেতকীর এই উপলব্ধি কেবলমাত্র ভিক্তোরিয়ার জীবন নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেরও চর্চা ও চর্যা সঞ্জাত নিঃসন্দেহে। অসবর্ণ বিবাহের জাতক কেতকী বাড়িতে বরাবর পেয়েছেন এক রক্ষণশীলতাহীন মুক্ত পরিবেশ, প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রাবস্থা সেই আধুনিক মনোভঙ্গিকেই আরও দৃঢ় হতে সাহায্য করেছে। প্রিয় কবি বুদ্ধদেব বসু ছিলেন পিতৃবন্ধু, যাঁর কাছ থেকে তিনি পান মাতৃভাষার প্রতি ভালবাসা এবং এক শিশিক্ষু মন নিয়ে জগতকে দেখার উত্তরাধিকার। যে কারণে কুড়ি বছর বয়সে দেশ ছেড়ে, একজন ইংরেজকে বিবাহসূত্রে জীবনের সিংহভাগ বিলেতের মাটিতে যাপন করেও একদিকে যেমন বাংলায় লিখে গেছেন আজীবন, অন্যদিকে কোনোদিনই তাঁর জীবন অন্য অনেক পরবাসী বাঙালিদের মতো গোষ্ঠীকেন্দ্রিক নয়। তাঁর প্রথম উপন্যাস *নোটন নোটন পায়রাগুলি* সম্পর্কে কেতকী নিজেই বলেন যে, এতে 'সত্তরের দশকের নারী আন্দোলনের ফসল ঘরে আনা হয়েছে।"[২৫] আলজেরীয়, আইরিশ, ব্রিটিশ, ফরাসি যে মেয়েদের সেখানে পাই তারা আত্মিক, আধ্যাত্মিক, শরীরী সবরকমের চাহিদার কথাই সোচ্চারে বলে। জীবনের সব সমস্যার মোকাবিলা যে তারা 'শক্ত হাতে' করতে পারে তা নয়, কিন্তু তারা যে নতুন সময়ের মেয়ে সে ব্যাপরে কোনো সন্দেহ নেই। এই উপন্যাসে নোটনের দৃষ্টিকোণটিকে ব্যবহার করা হয়েছিল বাকিদের জীবনের গল্প বলতে, আর পরের উপন্যাসে অনামিকা জীবনই উপন্যাসের কেন্দ্রে, যে

নিজে বাঙালি হলেও তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী একজন স্প্যানিশভাষী সেফার্দিক ইহুদি। সুতরাং ধারাবাহিতাটাকে বুঝতে অসুবিধা হয় না। এমিলিয়া কিন্তু শুধুই একজন সংগ্রামী নারী নন, তাঁর জীবনেও প্রেম এসেছে একাধিকবার এবং দুই সন্তানের মা হয়েও প্রৌঢ় বয়সে বিবাহিত ক্রিস্টোফারের প্রেমে পড়েছেন। যে প্রেম তাঁর নিঃসঙ্গ জীবনে নির্ভরতা এনেছে, তাঁকে নতুন করে বাঁচতে সাহায্য করেছে। পুরো উপন্যাস জুড়ে আমরা দেখি কীভাবে ক্রিসের বন্ধুত্ব, সাহচর্য, নির্ভর জুগিয়ে চলে এমিলিয়াকে—অনামিকা-অশনি সম্পর্কের সমান্তরালে এটাও এই উপন্যাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ খিলান।

অর্থাৎ এটাই বলতে চাইছি যে, গবেষণা এবং উপন্যাসে মেলানো এই বইটি ভিন্ন সময়ে, ভিন্ন দেশ-কাল-সংস্কৃতির পটভূমিকায় নারী-পুরুষ সম্পর্কের গল্প বলে। যে সম্পর্কের মধ্যে প্রেম আছে, যৌনতা আছে, বৌদ্ধিক বিনিময়ের আকাঙ্ক্ষাও আছে। রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া প্রসঙ্গে অন্য একটি প্রবন্ধে কেতকী যে কথা বলেন, তা হয়ত প্রতিটি সম্পর্কের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য—"নারীপুরুষের প্রেম একটা বর্ণালী, যার মধ্যে কোনো ছেদ নেই—একটা রঙ পরেরটার সঙ্গে মিশে যায়। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে তখন দেহে মনে মিশিয়ে একটা বিচিত্র বর্ণালী তাকে উদ্ভাসিত করে।"[২৬] রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া সম্পর্কে মধ্যে সবকটি রঙই একসময় পরস্পরের মধ্যে মিশেছিল এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর ভিক্তোরিয়ার জীবনে তা এক চূড়ান্ত সাবলিমেশনে পৌঁছোয়। যত দূরেই থাকুন পারস্পরিক শ্রদ্ধা এবং ঔৎসুক্য তাঁরা কোনোদিনই খুইয়ে বসেননি। কখনো চেষ্টা করেননি পরস্পরের জীবনে জোর করে প্রবেশ করতে বা তাকে নিয়ন্ত্রণ করতে। আর সেখানেই তাঁদের মহত্ব। অনামিকা-অশনি সম্পর্ক এই বর্ণালীর প্রথম ধাপেই থমকে যায়। আসলে অশনি তার জীবনের প্রথম বাঙালি মেয়েটিকে তার মনগড়া বঙ্গনারীর ছাঁচে ফেলতে চেয়েছিল, আর তা না পেরেই এই সম্পর্ক থেকে তার মন উঠে যায়। ভিক্তোরিয়ার জীবনেও এমন সঙ্কট একাধিকবার দেখা দিয়েছিল। তাঁর প্রেমিকদের অনেকেই তাঁর ইন্‌টালেকচুয়াল ক্ষুধাকে বুঝতে পারেন নি, ঠিকমতো কবজা করতে না পেরে আঘাত করেছেন। সুতরাং অনামিকার জীবনের সঙ্গে ভিক্তোরিয়ার সমান্তরতা বুঝতে অসুবিধা হয়না আমাদের।

সুতরাং গৌরী আইয়ুব এবং কেতকী কুশারী ডাইসনের এই বিতর্ক মূলত দৃষ্টিভঙ্গির ফারাক। তাঁদের নারীচেতনাতেও আদর্শগত পার্থক্য রয়েছে। পার্থক্যটা কোথায় বোঝাতে রবীন্দ্রনাথের একটি টেক্সটকে তাঁরা কীভাবে জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখেন সেই উদাহরণ দিয়ে এই প্রসঙ্গের ইতি টানবো। বইটি *চিত্রাঙ্গদা* কাব্যনাট্য। উভয় প্রবন্ধেরই বিষয় আধুনিক সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে বাঙালি মেয়েরা।

গৌরী লেখেন, "যে চিত্রাঙ্গদারা কেবল 'পুরুষের বিদ্যা' শিক্ষা করেন আর মনোহরণের কলায় দীক্ষা নিতে অবহেলা করেন তাঁরা স্বামী নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় প্রায়ই হেরে যান।"[২৭] আর কেতকী এই প্রসঙ্গ টেনে অন্য একটি প্রবন্ধে লেখেন, "রবীন্দ্রনাথের কল্পনায় চিত্রাঙ্গদা-নাম্নী যে নারী ব্রহ্মচর্যব্রতধারী, দ্রৌপদীর পতি অর্জুনকে রীতিমতো 'সিডিউস' করেন, আমার অনামিকা কি তাঁর চাইতেও খারাপ মেয়ে?"[২৮]

উল্লেখপঞ্জি

১। *রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া ওকাম্পোর সন্ধানে,* কেতকী কুশারী ডাইসন, প্রথম প্রকাশ এপ্রিল ১৯৮৫, দ্বিতীয় দে'জ সংস্করণ, মার্চ ২০০৪, পৃষ্ঠা : ১৭০

২। তদেব, পৃষ্ঠা : ১২২

৩। তদেব, পৃষ্ঠা : ১২২

৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৬১

৫। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৬৬

৬। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৮৪

৭। *In Your Blossoming Flower-Garden,* Rabindranath Tagore and Victoria Ocampo, Sahitya Akademi. First Published in 1988, p-388

৮। তদেব, p-394

৯। তদেব, p-272

১০। তদেব, p-247

১১। 'রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারা—১', *আমাদের দুজনেরকথা এবং অন্যান্য* (রচনা সংগ্রহ), গৌরী আইয়ুব, দে'জ পাবলিশিং,প্রথম প্রকাশ ২৫শে বৈশাখ, ১৪২১, পৃষ্ঠা : ৫৫০

১২। তদেব, পৃষ্ঠা : ৫৫৯

১৩। 'রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারা—২', *আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য* (রচনা সংগ্রহ), গৌরী আইয়ুব, পৃষ্ঠা : ৫৬২

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ৫৬৮

১৫। 'আমার রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া বিষয়ক বইদুটির সূত্রে', *চলন্ত নির্মাণ* (প্রবন্ধ-গ্রন্থসমালোচনা-যুক্তি-তর্ক-আলোচনা), কেতকী কুশারী ডাইসন, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০০৫, পৃষ্ঠা : ১৭৮

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা : ২০০

১৭। 'রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারার প্রবর্তিকার সমালোচনার জবাবে', *আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য,* পৃষ্ঠা : ৫৮০

১৮। 'আমার রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া বিষয়ক বইদুটির সূত্রে, *চলন্ত নির্মাণ*, পাদটীকা,

পৃষ্ঠা : ২০৩
১৯। 'আমাদের দুজনের কথা', *আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য* (রচনা সংগ্রহ), গৌরী আইয়ুব
২০। 'শান্তিনিকেতনের দিনগুলি', *আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য*, পৃষ্ঠা : ৭৭
২১। 'রবীন্দ্রগবেষণার অভিনব ধারা—১', *আমাদের দুজনের কথা এবং অন্যান্য*, পৃষ্ঠা :৫৫১
২২। তদেব, পৃষ্ঠা : ৫৫৩
২৩। 'আমার রবীন্দ্রনাথ-ভিক্তোরিয়া বিষয়ক বইদুটির সূত্রে', *চলন্ত নির্মাণ*, পৃষ্ঠা : ১৮৬
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৮৪
২৫। *নোটন নোটন পায়রাগুলি* প্রসঙ্গে, *এই পৃথিবীর তিন কাহিনী*, 'মুখবন্ধ', কেতকী কুশারী ডাইসন, ছাতিম বুকস্, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০০৬, পৃষ্ঠা : ৯
২৬। 'রবীন্দ্রনাথ ও ভিক্তোরিয়া' *জিজ্ঞাসা* পত্রিকায় ৯:১ সংখ্যায় শ্রীমতী সুপ্রিয়া রায়ের সমালোচনার উত্তর, *চলন্ত নির্মাণ*, পৃষ্ঠা : ৯৫
২৭। 'গত পঞ্চাশ বছরে কলকাতার মেয়েরা', *আমাদের দুজনের কথা এবং অনান্য*, পৃষ্ঠা : ৪৬০
২৮। 'একালের বাঙালী মেয়ে : কয়েকটি পরিপ্রেক্ষিতে', *চলন্ত নির্মাণ*, পৃষ্ঠা : ১১২

লেখক পরিচিতি :
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত : কবিতার শিল্পরূপ

সুব্রত মণ্ডল

সারাংশ :

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্য মানস নির্মিত হয়েছে একই সঙ্গে ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্যের সঙ্গে পাশ্চাত্য দর্শনের সম্পৃক্তায়ণে। প্রাচ্য তথা ভারতের সংস্কৃত ভাষা ও শব্দের প্রতি তাঁর গভীর আসক্তির সঙ্গে পাশ্চাত্যের সাহিত্য আন্দোলনের অস্তিত্ববাদ (*Existentialism*), বিচ্ছিন্নতবাদ (*Alienation*), চিরমুহূর্তবাদ (*Ternalism*) তাঁর কবিতার শরীর নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের অন্তরালে তিনি তাঁর কাব্যের রোমান্টিক মননকে মুক্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যের আলোকে উদ্দীপ্ত করেছেন। সমকালীন সমাজমানসের বিপর্যয় হতাশা, ক্লান্তি, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে, মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের তীব্র একাকীত্বকে, নৈরাশ্যকে প্রতীকায়িত করেছেন তাঁর কবিতার ভাষায়-বাক্যবন্ধে।

মূল শব্দ : অস্তিত্বববাদ, মেটাফিজিক্যাল, দুরূহতা।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা বাংলা আধুনিক কবিতা ধারার মধ্যে একটি স্বতন্ত্র সংযোজন। কবিতার বিষয় নির্বাচন, গঠন প্রণালী ও শব্দ নির্বাচনে কবির শিল্প-নৈপুণ্য সমকালের কাছেও সমানভাবে বিস্ময়কর। বাংলা আধুনিক কবিতার যাত্রাপথে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত একজন অনন্য কিংবদন্তি। সুধীন্দ্রনাথের পাঠক কখনোই সাধারণ অভিজ্ঞানে তাঁকে স্পর্শ করতে পারবেন না। তিনি কবিতাকে, তার ভাষাকে কখনোই সাধারণের মতো করে সরল অভিজ্ঞানের সহজ সমীকরণে নির্মাণের পক্ষপাতী কখনোই ছিলেন না। তাঁর মতে 'কালজ্ঞান ভিন্ন' কবির যেমন গত্যান্তর নেই, তেমনি পাঠককেও কবিতার জন্য, কবিতার ভাব-অর্থ হৃদয়াঙ্গম করার জন্য কবিতার পটভূমিও জানা প্রয়োজন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষা ও গঠন প্রণালী সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ 'আকাশ প্রদীপ' গ্রন্থের উৎসর্গ পত্রে তাঁর কাব্য প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়েছেন—'বয়সে তোমাকে অনেক দূরে পেরিয়ে এসেছি তবু তোমাদের কালের সঙ্গে আমার যোগ লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছে এমনতর অস্বীকৃতির সংশয়বাক্য তোমার কাছ থেকে শুনিনি। তাই আমার রচনা তোমাদের কালকে স্পর্শ করবে আশা করে এই বই তোমার কাছে এগিয়ে দিলুম। তুমি আধুনিক সাহিত্যের সাধনক্ষেত্র থেকে গ্রহণ করো।' বুদ্ধদেব বসুও সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাকে দুর্বোধ্য নয়, দুরূহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। আসলে সুধীন্দ্রনাথ তাঁর সময়কালকে দেখেছেন বিশ্ব ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, তাই স্বভাবতই তাঁর কবিতার বিষয় ও

ভাষা নির্বাচনে দুর্বোধ্যতার ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে। 'সংবর্ত' কাব্যের 'যযাতি' কবিতায় কবির সেই বিশ্ব চেতনা ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠেছে—

'জাতিভেদে বিবিক্ত মানুষ;
নিরঙ্কুশ একমাত্র একনায়কেরা। কিন্তু তারা
প্রাচীর, পরিখা, রক্ষী, গুপ্তচর ঘেরা প্রসাদেও
উন্নিদ্র যেহেতু, তাই ভগ্ন সেতু নদীতে নদীতে,
মরু নগরে নগরে।' (যযাতি/সংবর্ত)

—এক অনিশ্চয়তা, দুশ্চিন্তা আচ্ছন্ন কবির চেতনালোকে, বিশ্বযুদ্ধের অনির্দেশ্য অভিঘাতের শঙ্কাও শঙ্কিত করে কবিকে—'সংবর্ত' কাব্যের '১৯৪৫' শীর্ষক কবিতায় কবির সেই অনুভূতির প্রকাশ—

'শূন্যে ঠেকেছে লাভে লোকসানে মিলে,
ক্লান্তির মতো শান্তিরও অনিকাম।
এরই আয়োজনে অর্ধশতক ধ'রে,
দু-দুটো যুদ্ধে, একাধিক বিপ্লবে;
কোটি কোটি শব পচে অগভীর গোরে,
মেদিনী মুখর একনায়কের স্তবে!' (১৯৪৫/সংবর্ত)

আর এই সকল দুঃসময়, অসময়ের আহ্বানের মধ্যে অপমানিতের অশ্রুনীরের তীব্র হাহাকারে যখন সারা বিশ্ব স্তব্ধ, তখন কবির অনুভূতি—মানুষ কি সুখে আছে? নিশ্চয় সুখে নেই। কবির অনুভবে সেই অচলবস্থার চরম অভিঘাত—'সংবর্ত'র 'নান্দীমুখ' কবিতায়—

'তার স্বাধিকার আগে ফিরে দিতে হবে;
নতুবা নগর, তথা প্রান্ত,
ভ'রে রবে বাসি শবে।' (নান্দীমুখ/সংবর্ত)

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় একই সঙ্গে সমকালীন বিশ্ব ইতিহাসের প্রেক্ষিত ও দেশীয় সংস্কৃতির রুচিহীনতারও ছবি প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর ফ্যাসিবাদ বিরোধী মনোভাব ব্যক্ত হয়েছে 'প্রত্যাবর্তন' এ—

'অনুবিদারণে শত সহস্র মানুষ হত,
ব্যক্ত অভিব্যক্তিবাদের ফাঁকি;
বেতালগ্রস্ত বিকলাঙ্গের দুষ্ট ক্ষত,
পরিত্যাজ্য হিরোশিমা, নাগাসাকি।' (প্রত্যাবর্তন/সংবর্ত)

ব্যক্তি প্রেম-অপ্রেমের সরলরৈখিক গতিপথ থেকে কবির মন ও মনন পৌঁছে যায় বিশ্ব সংকটের বহুমাত্রিকতায়—'সংবর্ত'-এ কবির সেই অভিজ্ঞান—

'হয়তো তখনই
উপশয়ী সংবর্তের আড়ালে অশনি
লেলিহান করবালে ধার দিতে শুরু করেছিল।
প্রবাদের ধুয়ো ধরেছিল
তৎপূর্বে অন্তত
মুসোলীনি যুদ্ধগামী বর্বরে মতো'; (সংবর্ত/সংবর্ত)

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যমন নির্মিত হয়েছিল একই সঙ্গে ভারতীয় দর্শন-সাহিত্যের প্রতি গভীর অনুরাগে, যেখানে সংস্কৃত ভাষা ও শব্দের প্রতি ছিল তাঁর তীব্র আসক্তি। এবং তাঁর সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছিল পাশ্চাত্য দর্শন-শাস্ত্রের প্রতি গভীর আকর্ষণ। তিনি তাঁর কাব্যের ভাষা ও শব্দ নির্মাণে যে দুরূহ ও আভিধানিক শব্দপ্রয়োগ করেছেন তা ছিল তাঁর স্বেচ্ছাকৃত। তিনি স্থির প্রজ্ঞায় উপলব্ধি করেছিলেন পাশ্চাত্য আধুনিক কাব্য আন্দোলনকে। টি. এস. এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, স্পেনডার, ডি. এইচ. লরেন্স, হুইট ম্যান, রিলকে, হাইনে, মালার্মে,পল ভালেরি যেমন একদিকে তাঁর কাব্য রচনার প্রেরণা, তেমনি অন্যদিকে কালিদাস, ভবভূতি, রবীন্দ্রনাথকেও তিনি আত্মস্থ করেছেন তাঁর প্রগাঢ় ধী-সত্তায়। সে কারণে একই সঙ্গে তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়েছে পাশ্চাত্য সাহিত্য আন্দোলনের অস্তিত্ববাদ (Existentialism), বিচ্ছিন্নতাবাদ (Alienation), চিরমুহূর্তবাদ। এবং তার পাশাপাশি আমাদের প্রাচ্যের সোহংবাদ, বৌদ্ধ দর্শনের ক্ষণবাদ—প্রভৃতি দর্শন ও তত্ত্বের সম্পৃক্তায়ন তাঁর কবিতার শরীর নির্মাণে সহায়ক হয়ে উঠেছে। এক ধ্রুপদী গাম্ভীর্যের অন্তরালে তিনি তাঁর কাব্যের রোমান্টিক মননকে সংরূপ দিয়েছেন মুক্ত ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উদ্দীপ্ত চিন্তায়। সমকালীন সমাজ-মানসের বিপর্যয়জনিত হতাশা, ক্লান্তি, স্বপ্নভঙ্গের বেদনাকে, মানুষের বিচ্ছিন্নতাবোধের তীব্র একাকীত্ব ও নৈরাশ্যকে নানাভাবে প্রতিকায়িত করেছেন তাঁর কবিতার ভাষায়, বাক্যবন্ধে।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত অস্তিত্ববাদী দর্শনে বিশ্বাসী। তাঁর অস্তিত্ববাদ একই সঙ্গে অস্তিত্ববাদী ও নাস্তিত্ববাদী। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় বারবার উঠে এসেছে মানবসত্তার চেতনার বা অস্তিত্বের অনুভূতি। ক্ষণবাদী চিন্তা-চেতনার আবেশে লালিত সুধীন্দ্রনাথ সময় ও সমাজের অহেতুক কলঙ্কের গ্লানিকে উপলব্ধি করেছেন অনির্দেশ্য এক বিষণ্ণতাবোধে। জীবনানন্দ দাশ সুধীন্দ্রনাথের মধ্যে প্রথম লক্ষ্য করেন তাঁর চৈতন্যবাদী বা অস্তিত্ববাদী মননকে। জীবনানন্দের কথায় 'তিনি আধুনিক বাংলা কাব্যের সবচেয়ে বেশি নিরাশকরোজ্জ্বল চেতনা।'[১] অর্থাৎ, 'নিরাশকরোজ্জ্বল' শব্দ বা বিশেষণটি এই অর্থে বিশেষ প্রযুক্ত যে, জীবনানন্দ সুধীন্দ্রনাথ সম্পর্কে একই সঙ্গে 'নিরাশা', 'উজ্জ্বল', ও 'চেতনা' তিনটি শব্দকে এক রেখায় অত্যন্ত সচেতনভাবে

প্রয়োগ করেছেন। সুধীন্দ্রনাথ নৈরাশ্যবাদী নন, বরং নৈরাশ্যহীন উজ্জ্বল নাস্তিত্বই তাঁর কাব্যের প্রাণ। তাঁর মনন অস্তিত্ববাদী দর্শনের ভূমিতে নিবিষ্ট। সুধীন্দ্রনাথের কাব্যে বরাবরই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার প্রাধান্য। এই দার্শনিক সত্তা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। জগন্নাথ চক্রবর্তী সুধীন্দ্রনাথের কাব্যধর্মের বিশেষত্ব প্রসঙ্গে, তাঁর এই প্রত্যক্ষ জীবন দর্শন সম্পর্কে বলেছেন—

"প্রবন্ধে, পত্রে বা আত্মজবানিতে তিনি যাই লিখে থাকুন না কেন, সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত অস্তিত্ববাদী। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ও অনুভবের প্রাধান্য বজায় রেখেই তার যা কিছু দার্শনিকতা। ক্ষণবাদ, ভোগবাদ, অনেকান্তবাদ, শূন্যবাদ, সোহংবাদ ইত্যাদি নানা নামে অভিহিত হলেও কবি সুধীন্দ্রনাথের দার্শনিকতা অস্তিত্বাশ্রয়ী মনোভূমিতেই বিশেষভাবে প্রতিষ্ঠিত। দর্শনে অস্তিত্ববাদী এবং কাব্য প্রকরণে মেটাফিজিক্যাল, এই হচ্ছে কবি সুধীন্দ্রনাথের পরিচয়।"[২] সুধীন্দ্রনাথের এই জীবন দর্শন শুধুমাত্র পাশ্চাত্য কবি দার্শনিকের প্রভাবে নয়, তা তাঁর নিজস্ব জীবন অভিজ্ঞতার ফসল। একদিকে রবীন্দ্র ঐতিহ্যের প্রতিবেশ, তার সঙ্গে যুগ-চেতনার তীব্র টানাপোড়েন তাঁকে নতুন জীবনবোধে উন্নীত করেছিল—

'তোমার ভ্রূকুটি তাই শতমুখী চাবুকের মতো
গগনে আভাসে
তোমার আকাশবাণী রুদ্র রবে সম্প্রতি জাগ্রত
কুলিশে প্রকাশে,
তোমার উড্ডীন কেশ, ধৃতফণা নাগিনীর প্রায়
ব্যাপ্ত নভে নভে, তোমার সন্তপ্ত শ্বাস বেনুবনে আতঙ্ক জাগায়
বিপুল আরাবে।।" (চিরন্তনী/তন্বী)

অথবা 'তন্বী' কাব্যের 'অপলাপ' কবিতায়—

'আমি তব নাম ল'য়ে করেছিনু খেলা;
ভেবেছিনু মরণের অভিনয় করা
পরম গৌরব বুঝি; বলেছিনু, "জরা,
রাগহীন, শক্তিহীন স্তিমিত একেলা,
নাচি যাচি; সহিব না জীবনের হেলা,
প্রণয়বাসনারিক্ত দিন গ্লানিভরা,
যৌবনের ব্যর্থ চেষ্টা, তার চেয়ে ত্বরা
আসুক অনুভূতি মৃত্যু এই বেলা।' (অপলাপ/তন্বী)

রবীন্দ্র সমসাময়িক ও রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে কাব্য প্রকরণে একমাত্র সুধীন্দ্রনাথ দত্তই পুরোপুরি মেটাফিজিক্যাল মেজাজ ও রীতির প্রবর্তনা করেন

তাঁর কাব্যে। সুধীন্দ্রনাথের আগে যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত ও মোহিতলাল মজুমদার মেটাফিজিক্যাল-এর ফর্ম নিয়ে চর্চা শুরু করলেও তা ছিল বাংলা কাব্যের এক নব দিগন্ত সম্ভাবনা মাত্র। সুধীন্দ্রনাথে এসে সে সম্ভাবনার সিদ্ধি। মেটাফিজিক্যাল অর্থে শুধুমাত্র কবিত্বের সম্ভাবনার স্ফূরণমাত্র নয়, নয় স্বভাবজাত কবিতার চর্চা; মেটাফিজিক্যাল কবি তাঁর পাণ্ডিত্যের প্রচণ্ড ধী-শক্তিতে আত্মস্থ হয়ে হৃদয়বত্তার উৎসার ঘটান তাঁর কবিতায়। অধ্যাপক জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রাসঙ্গিক ভাবে সুধীন্দ্রনাথের মেটাফিজিক্যাল দার্শনিক সত্তার বিষয়ে আলোচনার সাপেক্ষে বলেছেন—

"মেটাফিজিক্যাল কবিতার প্রেম প্রথম দর্শনেই 'তদিদং হৃদয়ং তব' নয়, প্রেম সন্দিগ্ধ ও বিপর্যস্ত, স্বত-উৎসারিত না হয়ে স্থগিত বা ব্যাহত আবেগের সংকটে পীড়িত। মেটাফিজিক্যাল কবিতা মেধাবী কবির মেধাশ্রয়ী কবিতা।"[৩] সুধীন্দ্রনাথের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য অবশ্যই তাঁর কবিতার শরীরকে নির্মাণ করেছে, কবির ভাষায় 'দুর্বোধ্য' ভাবে। কিন্তু তাঁর মেটাফিজিক্যাল ভাবাদর্শের সঙ্গে, একই সঙ্গে কবিতায় এসেছে ব্যক্তিগত জীবন অভিজ্ঞতার চিরন্তন প্রক্রিয়াও। তাই বলা যায় সুধীন্দ্রনাথের কবিতা মেটাফিজিক্যাল হলেও কবির একান্ত আবেগের ক্ষেত্রও এখানে জায়গা পেয়েছে সাবলীল ভাবে। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শব্দ কেবলমাত্র কবিতার ধ্বনিসাম্য রক্ষার জন্য নয়, শব্দ এখানে চিন্তন এক একটি নতুন ভাষ্য নিয়ে হাজির। তাই বুদ্ধদেব বসুর মতে, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতার দুরূহতার কারণ তাঁর কবিতার অপ্রচলিত তৎসম শব্দের বহুল ব্যবহার। তাই অভিধান খুলে অর্থ জেনে নিলে কবিতাপাঠের পর পাঠকের মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের প্রতিবেশ তৈরি হয়। এবং এক আত্মগত অনুভূতির রসে পাঠক সুধীন্দ্রনাথকে অনুভব করে পরম আনন্দে। তখনই সুধীন্দ্রনাথ পাঠের সার্থকতা ফুটে ওঠে।

শুধুমাত্র আত্মগত চেতনার স্ফূরণ নয়, কবির শব্দচয়ন ও শব্দ বিন্যাসে বারবার প্রতিধ্বনিত হয়েছে শান্ত-নিসর্গ পরিবেশের স্নিগ্ধতার মধ্যে ব্যক্তি জীবনের নিভৃত হৃদয় সংবেদনের সুষমা। কিন্তু সেই আবেগের অনুভবও বাইরের অশুভ শক্তির পদসঞ্চারে ত্রস্ত; রাষ্ট্রিক স্বার্থের প্ররোচনায় ভেঙে যায় স্নিগ্ধতার প্রতিবেশ। সুধীন্দ্রনাথ তাঁর কাব্যে দেশ-কাল-বিশ্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত ধ্বনিত করেছেন এক প্রবল উৎকণ্ঠা ও বিহ্বলতা নিয়ে। তিনি সমকালীন ইতিহাসকে দেখেছেন—

'কখনও কখনও মনে হয় যেন চিনি—
বিদ্যুতে লেখা হেন রূপরেখা
চীনে পটে বন্দিনী।
স্পেনেও হয়তো অমনই অঙ্গভঙ্গি

চিত্রার্পিত অসংহতির সঙ্গী;
সেখানেও আজ নিভৃত বিলাস লঙ্ঘি,
পশে উপবনে পরদেশী অনীকিনী।' (নান্দীমুখ/সংবর্ত)

আবার সমকালীন বিশ্বযুদ্ধের আবহে কবি হৃদয়ে দ্বন্দ্বের অন্যরূপ—

'বুঝেও বুঝি না নিরাকার আঁখি কী সাধে,
প্ররোচিত করে ত্যাগে, না অঙ্গীকারে।
মাগে প্রতিশোধ, মানায় প্রবোধ,
অনিকেত অভিসারে।।" (নান্দীমুখ/সংবর্ত)

—সঙ্গে সঙ্গে অত্যাচার অনাচারের হাহাকারের মধ্যে কবি শুনতে পান 'আশার অলকানন্দা'কে—

'ডরায় না ব্যাধি, মৃত্যু, জরা,
চিতার স্ফুলিঙ্গযোগে জীবনের দীপপরম্পরা
জ্বালায় সে নিবিষাদ নির্বাণের আগে।
অক্ষয় মনুষ্যবট নির্বিকার যে-প্রাণপরাগে
বিকশিত আশুক্লান্ত নির্বিশেষ, ফলে,
সে-অনাম চিরসত্তা খুঁজি আমি নিজের অতলে।।" (সন্ধান/ক্রন্দসী)

সুধীন্দ্রনাথের কাব্য-কবিতা আধুনিক বাংলা কবিতার শিল্পতত্ত্ব বিষয়ক একটি নির্দশন বা নতুন দিক হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে। দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালীন যুগ চেতনার সংলাপ তাঁর কবিতা। অবশ্যই ব্যতিক্রমী শৈল্পিক প্রকরণ নিয়ে। একদিকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের উত্তরসূরী হিসেবে বাংলা কাব্যের চেনা পথ অতিক্রম করে, কবিতাকে অন্যধারায় সীমায়িত করেছেন, অভিযোজিত করেছেন অন্য সংরূপে। রবীন্দ্র পরবর্তী নব্য রোমান্টিক প্রকরণের অনুধ্যান করেছেন তিনি। প্রাচ্যের পাশাপাশি পাশ্চাত্যের কবিদের কাব্যদর্শনকে গ্রহণ করলেও প্রকাশ ভঙ্গিমায় মৌলিকত্ব দেখিয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ স্তেফান মালার্মের কবিতা পাঠ করেছেন, তাঁর কবিতার শিল্প প্রকরণে প্রাণিত হয়েছেন। এমন কি মালার্মের থেকে ভাব প্রকরণের ঋণ স্বীকারও তিনি করেছেন। তিনি মালার্ম, এলিওট প্রমুখের সঙ্গে একাত্মতাও অনুভব করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের প্রিয় কবি ছিলেন মালার্মে। মালার্মের কবিতার শব্দ চয়ন, বাক্য নির্মাণ, ক্রিয়া পদের ব্যবহার, কঠিন শব্দের অবতারণা সুধীন্দ্রনাথের কবিতার শরীরেও লক্ষ্য করা যায়। সুধীন্দ্রনাথের স্বাতন্ত্র্য চিহ্নিত কাব্য প্রকরণে পাশ্চাত্য প্রভাব থাকলেও সেখানে থেকে তিনি নিজেকে আলাদা করেছেন নিজস্ব শৈলী চয়নে। অর্থাৎ সুধীন্দ্রনাথ ভালেরি-মালার্মের থেকে ভাব প্রকরণের অনেকদূর অতিক্রান্ত। তাই সুধীন্দ্রনাথ যখন লেখেন,—

'একটি কথায় দ্বিধাথরথর চূড়ে
ভর করেছিল সাতটি অমরাবতী;
একটি নিমেষ দাঁড়াল সরণী জুড়ে,
থামিল কালের চির চঞ্চল গতি;
একটি পণের অমিত প্রগলভতা
মর্ত্যে আনিল ধ্রুবতারকারে ধ'রে;
একটি স্মৃতির মানুষী দুর্বলতা
প্রলয়ের পথ ছেড়ে দিল অকাতরে।' (শাশ্বতী/অর্কেস্ট্রা)

—এই ভাবের বন্ধন শুধুমাত্র সুধীন্দ্রনাথের। ভালেরি বা মালার্মের নয়। কবিতার এমন সাবলীল-স্বচ্ছন্দ বিচরণ একান্তই শুধীন্দ্রীয়। কবির এই মেজাজের স্বকীয় চলন তাঁর মেটাফিজিক্যাল অবস্থানকে স্বীকৃতি দেয়। দীপ্তি ত্রিপাঠী মালার্মের সঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের যোগসূত্র প্রসঙ্গে বলেছেন—

"মালার্মের প্রতি সুধীন্দ্রনাথের আকৃষ্ট হবার প্রধান কারণ তাঁর অভিজাতসুলভ উন্নাসিকতা, সংহত স্বল্পভাষ, ব্যঞ্জনাময় প্রকাশশৈলী, শব্দের অভিধানগত অর্থের বিনষ্টি এবং সর্বোপরি তাঁর বিষণ্ণ নেতিবাদী জীবনদর্শন। হয়ত দুরূহতাও।"[৪]

মালার্মে কাব্যকে এমন একটি স্বকীয় চেতনা প্রবাহরীতির মাধ্যম বলে মনে করতেন, যেখানে তিনি শিক্ষিত ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষা সাধারণ স্থূল রুচির পাঠকের অনুপ্রবেশকে অগ্রাধিকার দিতে রাজি ছিলেন না। তিনি বিশ্বাস করতেন কবিতা সাধারণ পাঠকের জন্য নয়। কবিতাকে আস্বাদন করতে মেধার প্রয়োজন। কবিতার রহস্যময় চক্রে তিনি অদীক্ষিত জনসাধারণের প্রবেশ স্বীকার করতে না।' সুধীন্দ্রনাথও তাঁর কাব্যের শিল্প প্রকরণে মালার্মের এই দুর্বোধ্য পথকে বেছে নিয়েছেন। প্রসঙ্গত দীপ্তি ত্রিপাঠী আরও বলেছেন—

"প্রকরণ শিল্পে সুধীন্দ্রনাথ মালার্মেকে অনুসরণ করেছেন। মালার্মে যেমন সব সময় প্রত্যেকটি শব্দের উপর জোর দিতেন এবং তাদের এমন ভাবে সাজাতেন যে সম্ভাব্য অর্থের কোনো দ্যোতনাই বাদ না পড়ে, তাদের সূক্ষ্মতম ব্যঞ্জনাও ধরা পড়ে।"[৫]

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়ও তারই প্রতিরূপ -

'সন্তপ্ত হবে না কভু সঙ্গিনীর শ্লিষ্ট সহবাসে।
বিতরি উন্মাত্র সিদ্ধি পাশব উল্লাসে
বৃংহিত গণেশ হেথা মিটাবে না জনতার তৃষা।
নিরঞ্জন, নিত্য মহানিশা
হারাবে না পবিত্রতা নৈমিত্তিক ক্রিমির প্ররোহে।

গৃধ্রের কলহে
শূন্যের নির্গুণ শান্তি টুটিবে না কখনও কিছুতে।' (মৃত্যু/ক্রন্দসী)

মালার্মের নেতিবাদী জীবনদর্শন অনুপ্রাণিত করেছিল সুধীন্দ্রনাথকে। মালার্মের গোরস্থান, কবর, মৃত্যু,ভাঙা জাহাজ, অবসাদ যেমন তাঁর কবিতার morbidity সত্তার এক একটি চালিকা শব্দ, সুধীন্দ্রনাথের কবিতার মধ্যেও সেই একই অনুষঙ্গ—মরুভূমি, নরক, শব, পিশাচ, বভ্রুজ্বালা প্রভৃতি। 'মালার্মের শূন্যতা, যন্ত্রণা, মৃত্যু, অন্তর্ধান, বস্তুর বহিরঙ্গ নয়, অন্তঃসারকে আভাসে ইঙ্গিতে ফুটিয়ে তোলা। অর্থাৎ ঐ বস্তুটিকে নয়, বস্তুটি মনের উপর কি ধরনের প্রতিক্রিয়া উৎপন্ন করল বা ছাপ ফেলল তার বর্ণনা—এই সবই সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় যথেষ্ট রয়েছে।'[৬] মালার্মে ভগ্ন তরীর চিত্রকল্প নির্মাণ করেছেন—

"And perhaps the masts, tempests
Are of those which a wind bend over shipwrecks
Lost, without masts, without mast, or fertile isles
But oh my heart listen to the sailor's song!" (Brise Marine)

—এরই প্রতিচিত্রায়ন সুধীন্দ্রনাথে —

"অবশ্য প্রতিকার্য অন্তিম কুম্ভক :
অনন্তার্য নাস্তির কিনারা :
বৈকল্যের ষড়যন্ত্রে তুল্যমূল্য তুঙ্গী ধ্রুবতারা
ও মগ্ন চুম্বক।।

তথাচ অভাবে যবে তলাবে নাবিক,
তখনই তো স্মৃতির বিদ্যুতে
পাবে সে নিজের দেখষ, তার পড়ে মিশ আদিভূমে,
হবে স্বাভাবিক।" (নৌকাডুবি/দশমী)

আবার 'ভ্রষ্টতরী'তে সেই একই চিত্রকল্প—

"একদা কত কী ভর করেছিল তাতে—
স্বপ্ন ও স্মৃতি, পর্বত পরিমান :
মহার্ণবের দারুণ ঝঞ্ঝাবাতে
কিঞ্চিৎও শেষে পায়নি পরিত্রাণ

মাস্তুল ডেকে এনেছিল অশনিকে;
পালে জেগেছিল কেবল ত্রাহিস্বর;
ভেঙেছিল হাল : সর্বনাশের দিকে—
গতি হয়েছিল অবাধ অতঃপর।।' (ভ্রষ্টতরী/দশমী)

আবার মালার্মের দার্শনিক সত্তায় যেখানে চৈতন্যকে বার বার বিসর্জন দেওয়ার কথা এসেছে সেখানে ভালেরি আশ্রয় করেছেন চৈতন্যকে। সুধীন্দ্রনাথও চৈতন্যকে আশ্রয় করেছেন তাঁর চেতনা প্রবাহে। 'সংবর্ত' এ তারই প্রকাশ—

'নিখিল নাস্তির মৌনে সোহংবাদ করেছি ধ্বনিত :
বলেছি আমি সে আত্মা, যে উত্তীর্ণ দুরন্ত তারায়
উদাত্ত মনের আগে; মতারিশ্বা নিয়ত ধারায়
ফলায় যে কর্মফল, তা আমারই বুভুক্ষাজনিত'; (সোহংবাদ/সংবর্ত)

সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় নেতিবাচকতার পাশাপাশি এক তীব্র মুক্তিলাভের আকাঙ্ক্ষার প্রতি ব্যাকুলতাও প্রকাশমান হয়ে ওঠে। "অর্কেস্ট্রায় সুদীন্দ্রনাথ হাহাকার করেছেন অতীত ভবিষ্যৎ হারিয়ে সর্বস্বান্ত বর্তমানে দাঁড়িয়ে প্রেমকে অন্তরীক্ষে চলে যাবার নির্দেশ দিয়েছেন। 'ক্রন্দসী'র মধ্যে কবির সেই হতাশাই তীব্র ও তীক্ষ্ণ হয়ে আছে। তবে তাঁর সঙ্গে সহজ বিশ্বাসের কোন আশ্রয়ের প্রতি উন্মুখীনতাও দেখা দিয়েছে।"[৭] সুধীন্দ্রনাথ সেই লগ্নভ্রষ্ট অবক্ষয়ের মধ্যেও পৌঁছতে চাইছেন বিশ্বাসের মরুদ্যানে। হতাশার, বিষণ্ণতার পাশাপাশি 'উটপাখি' কবিতায় কবির সেই বিশ্বাস খোঁজা—

'ক্ষয়ে ক্ষ'য়ে ছায়া ম'রে গেছে পদতলে।
আজ দিগন্তে মরীচিকাও যে নেই;
নির্বাক, নীল, নির্মম মহাকাশ।
নিষাদের মন মায়ামৃগে ম'জে নেই;
তুমি বিনা তার সমূহ সর্বনাশ।
কোথায় পালাবে?' (উটপাখি/অর্কেস্ট্রা)

এই আক্ষেপের পরেই অবক্ষয়ের জীবন শেষ না করে কবির আকাঙ্ক্ষা—

'তুমি তো কখনও বিপদ্‌প্রাজ্ঞ নও।
নব সংসার পাতিগে আবার চলো।
যে-কোনও নিভৃত কণ্টকাবৃত বনে।
মিলবে সেখানে অত্যন্ত নোনা জলও
খসবে খেজুর মাটির আকর্ষণে।' (উটপাখি/অর্কেস্ট্রা)

আসলে সুধীন্দ্রনাথের মালার্মের প্রতি তীব্র আসক্তির মূল কারণ তাঁর অভিজাতসুলভ মানসিকতার গঠন, প্রকাশের ব্যঞ্জনাময়তার প্রতি অনুরাগ, শব্দের গভীরার্থের দ্যোতনা এবং নেতিবাচক জীবনদর্শনের প্রতি তাঁর মমত্ব। তাই সুধীন্দ্রনাথ

পাশ্চাত্য থেকে রস নিলেও স্বতন্ত্র পথ নির্মাণে তাঁর সিদ্ধিলাভ। তিনি তাঁর কাব্যের প্রতিবেশকে ন্যায় ও যুক্তির আবহে লালন করেছেন। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিশেষত্বের অন্যতম দিক—"মালার্মের অপ্রচলিত শব্দ স্বল্পই ব্যবহার করেছেন, সুধীন্দ্রনাথের শব্দ ভাণ্ডার প্রধানত অপ্রচলিত তৎসম ও সংস্কৃত শব্দাবলী হ'তে আহরিত। সে কারণে মালার্মের দুর্বোধ্যতার প্রকৃতি ও সুধীন্দ্রনাথের দুর্বোধ্যতার প্রকৃতি ভিন্নরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে।"[৮] সুধীন্দ্রনাথ তাঁর 'স্বগত' গ্রন্থে কবিতার ভাষা ও শব্দ সম্পর্কে বলেছেন "শব্দের স্বভাব টাকার মতো; বহু ব্যবহারে তা ক্ষ'য়ে যায়। হস্তান্তের তাতে কলঙ্ক জমে, বয়স তাকে অচল করে; আবার কালে সে স্থান পায় জাদুঘরের গ্লাসকেসে। কিন্তু ম্যুজিয়ম ভুক্তি বিলুপ্তির নামান্তর নয়; অপ্রচলিত শব্দও অবস্থা বিশেষে কাজে লাগে।"[৯] সুধীন্দ্রনাথের কবিতার বিযুক্তিবোধ ও বিষাদকে শামসুর রহমান যথার্থই সম্মান জানিয়েছে—"অন্যান্য বাঙ্গালী কবির কবিতায় নিঃসঙ্গতার ছাপ নেই একথা বলি না; কিন্তু নিঃসঙ্গতার ধ্বনি সবচেয়ে প্রবল এবং ব্যাপক সুধীন্দ্রনাথ দত্তেরই কাব্যে; আর কার কবিতায় নয়।"[১০]

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বাস্তববাদী কবি। তাঁর তাত্ত্বিক দৃষ্টিতে কখনোই তিনি নাস্তিক্যবাদী, শূন্যবাদী বা অহংবাদী ছিলেন না তিনি বাস্তব জগতের বিষয়-বিষয়ীর মধ্যে খুঁজে পেতেন তাঁর দার্শনিক মননের চলাচলকে। তাঁর গভীর মননে বৃহত্তর সমাজ বাস্তবতাকে আত্মস্থ করে যে স্বতন্ত্র বীক্ষণটি গড়ে তুলেছিলেন সেখানে ছিল তাঁর ব্যক্তি চৈতন্যের নতুন আবিষ্কার। এক শুদ্ধ চেতনার চিরায়ত সৌন্দর্যের রূপকার তিনি। তাঁর কবিতায় বিষয় ও ভাষা কখনোই রূঢ় বাস্তবের নিষ্ঠুরতা থেকে পলায়ন করেনি। রূঢ় সত্যের প্রতি একাগ্রতাই তাঁর ভাবনায়, তাঁর কবিতার চলন—

'অতএব কারও পথ চেয়ে লাভ নেই :
অমোঘ নিধন শ্রেয় তো স্বধর্মেই;
বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী।
অনুমানে শুরু, সমাধা অনিশ্চয়ে,
জীবন পীড়িত প্রত্যয়ে প্রত্যয়ে:
তথাচ পাব না আমি আপনার দেখা কি? (প্রতীক্ষা/দশমী)।

তথ্যসূত্র :

১। জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা (উত্তর বৈরিক বাংলা কাব্য), সিগনেট প্রেস, কলকাতা, ১৯৮৫, পৃষ্ঠা : ৩৮

২। জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৫
৩। জগন্নাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪, পৃষ্ঠা : ৬
৪। দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা : ২১১
৫। দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা : ২১২
৬। মঞ্জুভাষ মিত্র, সুধীন্দ্রনাথ এবং মালার্মে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবন ও সাহিত্য (ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণী, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা : ৪৯৪
৭। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, 'ক্রন্দসী'র কবি : উদ্বিগ্ন নচিকেতা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবন ও সাহিত্য (ধ্রুব কুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত), পুস্তক বিপণি, কলকাতা, ২০০২, পৃষ্ঠা : ৭৪৩
৮। দীপ্তি ত্রিপাঠী, আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা : ২১৭
৯। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'স্বগত', দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৭৬, পৃষ্ঠা : ২৯
১০। শামসুর রহমান, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিরূপ বিশ্বে মানুষ নিয়ত একাকী (নিরঞ্জন হালদার সম্পাদিত), রামায়ণী প্রকাশ ভবন, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃষ্ঠা : ৪০।

আকর গ্রন্থ :

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের শ্রেষ্ঠ কবিতা, (জগন্নাথ চক্রবর্তীর সম্পাদিত), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১৪

লেখক পরিচিতি :

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী, বিশ্ববিদ্যালয়।

‘বনপলাশির পদাবলী’ : যৌথ কৃষ্টির বিন্যাস থেকে বিপর্যয়

সুরজিৎ বেহারা

সারাংশ :

‘বনপলাশির পদাবলী’ (১৯৬২) উপন্যাসে রমাপদ চৌধুরী যে নির্মাণ-মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তা কিছুটা নিজের সঙ্গে চ্যালেঞ্জ নিয়েই। কারণ তিনি সে অর্থে গ্রাম দেখেননি। রেল-শহর খড়গপুর থেকে ক্রমশ যখন তিনি বাইরের পৃথিবীতে পা বাড়িয়েছেন, এই অচেনা গ্রাম-জীবনের রহস্য তখন থেকেই তাঁর জীবনে ধীরে ধীরে তৈরি করে নিয়েছে একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এরপর তাঁর মননে গ্রাম সম্পর্কে গড়ে ওঠে একটি নির্বিশেষ দর্শনবোধ—‘আমাদের নিজেদেরও একটি গ্রাম ছিল, থাকারই কথা, কারণ কলকাতা শহরটাই তো এই সেদিনের। গ্রাম থেকে আসা মানুষগুলোই এ-শহরে এসে শহুরে হয়েছে। তফাত এই, সে-কথাটাই তারা ভুলে গেছে।’ সেই বিস্মৃতিকে খুঁজতেই যেন উপন্যাসটি হয়ে ওঠে লেখকের পথে নামার ডকুমেন্টারি। পরবর্তী জীবনে যত গ্রাম তিনি দেখেছেন, সে-সবেরই যেন একটা সম্মিলিত চেহারা বনপলাশি। বনপলাশি পশ্চিমবঙ্গেরই কোনো গ্রাম। বিশেষত তা কাটোয়া-বর্ধমান সংলগ্ন একটি অঞ্চল। গ্রামের মানুষ সেই আগের সময়ের মতো এখানে আর আকর্ষণবোধ করে না। তার প্রধান কারণ, নাগরিক জীবনের হাতছানি। তাই শরৎচন্দ্রীয় উপন্যাসে গ্রামবাসীরা যে বৈশিষ্ট্যের দোষে দুষ্ট, রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাসে তা চোখে পড়বে না। তবে এতদিন এই বনপলাশি ছায়া-সুনিবিড় মায়া জড়ানো গ্রাম-জীবনের পরিচয় নিয়েই বেঁচে ছিল। এই ছোটো অঞ্চলটি শুধুমাত্র নয়, কাছাকাছি সবগুলি গ্রাম নিয়েই বনপলাশি বলা হত অঞ্চলটিকে। তখন লাল পলাশের বন্যায় রেঙে উঠত সবক’টি গ্রাম; তা থেকেই এমন নামের উৎপত্তি। নানা কথকতায় এই গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ তখন কলরোলে পরিপূর্ণ। তবুও হলুদ রঙের পালকি, টাট্টু ঘোড়া, গোরা সৈনিকের আতঙ্ক মেশানো পদচারণা, এ-সব একদিন স্তব্ধ হলো। বৃদ্ধা অট্টামা বনপলাশির একজন অসাধারণ চরিত্র। উপন্যাসে তার মুখেই এই বদলে যাওয়া জনপদের কথা পাঠকেরা শুনেছেন। সেই কোন অতীতের কথা—যখন বর্ধমান থেকে কাটোয়া পর্যন্ত দুটো উটের গাড়ি চলত। কার্জনার কাছারিতে বা তার আশেপাশে খুন, রাহাজানি ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। অট্টামা তার অদৃশ্য গল্পের সুতোয় সেই অতীতকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে কখনও-বা তাল হারিয়ে

ফেলে। স্মৃতির মধ্যে সেখানে প্রাচীর তুলে দেয় আধুনিকতার বিপত্তি। পাকা রাস্তার নিচে অতীতের সেই নিস্তরঙ্গ জীবন চাপা পড়ে যায়। উনিশ শতকের সমাজতত্ত্ব দিয়ে আজ এই স্বাধীনতা-পরবর্তী গ্রামীণ বাংলার মানচিত্রকে বোঝা সম্ভব নয়। একসময় ভারতীয় গ্রামগুলির প্রসঙ্গে চার্লস মেটকাফ মন্তব্য করেছিলেন, 'গ্রামগুলো হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র যেখানে জীবন ধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই মিলত। বাইরের সঙ্গে তাদের বিশেষ যোগাযোগ করতে হত না। যেখানে কোনোকিছুই টিকে থাকে না সেখানে গ্রামগুলি টিকে আছে।' তবে আজ সেই চরিত্র চোখে পড়বে না। কারণ স্বাধীনতা উত্তর দুটি পঞ্চবার্ষিকীর পরে বাংলার গ্রামগুলি ক্রমশ শহরমুখী হচ্ছে। তার অখণ্ড সত্তা ভেঙে গেছে সেই স্বাধীনতার মুহূর্তেই। তাই অভাব ঢাকতে কেউ কেউ শহরে মুখ লুকোয়। গ্রামীণ স্বার্থ, যে-কথা শরৎচন্দ্র-তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ-মানিকের কলমে স্পষ্ট ছিল; তা থেকে এখনকার গ্রাম অনেক দূরগামী। কারণ আজ আর গ্রামে বিশেষ কিছু অবশিষ্ট নেই। কেবল অট্টামা, গিরিজা, অবিনাশেরা পরিত্যক্ত বনপলাশিতে নিজেদের শিকড় খুঁজে চলে। এই শিকড় ছেঁড়া এবং শিকড় অনুসন্ধানের মাঝখানেই উপন্যাসের ব্যাপ্তি থেকে বিপর্যয় নিহিত। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন তারাই হতে চায় যাদের বাহ্যিক প্রয়োজন, চাহিদা অনেক বেশি। যেমন ধনবান অবনীমোহন চ্যাটার্জী, ট্রেনের ফেরিওয়ালা দামু, ড্রাইভার উদাস বা চাকরি-সন্ধানী হংস চট্টোপাধ্যায়। রমাপদ চৌধুরী জানাচ্ছেন, 'উপন্যাসের চিত্রকাল ষাট-সত্তর বছর, যদিও ঘটনাকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।' অর্থাৎ বিন্দুতে সিন্ধু দর্শনের একটি প্রয়াস গ্রামজীবনকে ঘিরে লেখক এখানে বুনন করেছেন। যে অন্বেষণ আসলে স্বাধীনতা পরবর্তী একজন নাগরিকের গ্রামকে খোঁজার প্রচেষ্টা। বুঝতে চেষ্টা করা, গ্রামের প্রকৃত জীবন স্পন্দনটি কোথায় নিহিত রয়েছে? ঔদাসীন্যকে চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে এক কালের যৌথ কৃষ্টিবদ্ধ বনপলাশিকেও আজ সময়ের নিয়ম মেনে বিপর্যয়ের স্রোতে অবগাহন করতে হয়। রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাস আসলে তাঁর জীবনের ব্যতিক্রমী সত্য সন্ধানের দস্তাবেজ। কারণ তিনি তো প্রথমাবধি গ্রামের আত্মাকে জীবন দিয়ে জানতে চাননি। তিনি চিনেছেন রেল-জীবনের হৃদ স্পন্দন ('প্রথম প্রহর'), অনুভব করেছেন আধুনিক সভ্যতায় হারিয়ে যেতে থাকা সবকিছুর মধ্যে মূল্যবোধ নিয়ে টিকে থাকার দুঃসাধ্য স্ট্রাগলকে ('বীজ')। বুঝেছেন মধ্যবিত্তের নিজস্ব জীবন সংঘর্ষ ('খারিজ') বা খুঁজেছেন নির্লোভ-নিরাসক্ত সাধারণ মানুষগুলির অস্তিত্ব ('ছাদ'); যারা চিরকাল সমাজের ছাদকে ধরে রাখবে। ঠিক তার মাঝেই গ্রামের জীবন তাঁকে হাতছানি দিয়েছে। সে-কারণেই আমরা মনে করি উপন্যাসটি রমাপদ চৌধুরীর ব্যতিক্রমী জীবন-অন্বেষণ। 'বনপলাশির পদাবলী'র তেত্রিশতম

পর্বে অট্টামার অনুভূতির মধ্যেই গ্রামীণ চৈতন্যের সেই উদাসী উপসংহারকে আমরা খুঁজে পাই', ...একজনকে ফেলে আরেকজন চলে গেছে জীবনের অপর পারে; কিন্তু সেসব দুঃখের স্মৃতি মুছে গেছে তার মন থেকে। বেঁচে আছে শুধু সুখের স্বপ্নগুলো।' সবকিছু মিলেমিশে গ্রামীণ অস্তিত্বের শিকড় অনুসন্ধান, গ্রাম পতন এবং আবারও নতুন করে জীবন ও শিকড়ের প্রতি আত্ম-অনুসন্ধানের উপন্যাস এই 'বনপলাশির পদাবলী'। যার অবতলে স্বাধীনতা পরবর্তী সামাজিক পটভূমিকায় গ্রাম পতনের পদধ্বনি নিহিত রয়েছে।

মূল শব্দ : কৃষ্টি, নৃতত্ত্ব, গ্রামপতন, নগরায়ন, পঞ্চবার্ষিকী

মূল প্রবন্ধ :

বনপলাশিতে হিংসা, দলাদলি বা একে অন্যের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা নেই। কেন নেই? সেই জিজ্ঞাসার উত্তরও বোধহয় খুব জটিল নয়। বনপলাশি পশ্চিমবঙ্গেরই একটি গ্রাম। বিশেষত কাটোয়া-বর্ধমান সংলগ্ন একটি অঞ্চল। গ্রামের মানুষ সেই আগের সময়ের মতো এখানে আর আকর্ষণবোধ করে না। তার প্রধান কারণ, নাগরিক জীবনের হাতছানি। তাই শরৎচন্দ্রীয় উপন্যাসে গ্রামবাসীরা যে বৈশিষ্ট্যের দোষে দুষ্ট, রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাসে তা চোখে পড়বে না। তবে একদিন এই বনপলাশি ছায়া-সুনিবিড় মায়া জড়ানো গ্রাম-জীবনের পরিচয় নিয়ে বেঁচে ছিল। এই ছোটো অঞ্চলটিই শুধুমাত্র নয়, কাছাকাছি সবগুলি গ্রাম নিয়েই অঞ্চলটিকে বনপলাশি বলা হত। তখন লাল পলাশের বন্যায় সবকটি গ্রাম রেঙে উঠত; তা থেকেই এমন নামের উৎপত্তি। নানা কথকতায় এই গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপ তখন কলরোলে পরিপূর্ণ। তবুও হলুদ রঙের পালকি, টাট্টু ঘোড়া, গোরা সৈনিকের আতঙ্ক মেশানো পদচারণা, এ-সব একদিন স্তব্ধ হলো। বৃদ্ধা অট্টামা বনপলাশির একজন অসাধারণ চরিত্র। উপন্যাসে তার মুখেই এই বদলে যাওয়া জনপদের কথা পাঠকেরা শুনেছেন। সেই কোন অতীতের কথা—যখন বর্ধমান থেকে কাটোয়া পর্যন্ত দুটো উটের গাড়ি চলত। কার্জনার কাছারিতে বা তার আশেপাশে খুন, রাহাজানি ছিল প্রতিদিনের ঘটনা। অট্টামা তার অদৃশ্য গল্পের সুতোয় সেই অতীতকে বিন্যস্ত করতে গিয়ে কখনও-বা তাল হারিয়ে ফেলে। স্মৃতির মধ্যে সেখানে প্রাচীর তুলে দেয় আধুনিকতার বিপত্তি। পাকা রাস্তার নিচে অতীতের সেই নিস্তরঙ্গ জীবন চাপা পড়ে যায়।

ম্যাকলিওড রেল কোম্পানি বর্ধমান থেকে কাটোয়া অবধি ছোটো লাইনের গাড়ি চালাতে শুরু করে। এখান থেকেই তথাকথিত সভ্যতার কাছে গ্রাম-সমাজ পরাজয় স্বীকার করে নেয়। বনপলাশির অতীত জীবন তার অভিজ্ঞান হারাতে

থাকে। অজগরের মতো ছড়িয়ে যাওয়া রেলপথ তখন মানুষগুলিকে আর ঘরে বেঁধে রাখেনি। বনপলাশিও বদলে গেছে। গ্রামটি তার অখণ্ড সীমাকে হারিয়ে ফেলে আজ কেবলমাত্র একটি 'ছোট্টো গাঁ'। এই ভেঙে পড়াই হয়তো আবহমানকালের নিয়ম। তবে চিরাচরিত গ্রামনির্ভর উপন্যাসের সঙ্গে 'বনপলাশির পদাবলী'কে এক করে ফেলা বোধ হয় ঠিক হবে না। তার কারণ, এখানে যে গ্রামকে কেন্দ্র করে এই উপন্যাস সেই গ্রাম যৌথ জীবননীতির অনুসারী নয়। এখানে মানুষগুলি যেন জন্মগ্রহণই করে শহরে নির্বাসন নেবে বলে। তারা নিজের গ্রামকে বিকল্প বাসভূমি বানিয়ে রেখে আজীবনের আশ্রয় খোঁজে নগরে। তাই বনপলাশির জীবন ও কৃষ্টিকে স্বাধীনতা পরবর্তী প্রেক্ষাপটে ঔদাসীন্যের উপসংহার ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। লেখক এই গ্রাম-জীবনের বদল প্রসঙ্গে জানিয়েছেন, 'এ উপন্যাসে আমি শুধু গ্রামজীবনকে উপস্থিত করতে চাইনি। চেয়েছিলাম স্বাধীনতা-পরবর্তী কালের গ্রামজীবনের ছবিকে পুরোনো দিনের পটভূমির ওপর গড়ে তুলতে।'[১]

যদিও গভীরে গ্রাম পতনের শব্দ শোনা যাচ্ছিল কিন্তু বাইরে থেকে সেই পতন-রোধের কিছুটা চেষ্টাও এখানে বর্তমান। গিরিজাপ্রসাদ সেই চেষ্টার একজন সৈনিক। কলেজ পাশ করা যে-সব যুবক প্রথমদিকে এই বনপলাশির নাম উজ্জ্বল করেছিল, গিরিজা তাদেরই একজন। দেওঘরে হাইস্কুলে শিক্ষকতার মাধ্যমে কর্মজীবন শুরু করে সেখানেই পাঁচশো টাকা বেতনের প্রধান শিক্ষক হিসাবে কর্মজীবন থেকে অবসর। এখন স্ত্রী-পুত্র-কন্যাসহ আবার তার গ্রামে ফিরে আসা। তবে এই মানুষটি কোনোদিনই বৈষয়িক হতে পারেনি। গ্রাম নিয়ে তার মনে মঙ্গলচিন্তা অবশ্যই অছে। কিন্তু সেগুলি কার্যকর করার সামর্থ্য নেই। বরং যে আন্তরিকতা এই গ্রামবাসীদের আজ অস্তমিত; গিরিজাপ্রসাদ সেই আন্তরিক আকর্ষণ নিয়ে গ্রামকে বুঝতে চায়, অনুভব করতে চায়। এখানেই গ্রাম-নগরের প্রবল বৈপরীত্য চোখে পড়ে। একদিকে গ্রামবাসীরা কাটোয়া কিংবা বর্ধমানের উপকণ্ঠে বা মূল শহরের দিকে পা বাড়াতে সচেষ্ট অন্যদিকে গিরিজা পুনরায় মুখ ফেরাতে চায় গ্রামের দিকে। উপন্যাসের দ্বিতীয় পর্বে গিরিজাপ্রসাদের এই প্রত্যাবর্তনের মনস্তত্ত্বটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কোলাহলপূর্ণ জীবন জীবিকার মাঝে মানুষটির জীবনরস নিঃশেষ হয়ে গেছে কিন্তু জীবনের মাঠ ধানে ধানে কখনও ভরে ওঠেনি; সেই ব্যর্থ জীবনকে পরিপূর্ণ করার আকাঙ্ক্ষা নিয়েই তার বনপলাশিতে ফিরে আসা।

এই শিকড় ছেঁড়া এবং শিকড় অনুসন্ধানের মাঝখানেই উপন্যাসের ব্যাপ্তি থেকে বিপর্যয় নিহিত। মূল থেকে বিচ্ছিন্ন তারাই হতে চায় যাদের বাহ্যিক প্রয়োজন-চাহিদা অনেক বেশি। যেমন ধনবান অবনীমোহন চ্যাটার্জী, ট্রেনের

ফেরিওয়ালা দামু, ড্রাইভার উদাস বা চাকরি-সন্ধানী হংস চট্টোপাধ্যায়। আবার জীবনে শিকড়ের সঙ্গে সম্পর্ক যাদের গভীর তারা গ্রামে ফিরে আসে। যেমন গিরিজা কিংবা যুদ্ধ-ফেরত ভিনদেশি অবিনাশ ডাক্তার। তার বাম পা গুলির আঘাতে (ক্ষত হয়ে) বাদ পড়েছে। এই মানুষগুলিই গ্রামে ফিরে আসে। রচনাবলী অন্তর্গত 'প্রসঙ্গ কথা'য় উপন্যাস প্রসঙ্গে লেখকের আলাপ তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে লেখক জানাচ্ছেন, 'উপন্যাসের চিত্রকাল ষাট-সত্তর বছর, যদিও ঘটনাকাল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত।'[২] এই সংক্ষিপ্ত পরিসরে বদলে যাওয়া গ্রামের ছবি চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বিশেষত গিরিজাপ্রসাদের চোখে। যতে কোটাল এই গ্রামের বাসিন্দা। তার গরুর গাড়ি করে মাঠ পার হয়ে গিরিজা যখন বাড়ির দিকে আসছে, চোখে পড়ে ডি.ভি.সি.'র ইলেকট্রিক তারের সারি সারি স্তম্ভ। আরও কিছুটা এগিয়ে চোখে পড়ে ক্যানেল খনন হয়েছে। কিন্তু এই আধুনিক সভ্যতার উপকরণগুলি বঞ্চনা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। কারণ, বিদ্যুৎ আজও গ্রামবাসী চোখে দেখেনি। ক্যানেলে জলপ্রবাহ সুদূর ভবিষ্যতের হাতে। গরুর গাড়ির চালক যতে কোটাল সুর তোলে, 'লদী কাটল সরকারে/তার খাজনা যোগাও দরবারে।' বৃদ্ধা অট্টামাকে এখানেই তাৎপর্যময়ী বলে মনে হয়। আশি বছরে এই অট্টামারা চিরকালের সাহিত্যেই সূত্রধরের কাজ করে। অনন্ত কালধারাকে তারাই খণ্ডকালের বৃত্তে আবদ্ধ করে পাঠক ও শ্রোতাদের বিস্মিত করে তোলে। যেমন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথা' উপন্যাসের সুচাঁদ বুড়ি। বদলে চলা সময়ের স্পন্দনটি অট্টামার কাছে খুব স্পষ্ট। তাই তো গিরিজার ভ্রাতৃজায়া মোহনপুরের বউকে উদ্দেশ করে এই বৃদ্ধা ছড়া কেটেছিল, 'ধন নাই চাল নাই গোলাভরা ইঁদুর/ভাতার নাই পুত নাই কপাল ভরা সিঁদুর।' এখানে থেকেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে, গ্রাম তার সেই আকর্ষণ আজ হারিয়ে ফেলেছে। ঢেঁকির শব্দ, ধান ভানার স্মৃতিগন্ধময়ী অতীত নিশ্চিহ্ন এখানে। তাই অবিনাশ ডাক্তার বা গিরিজাপ্রসাদ যখন গ্রামকে আবার নতুন করে সাজাবার চেষ্টা করে—আমাদের মতো দূরবর্তী পাঠকেরাও তখন একে ব্যর্থ প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু আর বলতে পারি না। সময়ের নিয়মই হয়তো তাই—'গ্রাম ভাঙতে ভাঙতে ধীরে ধীরে বিশাল অজগরের খাদ্যবস্তু গ্রহণ করার মত গ্রামকে আত্মস্থ করতে করতে শহরে আসে। সেই আত্মস্থ করার শক্তি হল সভ্যতা। সভ্যতা যত এগোয়, যত আধুনিক হতে চায়, বিজ্ঞানে যত দীপ্ত হয়, গ্রাম ততই শহরের মধ্যে মুখ লুকোয়।'[৩]

গ্রাম বা যৌথ কৃষ্টি হারিয়ে যাওয়ার এই সমাজতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের মধ্যে কেবল তত্ত্ব নেই। বাস্তব দৃষ্টান্তগুলিও চোখে পড়ার মতো। উপন্যাসে নানা কারণে এই গ্রাম ভাঙন তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। কখনও দারিদ্র্য কিংবা অসহায়তা

আবার কখনও স্বাচ্ছন্দ্যের হাতছানি। যে পরিবর্তনগুলি বিশ শতকের শুরু থেকে একটু করে গড়ে উঠছিল, স্বাধীনতা পরবর্তীকালে সেই প্রবণতাগুলি আরও গভীর হয়ে ওঠে। সেখানে আত্মকেন্দ্রিকতার অসুখটি বোধ হয় সব থেকে বড়ো অভিশাপ। যেমন অবনীমোহন চ্যাটার্জী চরিত্রটির কথা বলা যেতে পারে। মানুষটির মূলকেন্দ্র এই বনপলাশি হলেও শহর কলকাতাই এখন তার স্থায়ী ঠিকানা। কেবলমাত্র প্রতি বছর ধানের মরশুমে গ্রামে এসে ধান বেচাকেনা করে আবার সে শহরে ফিরে যেত। তাই গ্রামবাসীরা অবনীমোহনকে উদ্দেশ করে বলে, 'ও আমাদের ইংরেজ গরমেন্ট গো, গাঁয়ের টাকা গাঁয়ে রাখবে না, কলকাতায় চালান দিয়ে দেয়।'[৪]

তবে এই বিষয়টি লঘু চালেই আলোচনায় উঠে আসে। তার আরও একটি কারণ যে, হয়তো গ্রামবাসীরাও এই মূল থেকে সরে আসাকে প্রচ্ছন্নে সমর্থন করেছে। গ্রামের মানসিকতা বদলের নেপথ্যে আরও একটি দিক গিরিজাপ্রসাদ লক্ষ করে, স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। আঠাশতম পর্বে পরান বাউরি, নলে বাউরি এবং নলে বাউরির বউকে ঘিরে একটি সমস্যা তৈরি হয়। নলে বাউরির বউ নলেকে ছেড়ে গিয়ে উঠেছে বৃদ্ধ পরানের ঘরে। সমস্যা এই নিয়েই। তাছাড়া এই নারীর দৈহিক অবয়বেও আকর্ষণের কোনো স্পর্শ নেই। তাহলে কেন এই 'অবৈধ' যাপনের হাতছানি? আসলে প্রকৃত সত্য হলো, নলে বাউরি তার স্ত্রীকে দুবেলা খেতে দেয় না। সব ভাত সে নিজে খেয়ে নেয়। বউ যদি তাকে হাঁড়ি নিঃশেষ করে থালায় না ভাত সাজিয়ে দেয়, তবে রাঙা চোখে সে বউকে তিরস্কার করে। যেন মনে হয়, লাঙলের ফালা দিয়ে স্ত্রীকে হত্যা করবে। তাই কোনো রূপের বা লালসার আকর্ষণে নয়, একজন পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন বছরের নারী কেবলমাত্র দুমুঠো অন্নের জন্য আরও এক বৃদ্ধ পুরুষের ঘরে উঠে আসতে বাধ্য হয়েছে। এই অভাবের তালিকা গ্রাম-জীবনে আজ সর্বময়। সে-কারণেই গ্রাম ভেঙে পড়াও অনিবার্য। ভারতীয় গ্রামগুলির প্রসঙ্গে চার্লস মেটকাফ মন্তব্য করেছিলেন, 'গ্রামগুলো হল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র যেখানে জীবনধারণের জন্য যা প্রয়োজন তার প্রায় সবকিছুই মিলত। বাইরের সঙ্গে তাদের বিশেষ যোগাযোগ করতে হত না। যেখানে কোনোকিছুই টিকে থাকে না সেখানে গ্রামগুলি টিকে আছে।'[৫]

উনিশ শতক প্রসঙ্গে এই মূল্যায়ন হলেও স্বাধীনতার দশক থেকেই গ্রাম তার সংজ্ঞা বদলাতে শুরু করে। প্রধানত স্বয়ংসম্পূর্ণ ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র হিসাবে কোনো গ্রামই আর স্বাধীনতা উত্তর পর্বে অবশিষ্ট ছিল না। আর্থিকভাবে যারা সমর্থ বা শিক্ষার ক্ষেত্রে যারা সাবলম্বী তারা একে একে গ্রাম ছেড়ে নগরমুখী হয়েছে। এমনকি গিরিজা অনেক প্রত্যাশা নিয়ে গ্রামের সঙ্গে নিজের শিকড়কে

জুড়তে চাইলেও তার নিজের সন্তানেরা তেমন জীবনকে মেনে নিতে পারেনি। সন্তান অমরেশ প্রতীক্ষা করতে থাকে, পুজোর ছুটি শেষ হলেই এই বন্দি দশা থেকে মুক্ত হয়ে সে আবার শহরের কলেজে চলে আসবে। উপন্যাসের তেরোতম পরিচ্ছেদে গিরিজাপ্রসাদ অনুভব করেছে—এই বনপলাশির জীবন ঠিক যেন দম বন্ধ হওয়া একটি নিস্পন্দ ঘড়ি। যা চিরকালের জন্য থেমে গেছে। এখানে জন্মেই একমাত্র আনন্দ, বিবাহেই কেবল স্বপ্ন চরিতার্থ হয়। গ্রাম যে একদিন ভেঙে পড়বেই তার চিত্র নিহিত আছে শারদীয় উৎসবের মধ্যে। গিরিজা তার শৈশবে দেখেছে বনপলাশির আট-দশটা বাড়িতে দুর্গাপূজা হতে। বাগদি, বাউরি, কোটালপাড়ার লোকে লোকারণ্য হয়ে থাকত সেইসব দিনগুলি। কিন্তু আজকের বিজয়া দশমীতে এই গ্রাম যেন অচৈতন্য হয়ে পড়ে রয়েছে। বাড়িগুলি ধারণ করেছে পোড়ো অবয়ব। মজুমদার বা চাটুজ্জে বাড়ির ধনী ব্যক্তিরা কেনা-বেচার পরে দু-চার বস্তা ধান বারোয়ারিতলায় দিয়েই নিজেদের দায়িত্ব সমাপ্ত করে। তাই যাদের কাছে আশা ভরসা তারা ভিন্ন কেইবা গ্রামের সেই আদিম স্বয়ং সম্পূর্ণতা ধরে রাখবে? অর্থের প্রতি আকর্ষণ আরও এক দিক থেকে গ্রামের ঐকান্তিক আত্মীয়তাকে বিনষ্ট করেছে। গিরিজাপ্রসাদ নিজের জীবন দিয়ে সে-সব বুঝতে পারে। উপন্যাসের সূচনায় তার বনপলাশিতে প্রত্যাবর্তনকে ঘিরে একটি চাঞ্চল্য শুরু হয়। গ্রামের মানুষেরা যেমন, নিত্য মল্লিক বা গোপেন মোড়ল; এরা গিরিজার ভাই গিরীনকে দেখতে পেলেই প্রশ্ন করে, দাদার জন্য সবকিছুর সুব্যবস্থা করা হয়েছে তো? আমরা জানি এতে আন্তরিকতার আবরণ থাকলেও গভীরে স্বার্থ চরিতার্থতার উদ্দেশ্য নিহিত রয়েছ। লেখকের ভাষায়, গিরিজাপ্রসাদ—'শিক্ষিত হয়েছে, দারিদ্র্যকে জয় করেছে, বনপলাশির নরক থেকে মুক্তি পেয়ে বড় হয়েছে, চাকরি করে টাকা জমিয়েছে।'[৬]

এই অর্থ সঞ্চয় করে বাড়ি ফেরার বিষয়টিই এখানে গুরুত্বপূর্ণ। সেখানেই গ্রামবাসীদের আকর্ষণ সর্বাধিক। কিন্তু যত দিন গেছে গ্রামবাসীরা বুঝেছে গিরিজা নিতান্তই সাধারণ। অর্থের সামর্থ্য নেই তার। ষোলোতম পর্বে গিরিজার মধ্যে একটি আত্মদর্শন গড়ে উঠতে দেখা যায়। এক সময় এই বনপলাশিতে হৃদয় মণ্ডলদের অর্থের বাড়বাড়ন্ত ছিল। কিন্তু তাদের ঘরের সন্তানদের তুলনায় গ্রামবাসীরা গিরিজাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে, সম্মান করেছে। সেই হৃদয় মণ্ডল বলতেন, 'টাকা আজ আছে কাল নেই, শিক্ষাদীক্ষা চিরকালের।' কিন্তু আজ ভিনদেশি ব্যবসায়ী অবনীমোহনদের গুরুত্ব অনেক বেশি। কারণ তারা ধনী। এবং গিরিজাপ্রসাদ?

'গ্রামের লোক বুঝে নিয়েছে হয়তো, গিরিজাপ্রসাদ ব্যর্থ হয়ে, নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছেন। তাই তাঁকে আর মানুষ বলে কেউ গণ্য করে না, অপমান

করতেও বাধে না তাদের।'[৭]

দেখা যায়, স্বাচ্ছন্দ্যের প্রশ্নে—রুচির প্রসঙ্গে—আন্তরিকতার জিজ্ঞাসায় গ্রামের অতীত আজ ব্যর্থতার দিকে এগিয়ে চলেছে। চরম বিপর্যয়ের হাত থেকে স্ব-দেশে ফিরে আসা গিরিজা অর্থ দিয়ে না হোক পরিশ্রম দিয়ে, আন্তরিকতা দিয়ে তার পুরাতন গ্রামকে গড়ে তুলতে চায়। তার উদ্যোগে এবং বিডিও প্রভাকরের মধ্যস্থতায় বনপলাশিতে স্কুল গড়ে তোলার প্রস্তাব ওঠে। শর্ত হয়, সরকার দশ হাজার টাকা মঞ্জুর করলেও বাকি পাঁচ হাজার গ্রামবাসীদের সংগ্রহ করতে হবে। তবে গ্রামবাসীরা তাতে উৎসাহী নয়। বলা চলে অসমর্থ তারা। যুদ্ধ ফেরত ডাক্তার অবিনাশ গিরিজাকে উদ্দেশ করে বলে, 'দেবে না নয়, পারবে না বলুন। উই আর অল লিভিং হিয়ার ইন কনস্ট্যান্ট ওয়ান্ট, নয় কি?'[৮]

—তাই সামর্থ্য অর্জনের জন্য মানুষগুলিকে অনিবার্যভাবেই শহরের দিকে মুখ ফেরাতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, কথাকার রমাপদ চৌধুরী কিন্তু শরৎচন্দ্র, তারাশঙ্কর বা বিভূতিভূষণ-এর মতো গ্রামকে কোনোদিন গভীরভাবে চেয়ে দেখেননি। পিতার চাকরি সূত্রে তিনি ভারতের নানা স্থানে ঘুরে দেখলেও গ্রামজীবনকে গভীর থেকে দেখার সুযোগ সেভাবে হয়নি। রেল শহর খড়গপুরকে কেন্দ্র করে বিচিত্র মানুষের সমারোহে তিনি প্রথম গ্রামীণ ভারতকে আবিষ্কার করেন। স্থানীয় গোলবাজারে আশেপাশের গ্রাম থেকে চাষিরা এসে পসার সাজিয়ে বসত। তাছাড়া বেকার জীবনে লেখক দেশ-বাংলার পাঁচটি জেলার প্রায় ষাটটির মতো গ্রাম ঘুরে দেখেছেন। এই গ্রামগুলি মিলেমিশে তাঁর মনে যে পরিপূর্ণ একটি গ্রাম গড়ে উঠেছিল, তারই নাম বনপলাশি। অট্টামা, মোহনপুরের বউ, গিরীন, উদাস, পদ্ম—এই চরিত্রগুলিকে সেই জীবন অভিজ্ঞতা থেকেই উপন্যাসে তিনি তুলে এনেছেন। লেখকের কাছে এরা প্রত্যেকেই খুব পরিচিত মানুষ। তাঁর কথায়, 'কে অচেনা? এদের সকলকেই তো আমি সত্যি দেখেছি, হয়তো টুকরো টুকরো করে।'[৯]

সেই বিচ্ছিন্ন চরিত্রগুলির মধ্যেই একটি অদৃশ্য সঙ্গতি থেকে গেছে। তারা প্রত্যেকেই যেন উপসংহারের শেষ স্তবক। বনপলাশি চাইলেও তার সব শক্তি দিয়ে এই বিপর্যয়কে আটকাতে পারবে না। সকলেই তো আর বৃদ্ধা অট্টামার মতো নয়। এই নারী তার বংশের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজের ধর্মান্তরিত স্বামীকে গ্রহণ করেনি। কেবলমাত্র শ্বশুরবাড়ির মর্যাদা রক্ষা করে গেছে। গিরিজার কনিষ্ঠ গিরীনের স্ত্রী মোহনপুরের বউ নামেই গ্রামে পরিচিত। সেই নারীর মধ্যে চিরকালীন গ্রামীণ আদর্শের স্বভাব নিহিত রয়েছে। তার মধ্যে আপাত ঈর্ষা, স্বার্থপরতা এ-সব থাকলেও যখন জানা যায় কন্যা টিয়ার জন্য ঠিক করা পাত্রের সঙ্গে

ভাসুরঝি বিমলার প্রেম-সম্পর্ক রয়েছে; তখন কেবলমাত্র প্রভাকরকেই সে বিমলার হাতে তুলে দেয়নি। টিয়ার বিয়ের জন্য গড়ানো সোনার অলংকারও বিমলাকে দিয়ে দিতে মোহনপুরের বউ-এর বাঁধেনি একটুও। ভিড় থেকে আলাদা কিছুটা ব্যতিক্রমী চরিত্র উদাস ও পদ্ম। যে উদাস গ্রামের পরিসীমায় আটকে থাকতে নারাজ। সে কীর্তনিয়া বংশীর ছেলে। কাটোয়ায় ড্রাইভারি করে। স্ত্রী লক্ষ্মীমণির সঙ্গে উদাসের সম্পর্ক যেন শত্রুতার। বরং তার বাবা বংশী যে মেয়েকে এক সময় ছেলের জন্য নির্বাচন করেছিল সেই পদ্মর প্রতি উদাসের এখন আকর্ষণ বেড়েছে। ত্রিবিধ সম্পর্কের দোলাচল-শেষে লক্ষ্মীমণির মৃত্যুর পর উদাস ও পদ্ম সেই নাগরিক জীবনের দিকেই পা বাড়াবে। অন্যদিকে বংশী ও গোঁসাইদিদির মধ্যে আবার গ্রাম-জীবনের চিরকালীন নিবিড়তা দেখা যায়। বংশী একসময় কীর্তন গাইত। সে সারাজীবন ধরে উদ্দেশ্যহীনভাবে যাত্রাদলের গায়ক হতে চেয়েছে। যাকে 'একানে' বলা হয়। আজীবন উদ্দেশ্যহীন হয়ে গ্রামের ধুলো-মাটির সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে থেকেছে বংশী। অন্যদিকে বৈষ্ণবী গোঁসাইদিদির মধ্যে শৈশবের গিরিজা নিজের মায়ের স্নেহ-স্পর্শ অনুভব করেছিল। বনপলাশির প্রান্তে নিকুঞ্জদাসের আখড়ায় তিনি থাকতেন। শৈশবের স্বপ্ন ও মুগ্ধতার পদাবলীর মতো এই গোঁসাইদিদিরা আজীবন একইভাবে গ্রামের আলো-বাতাসের সঙ্গে এক হয়ে থেকে গেছে। কিন্তু সময় প্রতিদিন বদলে চলেছে নিজের নিয়মে। অতীতের সেই নিবিড় আন্তরিকতা আজ অস্তগামী। গিরীন তার দাদার প্রত্যাবর্তনে চিন্তিত হয়। একদিকে নিজের অনেক সন্তান-সন্ততি ভরা সংসার, অন্যদিকে দাদা গিরিজার পারিবারিক দায়িত্ব! একশো বিঘের যৌথ কৃষিক্ষেত্রের মালিকানাও তখন গিরীনের কম বলে মনে হয়। তাছাড়া পারিবারিক কলহ তো দুটি পরিবারে নিত্যদিনের ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। উপন্যাসের সতেরোতম পর্বে দুই ভাইয়ের পরিবারে হেঁশেল ভাগ হয়ে যায়। গিরীন একার হাতে সব পরিচালনা-তদারকি করলেও তা দুই পরিবারে ভাগ হয়ে যাচ্ছে; এই সংকট থেকে মুক্তির জন্যই সম্পত্তি ভাগ হওয়া আবশ্যক হয়ে পড়ে। বাইশতম পর্বে চোখে পড়বে দুটি পৃথক-অন্ন পরিবারের মাঝে পশ্চিম ও দক্ষিণ দুয়ারি প্রাচীর উঠেছে। বোঝা যাচ্ছিল, বাইরের সমাজ ও অন্দরমহল এই দু-দিক থেকেই গ্রাম ভাঙছে। যদিও গ্রাম-সমাজের দ্বন্দ্ব-সংঘাত আজ আর সেভাবে নেই কিন্তু কুৎসা রটানোর প্রবণতা বোধ হয় গ্রাম-জীবন মাত্রই স্বাভাবিক। অনাত্মীয় পদ্ম ঘর ছেড়ে ডাক্তার অবিনাশের বাড়িতে কাজ নিয়ে উঠে এলে গ্রামবাসীরা এ-ঘটনায় বিরূপ লোকশ্রুতি ছড়াতে শুরু করে। ছেলে-ছোকড়াদের মুখে সে-সব বিষয় নিয়েই রঙ্গ রকিসতা। অন্যদিকে গিরিজার বড়ো মেয়ে বিমলাকে বিডিও প্রভাকর সন্ধেবেলা গাড়ি করে বাড়ি

পৌঁছে দেয়; এই ব্যাপারটিকে রহস্যে মুড়ে যাত্রার মজলিসে রসিকতার মাধ্যমে উদাস পরিবেশন করে। সবকিছু মিলিয়ে গিরিজা বুঝেছে বনপলাশির সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হওয়া বা তার শিকড়ের মধ্যে প্রবেশ করে জীবনরস সিঞ্চন করা আজ আর কোনোভাবেই সম্ভব নয়। তাই গিরীনও হয়তো একদিন কৃষিকাজ ছেড়ে বলগার স্টেশনে ধান-চালের ব্যাবসা করবে। সবুজ ধানের চিহ্ন হারিয়ে গিয়ে চতুর্দিক ভরে যাবে কৃষি-ব্লক-ক্যানেল-ট্যাক্স ইত্যাদি সরকারি দপ্তরে। যারা একদিন মাঠের সম্রাট ছিলেন তারা পরিণত হবেন দপ্তরের কেরানিতে। 'বনপলাশির পদাবলী' (জুন, ১৯৬২) উপন্যাসটি প্রকাশের প্রায় সাত বছর পরে অর্থাৎ ১৯৬৯ সালে ভারত সরকার কর্তৃক গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য নথিবদ্ধ করার জন্য একটি নৃতাত্ত্বিক সমীক্ষার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়। সেই সমীক্ষা প্রসঙ্গে বিভাগের অধ্যক্ষ নির্মলকুমার বসু মন্তব্য করেছেন—'ভারতীয় সভ্যতার ঐক্যবদ্ধ রূপকে একটি পিরামিডের সহিত তুলনা চলিতে পারে। জনসাধারণের বাস্তব জীবন ইহার সুবিস্তীর্ণ ভিত্তিভূমি, সেই স্তরে বহু দৃষ্টিগোচর পার্থক্য বর্তমান। কিন্তু উহা যতই উপরে উঠিয়াছে, প্রভেদগুলি ততই মিলাইতে আরম্ভ করেছে।'[১০]

উল্লেখ্য যে, লেখক এই উপন্যাসে বিগত ষাট-সত্তর বছরের একটি পরিপূর্ণ ছবির অনুসন্ধান করেছেন। নৃতত্ত্বের ভাষায় যাকে পিরামিডের সম্মিলিত বিন্দু বলা হয়েছে, উপন্যাসের ক্ষেত্রে তাকেই সাদৃশ্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলা যায়। সেখানে বাংলা ছাড়াও ভারতীয় ভাষার অন্যান্য গ্রামনির্ভর উপন্যাসে সেই গ্রাম পতনের ছবিই সর্বব্যাপী। যেমন ভারতীয় ইংরেজি ভাষার কথাকার রাজা রাও-এর 'কান্থাপুরা' (১৯৩৮) উপন্যাসে দক্ষিণ ভারতের মালাবার অঞ্চলের একটি গ্রামের আঞ্চলিক পরিচয় বদলের কথা রয়েছে। সেখানে যুবক মূর্তি শহর থেকে গ্রামে প্রত্যাবর্তন করেছে নতুন আদর্শকে সঙ্গে নিয়ে। জাতি-বর্ণের সংস্কার, হরিকথা, ভজন—এই সব কিছুর ঊর্ধ্বে, 'young Moorthy, back from the City, brimming with new ideas...'। তবুও গান্ধীবাদ ও হরিকথাকে অনুষঙ্গ করে গ্রামকে সে রক্ষা করতে পারেনি। গান্ধাবাদী চেতনা সেখানে প্রধান হলেও গ্রামের অন্দরমহলে নরসাম্মা ভট্ট তথা মহীশূরের প্রভাবশালী ব্রাহ্মণপন্থী স্বামীরা যেমন এই মানব উৎসবে সম্মত নয়। তেমনই স্কেফিংগটন কফি বাগানকে কেন্দ্র করে জন-আন্দোলনও কান্থাপুরাবাসীদের রাজরোষে ফেলে। ফলে বাইরের ও অন্দরের শক্তি প্রাবল্যে নষ্ট হয়ে যায় একটি গ্রামের নিজস্ব সঙ্গতি।

সম্পর্কের হাত ধরে গ্রামীণ পরিবার ভাঙনের দৃষ্টান্ত চোখে পড়বে ওড়িয়া কথাকার কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহীর 'মাটির মণিষ' (১৯৩১) উপন্যাসে। কটক জেলার বিরূপা নদীর ধারে যে পধান পাড়া সেই জনপদের আদর্শবান পুরুষ শাম

পধানের বড়ো ছেলে বরজু। তাদের একান্নবর্তী সংসার বরজু টিকিয়ে রাখতে চাইলেও ছোটোভাই ছকড়ি স্থানীয় হরিহর মিশ্রের কুমন্ত্রণায় নিজেদের পরিবার ভেঙে ফেলে। অবশেষে একান্নবর্তী পরিবারের মায়া ত্যাগ করে বরজু যখন স্ত্রী, কন্যা, পুত্রের হাত ধরে পথে নামে তখনই গ্রামবাসীরা বিচলিত হয়েছে। তারা বুঝেছে বরজুর পথ ধরেই একদিন বিরূপা নদী তীরবর্তী এই জনপদ একাত্ম-জীবনের সমস্ত সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলবে। এ'ও এ ধরনের গ্রাম-পতন।

আবার উত্তর স্বাধীনতা পর্বে অসমীয়া লেখক নরকান্ত বড়ুয়া তাঁর 'ককাদেউতার হাড়' (১৯৭৫) উপন্যাসে সমৃদ্ধ দুটি পুরাতন পরিবারের অন্তর্দ্বন্দ্বের আখ্যান তুলে ধরার মধ্য দিয়ে আধুনিক ধনতন্ত্রের কাছে জমিদারতন্ত্রের আত্মসমর্পণের ইতিহাস-ইঙ্গিত স্পষ্ট করে দিয়েছেন। দেখিয়েছেন সামন্ততান্ত্রিক পরিবারের মানুষগুলি কীভাবে নগর গুয়াহাটিতে এসে ক্রমান্বয়ে চাকরিজীবী নাগরিক হয়ে উঠল —সেই বৃত্তান্ত। লেখক সেই উপন্যাসের একস্থানে স্বগত সংলাপে বলেছেন, '...একদল মানুষ আছে যারা পূর্বপুরুষ বা অতীতে আশ্রয় খুঁজে পায়। তারা ফলত অন্য এক ধরনের অতীতে যাত্রা করে। আত্মার অতীত, চেতনার অতীত তাদের আশ্রয়।'[১১] 'বনপলাশির পদাবলী'র তেত্রিশতম পর্বেও অট্টামার চৈতন্যে যেন সেই একই অনুভূতির প্রকাশকে আমরা দেখতে পাই',...একজনকে ফেলে আরেকজন চলে গেছে জীবনের অপর পারে; কিন্তু সেসব দুঃখের স্মৃতি মুছে গেছে তার মন থেকে। বেঁচে আছে শুধু সুখের স্বপ্নগুলো।'[১২]

ঔদাসীন্যকে চেতনার সঙ্গে জড়িয়ে নিয়ে এক কালের যৌথ কৃষ্টিবদ্ধ বনপলাশিকেও আজ সময়ের নিয়ম মেনে বিপর্যয়ের স্রোতে অবগাহন করতে হয়েছে। রমাপদ চৌধুরীর এই উপন্যাস আসলে তাঁর জীবনের ব্যতিক্রমী সত্য সন্ধানের দস্তাবেজ। কারণ তিনি তো প্রথমাবধি গ্রামের আত্মাকে জীবন দিয়ে জানতে চাননি। তিনি চিনেছেন রেল-জীবনের হৃদ স্পন্দন ('প্রথম প্রহর'), অনুভব করেছেন আধুনিক সভ্যতায় হারিয়ে যেতে থাকা সব কিছুর মধ্যে মূল্যবোধ নিয়ে টিকে থাকার দুঃসাধ্য স্ট্রাগলকে ('বীজ')। বুঝেছেন মধ্যবিত্তের নিজস্ব জীবন সংঘর্ষ ('খারিজ') বা খুঁজেছেন নির্লোভ-নিরাসক্ত সাধারণ মানুষগুলির অস্তিত্ব ('ছাদ'); যারা চিরকাল সমাজের ছাদকে ধরে রাখবে। ঠিক তার মাঝেই গ্রামের জীবন তাঁকে হাতছানি দিয়েছে। সে-কারণেই আমরা মনে করি উপন্যাসটি রমাপদ চৌধুরীর ব্যতিক্রমী জীবন-অন্বেষণ। তারপরেও তিনি বলেন, 'কিন্তু, আমি গ্রাম সত্যি আজও দেখিনি। পিকনিক করার মতো মন নিয়ে নানা জেলার নানা গ্রামে গিয়েছি পরবর্তী জীবনে। আমাদের নিজেদেরও একটি গ্রাম ছিল, থাকারই কথা,কারণ কলকাতা শহরটাই তো এই সেদিনের। গ্রাম থেকে আসা

মানুষগুলোই এ শহরে এসে শহুরে হয়েছে। তফাত এই, সে-কথাটাই তারা ভুলে গেছে।'[১৩]

সেই বিস্মৃত অস্তিত্ব খুঁজতেই গিরিজা পুনরায় বনপলাশিতে এসেছিল। অথচ সব ছেড়ে আবার তাকে চাকুরে বড়ো ছেলের আশ্রয়ে চলে যেতে হবে। গ্রাম বদলায় না। যেমন অট্টামা বলেছে, 'যারা যাবার তারা যাবেই, শুধু বনপলাশি থাকবে রে, থাকবে।' এই থাকাটাই একমাত্র সত্য। গ্রাম কোনোদিন বদলে যায় না। কেবলমাত্র একদিন যারা আশৈশব এই মাটির সঙ্গে জুড়ে ছিল তারাই যায় বদলে। নাগরিক ধূসরতা তাদের গ্রাস করে। গ্রামকে তখন মনে হয় দূরতম দ্বীপ। তাই 'বনপলাশির পদাবলী' উপন্যাসটিকে শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতা পরবর্তী গ্রাম-বাংলার উপসংহারই বলা যায়। যার সেই প্রাচীন যৌথ কৃষ্টির বিন্যাস এখন বিপর্যস্ত। তা থেকে উত্তরণের আজ আর কোনো পথ নেই।

তথ্যসূত্র :

১। রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৫১৯-৫২০
২। তদেব, পৃষ্ঠা : ২০
৩। ভাস্বতী সমাদ্দার, *বাংলা উপন্যাসের পালাবদল,* প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪, কলকাতা,পৃষ্ঠা : ৯৭
৪। রমাপদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭
৫। অসিতকুমার বসু, *পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত*, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ১
৬। রমাপদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ১২
৭। তদেব, পৃষ্ঠা : ৯৭
৮। তদেব, পৃষ্ঠা : ৪৪
৯। তদেব, পৃষ্ঠা : ৫১৯
১০। নির্মলকুমার বসু, *ভারতের গ্রাম-জীবন*, পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪১৫ ব., কলকাতা, ভূমিকাংশ
১১। নবকান্ত বড়ুয়া, *কাকাদেউতার হাড়*, অনুবাদ—বাহারউদ্দিন, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য আকাদেমি, ১৯৯৫, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৬৫
১২। রমাপদ চৌধুরী, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২০২
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা : ৫১৮।

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর :

রমাপদ চৌধুরী, উপন্যাস সমগ্র, চতুর্থ খণ্ড, পঞ্চম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৮, কলকাতা

সহায়ক :

কালিন্দীচরণ পাণিগ্রাহী, *মাটির মণিষ*, অনুবাদ—সুখলতা রাও, তৃতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি,১৯৯৪, কলকাতা

নবকান্ত বড়ুয়া, *কাকাদেউতার হাড়*, অনুবাদ—বাহারউদ্দিন, প্রথম প্রকাশ, সাহিত্য অকাদেমি, ১৯৯৫, কলকাতা

Raja Rao, Kanhapura, Penguin Books, 2014, Gurgaon

অন্যান্য :

অসিতকুমার বসু, *পশ্চিমবঙ্গের পঞ্চায়েত*, প্রথম প্রকাশ, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯৮, কলকাতা

নির্মলকুমার বসু, *ভারতের গ্রাম-জীবন*, পুনর্মুদ্রণ, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, ১৪১৫ ব., কলকাতা

ভাস্বতী সমাদ্দার,*বাংলা উপন্যাসের পালাবদল*, প্রথম প্রকাশ, পুস্তক বিপণি, ১৯৯৪, কলকাতা

ইন্টারনেট :

Sahitya-akademi.gov.in.

Ramapada Choudhury: A Short Documentary Film By Raja Mitra (YouTube; Retrieved on 02.01.2021 at 08.22 A.M./Upload, 14th December, 2015)

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ ডি, গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

আবু ইসহাকের ছোটোগল্প (নির্বাচিত): সমাজের অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোর সন্ধানে

মানিকলাল সাহা

সারসংক্ষেপ :

বাংলা ছোটোগল্পের বিকাশ এবং সমৃদ্ধিতে কথাকার আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩) এক উল্লেখযোগ্য নাম। তাঁর লেখার সংখ্যা স্বল্প, তবে প্রথম রচনা থেকেই তিনি পাঠক ও সমালোচক মহলে পরিচিতি পেয়েছেন। 'সূর্য-দীঘল বাড়ী'র (১৯৫৫) আবু ইসহাক দুই বঙ্গেই পাঠক মনের ভালোবাসা আদায় করে নেন। তিনি জীবন এবং সময়ের চক্রে 'হারেম' এবং 'মহাপতঙ্গ' নামে দু'টি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন। এই দুই গ্রন্থের অন্তর্গত বনমানুষ, সাবীল, দাদীর নদীদর্শন, কানাভুলা, গণৎকার, আগুনমুখো ভূত, ঠগিনী, হারেম প্রভৃতি গল্পের মধ্যে দিয়ে তিনি মানবসমাজকে সমাজজীবনের শিকড়ের অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোক পথের সন্ধান দিতে চেয়েছেন। চিরন্তন বদ্ধমূল কুসংস্কার যখন মানুষকে অনিশ্চিত এক অন্ধকারে ঠেলে দেয়, ঠিক সেই সময় আবু ইসহাক তাঁর রচনাকর্মের মধ্য দিয়ে মানুষর হাতে বিজ্ঞানসম্মত উন্নতজীবনের মঙ্গল মশাল তুলে দিয়েছেন। তাই তাঁর গল্প সময়ের পথে মানুষের মন এবং দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের সহায়ক হিসেবে বারংবার আলোচিত হয়েছে।

সূচক শব্দ : অন্ধকার, আলো, কুসংস্কার, বিজ্ঞান, সময়, নারী...

বাংলাদেশের সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য কথাকারদের মধ্যে এক অনন্য ব্যক্তিত্বের অধিকারী হলেন আবু ইসহাক (১৯২৬-২০০৩)। তাঁর প্রথম লেখা 'সূর্য-দীঘল বাড়ী' (১৯৯৫) উপন্যাসেই তিনি প্রায় সকল পাঠকের মন আকর্ষণ করেন। কর্মজীবনে দেশের বিভিন্ন দায়িত্বশীল পদে এবং বিদেশে কূটনৈতিক বিভাগে কাজ করেছেন। কলকাতায় বাংলাদেশ দূতাবাসে ভাইস কনসাল এবং ফ্রার্স্ট সেক্রেটারির দায়িত্বে ছিলেন। সাহিত্য বাংলা একাডেমী ১৯৬২-৬৩ সালে তাঁকে সাহিত্য পুরস্কারে সম্মানিত করে এবং ১৯৯৭ সালে তিনি বাংলাদেশের একুশে পদক লাভ করেন। তাঁর দ্বিতীয় উপন্যাস 'পদ্মার পলিদ্বীপ' প্রকাশিত হয় ১৯৮৬ সালে। ১৯৮৯ সালে 'জাল' নামে তাঁর একটি রহস্যোপন্যাস প্রকাশ পায়। 'স্মৃতি বিচিত্রা' (২০০১) নামে একটি স্মৃতিকথাও তিনি রচনা করেন। এছাড়া ১৯১৩-এ বাংলা একাডেমী ঢাকা থেকে আবু ইসহাকের সংকলন এবং সম্পাদনায় প্রকাশিত

হয় 'সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান, বাংলা ছোটোগল্পের বিকাশ এবং সমৃদ্ধিতে আবু ইসহাকের গল্প বিশেষভাবে স্মরণে রাখতে হয় কারণ বাংলার মানুষকে কুসংস্কারাচ্ছন্ন অন্ধকারময় জীবন থেকে আলোক উৎসের সন্ধান দিতে তিনি উপন্যাসের পাশাপাশি গল্প আঙ্গিকেরও আশ্রয় নিয়েছেন। আবু ইসহাকের প্রথম গল্প 'অভিশাপ' (১৯৪০) কবি নজরুল ইসলাম সম্পাদিত 'নবযুগ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জীবন এবং সময়ের চক্রে তিনি মাত্র দুটি গল্পগ্রন্থ রচনা করেছেন—'হারেম' (১৯৬২) এবং 'মহাপতঙ্গ' (১৯৬৩)। তাঁর রচিত গল্পের বিচ্ছুরিত আলোকেই আমরা নিরাসক্ত দৃষ্টিতে এগিয়ে যাব।

একটি তালিকায় আবু ইসহাকের সাহিত্যকর্ম দেখে নেওয়া যাক :

উপন্যাস	**ছোটোগল্প**	**অন্যান্য**
সূর্য-দীঘল বাড়ী (১৯৫৫)	হারেম (১৯৬২)	সমকালীন বাংলা ভাষার অভিধান (১৯৯৩)
পদ্মার পলিদ্বীপ (১৯৮৬)	মহাপতঙ্গ (১৯৬৩)	স্মৃতি বিচিত্রা (২০০১)
জাল (রহস্য উপন্যাস) ১৯৮৯		

(২)

আবু ইসহাকের গল্পের দ্যোতনা কখনও শহরের নাগরিক প্রেক্ষিতকে কেন্দ্র করে, কখনও গ্রামের, কখনও রূপকথার মোড়কে, কখনও বা প্রেমের; যা একটি নির্দিষ্ট আয়তনের মধ্যে থেকেও সময়াতীত হয়ে ওঠে। গ্রামের পাশাপাশি কলকাতা, করাচি, ইসলামাবাদ, ঢাকা প্রভৃতি স্থানের নাগরিক জীবনের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন বলেই তিনি উপলব্ধি করেন সমাজজীবনের শিকড়ের অন্ধকার। তাই মানুষের ভালো চেয়ে, মানুষের মঙ্গল করতে আলোকময় পথের সন্ধান করেছেন তাঁর বিভিন্ন গল্পের অবয়বে।

আবু ইসহাক মুসলমান সমাজে পর্দার আড়ালে থাকা নারীদের কথা তুলে ধরতে রচনা করেছেন 'দাদীর নদীদর্শন' গল্প। মীরহাবেলির পর্দানিশ দাদির সঙ্গে পরিবারের অন্যান্য পুরুষের সম্পর্ক কতটা গভীরতাপূর্ণ তা গল্পে দেখানো হয়েছে। মৌলবী ছাড়া দাদির মুখ কেউ কোনোদিন দর্শন করেনি। একবার পরপুরুষ তাঁর মুখ দেখে ফেলেছিল বলে তিনি মাথা ন্যাড়া করেছিলেন এবং যুক্তি দেখিয়েছিলেন—'পরপুরুষে দেখা চুল রাখতে নেই, রাখলে প্রত্যেকটা চুল সাপ হয়ে কামড়াবে

হাশরের দিন'। মীরহাবেলির দাদীর বাপের বাড়ি এবং শ্বশুর বাড়ি ছ'হাত উঁচু দেওয়াল ঘেরা, এ বাড়ি থেকে গত পঞ্চাশ বছরে তিনি একবারও বাইরে বের হননি। পর্দার মর্যাদা রক্ষায় তিনি দৃষ্টান্ত হয়ে গিয়েছেন মৌলবীদের কাছে। পরিবারের অন্যান্যরা কেউ কোনোদিন তাঁর শাসন অমান্য করার সাহস দেখায়নি—

> গত পঞ্চাশ বছরের মধ্যে তিনি ভুলেও একবার বাড়ির বৈঠকখানায় ঢোকেননি। এ-বাড়িতে যারা বউ হয়ে এসেছে, পর্দার কড়াকড়িতে তাদের শ্বাসরোধ হওয়ার জোগাড়। দাদীর চোখ-রাঙানির ভয়ে মীর খানদানের পর্দার মর্যাদা এতটুকু ক্ষুণ্ণ করতে সাহস হয়নি কারো।[১]

দাদির সঙ্গে তাঁর চাচাত ভাই মীর আদিলের বিবাহ হয়। এখানে মুসলমান সমাজে প্রচলিত রক্তের সম্পর্কিত মানুষের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের কথাও শুনিয়েছেন গল্পকার। আর তাই দাদির বাপের বাড়ি পরিণত হয়েছে শ্বশুর বাড়ি হিসেবে।

বিলাতি দ্রব্য দাদির পছন্দ নয়, তাই তিনি বিলাতি দ্রব্য খাননি এবং কাউকে খেতেও দেননি। তাঁর কাছে মোড়ক লাগানো জিনিস মানেই বিলাতি। তাই তাঁর পুতের ঘরের নাতি কামালের ছোটোভাই জগলু চকোলেট মুখে পুড়ে এলে দাদি মুখে হাত ঢুকিয়ে তা বের করে নেন। আবার দাদির পুতের ঘরের নাতি কামাল বিলাত থেকে ঘুরে এসে দাদির কাছে দাঁড়ালে দাদি তা বিশ্বাস করতে পারেন না। এমনকি দাদি চাননি তাঁর নাতি বিলাতে যাক—

> বিলাতে যাওয়ার দিন দাদীর কাছ থেকে বিদায় নিতে পারেনি কামাল। দাদী সেদিন তাঁর ঘরের দরজা বন্ধ করে রেখেছিল। তাঁর ইচ্ছে ছিল না কামাল বিলেতে যায়। বিলেতি জিনিসের ওপর যাঁর এত বিদ্বেষ, বিলেতের ওপর তার মনোভাব যে কেমন হবে, সহজেই বোঝা যায়।[২]

সময় এবং প্রাকৃতিক কারণে দাদি নাতির পরামর্শে ঘর থেকে প্রথম বের হন নতুন বাড়ির উদ্দেশে। দাদি নিরুপায় হয়েই বাড়ি থেকে এই প্রথম বের হন কারণ নদী তাঁদের বাড়ি দখল নিতে আসছে। যিনি কোনোদিন নদী দেখেননি তিনি পানসি চেপে নতুন বাড়ির উদ্দেশে যাত্রা করলেন, দাদী নিজের ঘোলাটে বুড়ো চোখ মেলে তাকান খিরকির পর্দা ফাঁক করে। ভয়, বিস্ময়ের ছাপ তাঁর চোখে মুখে আভাসিত হয়—

> দু মাইল দূরে ছিল পদ্মা, ভাঙতে ভাঙতে সে এখন মীরহাবেলির কাছাকাছি এসে গেছে।...পালকি এনে নামানো হয় পানসিতে, পালকি আর পানসির

দরজা এক করে। দাদী নৌকার খোপে ঢোকেন। দরজা বন্ধ হয়। দাদী তাঁর ঘোলাটে বুড়ো চোখ মেলে তাকান খিড়কির পর্দা ফাঁক করে। ভয় ও বিস্ময়ের ছাপ তাঁর চোখে মুখে।...এ পানি কোন্‌খান থিকা আসে, আবার কোথায় যায়, খোদা ছাড়া কেউ জানে না।...দাদী আর চাইতে পারেন না। তাঁর মুখখানা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে।[৩]

নতুন বাড়িতে পৌঁছেই দাদির বমি শুরু হয়। নাতি কামাল সমুদ্র পীড়া সম্পর্কে জানত কিন্তু বুঝতে পারেনি নদী দেখে দাদির সমুদ্র পীড়া হবে। নদীদর্শনই কাল হয় দাদির—'দাদীর নদীদর্শন এখানেই শেষ হয়। কিন্তু এ নদীদর্শনই কাল হয় তাঁর ঐ দিনই আছরের নামাজের পর দাদি ইন্তেকাল করেন।' পুরুষতন্ত্রের চাপিয়ে দেওয়া সংস্কার নারীরা কীভাবে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত পালন করে যায় তা দাদিকে দেখে বোঝা যায়। নারীসমাজকে শিক্ষার আলো, প্রকৃতির আলো থেকে সরিয়ে রেখে পর্দার আড়ালে জীবনকে কীভাবে আটকে দিয়েছে আবু ইসহাক তা প্রকাশ করেছেন। সমাজে নারীদের যে আলাদা মর্যাদা এবং অধিকার আছে তা তিনি মর্মে অনুভব করেছিলেন বলেই নারীদের অন্দরমহলের চিত্রকে আমাদের সামনে মেলে ধরেছেন গল্পের অন্তরে।

নারী এবং সমাজের উপর পুরুষতন্ত্রের ক্ষমতার যথেচ্ছাচারকে প্রকাশ করতে আবু ইসহাক রচনা করেছেন 'হারেম'। গল্পে আমীর মুরাদ বেন-হাম্মাদ আল্‌-জুলফিকার দিস্তান সাম্রাজ্যের রাজা। তাঁর নিজস্ব একটি হারেম আছে, বেগমদের সুরক্ষার দায়িত্ব ছিল হিজরেদের উপর। হিজরে পালোয়ান রাখার কারণ বিষয়ে জানা যায় তিনি হিজরেদের খোরপোশ দান করে পুণ্য সঞ্চয় করতেন, কিন্তু আসল সত্য হল তারা প্রত্যেকে নপুংসক ছিল, ফলে রাজা বেগমদের পরিচালনার ভার হিজরেদের হাতে দিয়ে অনেকটাই নিশ্চিন্তে থাকতে পারতেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) জানিয়েছেন, 'আজ পৃথিবীর সর্বত্রই মেয়েরা ঘরের চৌকাঠ পেরিয়ে বিশ্বের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এসে দাঁড়িয়েছেন। এখন এই বৃহৎ সংসারের দায়িত্ব তাদের স্বীকার করতেই হবে; নইলে তাদের লজ্জা তাদের অকৃতার্থতা।'[৪] হারেমে বন্দি বেগমরা যখন নিজেদের স্বাধীন জীবনের খোঁজে পালিয়ে যায় তখন মনে হয় রবীন্দ্রনাথের ভাবনা সমাজে পূর্ণতা পেয়েছে। স্বামীর পদানত হয়ে বন্দি জীবনে হাঁপিয়ে ওঠা বেগমরা নিজস্ব পছন্দের পাত্রের সঙ্গে যখন পালিয়ে যায় তখন হারেম সম্রাট তা মেনে নিতে পারেননি। তাই তিনি আদেশ দিয়েছেন তাদের খুঁজে এনে শাস্তি দিতে হবে, যাতে করে হারেমে

থাকা বাকি বেগমরা এই কাজ ভবিষ্যতে আর করতে না পারে। 'খারিজা মহল থেকে দুজন আর বেওয়া মহল থেকে একজন বেগম উধাও হয়েছে। খবর পেয়ে আমির নিজেই তদন্তে গিয়েছিলেন।' কিন্তু কোনো লাভ হয় নি, ফলে তিনি গোয়েন্দা প্রধানকে উদ্ধারকার্যে নিয়োগ করেন। হারেম রক্ষা করতে গিয়ে আমীর গ্রামীণ পরিবেশে যাদের সঙ্গে প্রজা-পিতার সম্পর্ক রেখে চলেছিলেন তাদেরই সেচ বন্ধ করেন, কারণ তাঁর দিস্তান রাজ্যের অভ্রখনি প্রায় ফুরিয়ে গিয়েছে। পাশাপাশি উজিরের সঙ্গে পরামর্শ করে চাষিদের খেজুর গাছের উপর অতিরিক্ত ট্যাক্স বসান। আমীর নিষ্ঠুর এবং নির্মমভাবে নিজের স্বার্থে গ্রামীণ গরিব মানুষদের উপর অন্যায়ভাবে খাজনা চাপানোর আদেশ জারি করেন—'হ্যাঁ গরিব তো ঠিকই। গরিব বানিয়েছেন খোদাওন্দ করিম। মানুষ তার কী করবে? গরিব বলে কি মালিককে খাজনা দিতে হবে না?' সমাজের আশ্রয়দাতা সর্বোচ্চ অধিকারী মানুষ যখন আত্মসুখে মগ্ন থাকে তখন সাধারণ মানুষকে দুঃখ ভোগ করতেই হয়। তাই প্রজারা দুঃখে থেকেও হারেমের খোরপোশের (বিলাসিতার) টাকা যুগিয়ে গিয়েছে নিঃশব্দে।

মুসলমান সমাজে বহুবিবাহ নারীকে মানসিক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে দিয়েছে ফলে নর-নারীর স্বাভাবিক সম্পর্ক সহজেই ভেঙে গিয়েছে, এর জন্য মূলত আমিরজাদারাই দায়ী। শুধুমাত্র দেহভোগের জন্যই আমীর এই হারেম নির্মাণ করেছেন। হারেমের আবার দুটি মহল নির্দিষ্ট করা, একটি বেগম মহল অপরটি খারিজা মহল। খারিজা মহলে থাকে আমীরের পরিত্যক্তা বেগমরা। দেহভোগ হয়ে গেলে বিত্তবান পুরুষরা কীভাবে নারীদের ছুঁড়ে ফেলে তা বোঝা যায় এই ঘটনা থেকে। বর্তমান সময়ে এই চিত্র শহরজীবনের আনাচে-কানাচে দেখা যায়। নারীকে সচেতন করতেই গল্পকার হারেমকে দৃষ্টান্ত রূপে তুলে ধরেছেন।

(৩)

ধর্মের প্রতি মানুষের অন্ধবিশ্বাস থেকে মানুষকে বৈজ্ঞানিক ভাবনায় বিশ্বাসী করতে আবু ইসহাক 'কানাভুলা' গল্প লিখেছেন। গল্পের মুখ্য চরিত্র জাহিদ, সে একজন সাধারণ রিক্শা চালক। তার মা অন্ধকারাচ্ছন্ন পীর সমাজকে বিশ্বাস করেন। তাই মায়ের কথা মতো সে 'জলপড়া' আনতে যায় পীর সাহেবের কাছে। জলপড়ার কল্যাণে পীরের স্ত্রী ভালোভাবে প্রসব করেছে। পীরের দুয়ারে সে অরো শুনতে পায় আল্লাহর কৃপায় নাকি পীরের ছোট মেয়েও ভালোভাবে

খালাস হয়েছে। জাহিদ মনে আনন্দ দিয়ে বেরিয়ে আসে এবং রিক্‌শা চালানো শুরু করে। অদূরে সে দেখতে পায় গ্রামীণ হাসপাতালের লেডি ডাক্তার আর নার্স বেরিয়ে আসছে, তারা জাহিদের রিক্‌শায় চাপতে চায় কিন্তু জাহিদ অসম্মত হয় কারণ সে তার স্ত্রীর জন্য জলপড়া নিয়ে যাচ্ছিল। কিছুদূর যাবার পর আবার সে ফিরে আসে এবং নার্সদের নিয়ে চলতে রাজি হয়। নার্সদের দেখানো পথে জাহিদ না গিয়ে নিজের স্ত্রীর জন্য তার বাড়ির উঠোনে নিয়ে রিক্‌শা থামায়। জাহিদের মা 'জলপড়া' তে বিশ্বাস রাখলেও ডাক্তার নার্সদের হাতেই জাহিদ একসঙ্গে ছেলে এবং মেয়ে যমজ সন্তানের মুখ দেখতে পায়।

গল্পশেষে দেখা যায় মা পীর সাহেবের দরগায় মিষ্টি এবং টাকা চড়াতে চাইলে জাহিদ মানা করে না কিন্তু যাত্রা পথের উল্টোদিশায় সে চলতে থাকে, কারণ সে যাবে ডাক্তারের বাসায় মিষ্টি নিয়ে, তাদের জন্যই সে ছেলে-মেয়ে দুজনকে একসঙ্গে জীবিত অবস্থায় পেয়েছে। মা জানায় তার পথ ভুল হচ্ছে তাকে কানাভুলায় পেয়েছে, পীর সাহেবের রাস্তা আলাদা পথে কিন্তু জাহিদ অন্যপথে যাচ্ছে। মায়ের কথায় জাহিদ জানায়—'এবার আর পথ ভুল হবার নয়, এমনকি তাকে কানাভুলাতেও ধরেনি।' গ্রামীণ অন্ধকারময় কুসংস্কারাচ্ছন্ন মায়ের বদ্ধমূল বিশ্বাস থেকে জাহিদ নিজের মনকে বৈজ্ঞানিক আলোর অভিমুখে যাত্রা করায়। তাই তার রিক্‌শার সম্মুখের চাকা ডাক্তার বাড়ির উদ্দেশ্যে চলতে থাকে। গল্পকার আবু ইসহাক গ্রামীণ মানুষকে পীরদের অন্ধকারের বর্ম থেকে মুক্ত করে আলোর সন্ধান দিতে চেয়েছেন গল্পের কাহিনিতে।

আবু ইসহাক শহরজীবনে মানবমনের অন্ধকারকে উপলব্ধি করে ১৯৫৯ সালের জুন মাসে ৩৮/৫-ই জাহাঙ্গীর রোড (পূর্ব) করাচিতে অবস্থানকালে রচনা করেন 'সাবীল' গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় পুরুষ চরিত্র মিস্টার আজফার। সাড়ে সাতটায় তাঁর অফিস। তিনি তৈরি হয়ে বসে খবরের কাগজের হেডিংগুলোয় চোখ বুলিয়ে নিচ্ছেন কারণ সেদিন তাঁর গাড়ি এসে পৌঁছায়নি। তাঁর স্ত্রীও খবরের মাঝের পাতা নিয়ে সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখতে শুরু করেন। সেই মুহূর্তে দরজায় খট্ খট্ আওয়াজে মিসেস আজফার একটু রেগে যান। কেননা তাঁর মতে—

> এদের বেশি লাই দিলে মাথায় চড়ে বসে।...বাব্বা কি ময়লা কাপড় আর বোঁটকা গন্ধ এক-একটার গায়ে। গোছল তো করে না বোধহয় সাত জন্মে।[৫]

মধ্যবিত্ত ব্যক্তিজীবনে ধর্মীয় অসংগতিবোধ গল্পকার আবু ইসহাককে বিচলিত করে। ধর্মের জয়গান ও পুণ্যসঞ্চয়ের অভিলাষে মানবসেবায় অংশগ্রহণ করা, ধর্মীয় উৎসব শেষে মানুষের প্রতি অমানুষিক ব্যবহার—সবকিছু মানবীয় বিবেকবোধে

আঘাত হানে। মধ্যবিত্ত ব্যক্তিমনে এই অসংগতি প্রতিনিয়তই আমরা লক্ষ করতে পারি। কয়েকটা ছেলে 'সাবীল' অর্থাৎ মহরমের চাঁদা তুলতে এলে আজফার সাহেব চাঁদা না দিয়ে তাদের মুখের ওপর দরজা বন্ধ করেন। কারণ তাঁর মতে—

> যতসব বখা ছেলে।...কাদের দেবো চাঁদা! কোথাকার কতগুলো বখাটে ছোঁড়া! সাবীলার নাম করে বিড়ি-সিগারেটের পয়সা জোগাড় করচে। সাবীল দেবে না আরো কিছু।[৬]

ঠিক সেই মুহূর্তেই মিসেস আজফার স্বামীকে বলেন, তিনি সাবীল দিতে চান। মূলত এই সাবীল বা মহরম উৎসবে পথচারীদের জলদানের মধ্যে দিয়ে পুণ্যসঞ্চয় করা যায়। মিসেস আজফার, বাড়িতে আসা পাড়ার নোংরা জামাকাপড়ে শরীর ঢাকা পাঠান বস্তির মেয়েরা জল নিতে এলে তাদের জলদান না করলেও এবার তিনি ভাবেন বাড়ির সামনে চাকর লালুকে বসিয়ে 'সাবীল' দেবেন। সাবীল দেবার অন্য কারণ হল তাঁদের সন্তান নেই। ফলত, ধর্ম-কর্মের মাধ্যমে পরজন্মের জন্য পুণ্যসঞ্চয় করে রাখতে চান গৃহকর্ত্রী, যা গৃহকর্তার অবগত এবং তিনি এ বিষয়ে দ্বিমত করেন না। স্বামী-স্ত্রীর কথায় সেই চিত্র ধরা পড়েছে—

> ...ছেলেপুলে নেই আমাদের। পয়সা জমিয়ে করবো কি? ঠিক জায়গায় আঘাত করেছেন বেগম। তাঁদের বিয়ে হয়েছে আজ সাত বছর। কিন্তু ছেলেপুলে হয়নি। আর হওয়ার আশাও নেই। আজফার সাহেব জানেন—নিঃসন্তান স্ত্রী ধর্ম-কর্মের মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজে বেড়ান। ধর্মের কোন কাজ করতে পেলে খুশি হন খুব। তিনি বলেন আচ্ছা তোমার যখন এত ইচ্ছা তখন হবে। অফিস থেকে ফিরে আসি। সাবীলের জন্য কি কি লাগবে তখন ঠিক করব।[৭]

সাবীলে জলদানের মধ্য দিয়ে পরকালের পুণ্যসঞ্চয় নিছক খামখেয়ালিপনা। তা না হলে মিসেস আজফার জল চাইতে আসা পাঠান বস্তির মেয়েকে ফিরিয়ে দিতে পারতেন না। প্রকৃত মানবসেবার পুণ্য থেকে তিনি আজ দশ হাত দূরে অবস্থান করছেন। তাই তাঁর সাবীলের জলে আজ মশারা জন্ম নিয়েছে অর্থাৎ মধ্যবিত্ত মনেও জন্ম নিয়েছে পঙ্কিলতা। মধ্যবিত্ত মানুষ বর্তমান সমাজপরিবেশে শুধু দেখানোতেই বিশ্বাসী, প্রকৃত ভালোবাসা আজ তাদের গুহাকন্দরে সাবীলের মটকায় বন্দি হয়েছে। আবু ইসহাক মানুষের অন্তরে জমে থাকা ভেদাভেদের দ্বন্দ্বকে মুছে সকলের হাত ধরে প্রকৃত ধর্মপথে চলতে চেয়েছিলেন।

(৪)

'গণৎকার' গল্পে দেখা যায় গণৎকার হাত দেখে ভবিষ্যৎবাণী করতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে ইলিয়াসের বিশ্বাস উঠে গিয়েছে অনেকদিন আগেই; যখন সে সপ্তম শ্রেণিতে পড়ে। তার হায়দার চাচা এক গণৎকারকে হাত দেখালে গণৎকার জানায় তার কয়টা বিয়ে হবে এবং সে কতদিন বাঁচবে ইত্যাদি। ইলিয়াসও পাঁচ পয়সা দিয়ে প্রথম হাত দেখিয়েছিল কারণ গণৎকার পুকুরে কটা মাছ, কার পেটে কটা কৃমি, কে কতদিন বাঁচবে সব বলে দিতে পারে। ইলিয়াস দুষ্টুমি করে একটা পাকা শসা এবং দা নিয়ে এসে শসার পেটে কটা দানা আছে তা জানতে চায়। গণৎকার তার ভণ্ডামি বুদ্ধিতে জানায় ২৫৬টি। ইলিয়াস সঙ্গে সঙ্গে শসা কেটে গুণতে চাইলে গণৎকার চালাকি করে সেখানে থেকে পালিয়ে যায়। শেষে শসা কেটে ৩৭২টি দানা পাওয়া যায়। এমনকি গণৎকারের করা ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ইলিয়াস বার্ষিক পরীক্ষায় প্রথম স্থান পায়। গণৎকার ইলিয়াসকে বলেছিল, সে পরীক্ষায় প্রথম হতে পারবে না। সকল ভবিষ্যৎবাণীকে মিথ্যা প্রমাণিত করে ইলিয়াস মানুষের নিজস্ব কর্মের উপর বিশ্বাস রেখেছে এবং তাকে সকলের সম্মুখে প্রমাণ করে দেখিয়েছে। গল্পে ইলিয়াসের মধ্য দিয়ে গ্রামীণ জনজীবনে মানবমনের বিমূর্ত ভাবনার অন্তর্লোকে আলোর বিচ্ছুরণ করতে চেয়েছেন গল্পকার আবু ইসহাক।

'আগুনমুখো ভূত' গল্পের শুরুতে দেখা যায় জাহিদ পুকুরপারে ভূত দেখে এসে বাড়িতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। ইলিয়াস জাহিদকে বোঝায় ভূত বলে কিছু নেই। কিন্তু জাহিদ এত ভয় পেয়েছে যে সন্ধ্যার আগেই চায়ের দোকান বন্ধ করে বাড়ি ফিরে আসে। যদিও সন্ধ্যাতেই চায়ের দোকানে বিক্রি বেশি হয়, কিন্তু জাহিদ তার তোয়াক্কা করে না। জাহিদের জ্ঞাতি ভাই ইলিয়াস, জাহিদের থেকে পাঁচ বছরের ছোট। সে মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়েছে, তার ভূতের ভয় নেই। ভূতের ভয় না পেলেও রাতের অন্ধকারে সে সাপের ভয় পায়; তাই রাতে সে হাতে একটা টর্চ রাখে। রাতবিরেতে সে ঘুরে বেরাতেই বেশি পছন্দ করে। এমনকি রাত্রি করে সে বায়োস্কোপও দেখে। বায়োস্কোপে 'দেবদাস' দেখানো হবে বলে সে উপন্যাসটিও পড়ে নিয়েছে।

ইলিয়াসের সঙ্গে জাহিদও বায়োস্কোপ দেখবে বলে সে ইলিয়াসের সঙ্গ নেয়। দেবদাস শুরু হবার কথা ছিল সন্ধ্যে ছয়টা, কিন্তু শুরু হয় সন্ধ্যে সাতটায়। ফলে বায়োস্কোপ শেষ হয় রাত্রি দশটায়। তারা পুকুর পাড়ে এলে ইলিয়াস ভূত তাড়ানোর মন্ত্র পড়ে এবং জাহিদকেও তার সঙ্গে সঙ্গে পড়তে বলে। আগুনমুখো

ভূত'কে ইলিয়াস দেখতে পায় গাছের আড়ালে, ইলিয়াস ভূতের পিছু নেয়। অবশেষে ঢিল খেয়ে ভূত ধরা দেয় এবং ভূত জানায় 'ইলিয়াস ভাই আমি হাবলু।' জাহিদের সামনে ইলিয়াস তখন নিজে ভূত সাজে এবং বলে 'কি জাহিদ ভাই আমি এখন ভূত আমায় দেখে ভয় পাচ্ছ নাকি।' এভাবেই গ্রামীণ পরিবেশে মানুষের মন থেকে আবু ইসহাক শিক্ষিত যুব সমাজের হাত দিয়ে ভূতের পরিবেশকে ভেঙ্গে দিয়ে আলোর দিশা দেখিয়েছেন। গ্রামজীবনে ভূতের ভয় অপেক্ষা সাপকে যে বেশি করে ভয় পাওয়া উচিত তা ইলিয়াসের হাতে টর্চ দিয়ে লেখক আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন।

শুধু গ্রামীণ পরিবেশেই নয় শহর জীবনেও মানুষকে বোকা বানানো হয়, ঠকানো হয়। অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জন করতে শহরের ব্যস্ত এবং সৎ মানুষকে কীভাবে ঠকানো হয় সে চিত্র আবু ইসহাক তুলে ধরেছেন 'ঠগিনী' গল্পে। দেখা যায় ইলিয়াস একজন সরকারি কর্মচারি। সে অপরাধ বিজ্ঞান নিয়ে পরীক্ষায় প্রথম হয়েছে এমনকি অপরাধী ধরাই তার পেশা। কিন্তু সে ঠকে যায় এক 'ঘি' বিক্রেতার কাছে। ইলিয়াস মাইনের টাকা দিয়ে নাকে শুকে ঘি কেনে, পরদিনই ঘি পোড়া মোবিলে পরিণত হয়। এতে তার স্ত্রীর রাগ সপ্তমে ওঠে। ইলিয়াসের ভুল হয়েছে বলে স্ত্রীর কটুবাক্য অনায়াসে সে হজম করে যায়। ইলিয়াস এমনভাবে ঠকবে বুঝতে পারেনি। তার উপার্জনের টাকা হারামের টাকা নয়, তবুও কেন তার কেনা ঘি পোড়া মোবিল হল এই নিয়ে ভাবতে থাকে। মোবিলের উপর ঘি ঢেলে বিক্রি করে প্রৌঢ়া মহিলা এবং যুবতি। ইলিয়াস ঐ ঘি শুকেই কিনেছিল। কেনার সময় প্রৌঢ়া তাকে বলেছিল এই ঘি খেলে তাকে 'ইয়াদ' করতে হবে। কিন্তু ঘি না খেয়েই ইলিয়াস প্রৌঢ়াকে সারাজীবন মনে রেখেছে। অপরাধ দমন শাখার অফিসারকেই অপরাধীরা ঠকিয়ে গেছে। সামাজিক অপরাধজগতের খণ্ডচিত্র প্রকাশিত হয়েছে এই গল্পে।

আবু ইসহাক তাঁর রচনাকর্মের মধ্যে দিয়ে পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের সমাজে মানবজীবনকে নানা সংকট এবং অন্ধকার থেকে আলোর দিশা দেখিয়েছেন। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সমাজে শিক্ষিত এবং বাস্তববোধ সম্পন্ন মানুষের হাতে মঙ্গল মশালও তুলে দিয়েছেন। গ্রাম এবং শহরের প্রেক্ষিতে মানুষের শুভবুদ্ধিকে বিচ্ছুরিত করতে—'বনমানুষ', 'হারেম', 'সাবীল', 'দাদির নদী দর্শন', 'কানাভুলা', 'আগুনমুখে ভূত', 'গণৎকার', 'ঠগিনী'র মতো গল্পের জন্ম দিয়েছেন। এছাড়াও 'বোম্বাই হাজি', 'শয়তানের ঝাড়ু' গল্পে গ্রামীণ পীরসমাজের ভণ্ডামিকে সকলের

সামনে প্রকাশ করেছেন। সময়ের পায়ে পায়ে মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি বদলাতে আবু ইসহাকের গল্পকে দৃষ্টান্ত হিসেবে দাঁড় করাতেই হয়।

তথ্যসূত্র :

১। আহমদ মোস্তফা কামাল (স.) 'শ্রেষ্ঠগল্প', আবু ইসহাক, 'দাদীর নদীদর্শন', বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্র, ঢাকা, প্রকাশ-২০০৬, পৃষ্ঠা : ১৯
২। প্রাগুক্ত, 'দাদীর নদীদর্শন', পৃষ্ঠা : ২২
৩। প্রাগুক্ত, 'দাদীর নদীদর্শন',পৃষ্ঠা : ২৩-২৪
৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'নারী', কালান্তর, বিশ্বভারতী মুদ্রণ-১৪০৯, পৃষ্ঠা : ৩৬৭
৫। আবু ইসহাক, 'গল্পসমগ্র', নওরোজ সাহিত্য সম্ভার, বাংলাবাজার, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, সেপ্টেম্বর ২০১৩, পৃষ্ঠা : ১৫১
৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৫২
৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৫২

লেখক পরিচিতি :

পিএইচ. ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়

নারী মনস্তত্ত্বের আলোকে ভাটিয়ালী

দীপক কুমার মণ্ডল

সারসংক্ষেপ :

সুদীর্ঘকাল ধরে বাঙালী জীবনের বিচিত্র সুখানুভূতির পাশাপাশি বঙ্গ নারীর অন্তহীন দুঃখ-বেদনার রক্ত তিলক নিজ দেহে ধারণ করে—বাঙালী মানসের চিত্ত বিনোদনে যার জুড়ি মেলা ভার, সে হল বাংলার ঐতিহ্যবাহী লোকসুর—ভাটিয়ালী। যা বাংলা লোক-সঙ্গীত সাহিত্যের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এবং সমৃদ্ধতম সম্পদ। বাংলা লোক সাহিত্যের অপরাপর বিষয় যেমন ছড়া-প্রবাদ-ধাঁধা-কথা এগুলি যত না প্রাণের সামগ্রী তার চেয়ে বড্ড বেশী হৃদয়-সংলগ্ন লোকগানের এই বিশেষ ধারা। সেদিক থেকে বাংলা লোকসংস্কৃতির ভিত যে লোকাগানের উপর প্রতিষ্ঠিত তা সহজেই অনুমেয়। সুখ-সলিলে নিমজ্জিত হতে হতে কিংবা দুখের দহনে পুড়ে ছারখার হয়ে যেতে যেতে এ গান প্রাণে এনে দেয় আশ্চর্য এক অনুভূতি- হৃদয়ে জাগায় অনাবিল আনন্দ। বাংলা লোক-গানের ধারায় ভাটিয়ালী যুগ যুগ ধরে সংগোপনে সেই কাজটি নিরলস ভাবে করে চলেছে।

দেশীয় সভ্যতা সুদীর্ঘ কাল ধরে পুরুষ আধিপত্যের হলেও এ দেশের চিরন্তন আদর্শের নারী চিরকাল ধরে পুরুষকে তার দেহালঙ্কার রূপে বরণ করে এসেছে। পুরুষও নারীর কণ্ঠমালা হয়ে বিচিত্র রিনিঝিনি শব্দে ঝঙ্কৃত হতে ভুল করেনি। আর ভুলে যায়নি বলেই তার শৈল্পিক কল্পনা বারে বারে ঝরে পড়েছে আপনসৃষ্ট সাহিত্য সম্পদে। এই শাশ্বত অবলা-নারী কখনো কন্যা, কখনো যৌবন- উপবনের যুবতী, আবার পরক্ষণে সে মাতৃস্বরূপা। তার জীবনের বেশীরভাগটাই দুঃখ-জর্জর। সেই জর্জরিত জীবনের কাহিনী লোককবিগণ ক্ষণিকের জন্য এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। এই নারীর দুঃখে-দৈন্যে যেমন চোখ নামে নীরব বারিধারা, তেমনি আনন্দঘন মুহূর্তের ভাষা লেগে থাকে অপলক দুনয়নে—আর স্ফূর্তির বিকিরণ জাগে মনের আনাচে কানাচে। নারীমনের সেই আঁতের কথা, তার মনস্তত্ত্বের স্বরূপ এবং বিচিত্র সেই অনুভূতিরাজি হৃদয় অনুভবী লোককবির হাতে কত যে মাধুর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে ভাটিয়ালী তার উৎকৃষ্টতম প্রমাণ।

বাংলা লোকগানের প্রধান ধারাগুলির অন্যতম ভাটি অঞ্চলের বাদ্যহীন, দরাজ কণ্ঠের সুর—ভাটিয়ালী। এ গানের রসদ নারীর মনোবেদনায় পূর্ণ হলেও এর রূপকার মূলত পুরুষ মাঝি। ঐশ্বরিক চেতনার পাশাপাশি বাস্তবিক নারীর দুঃখ, যন্ত্রণা এ গানের আজন্ম সঙ্গী। সহজ কথায় ব্যথাতুর নারী মনের বিচিত্র অনুভূতিতে রঞ্জিত বাংলা লোকগানের এই পূর্ববঙ্গীয় ধারা। এই শ্রেণির গানে

বিরহী নারীর মনস্তত্ত্বগত Nature of Behaviour-এর বিচিত্রতা চোখে পড়ার মতো।

মূল শব্দ : ভাটিয়ালী, নারী মনস্তত্ত্ব, সুজান স্রোত, পরকীয়া, বারোম্যাসা, Sex Instinct.

বাংলা লোকসংগীতের প্রধান ধারাগুলির মধ্যে এক অনত্যম সুর ভাটিয়ালী। প্রবহমান কাল ধরে নদীমাতৃক বাঙালী মাঝির অবসর বিনোদনের কেবল কণ্ঠনির্ভর সুর, আপামোর বাঙালীসহ ভিন্ন-ভাষী সংগীতপ্রেমীদের হৃদয়েও হিল্লোল তুলে চলেছে। ভারতের ত্রিপুরা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চল এবং অধুনা পূর্ববঙ্গের মৈমনসিংহ, নোয়াখালী, ঢাকা, চট্টগ্রাম নদীবিধৌত এলাকার মূলত ব্রহ্মপুত্র, পদ্মা, সুরমা, কুশিয়ার, মেঘনা প্রভৃতি নদী ও তাদের শাখা-প্রশাখার বাতাস-জল কবে যে প্রথম এ গানের দোলায় আন্দোলিত হতে শুরু করেছিল—তা বলা খুবই দুঃসাধ্য ব্যাপার। তবে বাংলায় এই শব্দের উৎপত্তি ও ব্যবহারের কাল হিসাবে 'সেক শুভোদয়া' ও 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' রচনার সময়কালকে ধরে এগোনো যেতে পারে। লিখিতভাবে 'ভাটিয়ালী' শব্দের উল্লেখ, বাংলা সাহিত্যে এখানেই প্রথম লক্ষ্য করি।

বাংলার অন্যান্য গানে, কোনো না কোনোভাবে নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণের চিরাচরিত প্রথাকে নস্যাৎ করে দিয়েছে এই ভাটিয়ালী। অন্ততঃ প্রথম দিকের খাঁটি ভাটিয়ালীর ক্ষেত্রে তো নয়ই। অনেক পরে, অর্থাৎ অত্যাধুনিক সময়ে বিপণনের বাজারে এসে এ গান নারীকণ্ঠে উঠেছে। যদিও খাঁটি ভাটিয়ালী সৃষ্টিলগ্নের আগে-পরেও নৌকা-চালক বা মাঝির আসনে নারীকে দেখতে পাওয়া গেছে। তবুও বলবো ভাটিয়ালী একছত্র অধিকার একেবারে পুরুষের। এতে কোনো সন্দেহ বা কোনো দ্বিমত নেই। তবে এর অর্থ এই নয় যে, মাঝি বা নৌকা-চালক হিসাবে নারী এ-গান করেনি। বলার অপেক্ষা রাখে না, বর্তমানকাল একথার যোগ্য জবাব দিচ্ছে—তবে যৎকিঞ্চিৎ। সে যাইহোক পরবর্তীকালের বিচিত্রতার ঢঙে ফেলে ভাটিয়ালীর প্রথম সৃষ্টির রঙকে ফ্যাকাসে করে দেওয়া ঠিক হবে না।

খাঁটি ভাটিয়ালীর গীতিকার, সুরকার, শিল্পী সবই প্রায় একজনই—সে হোলো পুরুষ মাঝি। মূলত পূর্ববঙ্গে তৎকালীন সময়ের সড়ক পথের অপ্রতুলতা, স্থানীয় জলা-প্রকৃতি, জলযানের আবিষ্কার ও সহজলভ্যতায় পণ্য পরিহনের জন্য মাঝির ক্ষণিক ও দীর্ঘসময়ের নদী-যাত্রাজনিত কারণে পরিবারের সঙ্গে অনিবার্য বিচ্ছেদ-ব্যথাই জন্ম দিয়েছে এ গানের। যেখানে বেশিরভাগ গানের বিষয় নারী এবং তার বিরহ যন্ত্রণা। ভাটিয়ালীর এই নারী আর কেউই নয়—সে হলো মাঝি-প্রিয়া। অথচ

নারীমুখ্য এ গানের রূপকার পুরুষ। আশ্চর্য রকমের হলেও পুরুষ মাঝির মধ্যকার সমব্যথী নারী-সত্তার ও নারী-ভাবনার দ্বারা এ গানে নারীর মনোবেদনার স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে নিখুঁতভাবে। তাতে এতটুকু মিথ্যার রং মেশানো বা কৃত্রিমতার ঝাঁঝে বিস্বাদ লাগেনি কখনো। বলাবাহুল্য পুরুষের সৃষ্ট নারীর-গান বলে পুরুষ দ্বারা সাজানো কথা—এমনটাও ভাবা নিতান্ত অমূলক। আসল কথা পুরুষ মাঝি নিজ দেহে নারী-সত্তা ধারণ করে এ গানের ক্ষেত্রে হয়ে উঠেছে অর্ধনারীশ্বর।

সুজান স্রোতে বৈঠা উঠিয়ে রেখে, পাল তুলে দিয়ে, কেবল হাল ধরে বিবাগী মাঝি তার দরাজ কণ্ঠ ভাসিয়ে দেয় জোলো বাতাসে। আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অন্তিম প্রান্তে দাঁড়িয়ে থাকা মাঝির দু'দণ্ড ঘরে বসে থাকার জো নেই। স্থানীয় চালু জীবিকায় যেমন পণ্য পরিবহণ, খেয়া পারাপার প্রভৃতি কাজে তাই তার গা ভাসাতেই হতো। ফলে পারিবারিক বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে পড়তো। তবে বেদনা-কাতর পরিবারের মধ্যে মাঝি-পত্নীর চোখে নেমে আসতো অবিরল বারি ধারা। এই বিচ্ছেদ তার কাছে চির-বিদায়ের যেন। কারণ উথাল-পাথাল নদীবক্ষে প্রাণ-প্রিয়কে একাকী ছেড়ে দেওয়া মানে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ। বিদায়ের ক্ষণে তাই প্রিয়ার ভারাক্রান্ত হৃদয় কেঁদে কেঁদে বলে ওঠে—

'সোনা বন্ধুরে কোন্ দোষেতে যাইবা ছাড়িয়া'[১]

মাঝিদের দীর্ঘ জল-যাত্রায় বিলম্বিত লয়ে, বাদ্যহীন দরাজ কণ্ঠে গাওয়া ভাটিয়ালী গানের বেশ কিছু অংশ ঈশ্বর ভাবনায় আকুল হলেও এ গানের সিংহভাগ জুড়ে থাকে বাস্তবিক জীবনের প্রেম-বিরহ—আদতে মাঝির পত্নী-বিরহ। এছাড়াও বন্দরে-বন্দরে,ঘাটে-ঘাটে ঘুরতে ঘুরতে কোনো নারীর প্রেমে পড়ে যাওয়ার আনন্দঘন মুহূর্তও সুর হয়ে ওঠে মাঝির কণ্ঠে। কখনো কখনো নদীর পারে সুন্দরী নারীকে দেখে মোহাবিষ্ট হওয়ার কথাও থাকে তার গানে। এক কথায় বলা যায় এ গান মাঝির ব্যক্তিক সুখ-দুঃখের স্মৃতি রোমন্থনচিত হলাহল। আর এর প্রেরণা-দোসর গৃহের মাঝি-পত্নীও। দোহারের মতো যোগ্য সঙ্গত রয়েছে তার।

মাঝির জীবনের প্রেম-বৈচিত্র্যের কয়েকটি মুহর্ত এবার তুলে ধরা যাক—ক্ষণিক হোক আর দীর্ঘ প্রবাসে যেতে হোক, সংসার সচল রাখার ও তার শ্রীবৃদ্ধি ঘটানোর পাশাপাশি প্রিয়ার চোখের জল মোছানোর গুরুভার মাঝির হাতেই ন্যস্ত। মন না চাইলেও বধুকে ঘরে রেখে যেতে হবে দূর দেশে। স্বাভাবিকভাবে দুঃখে ভারাক্রান্ত মন। অপরদিকে গৃহী অবলার ফাটা বুকে নেমে আসে দীর্ঘশ্বাস। তবু সে নিশ্চুপ-নিশ্চল। এমন অবস্থার মাঝেও অকুল দরিয়ার মাঝি দায়িত্ব ও কর্তব্যবোধে অবিচল-তার দৃঢ় মনোবল এবং বজ্রমুষ্টির হাল জীবন-নৌকাকে ঠিক তরীয়ে দেয় কাঙ্খিত উপকূলে। ওদিকে প্রিয়ার দীর্ঘ অদর্শনজনিত কারণে হৃদয়ের কোনে

পুঞ্জিত হতে থাকে বঞ্চিত ব্যথা। অন্তরর্যামী দরদী মাঝি-কবি অনায়াসেই প্রিয়ার সেই মনোবেদনার শতেক ভাব ছান্দিক অবয়বে ও সুর-মাধুর্যে ধরে রাখে নিজ কণ্ঠমালা করে—

'হায়রে বন্ধু নাই দেশে।
পত্র লইয়া যাওরে কোকিল আমার বন্ধুর উদ্দেশে।
আঙ্গুল কাটিয়া কলম বানাইলাম রে,
নয়নের জল কালি।
কলেজা ফাঁড়িয়া, লিখন লিখিয়া,
পাঠাইলাম বন্ধুর বাড়ি।
আমার বন্ধু চৈলে গেছে বৈদেশে নগরে।
মাসে মাসে দিতাম চিঠি, কইয়া গেছেন মোরে।
আমার বন্ধু বসত করে, নিদয়ারই ঘরে।
সেই বন্ধুর কারণে আমার পরাণ কাইন্দ্যা মরে।
(ময়মনসিংহ)'[২]

এ গানে পুরুষের ভাবনায় বাস্তবিক নারীর মর্ম যন্ত্রণার প্রখরতা সীমাহীন। প্রিয় সান্নিধ্য ব্যতীত মনঃকষ্টের এই দুর্যোগ কাটিয়ে ওঠা প্রায়ই অসম্ভব। বৈষ্ণব পদে এরই অনুরণন দেখেছি। মর্ত-মানবী রাধার প্রিয়-অন্বেষণ সূচক উপমা 'মত্ত দাদুরী-ডাকে ডাহুকী-ফাটি যাওত ছাতিয়া' আর এ গানে 'নয়নের জল'কে কালি করে পত্র মারফৎ প্রিয়ের সন্ধান—যেন অভাগা নারীর যাতনারূপ মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। নারী এখানে হারিয়ে ফেলেছে তার জাগতিক জীবনের চেতনা। অবচেতনার অতল গভীরে নিমজ্জিত হতে হতে এক প্রকার প্রলাপ বকতে থাকা নারীর সেই দুর্ভাবনা ও হুতাশন হয়তো দূর করতে পারে মন-পাখি। কাল বিলম্ব না করে, দূর দেশে থাকা প্রিয় মানুষটির কাছে তাই সংবাদ বাহক হিসাবে তাকে পাঠাতে চায় মন। বলার অপেক্ষা রাখে না যৌবন দগ্ধা নারী এখানে হারিয়ে ফেলে তার হিতাহিত জ্ঞান। আসলে মনস্তত্ত্বের আধারে এটি মানব জীবনের একটি অত্যন্ত স্বাভাবিক Organic Need বলা যায়। তাই হৃদয়ের বিস্ফারিত উষ্ণ শোণিতধারা দিয়ে পত্র লিখে ফেলে মুহূর্তে। প্রিয় অদর্শন হেতু মর্ত মানবীর যুগ-যুগান্তরের এই আচরণে যেন কোনো খাদ নেই। মাঝি কবির জ্ঞান-দৃষ্টি নিজের যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করে নারী মনের সেই অব্যক্ত ক্রন্দনকে লিপি রূপ দিয়েছে কণ্ঠের জাদু দিয়ে।

নারীর জীবন যেন যন্ত্রণা সহিতে। তার জীবনের বেশিরভাগটাই যেন দুঃখের অমানিশায় নিমর্জমান। তবে ক্রিয়ার বিপরীত প্রতিক্রিয়ারূপ দুঃখের কালো মেঘের আড়ালে সুখের ঝলকানি জীবনে আসে বৈকি। প্রাণ-প্রিয় মাঝি নয়নগোচর

হলেই মনের গ্লানি কেটে গিয়ে সহজেই প্রতিভাত হতে পারে এক চিলতে চাঁদের হাসি কিন্তু ভাটিয়ালীর গানের ক্ষেত্রে সে গুড়ে বালি। এ গানে নারী-জীবনের সুখচ্ছবি পাওয়া খুব মুশকিল। আসলে এ গান শেখেনি মিলন শয্যা তৈরী করতে। এ শুধু জানে বিচ্ছেদের সানাই বাজাতে, কেবল যন্ত্রণার ছবি আঁকতে। ব্যথার তুলি দিয়ে ভালো করে অশ্রুর প্রলেপ দিতে পারে নয়ন যুগলে। এ গানের কথামালায় কেবলই হতাশার কালো মেঘ ভিড় করে—জগদ্দল পাথরের মতো চেপে বসে থাকে নারীর বক্ষ-পিঞ্জরে। তাই সুখ-পাখি থেকে যায় অধরা। নিচের এই গানটি সেই কথারই সঙ্গত দেয় যেন—

'বিদ্যাশেতে রইল্যা মোর বন্ধু রে
ও মোর পরাণবন্ধু রে।
তোমরা সনে আমার মনের মিল
যেন হয় পরপারে রে।
(আর) বিধি যদি দিত রে পাঙ্খা
উইড়্যা গিয়া দিতাম দেখা
আমি উইড়্যা পড়তাম সোনাবন্ধুর দ্যাশে রে।
আমরা ত অবলা নারী
তরুতলে বাসা বান্ধি রে।
আমার বদন চুয়াইয়্যা পড়ে ঘাম রে।
বন্ধুর বাড়ি গাঙের পাড়
গ্যালে না আসিবে আর,
আমার বন্ধু না জানে সাঁতার রে।
বন্ধু যদি আমার হও,
উইড়্যা আইস্যা দ্যাখা দাও।
তুমি দ্যাও দ্যাখা জুড়াক পরাণ রে।'[৩]

ভাটিয়ালীর স্বাদ বড্ড চেনা। চোখের জলে আর নদীতে পাণিতে একাকার। বিরহ এবং বিচ্ছেদ বেদনা এ গানের আমৃত্যু সঙ্গী। এ গানে আসি বলে বন্ধুর এই সুদূর প্রবাসে আত্মগোপন করা গৃহী প্রেয়সীর উৎকণ্ঠা বাড়ানো ছাড়া আর কিছুই নয়। মনস্তত্ত্বের বিচারে এই সময় নারীর Expressive behaviour of emotion-এর বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। জাগতিক জীবনের পূর্বাপর বিষয় এইবার স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। আসে নানা আশঙ্কা—সে যে সাঁতারে অপারগ। আবার অযাচিতভাবে অন্য এক আশঙ্কার কালো মেঘ ঘনিয়ে আসে স্মৃতির পটে। সে একবার গেলে পুনরায় আসবে কী ফিরে? স্বাভাবিকভাবেই মনের

মধ্যে জেগে ওঠে ভয় (Fear)। একটা সময় সেই আশঙ্কা সত্যই বাস্তবিক রূপ পায়। তাই মন ভরে যায় সুতীব্র হতাশায় (Embarrasment)। তাছাড়া এ গানে নারীর একাকীত্ববোধের (Feeling of lonliness) এক করুণ ছবি চোখে পড়ার মতো। এই বোধ থেকে বিধাতার কাছে একান্ত মিনতিভরে পাখির মতো সেও দুটি ডানা পাওয়ার প্রত্যাশী। তা পেলে যন্ত্রণার উপশম হতো এখনই। অথবা অন্তিম চরণের আকুতি—তার পরাণ-প্রিয় যেখানেই থাকুক না কেন, সে যেন দ্রুত এসে দগ্ধ-তৃষিত প্রাণকে ক্ষণিকের জন্য অন্ততঃ একটু স্বস্তি দেয়।

দূত নির্বাচন ও নিয়োগ, দূত মারফৎ সংবাদ প্রেরণ ও আনয়ন—প্রেমের এক অত্যাবশ্যকীয় বৈশিষ্ট্য। ভাটিয়ালীতে নিরুপায়, বিরহ জর্জর নারী তাই বার বার নদী-পারে গিয়ে লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে অচেনা নাইয়াকে আপন করে নেওয়ার চেষ্টা করে। শুধু প্রাণপ্রিয়ের কাছে তার নিবেদিত প্রাণের খবরটি একবার পাঠানোর জন্য। নদী পারে তীর্থের কাকের মতো অন্তহীন অপলক নয়নে তাই সারাদিন ধরে চলে অচেনা নাইয়ার অন্বেষণ। দিন যায়, রাত নামে, অপেক্ষার প্রহর শেষ হয়ে যৌবন-কাঠে ঘুণ ধরে। তবু বৃথা আশা মরতে মরতে ত্রয়োদশীর শেষ প্রহরের চাঁদের মতো আধমরা হয়ে জেগে থাকে। বরাত ভালো হলে বা বিধাতার অসীম কৃপা বলে হঠাৎ করে হৃদয়ে আশার সঞ্চার হয় দূর গাঙে ঝাপসা নীল বাদাম চোখে পড়লে। এইক্ষণে নারীর Instinict of curiosity বা কৌতূহল প্রবৃত্তির সতেজতা চোখে পড়ে। পরক্ষণে তা থেকে Sex-instinct বা যৌন প্রবৃত্তি পুনর্জাগরণ হতে দেখা যায়। তাছাড়া নারীর চিরাচরিত বারোমাস্যার সুরও ধ্বনিত হতে দেখা যায় এ গানে। অবশেষে মাথার দিব্য দিয়েও মাঝির দেখা পাওয়া ভার—

‘আরে ও ভাইটাল গাঙের নাইয়্যা
দুঃখিনীর এই খবর কইও
বন্ধুর বড়ি যাইয়্যা।
ও নাইয়্যা রে কইও,
কইও মোর বন্ধুর কাছে
মোর প্রতিনিধি হইয়্যা,
আইবা বইল্যা আইল না বন্ধু
গ্যাল দিন বইয়্যা।
হেমন্ত শীতান্ত গ্যাল মোর
কান্দিয়া কান্দিয়া
রে বন্ধু বইয়্যা রইলাম

বন্ধুর পথ চাইয়্যা।
মনের আগুন জ্বইল্যা উঠল
বসন্তের বাও পাইয়্যা (রে)।
অ বন্ধু মোর মাথার কিড়া দিয়া
বন্ধু আইস্যা যদি দিত দেখা
আমি মরিতাম হেরিয়া।'[৪]

ভাটিয়ালী গানের লৌকিক প্রেমের চিত্র ব্যক্তিভেদে একটু স্বতন্ত্র রকমের। বিবাহিত ও অবিবাহিত পুরুষের চেতনায় প্রেমের রঙ এখানে বিচিত্র। যে মাঝি অবিবাহিত, তার ইতি-উতি চাউনির মাঝে একান্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা নারীকে স্পর্শ করার ও তাকে নিয়ে ঘর বাঁধার স্বপ্নে সে বিভোর। আর বিবাহিত পুরুষ মাঝির স্বপ্ন নারীর সঙ্গে অনন্তকাল সময় কাটানোর কিন্তু বিধি বাম। অভাবের তাড়না ছিন্ন করে দেয় ব্যক্তি জীবনের মধুর সম্পর্কগুলো। ফলত বিপরীত দিকের নির্দোষ মানুষটির মন-যাতনা মাঝির বুকে বেশি করে বাজে। আর তাই আপন মনের কথা চেপে রেখে মাঝি প্রাণ-প্রিয়ার কথা বেশি করে বলে। বলার অপেক্ষা রাখে না, এই দুই জনের একজন মনের মানুষকে পাওয়ার জন্য আকূল, অন্য জন পেয়ে হারানোর ভয়ে, ব্যথায় ব্যাকুল। সে যাইহোক উথাল-পাথাল দরিয়ার বুকে মাঝির একাকিত্ব মোচনের দোসর তার প্রিয়ার করুণ মুখখানি। বিচ্ছেদ-কাতর সেই মুখের প্রতিচ্ছবি সহজেই ধরা পড়ে মাঝির মনের আয়নায়। এই সময় অত্যন্ত করুণ সুরের গান ধরে মাঝি ভুলতে চায় সেই বিচ্ছেদের দহন জ্বালা। আর তাই চোখের জলে বক্ষ বিদীর্ণ করে দরাজ সুরের মধ্যে মাঝি পেয়ে যায় এক পরম তৃপ্তি আর সাময়িক সান্ত্বনা—

'চিত্ত-চোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে গো, প্রাণ-সজনি।
মন-চোরা বন্ধু আমার রহিল কোন দেশে।
সখী রে মনের দুঃখু কেউ না জানে,
পোড়া মনে বুজ না মানে।
বন্ধু হারা হইয়া আমি ফিরি পাগল বেশে।...'[৫]

ভাটিয়ালী গানে নারীর প্রেম, বিরহ, বিচ্ছেদের কথা বেশি থাকলেও অশ্লীলতার দোষে এ গানকে কোনোদিন দুষ্ট করা যাবে না। বরঞ্চ এ গানের প্রেম-প্রত্যাশী নারী সর্বদা শালীনতা বজায় রেখে চলেছে। আসলে ভাটিয়ালীর নারী লজ্জায় অবগুণ্ঠিতা, বেদনায়-বিরহে পাথর, শোকে মূর্ছিতা ও আচ্ছন্ন, যন্ত্রণায় মূহ্যমান এবং অশ্রুতে সে সদা সিক্ত।

ভাটিয়ালীতে নারীর প্রেম, বিরহের মাঝে একটি ভয়-ভীতির আশঙ্কা সর্বদা

পরিলক্ষিত হতে দেখা যায়। ভয় মনস্তত্ত্বের আধারে একটি মৌলিক প্রক্ষোভ বটে। আর এই ভীতি ভাটিয়ালী সুরের গায়ক এবং যার হয়ে গানটি গাওয়া হচ্ছে তাদের দুজনেরই ক্ষেত্রেই দেখা যায়। গায়কের ক্ষেত্রে উথাল-পাথাল নদীর হিংস্র জীবজন্তুর ভয়, প্রকৃতির রুদ্ররূপের ভয়, প্রিয়াকে গৃহকোণে একাকী ফেলে আসার ভয় এমনকি প্রিয়াকে হারানোর ভয় সর্বদা তাড়িত করে। অন্যদিকে যার জন্য বা যার হয়ে গানটি গাওয়া হয় তার ভয়ের স্বরূপ প্রায় সমধর্মী। মাঝি-প্রিয়ার সতত ভয় স্বামীকে হারানোর। সে দুর্যোগের কোপানলে পড়ে হতে পারে, হতে পারে অন্য কোনো নারীর প্রেমে পড়ে। তবে অন্তিম প্রকৃতির ভয় তুলনামূলকভাবে বেশি। যদিও ভাটিয়ালী গানে এই ঘটনার বৈপরীত্য বেশি চোখে পড়ে। অর্থাৎ মাঝির থেকে মাঝিপ্রিয়া স্বেচ্ছায় পর পুরুষের দিকে বেশি ধাবিত হতে দেখি। সে দিক থেকে দেখতে গেলে এই গানে পরকীয়ার বেশ চল পরিলক্ষিত হয়। নারীর এমন মনোভাবের যুক্তিসঙ্গত কারণ আছে বৈকি। সে চেয়েছিল Freedom from fear বা Freedom from threat অর্থাৎ প্রিয় সান্নিধ্য এবং তার ছত্রছায়ায় থেকে সকল প্রকার ভয় থেকে মুক্তি। কিন্তু দেখা যায় তার সমস্ত সুখস্বপ্ন নিমেশেই ভেঙে চুরমার। শেষ সম্বল শাশুড়ী হলেও অনতিবিলম্বেই তার দজ্জাল আচরণে চোখের বিষ হয়ে থাকা আর প্রতিক্ষণে ননদীর খোঁটা খাওয়ার থেকে সাধের এই সংসার পরিত্যাগ করে পরপুরুষের দিকে ধাবিত হওয়া অনেক ভালো। এখানে মানুষ হিসাবে তার Need for Physical Security কোথায়? আসলে স্বামীর দীর্ঘ অদর্শন ও অনুপস্থিতি এখানে নারীর Sex instinct-এর পক্ষে যথেষ্ট অন্তরায়। যা নিসঙ্গতায় বাড়াবাড়ি হয় বৈকি। এই সাধারণ প্রবণতার একটি পূর্বসূত্র বিদ্যমান—

অর্থের অসম বন্টন আর এই অসঙ্গতি থেকে দারিদ্রসীমার শেষ দেওয়ালে পিঠ ঠেকে যাওয়ায় নিরুপায় মাঝির কর্মব্যস্ততা থেকে দীর্ঘ প্রবাসে গমন।

↓

ফলতঃ বিবাহিত দম্পতির জীবনে আসে উৎকণ্ঠা, পরে অদর্শন-জনিত বিচ্ছেদ।

↓

এই বিচ্ছেদের সীমা লঙ্ঘিত হলে আসে বিরহ, দেখা দেয় নিদারুণ শোক।

↓

প্রিয় সন্নিধানের মরিয়া চেষ্টা থেকে দূতী নির্বাচন ও দূত প্রেরণ এবং তার বিফলতা। জীবনে আসে অন্তহীন হাহাকার।

↓

আশ্রয় ও নিরাপত্তার খোঁজে পারিবারিক (শ্বশুরকুলে) সম্পর্কসূত্রের

পরিজনকে আঁকড়ে ধরার ব্যর্থ চেষ্টা এবং বাপ-মা-ভাইদের সুতীব্র উদাসীনতা।

↓

জীবন-যৌবন কালি করে, অতৃপ্ত যৌনক্ষুধা পরিতৃপ্তির বাসনায় নিরুপায় নারীর পর পুরুষ অন্বেষণ—পরকীয়া।

↓

গৃহত্যাগ কিংবা অভিসারে গমন।

আসলে এই পরকীয়ার উদ্দেশ্য হল কামতৃষ্ণা চরিতার্থ করা। মানব জীবনের এও একটি মৌলিক প্রক্ষোভ। যাকে বলা হয় Lust. এবার ভাটিয়ালীর পরকীয়ার সুগন্ধিমাখা কয়েকটি গানের উদাহরণ নেওয়া যাক—

'সুজন মাঝি রে—
কোন্ ঘাটে লাগাইবা তোমার নাও।
আমি পারের আশায় বইস্যা আছি,
আমার লইয়া যাও।
এই পারেতে দরদী নাই,
ওই পারেতে যাইবার চাই,
হয় না আমার পারে যাওয়া
চঞ্চলিয়া চলিয়া যাও।'[৬]

এখান নব-প্রিয় সান্নিধ্যে যাবার তীব্র আকুতি লক্ষিত হচ্ছে। আগন্তুক মাঝি ফের-ফারের ভয়ে কামান্ধ নারীকে নৌকায় না তুললেও তবু সে আশাহত না হয়ে ভিন দেশে কিংবা সুদূর ওই পারে যাওয়ার জন্য সঙ্কল্পবদ্ধ। নিচের এই গানটি পরকীয়ার সেই জোরালো স্বীকারোক্তি—

'মাঝি নাও লাগাও কূলে
তোমার সনে করবো পিরিত তোমার দোন জালে
মাঝি নাও লাগাও কূলে।
অ মাঝি রে—
আমার বাড়ি যাইতে রে, মাঝিভাই আঁড়ু আঁড়ু পাণি
জল গামছা ভিজিয়া গেলে ধুতি দিয়ম আমি
অ মাজি রে—
আমার বাড়িত্ গেলে রে মাঝি বসতে দেব পিঁড়া
জলপান যে করিতে দিব চিকন ধানের চিঁড়া।'[৭]

এই গানে আবার লাজ-লজ্জায় তোয়াক্কা না করে নারী অত্যন্ত রকমের

নির্ভীক। এমনকি নিজ গৃহে সযতনে ভিন-দেশি মাঝিকে ডেকে সে কীভাবে এবং কীরূপে আপ্যায়ন করবে তার ফিরিস্তি বলতে এই নারীর কোনো সংকোচ বোধ হয় না। মিলনাকাঙ্ক্ষাহেতু, আর নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী অতিথি সেবায় এই নারীর দরদ যেন উথলে উঠছে। তাই মনের মতো বাছাই দ্রব্যটি সহজেই তাকে অর্পণ করতে বদ্ধপরিকর সে।

নিচের এই গানটি একই ভাবের কথা বলে। তবে এ গানে নারী আরও একধাপ এগিয়ে। স্বজাতিকে ফাঁকি দিয়ে আপন স্বার্থ চরিতার্থ করতে সে যে বিন্দুমাত্র পিছপা হবে না—তা সে হেঁকে ডেকে সর্ব সমক্ষেই বলে দিয়েছে। এমন অযাচিত মিলন-আহ্বানে ভিনদেশি মাঝির প্রত্যুত্তর বা প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে তা অনাবিষ্কৃত থেকে গেলেও এই ভিন গাঁয়ের নারী সত্যই অকপট—

'ভরা গাঙে পাল তুইল্যা যাও
কোন দেশেতে নাইয়া—
(মুই) আপর-দুপুর কাইন্দা মরি হায় রে
(পদ্মা) কার পানে চাহিয়া রে
মরি হায় হায় রে—
ঘরে তোমার বেসাত যত
আসমানে নাই তারা
(সেই) ঘরের সোনা রইল ঘরে
(হায় রে) দ্যাখ না আমারে চাইয়্যা রে
মরি হায় হায় রে—
পদ্মা গাঙের উজান ভাটি
তার চাইয়্যা এই পীরিত খাঁটি
বুইঝ্যা তুমি দেখ রে বন্ধু
যাও না আমারে লইয়্যা রে
মরি হায় হায় রে।'[৮]

তবে পরকীয়ার মনস্থির করার আগে নারী তার শ্বশুরবাড়ির বর্তমান সঙ্গীন অবস্থা, দূত মারফৎ সরজমিনে বাপের বাড়ি জানাতেও তৎপর হয়। পিতা না থাকলে নিজ ভাই, দাদাকেও সে জানাতে চায়। সেক্ষেত্রে নুন আনতে পান্তা ফুরানোর মতো অবস্থা যে পিতার, সে বাপ তো উদাসীন হবেই। তাছাড়া বাংলার হতদরিদ্র সমাজে অসহায় পিতার বা দাদা-ভাইদের নিজ কন্যা বা বোনের প্রতি এই অবহেলা ও নির্লিপ্ততা আজন্মকালীন এক রোগ বলা যেতে পারে। কোনও মতে বিবাহ দিয়ে বাড়ির বাইরে বের করতে পারলেই শান্তি যেন। বহু আগের থেকে তো বটেই তবে মধ্যযুগের সাহিত্য শাক্তপদের শিরা-উপশিরায়

পিতার এই কন্যা-অবহেলার ছবি চিত্রিত আছে স্পষ্টই। নিচের এই ভাটিয়ালী গানে পিতৃ-অবহেলার আশঙ্কাজনিত সেই ঘা এখনো দগদগে—

'উজান দেশের মাঝি রে ভাই ধন ভাটির দেশে যাও
বাপ মারে কইও খবর দেখা যদি পাও
ননদের চোখে বিষ হইয়াছি শাশুড়ির চোখে ঝাল
ডাইনের কপাল বাঁয়ে গেছে আমার দুঃখের কাল
আমার কেন্দে কেন্দে জনম গেল পথের পানে চাইয়া।
এই না গাঙে দিয়া রে মাঝি এই না গাঙে দিয়া
কত নায়ও আসে ও যায় আমি থাকি চাইয়া।
এবার যদি না নেয় নাইওর নায়ে ছইয়া দিয়া
কয়দিন বাদে আইবার কইয়ো বাঁশের পালঙ্গ লইয়া
আমি নাইওর যাবার সাধ মিটাব বিষের বড়ি খাইয়া।'[৯]

এইভাবে ভাটিয়ালী গানে বঙ্গ নারীর সহজাত দুঃখ-যন্ত্রণা ও আনুষঙ্গিক বিচিত্র অনুভূতির বাহ্যিক আচরণ সম্বলিত চিত্র, বসনের মতো অজন্মকাল ধরে জড়িয়ে থাকবে তার গায়ে। কারণ দুঃখের সমুদ্রে অবগাহন করেই আনন্দ-রত্ন আহরণ করাই এ গানের আসল লক্ষ্য। তাই অনাবিল কান্নার কালো মেঘের মধ্যে সে আত্মগোপন করে রাখে হাসির সূর্যটি। বঙ্গের প্রধান ক'টি লোকগানের মধ্যে ভাটিয়ালীতে এই বৈশিষ্ট্য অত্যন্ত রকমের প্রকট। মানব সমাজের উৎকর্ষচিত আচরণ তার সংস্কৃতির যদি অন্যতম আধার হয় তবে ভাটিয়ালীতে সে উৎকর্ষ বিদ্যমান। তাছাড়া বলা যায় বঙ্গ-নারীর মনস্তত্ত্বের বিচিত্র ঘনঘটার খণ্ডচিত্রের উজ্জ্বল উপস্থিতি যথেষ্ট পরিমাণে রয়েছে ভাটিয়ালীতে। বিশেষ করে তার Instincts, Emotion, Primary or Secondary Needs সম্বলিত বিষয়গুলির সুন্দর উপস্থিতি, বাংলার অন্যান্য লোকগানে কোথাও এইভাবে প্রস্ফুটিত হয়েছে কিনা সন্দেহ।

তথ্যসূত্র :

১। *বাংলার লোকগান*, আশিস্ ঘোষাল, বলাকা, প্রথম সংস্করণ ঃ জুলাই-২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৬১
২। *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, ওয়াকিল আহমদ, বাতায়ন প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মে-২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬৫
৩। *বাংলার লোকগান*, আশিস্ ঘোষাল, বলাকা, প্রথম সংস্করন ঃ জুলাই-২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২৭-৩২৮
৪। ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩২৮-৩২৯
৫। *বাংলা লোকসংগীতের ধারা*, ওয়াকিল আহমদ, বাতায়ন প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মে-২০১৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা-১৬১

৬। *বাংলার লোকগান,* আশিস্ ঘোষাল, বলাকা, প্রথম সংস্করণ ঃ জুলাই-২০১৮, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৩৬
৭। ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫০
৮। ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৩৮-৩৩৯
৯। ঐ, পৃষ্ঠা সংখ্যা-৩৫১

গ্রন্থপঞ্জি :

১. আহমদ ওয়াকিল। *বাংলা লোকসংগীতের ধারা,* ঢাকা-১১০০, বাতায়ন প্রকাশন, দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ মে-২০১৫
২। গুপ্ত অশোক। *শিক্ষা মনোবিজ্ঞান,* কলকাতা-৭৩, সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, প্রথম সংস্করণ ঃ সেপ্টেম্বর-২০১৯
৩। ভট্টাচার্য আশুতোষ। *বঙ্গীয় লোক-সঙ্গীত রত্নাকর, চতুর্থ খণ্ড (ভ হইতে হ),* কলকাতা-৩৪, পশ্চিমবঙ্গ লোক-সংস্কৃতি গবেষণা পরিষদ, প্রথম সংস্করণ ঃ কার্তিক ১৩৭৪
৪। —। *বাংলার লোক-সাহিত্য (প্রথম খণ্ড : আলোচনা),* কলকাতা-১২, ক্যালকাটা বুক হাউস, পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৬২
৫। —। *বাংলার লোক-সাহিত্য (তৃতীয় খণ্ড : গীত ও নৃত্য),* কলকাতা-১২, ক্যালকাটা বুক হাউস, প্রথম সংস্করণ ঃ ১৯৫৪
৬। ভট্টাচার্য পরেশনাথ। *মনোবিদ্যা,* কলকাতা-১৩৩, জি. এস. পাবলিকেশন, নতুন সংশোধিত সংস্করণ ঃ বৈশাখ ১৪২৪
৭। ভূঞ্যা ফাল্গুনি। *বাংলার লোকসংস্কৃতি : মনস্তাত্ত্বিক অন্বেষা ও প্রয়োগ,* দক্ষিণ ২৪ পরগনা, সমকালের জিয়নকাঠি প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ ঃ মার্চ-২০১১
৮। মজুমদার দীপ্তিপ্রকাশ। *হাজার বছরের বাংলা গান,* কলকাতা-০৯, অমর ভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি-২০০৩
৯। ধারা মণ্ডল কাকলি। (সম্পাদনা), *বাংলা লোকসংগীত কোষ,* কলকাতা-০৯, অমর ভারতী, প্রথম প্রকাশ ঃ ২০১৩
১০। রায় সুশীল। *শিক্ষা মনোবিদ্যা,* কলকাতা-০৯, সোমা বুক এজেন্সী, নতুন সংস্করণ ঃ ২০১০-২০১১
১১। সরকার আশিস্। (সংকলন ও সম্পাদনা), *বাংলার লোকগান,* কলকাতা-০৯, বলাকা, প্রথম সংস্করণ ঃ জুলাই-২০১৮

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ. ডি. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

যযাতির বাসনা ও তার প্রবহমানতা : মহাকাব্য থেকে আধুনিক কবিতা

বীণা মণ্ডল

সারসংক্ষেপ :

মহাভারতের 'আদিপর্ব' এর 'সম্ভবপর্বাধ্যায়' এ রাজা যযাতির কাহিনি আছে। তার জরা প্রাপ্তির অভিশাপ, পুত্রকে জরা দান করে পুনরায় যৌবন লাভের উপাখ্যান বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এই কাহিনির অলৌকিকতাকে বাদ দিলেও থেকে যায় এক চিরন্তন সত্যের স্পর্শ। তা হল, যৌবনের উজ্জ্বল উদ্দীপনা লাভের প্রতি মানব জাতির তীব্র আকাঙ্ক্ষা। যা শুধুই শারীরিক থাকে নি, মানসিক, বৌদ্ধিক, চৈতন্যের স্তরেও উপনীত হয়েছে ক্রমশ। এই আকাঙ্ক্ষা আধুনিক কবিদের কাব্যে নতুন মাত্রা পেয়েছে এবং ভিন্ন থেকে ভিন্নতর অভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। বিশ শতকের চারজন প্রতিনিধি স্থানীয় কবির কবিতা অবলম্বনে সেই অভিমুখের গতিপথ বিশ্লেষণ করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। কোনো কবি গ্রীক মিথের সঙ্গে ভারতীয় এই মিথের যূথবদ্ধ এক বেণী রচনা করেছেন, আবার কোনো কবি সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক উত্তাল যুগযন্ত্রণার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে তার থেকে মুক্তির সন্ধান দিতে এই মিথের প্রয়োগ করেছেন, আবার কেউ বা একান্ত ব্যক্তিগত নিবেদনের সূত্রে এনেছেন যযাতির প্রসঙ্গ।

মূল শব্দ : মহাকাব্য, যযাতি, কবিতা, বাসনা, যৌবন

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে কোথা কবে,
চিরস্থির কবে নীর, হায় রে, জীবন-নদে?"[১]

(বঙ্গভূমির প্রতি, মাইকেল মধুসূদন দত্ত)

কবি মধুসূদন দত্ত অপূর্ব ছন্দের বুননে এক ধ্রুব সত্যকে তুলে ধরেছেন। নদীতে যেমন নীর কখনো একই স্থানে স্থির থাকতে পারে না, জীবনেও তেমনই কোন এক সময়পর্ব বা বয়স কখনোই স্থির থাকে না, তা কালের নিয়মে প্রবহমান। কিন্তু যৌবনের মাদকতা, সৌরজ্জ্বলসম উদ্দীপনার দীপ্তি সকলেরই চির কামনার বস্তু, সকলেই চায় সেই বয়স, আর বয়সের উন্মাদনাকে ধরে রাখতে। সেই কারণেই জরা, ব্যাধি মৃত্যু যা কিছুই উদ্দীপ্ত জীবনশক্তি ও যৌবনের উদ্দামতার বিরোধী তারই বিরুদ্ধে খড়্গ ধরার অভিনব কৌশল তৈরি করে আসছে মানব সমাজ যুগ যুগ ধরে।

কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস রচিত মহাভারত এর 'আদিপর্ব' এর 'সম্ভপর্বাধ্যায়'এ অতিসংক্ষিপ্ত পরিসরে রাজা যযাতির জীবনকে অবলম্বন করে এমনই এক খণ্ডচিত্র উঠে এসেছে। মহাভারতের যুগে আমরা দেখেছি এক একজন রাজা হাজার হাজার বছর রাজত্ব করেছেন, জীবনকে উপভোগ করেছেন তবুও তাদের ভোগের অদম্য ইচ্ছার অসীম তৃষ্ণার কোন অন্ত নেই। যযাতির ক্ষেত্রেও অকাল জরার যে অভিশাপ নেমে এসেছিল তিনি কৌশলে তাকে সাময়িকভাবে ঠেকাতে সমর্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এই যৌবন আকাঙ্ক্ষা ও তার ভোগের কি কোন সমাপ্তি আছে? এই যৌবনলাভ আসলে শুধুই কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার প্রয়াস মাত্র? নাকি যৌবন আসলে সক্রিয় জীবনী শক্তির প্রতীক যা এমন এক সামর্থ্যের জোগান দেয়, যার জোরে মানুষ সমাজ ও বিশ্বের ঊষর ভূমিকে উর্বরা করার ক্ষমতা রাখে? এমনই নানা প্রশ্ন অঙ্কুরিত হয়েছে আধুনিক কবির কাব্যিক হৃদয়ে।

আসলে জরা, ব্যাধিকে হারিয়ে চিরযৌবনের অমরত্ব লাভের চিরকালীন বাসনা মানব হৃদয় বহন করে আসছে। মহাকাব্যিক চরিত্র যযাতি যেন সেই চিরযৌবন লাভের বাসনা ও আকাঙ্ক্ষার প্রতীক রূপে পৌরাণিক কাল থেকে আধুনিক কাল পর্যন্ত ধ্বনিত ও প্রবাহিত হয়ে আসছে। সেই ভাবনাই আধুনিক কবিদের হাতে পড়ে নতুন থেকে নতুনতর রূপ লাভ করেছে। তবে এই ভাবনা জরা আর মৃত্যুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, অমরত্ব শুধু শারীরিক আবর্তের মধ্যেই আবদ্ধ থাকেনি। আধুনিক কবিগণ তাকে শারীরিক ক্ষুদ্র বাসনা ও ভোগের ঊর্ধ্বে তুলে এক চিরকালীন রূপ দান করেছেন।

মহাভারতের মতো বিরাট বিস্তৃত মহাকাব্যের যে সকল কাহিনি বা অনুষঙ্গ আধুনিক যুগ প্রেক্ষিতে অভিনব মাত্রা পেয়ে চিরকালীন রূপলাভ করেছে তার মধ্যে রাজা যযাতির কাহিনি অন্যতম। মহাভারতের আদিপর্বে উল্লিখিত যযাতির সেই কাহিনির পরিচয় দিয়ে, আধুনিক কবিতার কালপর্বে এক দশক থেকে অন্য দশকে তা কীভাবে প্রবাহিত হয়েছে সেই আলোচনা ও বিশ্লেষণই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

মহাভারতের আদিপর্বে রাজা যযাতির যে কাহিনি বর্ণিত আছে, তা অতি সংক্ষেপে এইরূপ— চন্দ্রবংশীয় রাজা নহুষের পুত্র রাজা যযাতির সঙ্গে বিবাহ হয় দৈত্যদের পুরোহিত শুক্রাচার্যের কন্যা দেবযানীর। তবে বিবাহের পর তার সঙ্গে যায় সহস্র দাসী ও শর্মিষ্ঠা। এই শর্মিষ্ঠা অসুররাজ বৃষপর্বার কন্যা, নিজের কর্মফল স্বরূপ পিতার আদেশে সে দেবযানীর দাসী হয়ে থাকে। বিবাহের পর শুক্রাচার্য যযাতিকে স্পষ্ট জানিয়ে দিয়েছিলেন—

"বৃষপর্বার কন্যা এই কুমারী শর্মিষ্ঠাকে তুমি সসম্মানে রেখো,
কিন্তু এঁকে শয্যায় ডেকো না।"[২]

কিন্তু সমায়ান্তরে দেখা যায় শর্মিষ্ঠাই যযাতির কাছে উপযাচিকা হয়ে উপস্থিত হয় এবং নানা প্রকার প্রবোধ বাক্য দ্বারা যযাতির দ্বিধা দূর করে। কালক্রমে দেবযানী দুই পুত্রের জন্ম দেন—যদু ও তুর্বসু। অন্যদিকে শর্মিষ্ঠার গর্ভে জন্মগ্রহণ করে তিন পুত্র দ্রুহ্য, অনু ও পুরু। যা প্রথমে দেবযানীর কাছে সম্পূর্ণ গোপন থাকে। তবে জানার পর দেবযানী 'সাশ্রুলোচনে' পিতা শুক্রাচার্যের কাছে গিয়ে অভিযোগ জানালে, শুক্রাচার্য ক্রুদ্ধ হয়ে যযাতিকে অভিশাপ দিলেন—

"তুমি ধর্মজ্ঞ হয়ে অধর্ম করেছ,
আমার উপদেশ গ্রাহ্য করনি, অতএব দুর্জয় জরা তোমাকে আক্রমণ করবে।"[৩]

এই চরম শাস্তি প্রত্যাহারের জন্য যযাতি অনেক অনুরোধ করার পর, শুক্রাচার্য জানান তিনি এই অভিশাপ প্রত্যাহার করতে পারবেন না, তবে যযাতি ইচ্ছা করলে এই জরাভার অন্যকে দিতে পারবে। এরপর যযাতি একে একে যদু, তুর্বসু, দ্রুহ্য, অনু সকলকে অনুরোধ করলেন, তার জরা গ্রহণ করতে ও বিনিময়ে রাজ্যসুখ ও কীর্তি লাভ করতে। এরা কেউই সম্মত হল না। শেষে কনিষ্ঠ পুত্র পুরু পিতার অনুরোধ শোনা মাত্রই জানায়—"মহারাজ আপনার আজ্ঞা পালন করব, আমার যৌবন নিয়ে অভীষ্ট সুখ ভোগ করুন, আপনার জরা আমি নেব।"[৪]

পুরুর সেই যৌবন পেয়ে যযাতি সহস্র বৎসরব্যাপী রাজ্যসুখ ভোগ করার পর উপলব্ধি করে—

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্ধতে।।
যৎ পৃথিব্যাং ব্রীহিযবৎ হিরণ্যং পশবঃ স্ত্রিয়ঃ।
একস্যাপি ন পর্যাপ্তং তস্মাৎ তৃষ্ণাং পরিত্যজেৎ।।

—কাম্য বস্তুর উপভোগে কখনও কামনার শান্তি হয় না, ঘৃতসংযোগে অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধি পায়। পৃথিবীতে যত ধান্য, যব, হিরণ্য, পশু ও স্ত্রী আছে তা একজনের পক্ষেও পর্যাপ্ত নয়, অতএব বিষয়তৃষ্ণা ত্যাগ করা উচিত।"[৫]

এরপর পুরুকে যৌবন ও রাজত্ব দিয়ে যযাতি বানপ্রস্থে চলে যান ও কালচক্রে মৃত্যুমুখে পতিত হন।

বিশ শতকের তিনের দশকের প্রথিতযশা দুই কবি বিষ্ণু দে ও সুধীন দত্তের কবিতায় যযাতির এই মিথ দুই সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রেক্ষিতে উঠে এসেছে। আবার পাঁচের দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় দুই কবি শঙ্খ ঘোষ ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এই একই প্রেক্ষিতকে অবলম্বন করে কবিতা রচনা করলেও তা সম্পূর্ণ ভিন্ন দুই

আঙ্গিকে উপস্থাপিত হয়েছে। কোনো কবি গ্রীক মিথের সঙ্গে ভারতীয় এই মিথের যূথবদ্ধ এক বেণী রচনা করেছেন, আবার কোনো কবি সমকালীন সামাজিক রাজনৈতিক উত্তাল যুগযন্ত্রণার প্রসঙ্গ উপস্থাপন করে তার থেকে মুক্তির সন্ধান দিতে এই মিথের প্রয়োগ করেছেন। আবার কেউ বা একান্ত ব্যক্তিগত নিবেদনের সূত্রে এনেছেন যযাতির প্রসঙ্গ। আধুনিক কবিতার এক অন্যতম লক্ষণই হল সমসাময়িক যুগ প্রেক্ষিতকে অস্বীকার না করে, তাকে কবিতা রচনার প্রেক্ষাপট করে তোলা। পৌরাণিক কোন অনুষঙ্গ তার অলৌকিক মোড়ক ত্যাগ করে, বাস্তব সম্মত ব্যাখ্যা সহ সেই প্রেক্ষাপটের সমর্থনে বা বিশ্লেষণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। যা এই প্রবন্ধে আলোচ্য সকল কবির কবিতাতেই বিশেষ ভাবে প্রকটিত।

কবি বিষ্ণু দে'র (১৯০৯-১৯৮২) 'চোরাবালি' (১৯৩৮) কাব্যগ্রন্থের অন্যতম কবিতা 'যযাতি'। এই কবিতায় যযাতি অপ্রতিরোধ্য, দুর্দমনীয় এক আশাবাদের প্রতীক রূপে উঠে এসেছে। কবি গ্রীক পুরাণের দেবী প্রসার্পিনা ও মহাভারতের যযাতির মিথকে একই সূত্রে গেঁথেছেন। গ্রীক পুরাণের কাহিনি অনুসারে প্রসার্পিনা হলেন গ্রীক দেবতা জুপিটার বা জিউসের কন্যা। তিনি শস্য বা ফসলের দেবী রূপেই প্রসিদ্ধা। নরক তথা পাতালের দেবতা প্লুটো প্রসার্পিনাকে জয় করে পাতালের রানী করে নিয়ে যান। যার ফলস্বরূপ পৃথিবী ফসলহীন বন্ধ্যায় পরিণত হতে থাকে। এমতাবস্থায় পিতা জিউস কন্যা প্রসার্পিনার কাছ থেকে বছরের ছয় মাস সময় চেনে নেন পৃথিবীতে বাস করার জন্য। সেই ছয় মাসের জন্য পৃথিবী তার জরারূপ বন্ধ্যাদশা কাটিয়ে যৌবনরূপ উর্বরতা লাভ করে, কবির ভাষায়—

"বসুন্ধরার অগ্নি-উদরে লেগেছে দোলা,
শত সর্পিল ধূমকেতু তার অন্ত্র টানে।"[৬]

মহাভারতের যযাতি নিজের বাসনা চরিতার্থ করতে নিজের স্বার্থে পুত্র পুরুর কাছে যৌবন ভিক্ষা চেয়েছিলেন, তা পেয়ে ভোগও করেছিলেন দীর্ঘকাল। অন্যদিকে গ্রীক দেবতা জিউস ভূভাগ তথা বিশ্বভূমিকে রক্ষা করতে কন্যা প্রসার্পিনার কাছে সেই যৌবন চেয়েছেন। পৃথিবীকে আবার যৌবনবতী, শস্য শ্যামলা করার কারণেই জিউসের এই প্রার্থনা। দুই পিতার প্রার্থনার কারণের মধ্যে প্রভেদ থাকলেও সন্তানের কাছে পিতার আকূতির ধ্বনি আসলে একই সুরে প্রবাহিত হয়েছে। আর এই দুই ভিন্ন যুগ ও কাল খণ্ডের দুই ভিন্ন প্রসঙ্গকে কবি মিলিয়েছেন অপূর্ব ভঙ্গিমায়—

"প্রসার্পিনার মুঠিতেও তাই প্রণয়রতি
পিতৃ-সারস যযাতি-শিরার প্রবল গানে।"[৭]

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য ; প্রসার্পিনা পিতার অনুরোধ রাখতে প্লুটোকে ছেড়ে তার যৌবন দান করছেন ছয় মাসের জন্য বসুন্ধরাকে। ব্যাসদেবের মহাভারতে পুরুর কোন প্রণয়িনীর উল্লেখ নেই। তবে পরবর্তীকালে রচিত 'যযাতি' নামে এক নাটকে নাট্যকার চিত্রভানু পুরুর এক প্রণয়িনীর উজ্জ্বল উপস্থিতি দেখান। তিনি তার নামকরণও করেন অর্পিতা। তার আকূতি, অপেক্ষা ও বেদনার এক দীর্ঘ উপাখ্যান ধরা আছে এখানে। এরই পাশাপাশি পুরুর প্রতিকূলমুখী অগ্রাহ্যের করুণ স্বর 'যযাতি'র কাহিনির এক উপেক্ষিত অংশের এক প্রাসঙ্গিক সম্প্রসারণ হয়ে রয়ে গেছে।

কবি বিষ্ণু দে এই কবিতায় রাজা যযাতির জ্ঞান, কর্মফল, পাপ ও সেই বোঝার প্রসঙ্গ উল্লেখ করে আসলে কার্যকারণ পরম্পরায় এই ভাবনা সূত্রকে গাঁথতে চেয়েছেন। যযাতির এই পরিণতিকে অনেক 'জ্ঞানের চরম ক্ষতি' বলে উল্লেখ করেছেন কবি। কিন্তু এই পরিণতিকেও আধুনিক কবি 'কূট প্রশ্ন' করতে ভোলেন না। 'অশনায়োগ্র ধমনীশিরার পরম তৃষা' আসলে সেই তীব্র আশাবাদকেই ধ্বনিত করছে, যাকে একই সঙ্গে কবি 'নির্দয় লোভ' ও বলেছেন। অলৌকিকতার যে বাতাবরণে পৌরাণিক কাহিনি আবৃত থাকে, বাহ্যিক সেই বাতাবরণকে সম্পূর্ণ উচ্ছেদ করে মূল কাহিনির সারবস্তু ও মজ্জাকে তুলে এনে একান্ত নিজস্ব প্রেক্ষিতে উপস্থাপন করে থাকেন আধুনিক কবি। যার মধ্য দিয়ে মূল ভাবনার নতুন এক দিগন্ত প্রসারিত হয়। কবি বিষ্ণু দে'র যযাতি কবিতাতেও তার অন্যথা ঘটেনি। কালের নিয়মে যেখানে জীবন সমুদ্র বালুকারেখায় গিয়ে মিলে যায়, যেখানে সব সূত্র ছিন্ন হতে চায়, সেখানে দাঁড়িয়েই নাটকীয় প্রলাপের সুরে কবি সেই যৌবনের হৃদয়াবেগকেও কামনার ধ্বনি প্রবাহিত করেছেন। যা এই কবিতার প্রেক্ষিত ও উপস্থাপনকে এক ভিন্ন মাত্রায় পৌঁছে দিয়েছে।

তিন এর দশকের অপর এক প্রথিতযশা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত (১৯০১-১৯৬০)। যাঁর কবিতাতেও দেশি, বিদেশি নানা পুরাণের অনুষঙ্গের অভিনব ব্যবহার একই সঙ্গে মুগ্ধ ও হতবাক করে আধুনিক পাঠককে। কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'সংবর্ত' (১৯৫৩) কাব্যগ্রন্থের 'যযাতি' কবিতাতেও মহাভারতের যযাতির প্রসঙ্গ ও ভাবনার পুনর্নির্মাণ ঘটেছে। তবে তা অভিনব ভঙ্গিমায়। বিষ্ণুদের মতো কোন অপ্রতিরোধ্য আশাবাদের ছায়া নেই এখানে, বলা যেতে পারে তার বিপরীত এক প্রেক্ষিত উঠে এসেছে। দীর্ঘ এই কবিতাজুড়ে অপূর্ব এক মোহমুগ্ধকর আবহ তৈরি করে কবি মহাকাব্যিক মিথ, সমসাময়িক কাল পর্ব ও নিজের জীবনবোধকে এক অদৃশ্য সূত্র বন্ধনে বেঁধেছেন।

কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত 'যযাতি' কবিতা রচনা করেন ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৮ই মার্চ। কবির জন্ম ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে। অর্থাৎ কবি পঞ্চাশ উত্তীর্ণ বয়সে দাঁড়িয়ে এই কবিতা রচনা করেছেন। কবিতার প্রথম পংক্তি শুরু হয়েছে 'উত্তীর্ণ পঞ্চাশ' শব্দবন্ধ দিয়ে। এরপর কবিতার চতুর্থ স্তবকে গিয়ে কবি বলেছেন—

"আমি বিংশ শতাব্দীর সমানবয়সী"[৮];

কবির জন্ম সময়কে লক্ষ্য করলে আমরা দেখি বাস্তবিকই কবি বিংশ শতকের সমান বয়সী। একদিকে কবি যেমন যৌবন অতিক্রম করে পরিণত বয়সের দিকে ঢলে পড়েছেন, অন্যদিকে তেমনই বিংশ শতাব্দীও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা পরিণত বয়সে পৌঁছেছে।

'যযাতি' কবিতার ভাবসত্য ও মূলবক্তব্য বিশ্লেষণের পূর্বে, কবিতাটি সম্পর্কে ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়ের একটি মন্তব্য উপস্থাপন করা হল, যা কবিতাটির মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—

"যযাতি' ভারতীয় পুরাণের নবরূপায়ণ;...কাব্য রচনার ক্ষেত্রে অলৌকিক প্রেরণার পরিবর্তে তিনি যে অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবাদকেই পরম বলে গ্রহণ করেছিলেন সমালোচ্য 'যযাতি' কবিতাতে সেই কাব্যপ্রত্যয় মনস্তত্ত্বসমৃদ্ধ রূপমূর্তি লাভ করেছে"।[৯]

সত্যই কবি প্রৌঢ়ত্বের দোড়গোড়ায় দাঁড়িয়ে স্নিগ্ধ শীতল দৃষ্টিতে তাঁর অভিজ্ঞতা ও বুদ্ধিবাদকেই ভাষা ও ভাবনার বন্ধনে উপস্থাপন করেছেন এই কবিতায়। চিরন্তন মানবসত্তার অমরত্বলাভের আকাঙ্ক্ষা ও মৃত্যুভয়ে ভীত সত্তাকেই কবি বাস্তব যুক্তি দ্বারা পেশ করেছেন, পঞ্চাশ উত্তীর্ণ হওয়া মানে—

"...বনবাস প্রাচ্য প্রাজ্ঞদের মতে
অতঃপর অনিবারণীয়"[১০];

কিন্তু পৌরাণিক যুগে যযাতি যেমন জরা, ব্যাধি, বনবাসকে ঠেকানোর চেষ্টা করেছিলেন, আধুনিককালে বিজ্ঞান বলে মানুষ মূলত পশ্চিমী দুনিয়া তা সামান্য হলেও বাড়ানোর চেষ্টা করেছে। কিন্তু কবি জানেন তবুও মৃত্যুভয়ই যৌবনের প্রভু হয়ে আছে, বার্ধক্য তবুও হৃদয়ভার বাড়িয়ে চলে। কবি তাঁর নিজস্ব বয়স ও অভিজ্ঞতার সঙ্গে যযাতির মিথকে যেমন নতুনতর ভাবে উপস্থাপন করেছেন, তেমনই এই কবিতার পরতে পরতে উঠে এসেছে বিংশ শতাব্দীব্যাপী ঘটে যাওয়া মানবতার অবদমনের পর্ব। এই বিংশ শতাব্দীতেই বিশ্ববাসী দেখল পরপর দুটো বিশ্বযুদ্ধ। পৃথিবী তথা মানব সমাজ প্রথম এই ভয়াবহ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হল। বিশ্বব্যাপী সংঘটিত মারণ যজ্ঞের এই ব্যাপকতা সমগ্র মানবজাতিকে হতাশ করেছে। মানব হৃদয়কে করেছে যন্ত্রণাদগ্ধ। এর ফলশ্রুতিতেই দেখা যায় বিশ্বব্যাপী গড়ে ওঠা ঔপনিবেশিক শাসনগুলো একে একে শিথিল হতে থাকে। আর ভারতীয়

উপমহাদেশ সহ অন্যান্য অধীনস্থ দেশগুলির রিক্ত, জীর্ণ চেহারা সামনে উঠে আসে।

এমনই এক সময়ে দাঁড়িয়ে কবি নিজের দিকে ও বিংশ শতাব্দীর অতিক্রান্ত সময়ের দিকে তাকাচ্ছেন। পঞ্চাশ উত্তীর্ণ এই শতাব্দী যৌবনের ঝোড়ো সময়টা অতিক্রম করে এসে যে সময়ে পৌঁছেছে, তখন সমগ্র পৃথিবী জুড়ে যেন পোড়া ছাই উঁড়ছে। এখানে দাঁড়িয়েই কবির প্রশ্ন, আবার কি ফিরে যাওয়া সম্ভব শতাব্দীর বিগত যৌবনের প্রত্যাশায় বা বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সেই সময়পর্বে। বদলে যাওয়া শতাব্দীর বিচ্ছিন্ন, ধ্বংস, বিধ্বস্ত মানচিত্রের কথা বলতে গিয়ে কবি বলেছেন—

"কিন্তু গত শতকেও উল্লিখিত গ্রামের সন্ধান
পায়নি স্বয়ং র‍্যাবো",[১১]

যুগের এই মারনোল্লাসের যজ্ঞ থেকে স্বয়ং কবিও নিজেকে সরিয়ে রাখতে পারেনি, তাই তো বলেছেন—

"আমি ভাসিয়েছিলুম একদা তাদেরই মতো, আজ
এটুকুই আমার পরম পরিচয়।"[১২]

প্রসঙ্গক্রমে কবি বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি শুক্রশাপে, অকাল জরায় অবরুদ্ধ নন। দেবযানী—শর্মিষ্ঠার কলহের মতো কোন কিছু উদ্দীপক হয়ে থাক বা না থাক, তিনি কোনভাবেই দৈব অভিশাপে অভিশপ্ত নন, পুরুর সঙ্গে যৌবন বিনিময়েরও কোন প্রসঙ্গ এখানে নেই। সবই আসলে অভিজ্ঞতা জাত ভাবনার ফসল। যা যুগ ভাবনা, ব্যক্তিগত আবেগ ও মহাকাব্যিক মিথের অপূর্ব অভিনিবেশে উঠে এসেছে।

পাঁচ এর দশকের প্রতিনিধি স্থানীয় কবি শঙ্খ ঘোষ, (১৯৩২-২০২১) এর 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল' (রচনা ১৯৭৭-৮১। প্রকাশ ১৯৮২) কাব্যগ্রন্থের 'শিলালিপি' পর্বাধ্যায়ের কবিতা 'যযাতি'। কালের কণ্ঠস্বরকে আত্মস্থ করে, তাকে হৃদয়ানুভূতির সঙ্গে একাত্ম করে একের পর এক কবিতা রচনা করেছেন কবি শঙ্খ ঘোষ। সুধীন্দ্রনাথ দত্তের 'যযাতি'র যুগভাবনার সঙ্গে যুক্ত করা যায় 'প্রহরজোড়া ত্রিতাল' কাব্যগ্রন্থের 'যযাতি' কবিতাকেও। অবশ্যই এই দুই যুগভাবনার পটভূমি ও ঘটনার অভিঘাত সম্পূর্ণ পৃথক। সাতের দশক জুড়ে গোটা বাঙলা নকশাল আন্দোলনের যে অগ্নিময়ী ইতিহাসের অধ্যায় রচনা করে চলছিল, সেই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি এই কবিতা রচনা করেছেন। 'যযাতি'কে তিনি এখানে সাতের দশকের অবসন্ন কলকাতা নগরীর সঙ্গে তুলনা করে তার ক্ষয়িত, জীর্ণ, জরাগ্রস্ত দশাকে তুলে ধরেছেন। এই সময়পর্বে তরুণ-সমাজ নতুন এক উন্মাদনায় মেতে উঠেছিল। উত্তর উপনিবেশ পর্বে দাঁড়িয়ে গোটা বাঙলা তথা সমাজ তথা শহর কলকাতা যে আপোশ আর দুর্নীতির পচাগলা ক্ষয়ের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল তাকে

যৌবনের উন্মাদনা স্বরূপ এক ঝোড়ো হাওয়ার উন্মুক্ততা দিতে চেয়েছিল এই আগুন খেকো যুবকরা। হয়তো বা তাদের যৌবনের প্রখর উত্তাপে পচাগলা সমাজের গলিত অংশকে পুড়িয়ে সামাজিক কেমো থেরাপির মধ্য দিয়ে মুক্তি আনার স্বপ্ন দেখেছিল এই সমাজ—

"পটভূমির দিকে চেয়ে আছে স্থবির সময়
শহর অথর্ব হয়ে পড়ে আছে গঙ্গার কিনারে।
জল পেতে চায় মুখে, শ্বাস চায়, সচলতা চায়
পুরু বসে থাকে তার দুই হাতে রক্তভাণ্ড নিয়ে।"[১৩]

গঙ্গার কিনারে থাকা শহর তিলোত্তমার কথা ও রক্তভাণ্ড নিয়ে থাকা তরুণ সমাজের কথাই সাঙ্কেতিক ভাবে তুলে ধরেছেন কবি। মৃত্যু ভয়ে আচ্ছন্ন যযাতির অন্তিম পর্যায়ে যেন তার পুত্রেরা ভয়াবহ মুহূর্তের অপেক্ষায় বসে আছে, যদু, তুর্বসু, অনু, পুরু সকলে। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সকল দিক থেকে বিধ্বস্ত, ভঙ্গুর এই সমাজের রাজধানী শহর কলকাতার চারিদিকে ঘিরে থাকা যুবক সম্প্রদায়ের ছবির সঙ্গে সপুত্র যযাতির ছবিকে মিলিয়েছেন। একই সঙ্গে যযাতির মিথকে তিনি এখনে ভেঙেছেনও বটে। মহাকাব্যে শুধুমাত্র পুরুকে যৌবন বিনিময় করতে দেখা গেছে, অন্যরা অস্বীকৃতির মধ্যেই হারিয়ে গেলেও কবি এখানে তাদের চিন্তান্বিত অস্তিত্বকে তুলে ধরেছেন। শেষপর্যন্ত সাতের যুবকেরা সুস্থ সবল সমাজ গঠনের স্বপ্নে বিভোর হয়ে প্রশাসকের উদ্ধত বেয়নেটের সামনে বুক চিতিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, পিতৃভূমির ঋণ শোধ করে দিতে। যার জন্য নিজের জীবনের পরোয়া করেনা তারা—

"জাতক ও জনকের ঘনিষ্ঠ কঠিন পরিচয়ে
আপন ফুসফুস নিয়ে নিজেকে আহুতি দিতে গেলে
বিস্ফোরিত মুহূর্তের ধাবমান স্বপ্নে চেয়ে দেখি
কালপুরুষের নীচে মাথা তুলে দাঁড়ায় শহর।"[১৪]

যে স্বপ্নটাকে আঁকড়ে ধরে যুব সমাজ উত্তাল অভিযানের পথে পা রেখেছিল সেই স্বপ্নটাকে ছুঁতে চেয়েছেন কবি এই কবিতার শেষ পংক্তিতে—

"যযাতি জীবন পায় মূর্ছিত পুরুর শিরোদেশে।"[১৫]

এভাবেই এই কবিতায় মহাকাব্যিক মিথকে ব্যবহার করে আধুনিক সমাজ প্রেক্ষিতে প্রবেশ করে, আবারও সেই সময়কে উত্তীর্ণ করে কবি স্পর্শ করেছেন মহাকাব্যিক মিথকে।

পাঁচের দশকের অন্যতম কবি অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (১৯৩৩-২০২০)। দুই বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী উত্তাল বিশ্ব পরিস্থিতি, ভারতবর্ষে স্বাধীনতার নামে ঘটে যায়

র‍্যাডক্লিফ লাইনের প্রহসন। এই ভগ্ন খণ্ডিত সমাজনীতি, রাষ্ট্রনীতির ফলস্বরূপ আত্মযন্ত্রণা ও আত্মদংশনে দগ্ধ এক কবি সমাজের আবির্ভাব হয় এই দশকে। কবি অলোকরঞ্জনের কাব্য রচনার প্রেক্ষিত ও পরিসর কোথাও যেন নিজস্ব ধরণ খুঁজে নিয়েছ। যুগযন্ত্রণাকে আত্মস্থ করেও কবির সৃষ্টি ধারা ভিন্ন এক পথরেখাকে তৈরি করে নিয়েছে। 'ছৌ-কাবুকির মুখোশ' (১৯৭৩) কাব্যগ্রন্থের 'যযাতি এবং তিনশো ছত্রিশটি সিঁড়ি' কবিতায় কবি মহাকাব্যিক চরিত্র যযাতির মিথকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নতুন এক প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছেন। কবি যেন যযাতিকে বিশ্বমুহূর্তের সাক্ষী করতে চাইছেন এখানে। কখনো আবার নিজের সৃষ্টি সত্তার যৌবন সুলভ জীবন্ত মুহূর্তকে কামনা করেছেন। তবে কবিতার প্রেক্ষিত স্থাপন, কাব্য ভাবনা বা চিন্তার স্তর এবং উপস্থাপনের কৌশল এই কবিতাকে অভিনব ও স্বতন্ত্র করে তুলেছে।

কবিতার শুরুতেই কবি বলেছেন—

"আমি স্ট্রাসবুর্গ টাওয়ার থেকে"[১৬]

উত্তমপুরুষে, নিজের কথা বলতে বলতে যাওয়া এই কবিতার শুরুতে 'আমি'র উল্লেখ আছে। জহরসেন মজুমদার অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তের 'আমি'র প্রসঙ্গকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে মন্তব্য করেছেন তা বিশেষ তাৎপর্যবাহী—

"অলোকরঞ্জনের কবিতায় 'আমি' বাস্তবতা এবং পারমার্থিকতার সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত। আমি-সত্তার মধ্য দিয় ব্যক্ত হয়েছে জীবন ও জগৎ সম্পর্কিত সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি। এই 'আমি' নিজের স্বরূপ জানতে ব্যগ্র; আবার সকল বৈচিত্রের মধ্যে অবিচলিত হয়ে অস্তিত্বের সৌন্দর্যের পাশেই নশ্বরতার সৌন্দর্য উপলব্ধি করে।"[১৭]

(বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ)

প্রথমেই উল্লেখ্য যে, দশটি চরণের এই কবিতায় কবি একটি মাত্র বিরামচিহ্ন ব্যবহার করেছেন। শেষ চরণের সমাপ্তিতে আছে একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন। কবি প্রথমেই তাঁর আকাঙ্ক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে অতীতের সুপরিচিত এক ভৌগোলিক অবস্থানের পটভূমিতে উপস্থাপন করেছেন। এবং পরবর্তী অংশে পাশ্চাত্যের এক কবির জীবনের সঙ্গে নিজের সেই আকাঙ্ক্ষাকে এক অদৃশ্য সুতোয় বেঁধে, সযত্নে তা যুক্ত করেছন যযাতির যৌবনলাভের আকাঙ্ক্ষার মিথের সঙ্গে।

শুরুতেই স্ট্রাসবুর্গ টাওয়ারের দীর্ঘ সোপান ভাঙার প্রসঙ্গ এনেছেন কবি। এই স্ট্রাসবুর্গ টাওয়ার হল ফ্রান্সের সবচেয়ে পুরোনো ক্যাথিড্রাল। দীর্ঘদিন ধরে এটিই পৃথিবীর উচ্চতম সৌধের মর্যাদা পেয়ে এসেছে। সেই সৌধের সোপান পেরোনোর সময় কবি কোন ফরাসি কুমার গান্ধর্বের সঙ্গে বয়স বিনিময় করেন

বলে জানান, অবশ্যই তা চেতনায়। কিন্তু তিনি দেখেন তা আদৌ সম্ভব হল না। মহাকাব্যের যযাতি যুবক পুত্র পুরুর যৌবন পেয়ে সহস্র বৎসর তা ভোগ করেছেন। কিন্তু কবি কুমারগান্ধর্বের বয়স নিতে চেয়ে বা নিয়েও সেই সোপান 'অবরোহণ' করতে পারলেন না। কুমারগান্ধর্ব তার যৌবনের গতিতেই নামতে থাকে, কিন্তু কবির কাছে তা কঠিনতর হয়।

কবিতায় এর পরের অংশে কবি অলোকরঞ্জন ইংরেজ কবি গ্যোয়েটের প্রসঙ্গ এনেছেন। গ্যোয়েটের জীবনকে অপূর্ব বন্ধনসূত্রে তিনি এখানে মিলিয়েছেন। এই মহাকবির জীবনে অনেক প্রণয়িনী এসেছে। কবির অসম্ভব রকমের জীবন সংরক্ততা ছিল, বলা যেতে পারে ব্যাপ্ত জীবনবোধ ছিল। তাঁর জীবনে বারে বারে আসা প্রেম তাঁকে যেন বারবার যৌবনে ফিরিয়ে দিয়েছে। আর এরই সঙ্গে কবির সৃষ্টি তথা কবিতাও মিশে গিয়েছে, উভয়ে যেন পরস্পরের পরিপূরক হয়ে উঠেছে। যে 'দয়িতাকে অর্জন করে' নেওয়ার জন্য কবির তিনশো ছত্রিশটি সিঁড়িতে উত্তরণ ও আরোহণ সেই দয়িতা তথা নারীই কবির যৌবনের উৎস, আর কবিতাও তাঁর যৌবনের উৎস। যাদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কবি যৌবনের একটি শিখর থেকে অন্য শিখরে পদচারণা করেছেন। গ্যোয়েটের জীবনের এই পরিপূরকতা কবি অলোকরঞ্জনের কাছে যযাতি স্বরূপ।

এই মহাকবি যেন যযাতির মতোই যৌবনকে নিষ্কাশন করে নিয়েছেন, তবে তিনি সেই যৌবন নিয়েছেন কাব্য ও প্রেম থেকে। ফলত চিরন্তন যৌবন সুলভ প্রাণোজ্জ্বল আত্মপ্রকাশের শক্তিকে তিনি কোনদিন হারাননি। কবি অলোকরঞ্জন তাই বলেছেন—

> "অথচ নিজের কাঁধে ভর রেখে সেদিনও গ্যোয়েটে
> দায়িতাকে অর্জন করে নেবেন বলে
> এই তিনশো ছত্রিশটি সিঁড়ি ভেঙে একা একা
> উঠে গিয়ে নেমে গিয়ে উঠে গিয়েছেন।"[১৮]

কবিতার শেষ চরণে যে উঠে গিয়ে, নেমে গিয়ে আবারও ওঠার প্রসঙ্গ আছে তা লক্ষণীয়। একদিকে তা যৌবনের উন্মাদনার প্রাণোচ্ছল প্রকাশ। অন্যদিকে তাঁর এক প্রেম থেকে অন্য প্রেমে যাওয়ার, বা এক কাব্য থেকে অন্য কাব্যে বিচরণকেই ইঙ্গিত করে। প্রেমের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই তাঁর কাব্য রচনা আবার কাব্য রচনার মধ্য দিয়েই তার পরবর্তী প্রেমের দিকে এগিয়ে যাওয়া। অর্থাৎ গ্যোয়েটে যেন কবিতা থেকে দয়িতা, দয়িতা থেকে কবিতায় বারে বারে যাতায়াত করেছেন, এবং তার মধ্য দিয়েই যৌবনকে জিতে নিয়েছেন। যা কবি অলোকরঞ্জন পারেন না। 'অথচ' শব্দের প্রয়োগ সেই না পারা ও পারার বাসনারই

ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠে এসেছে। যা কবির কাছে মহাভারতের যযাতি স্বরূপ ধরা দিয়েছে। বলা যেতে পারে এই কবিতায় মহান এক পূর্বজ কবির প্রতি পরবর্তী এক কবির মুগ্ধতা ও স্বীকারোক্তি উঠে এসেছে। কবিতাকে যৌবন লাভের মতো করেই গ্যোয়েটে যেভাবে অর্জন করেছেন কবি অলোকরঞ্জন তা পারছেন না, এ যেন তারই স্বীকারোক্তি। এখানেই মহাকাব্যিক চরিত্র রাজা যযাতির যৌবন লাভের বাসনার মিথ তার নির্ধারিত পরিসর পেরিয়ে ভিন্নতর ও উচ্চতর এক পরিসরে পৌঁছে গিয়েছে। এভাবেই মহাকাব্যিক যযাতির মিথ বিশ শতকের কবিদের কাব্য ভাবনায় ভর করে সময় থেকে সময়ান্তরে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্যবাহী অবয়বে উপস্থাপিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র :

১। মাইকেল মধুসূদন দত্ত, বঙ্গভূমির প্রতি, গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতাবলী, মধুসূদন রচনাবলী, সম্পাদক, ডক্টর অজিতকুমার ঘোষ, প্রথম প্রকাশ ২১ আগস্ট, ১৯৭৩, হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৩৯০

২। রাজশেখর বসু, মহাভারত, প্রথম মুদ্রণ ১৩৫৬ সন, এম.সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাঃ লিমিটেড, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৩১

৩। পূর্বোক্ত,পৃষ্ঠা : ৩৩

৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৩

৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩৪

৬। বিষ্ণু দে, 'যযাতি', 'চোরাবালি', 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' প্রথম প্রকাশ : জুন, ১৯৯৫, সপ্তম সংস্করণ : ডিসেম্বর, ২০০৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৩২

৭। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৩২

৮। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'যযাতি' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২২৩

৯। ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, 'পুরাণ ঐতিহ্য ও বিষ্ণু দে', 'বিষ্ণু দে : জীবন ও সাহিত্য' ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম প্রকাশ : জুলাই, ১৯৯১,পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৫০৪

১০। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, 'যযাতি' সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কাব্যসংগ্রহ, প্রথম দে'জ সংস্করণ, জুলাই ১৯৭৬, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২২১

১১। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২২৩

১২। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ২২২

১৩। শঙ্খ ঘোষ, যযাতি, কবিতাসংগ্রহ (২), সপ্তম সংস্করণ—ফাল্গুন, ১৪২৩, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৫৪

১৪। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৫

১৫। পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা : ৫৫

১৬। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'যযাতি এবং তিনশো ছত্রিশটি সিঁড়ি', কবিতা সংগ্রহ প্রথম

খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি,২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ২০২০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২৪৭

১৭। জহর সেনমজুমদার, অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত : বিশ্বমুহূর্তের অংশীদার, বাংলা কবিতা : মেজাজ ও মনোবীজ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ১৯৯৮, পুস্তক বিপণি, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৫৩১

১৮। অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, 'যযাতি এবং তিনশো ছত্রিশটি সিঁড়ি', কবিতা সংগ্রহ প্রথম খণ্ড, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি, ২০০৫, দ্বিতীয় সংস্করণ, নভেম্বর, ২০২০, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২৪৮

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ. ডি. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

অক্ষৌহিণী (১৯৯৬) এবং ফুলের মানুষ (২০০০) : প্রান্তিক নারীর আর্থিক ও আত্মিক রূপচিত্রের গতিপ্রকৃতি

মোসা : সারমিন সুলতানা

সারসংক্ষেপ (Abstract) :

মহাকালের রথ সচল রাখার ক্ষেত্রে অর্ধেক শ্রমের অংশীদার হলেও নারীরা পায় না তাদের কাজের যথাযথ মূল্য বা স্বীকৃতি। বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা এবং দরিদ্র ও অধিক সন্তানের ভারে অসহায় নারীরা জীবনকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে বাধ্য হয়ে অর্ধেক মূল্যে বিক্রি করে চলেছে নিজেদের শ্রম। সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, উপন্যাস ও ছোটগল্পে অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রান্তিক নারীদের অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। প্রান্তিক সমাজের কথাকার সৈকত রক্ষিতের (১৯৫৪—) **'অক্ষৌহিণী'** (১৯৯৬) এবং ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের (১৯৪৮—) **'ফুলের মানুষ'** (২০০০) উপন্যাসে দেখা যায় দারিদ্র্যপীড়িত জীবন থেকে আর্থিক উত্তরণে প্রান্তিক নারীদের অবদানের চিত্র। নির্মাণ কাজে ইঁট একটি অপরিহার্য অঙ্গ। শহরের ছোট বড় সৌন্দর্যমণ্ডিত অট্টালিকা নির্মাণ করার সময় আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষের ভাবনায় হয়তো কখনো আসে না ইঁটভাটায় কর্তব্যরত মানুষদের মর্মান্তিক পরিশ্রমের কথা। এদের করুণ জীবন যন্ত্রণার ইতিহাসের কথা আমাদের জানা, অথচ প্রকৃত অর্থে অজানাই থেকে যায়। **'অক্ষৌহিণী'** উপন্যাসে ইঁটভাটায় কামিয়া অর্থাৎ মজুরদের সংগ্রামী জীবনের বিবরণ পাওয়া যায়। পুরুষদের পাশাপাশি পচি ও লীলমণিরা দরিদ্র সংসারে অর্থোপার্জনে বিশেষ অবদান রাখে। পুরুষদের মতো এরাও সমপর্যায়ের শ্রম প্রদান করে। অথচ মুন্সির খাতায় নাম থাকে পুরুষ খাদিয়াদের। এরা পুরুষদের কেবল সহযোগী মাত্র। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের **'ফুলের মানুষ'** উপন্যাসে রয়েছে ফুলতুলুনিদের দুই আঙুলে রক্ত ফুঁটিয়ে রক্তজবার কুঁড়ি কাটার প্রসঙ্গ। পুজো হোক বা উপাসনা, আয়ুর্বেদ হোক বা ভেষজ ঔষধি—জবাফুল বাঙালী জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। সাহিত্য অথবা গানের লাইনেও বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে জবার সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক। জবা ফুলের সৌরভ সৌন্দর্য আমরা প্রাণভরে উপভোগ করলেও এই ফুলচাষে কতজনের জীবন যন্ত্রণার কাহিনি চাপা পড়ে থাকে তা আমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করি না। **'ফুলের মানুষ'** উপন্যাসে এক বিক্ষুব্ধ সময়ে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামের পর গ্রাম জবা ফুলের চাষকে কেন্দ্র করে সেখানকার মানুষদের দিনযাপনের বৃত্তান্তকে তুলে ধরা হয়েছে।

ভীম সামন্ত, হামিদুল, মাঝিদের, মোড়লদের ও বাগেদের বাগানে ফুলতুলুনিরা জবার এক আঙুল লম্বা কুঁড়ি ছিড়ে ও মালা গেঁথে কিভাবে নিজেদের অন্নসংস্থান করে তার অনপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় এই উপন্যাসের প্রতিটি পাতায় পাতায়। এখানে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অর্থোপার্জনের দিকটিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে। বস্তুত নারীরা সর্বতোভাবে জীবনকে সচল রাখার ক্ষেত্রে নিরন্তর পরিশ্রম করে চললেও পিতৃতান্ত্রিক সমাজের নিষ্ঠুর নিয়মে তাদের শ্রমনিষ্ঠ জীবনের ইতিহাস চাপা পড়ে যায়। এই দুটি উপন্যাসে মূলত এই প্রান্তিক নারীদের অর্থনৈতিক গতিপ্রকৃতির একটা চালচিত্র অঙ্কিত হয়েছে।

সূচক শব্দ (Key word) : প্রান্তিক নারী, অর্থনীতি, ইঁটভাটা, খাদিয়া, ফুলতুলুনি, কুঁড়ি।

নারী ও পুরুষের সমতার বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়ে কবি কাজী নজরুল ইসলাম (১৮৯৯-১৯৭৬) **'সাম্যবাদী'** (১৯২৫) কাব্যগ্রন্থের **'নারী'** কবিতায় লিখেছেন—

"বিশ্বে যা-কিছু মহান্ সৃষ্টি চির-কল্যাণ-কর
অর্ধেক তার করিয়াছে নারী, অর্ধেক তার নর।"[১]

—কবির একথা শুধু কবিতাতেই নয়, সমাজ বাস্তবতার অগ্রযাত্রাতেও এই বাণী ধ্রুবসত্য। মহাকালের রথ সচল রাখার ক্ষেত্রে অর্ধেক শ্রমের অংশীদার হলেও নারীরা পাচ্ছেন না কর্মের যথাযথ মূল্য বা স্বীকৃতি। শুধুমাত্র নারী বলে এই অমানবিক অজুহাতে একাধিক ক্ষেত্রে একই কাজে পুরুষের সমপরিমাণ পরিশ্রম প্রদান করলেও তারা মজুরি পায় প্রায় অর্ধেক। গ্রামীণ প্রান্তিক নারীরা এখন আর কেবলমাত্র গৃহের কজে সীমাবদ্ধ নয়, অর্থোপার্জন বাড়িয়ে সংসারের স্বচ্ছলতা ফেরাতে পুরুষের পাশাপাশি তারা ক্ষেত-খামারে বিক্রি করেছে নিজেদের শ্রম। এসব নারী শ্রমিক কেউ বিধবা, কেউ স্বামী পরিত্যক্তা আবার কেউবা দরিদ্রতার কারণে অধিক সন্তানের ভারে অসহায়। অভাবের তাড়নায় জীবনকে টিকিয়ে রাখার তাগিদে বাধ্য হয়েই অত্যন্ত কম দামে নিজেদের শ্রম বিক্রি করে চলেছে। প্রান্তিক নারীরা নিরন্তর শ্রমিক হয়ে অর্থনীতিকে গতিদান করে চলেছে। কিন্তু শ্রমের অসম বন্টনের ফলে সার্বিক জীবনযাত্রার মান এদের অনুন্নতই থেকে যায়। এই প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) **'সমবায়নীতি'** (১৯৫৩) রচনায় বলেছেন—"**আমাদের প্রত্যেকের মধ্যেই ধন নিহিত আছে, এই সহজ কথাটি বুঝলে এবং কাজে খাটালে তবেই আমরা দারিদ্র্য থেকে বাঁচব।**"[২] নারীর অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হলেও সমগ্র পৃথিবী জুড়ে নারীর জীবন এখনও সামাজিক দুষ্ট রীতি আর

অন্যায় প্রথার ভেতরে আবদ্ধ। তবুও আমরা আশাবাদী অদূর ভবিষতে সামাজিক ও আর্থিক ক্ষেত্রে নারীরা বিশেষত প্রান্তিক নারীরা মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে। সাম্প্রতিককালে বাংলা সাহিত্যে কবিতা, নাটক, উপন্যাস ও ছোটগল্প ইত্যাদি শাখায় গ্রামীণ নারীদের অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদানের স্বীকৃতি প্রদানের বিশেষ প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

সত্তরের দশক থেকে বর্তমান কাল পর্যন্ত বাংলা কথাসহিত্যের অধিকাংশ অংশ জুড়ে রয়েছে অবহেলিত লাঞ্ছিত বঞ্চিত মানুষের সামাজিক জীবন ও অর্থনৈতিক অবস্থানের কথাপ্রসঙ্গ। প্রান্তিক মানুষের হাসি-কান্না, বিশ্বাস-অবিশ্বাস ও জীবন-জীবিকা সাম্প্রতিককালের কথাসাহিত্যকে বিশেষভাবে সমৃদ্ধ করেছে। একালের কথাসাহিত্যিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় (১৯৪৮) ও সৈকত রক্ষিতের (১৯৫৪) একাধিক উপন্যাসে উঠে এসেছে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রান্তিক নারীদের অবদানের চিত্র। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের **'ফুলের মানুষ'** উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে জবা ফুলের চাষকে কেন্দ্র করে গ্রামীণ অসহায় নারীদের জীবনের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার প্রসঙ্গ। সৈকত রক্ষিতের **'অক্ষৌহিণী'** উপন্যাসে ইঁট ভাটাকে কেন্দ্র করে পুরুষদের পাশাপাশি কায়িক শ্রমের ক্ষেত্রে নারীদের সমান অংশীদারিত্বের কথা বর্ণিত হয়েছে। বস্তুত এই দুইজন প্রান্তিক কথাকারের দরদী কলমের স্পর্শে আলোচ্য উপন্যাস দুটিতে উঠে এসেছে প্রান্তিক নারীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থানের বিশেষ দিক।

অক্ষৌহিণী

সত্তরের দশক থেকে বাংলা কথাসাহিত্যে পালাবদলের যে যাত্রা চলছিল তার অন্যতম যাত্রী সৈকত রক্ষিত। স্কুল জীবনে রবীন্দ্রনাথের লেখা পড়ে অনুপ্রাণিত হয়ে লেখক হওয়ার বাসনা জাগ্রত হয় তাঁর মনের গভীরে। জন্মসূত্রে পুরুলিয়ার সন্তান সাহিত্যচর্চা করতে এসে ক্রমে তিনি অনুভব করেন বাংলা সাহিত্যের পাতায় নিজের জেলার কথা তেমনভাবে উঠে আসেনি। স্থির করেন বাংলা কথাসাহিত্যের অঙ্গনে নিয়ে আসবেন আদিবাসী অধ্যুষিত পুরুলিয়া জেলার জীবনযাত্রা, লোকসংস্কৃতি ও প্রান্তিক মানুষের অভাব অনটনের চিত্র। কেবলমাত্র আত্মপ্রচারের জন্য নয়, শিল্প সৃষ্টির উদ্দেশ্যেই তিনি সাহিত্য রচনা করেন। উপন্যাসের পাতায় তিনি মূলত প্রান্তিক নর-নারীর জীবনচিত্র অঙ্কন করেছেন। 'আকরিক' (১৯৮৪) উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন পুরুলিয়ার হতদরিদ্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরি শ্রমিকদের জীবন যন্ত্রণার কথা। এটি তাঁর প্রথম উপন্যাস। শুকর পালক সহিসদের জীবনকথা হল হাড়িক (১৯৮৭) উপন্যাসটি। এছাড়াও 'সিঁদূরে কাজলে' (২০০২), 'মহামাস' (২০০৫) ও 'মদনভেরি' (২০০৮) উপন্যাসে নিম্নবর্গীয় মানুষের জীবনচিত্র অঙ্কন

করেছেন। 'অক্ষোহিণী' (১৯৯৬) উপন্যাসটি হল কাঁসাই নদীর তীরে গড়ে ওঠা ইঁটভাটার খাদিয়াদের জীবন সংগ্রামের আখ্যান। ক্ষেতের মাটি দিয়ে ইঁট গড়লে খাদ না হয়ে কোন উপায়ও নেই বলে ইঁট গড়ার কারিগরদের নাম হয়েছে খাদিয়া। আর অন্যদিক থেকে বলা যায়, এই কাজ করতে করতে এদের জীবনেও এক প্রকার খাদ তৈরি হয় এবং এখান থেকে উত্তরণ করতে পারে না বলেই হয়তো এদের নাম খাদিয়া।

নির্মাণ কাজে ইঁট একটি অপরিহার্য উপাদান। ইঁটের ব্যবহারের কথা বলে হয়তো শেষ করা যাবে না। তবে ইমারত নির্মাণ, সেতু,বাঁধ, সোলিং ও রাস্তা তৈরিতে প্রাচীনকাল থেকেই বহুল পরিমাণে ইঁটের ব্যবহার হয়ে আসছে। কিন্তু ইঁট দিয়ে নির্মিত ছোট বড় অট্টালিকায় বসবাসকারী মানুষেরা কখনও হৃদয় দিয়ে অনুভব করে না ইঁট তৈরীর প্রধান কারিগর খাদিয়াদের জীবন যন্ত্রণা। প্রান্তিক জনজীবনের কথাকার সৈকত রক্ষিত হৃদয়ের গভীরে আবেগ দিয়ে উপলব্ধি করেছেন কাঁসাই নদীর তীরবর্তী ইঁটভাটার শ্রমিকদের জীবন সংগ্রামের ইতিহাসকে। দরদী মন নিয়ে সূক্ষ্ম তুলির টানে তাদের জীবনের ইতিবৃত্ত রচনা করেছেন 'অক্ষৌহিণী' উপন্যাসে। সাতাশটি পর্বে বিন্যস্ত এই উপন্যাসে বর্ণনা করেছেন পালৈঞ্জা, ডুমৈরশোল, বলরামপুর ও চাকীরবন সহ দূরদূরান্ত গ্রাম থেকে আসা খাদিয়াদের জীবন সংগ্রামের বৃত্তান্ত। বিদ্যুৎবিহীন, এই গ্রামগুলো আদিমকাল থেকেই অন্ধকারময়। দারিদ্র্য বিড়ম্বিত কৃষিনির্ভর জীবনে তাদের কোনরূপ স্থিতিশীলতা নেই। উপযুক্ত পরিকাঠামোর অভাবে এসব অঞ্চলের মানুষেরা বছরভর্তি চাষবস করতে পারে না। জলের জন্য তাদের তাকিয়ে থাকতে হয় আকাশের দিকে। কথায় আছে "**চাষ আর স্বগ্‌গের আশ**"[৩] ধান চাষ শেষ হলেই এদের জীবনে বয়ে আসে অদৃষ্টের পরিহাস। অভাব অনটনের কারণে এমন সময় শিশুদের কান্নাও একঘেয়ে হয়ে পড়ে। চাষবাস উঠে গেলে কর্মহীন দিনগুলোতে শিশুর কান্না থামানোর কোনও অজুহাত খুঁজে পায় না মা। এই অভিশাপ থেকে বাঁচার জন্য নিজের ভিটেমাটি ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে কাঁসাই-এর তীরে গড়ে ওঠা ইঁটভাটাগুলোর উদ্দেশ্যে দিনজুরের কাজের আর্জি নিয়ে। উপন্যাসিকের ভাষায়—"**গ্রামের ভেতর থেকে ভাটায় আসে স্থানীয় কামিয়ারা (মজুর) আট-ন বছরের ছেলেমেয়ে থেকে শক্ত-সমর্থ পুরুষ। সঙ্গে তাদের বউ আসে। আসে জোয়ান বিটিও। কেবল বুড়োবুড়িরা থাকে ঘর-রাখা**।"[৪] যতই আলস্য থাক, জড়তা যতই তাদের শরীরকে অচল করে থাকুক, দিনের সূচনাতে তা অন্তর্হিত হয়ে তারা আবার যেন চনমনে হয়ে ওঠে। অল্প মজুরির বিনিময়ে এরা ইঁটভাটায় কঠোর পরিশ্রম করে চলে। ইঁটগড়তে শ্রমিকদের পরিশ্রমের কথা উল্লেখ করতে

গিয়ে উপন্যাসিক বলেছেন—"**ইঁট ত শুধুই জড় নয়, তা যেন কয়েক শতাব্দী জুড়ে সহস্র সহস্র মানুষের হাড়মাংস, বেদনা ও চোখের জলে শিলীভূত হওয়া এক জীবাশ্ম।**"[৫] বস্তুত ইঁটভাটায় নর-নারীরা নিরবচ্ছিন্ন পরিশ্রম করলেও এদের দারিদ্র্যক্লিষ্ট জীবনের হাত থেকে মুক্তি ঘটে না।

স্থানীয়রা ভাটার কাজ করে বাড়িতে ফিরে আসে। কিন্তু দূরদূরান্তের গ্রাম থেকে আসা কামিয়ারা ভাটায় নির্মাণ করে অস্থায়ী খাদিয়া নন্দ তার স্ত্রী পচি, ছয় বছরের পুত্র য-য ও দশ বছরের কন্যা লীলমণিকে সঙ্গে নিয়ে খোকন বাবুর ভাটায় আসে ইঁট কাটতে। দারিদ্র্য এদের নিত্য সঙ্গী। নন্দের লুঙ্গি ছিঁড়ে গেলে কিংবা পচির আটপৌরে শাড়ি নষ্ট হয়ে গেলেও তা কেনার সামর্থ্য নেই। শীত নিবারণের জন্য নেই উপযুক্ত গরম পোশাক। বাড়ির দুধ নিজের সন্তানকে না খাইয়ে ভাটার চায়ের দোকানদার পতিত-এর কাছে বিক্রি করে অতিরিক্ত কিছু পয়সা পাওয়ার আশায়। পচি ও লীলমণি নন্দর কাজের সহযোগী। আরপুত্র য-য বাড়িতে কাঁদবে বলে তাকেও নিয়ে আসে ভাটায়। লীলমণির মতো অপাপবিদ্ধ বালিকারা কৈশোরের আনন্দধারার পরিবর্তে নিজের অজান্তেই এসে পড়ে ইঁটভাটার নিথর জীবনে। 'খাদিয়া' অর্থাৎ যারা কাঁচা ইঁট প্রস্তুত করে। কাঠের ছাঁচ বা ফর্মাতে নরম মাটি ঢেলে কাঁটা ইঁট পোড়ানে শুকোতে দিতে হয়। পোড়ানের আরেক নাম পাথাই। পাথাই হল কাঁচা ইঁট রোদে শুকানোর জন্য পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন উঠোন। এই কারণে খাদিয়াদের পাথরিয়াও বলা হয়। ইঁট প্রস্তুতের কাজ একা একা করলে বেশি কাঁচা ইঁট কাটতে পারবে না বলে পুরুষরা তাদের সহযোগী হিসেবে নারীদেরও নিয়ে আসে ভাটার কাজে—"**প্রত্যেক খাদিয়া সাধারণত, তার বউকে কাজে লাগায়। মুন্সির 'স্টাপ খাতা'তে বউয়ের নাম থাকে না। খাদিয়া বলতে থাকে তার পুরুষ।' খাদিয়া যত বেশি ইঁট তৈরি করবে, শুনতি অনুসারে তার মজুরি তত বাড়বে। ফলত, নিজের সঙ্গে নিজের এক আমরণ প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। সেই প্রতিযোগিতায় পড়ে, খাদিয়া কেবল ইঁট গড়েই চলে।**"[৬] সমপরিমাণ কায়িক পরিশ্রম করলেও ভাটায় মেয়েরা কেবল পুরুষের সহযোগী। মুন্সি পল্টনের হিসেবের খাতায় নাম থাকে পুরুষদের। আর্থিক উত্তরণে এসব নারীরা সমান কাজ করলেও তাদের মূল্য নির্ধারণ হয় কেবলমাত্র পুরুষের সহযোগী হিসেবে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চরম নিষ্ঠুরতায় এরা কাজের স্বীকৃতি বা যথাযোগ্য মূল্য পায় না। এমনকি কাল মার্কস শ্রমিকদের ন্যূনতম মজুরি নির্ধারণে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করলেও গৃহে নিরলস কর্তব্যরত কর্মব্যস্ত নারীদের কাজের মূল্য নির্ধারণে তিনি এক প্রকার নীরব দর্শকের ভূমিকাই পালন করেছেন।

খোকনবাবুর ভাটায় নন্দ ইঁট গড়ে। নন্দ ভেজা তুলতুলে মাটির দলা পাঁকিয়ে ফর্মা ভর্তি করে আর পচি কাঁচা ইঁট রোদে শুকানোর জন্য নিয়ে যায় পোড়ানে দিতে—"**পোড়ান থেকে দু 'আঙুল মতো ওপরে ফর্মা ধরে, পচি ঝট্‌সে উল্টে দেয়। কাঁচা ইঁট থপ করে বসে। ইটের গায়ে ফুটে ওঠে কোম্পানির ছাপ :** RAJU।"[৭] পচি আবার ফর্মাগুলো নন্দকে দিয়ে যায়। এইভাবে চলতে থাকে একটার পর একটা ইঁট গড়া। সতর্কতার সঙ্গে এই কাজ না করলে ইঁট নষ্ট হয়ে যেতে পারে। ফলে মজুরি থেকেও বঞ্চিত হতে হয়। যদিও দরিদ্রের প্রকৃত প্রেরণায় পচিদের কাজ কখনও আনাড়ি হয় না। প্রত্যেক খাদিয়ার কর্মপ্রণালী যেন একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি। ভীমার ফর্মা নিয়ে যায় পার্বতী আর দুয়ারা মহাতোর সহযোগী রাধী অর্থাৎ রাধারানী। নন্দর থেকে ভীমা বেশি ইঁট কাটতে পারে। ভাটার মালিকরা পাহাড়প্রমাণ মুনাফা লুটলেও খাদিয়ারা পায় হাজারে মাত্র ষোল টাকা। নিজের স্ত্রীর সহযোগিতায় সারাদিন কঠোর পরিশ্রম করে ভীমা এক হাজার ইঁট কাটে আর নন্দ আটশো থেকে সাড়ে আটশো। অভাব, দরিদ্রতা, এবং ইঁট কাটতে কাটতে অনুভূতিহীন হাতের মতো এদের হৃদয়ের কোমলতাও নষ্ট হয়ে যায়। খিটখিটে স্বভাবের ভীমা তার সাত মাসের ছেলে কাঁদলে বিরক্ত হয়ে বলে—"**দে শালার মুহে মাটির লেসে!**"[৮] ইটের সংস্পর্শে থেকে এদের হৃদয়ও কঠিন ইটে পরিণত হয়। বিচলিত করে না নিজের ঔরসজাত সন্তানের কান্না। উপন্যাসিকের মন্তব্য—"**প্রজন্মের পর প্রজন্ম ইঁট গড়তে গড়তে, সত্যিই তাদের হাত আজ অনুভূতিহীন যন্ত্রাংশে পরিণত।**"[৯] কিন্তু মাতৃহৃদয় তো আর কোনো বাধা মানে না। ছেলে কাঁদলে পার্বতীর পাঁজর ভেঙে শব্দ হয়—"**খালি ফর্মা ভীমার কাছে ফেলে পার্বতী ছেলেকে কাঁখে তোলে। নাক মুছিয়ে গলায় আঙুলের কাতুকুতু দিয়ে হাসায়। নিজেও হাসে।**"[১০] মায়ের ছেলেকে আদর করা দেখে বিরক্ত ভীমা 'শ্লা আজের দিনটা ব্যাকার গেল' বলে আক্ষেপ করে। আসলে দারিদ্র্যের কাছে হার মানে এদের নৈতিক মূল্যবোধ। কাজ করতে করতে তারা খাওয়ার কথা ভুলে যায়। দুয়ারার স্ত্রী রাধী যখন কাজ ছেড়ে খাবার কথা বলে তখন সে উত্তর দেয়—"**নাঃ, শ-টেক দিঁয়েই লিই। খাওয়াটা পালাছে?**"[১১] অভাবের তাড়নায় অসহায় এই খাদিয়ারা খিদের জ্বালায় চোখে ঝাপসা না দেখলে খেতে যায় না। তাছাড়া খিদে পেলে খেতে হবে এমন রীতিও এদের নেই।

আষাঢ়ী ও তার মা মঞ্জরী একইসঙ্গে আসে ইঁটভাটার কাজ করতে বাগমুণ্ডি থেকে। আষাঢ়ীর কাজের সহযোগী মা মঞ্জরী। বাড়িতে আগুন লেগে সব পুড়ে গেলে সব হারানোর পর বেদনা নিয়ে ভাটায় আসে ইঁট গড়তে। এছাড়াও এই ভাটায় আসে অসংখ্য নামহীন খাদিয়া। মুন্সি পল্টনের সাইকেলের সঙ্গী ঝরি,

মনসারা ও গঙ্গাধর ফায়ারম্যান। ফায়ারম্যানের কাজ হল জ্বলন্ত ভাটায় আগুন সব জায়গায় নির্দিষ্ট পরিমাণে সরবরাহ হচ্ছে কিনা তা তদারকি করা। ভেলভেলা, হাকিম, ল্যালহা মাহাতো ও চুনারামেরা লোডার। অর্থাৎ যারা চিমনিতে ইঁট পোড়ানোর জন্য লোড করে। এই লোডারের কাজ অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে করতে পারে নারীরাও। ভাটার সমস্ত রকম কাজের দায়ভার মুন্সি পল্টনের। মালিকের পরেই তার স্থান। পাগল ইঁট লোড করার পূর্ব মুহূর্তে ভাটার রাবিশ পরিষ্কার করে, যাতে লোডাররা সহজেই পথ চলতে পারে। রহমত কোলম্যান ও পরিমল কড়িম্যান এবং বৃদ্ধ, মধ্যবয়সী ও কিশোর-কিশোরীরা প্রত্যেকে কঠোর পরিশ্রম করলেও এদের বেতন বৈষম্য রয়েছে। মুন্সি মাসিক সাড়ে চারশো টাকা পেলেও বাকি কামিয়ারা পায় মাস খোরাকি। ভাটা বন্ধ হলে এদের খোরাকিও বন্ধ হয়ে যায়। যদিও সর্বোচ্চ মুনাফা লাভ করে মালিক খোকনবাবু। মালিক কোনরূপ মেহনত না করে ভাটায় শুধু আসা যাওয়া করে প্রচুর অর্থোপার্জন করে—"**বানানো এবং লোডিং মিলে, চব্বিশ টাকা হাজারের ইঁট যখন পাকাই হয়ে বেরিয়ে আসছে, তখন, মালিকের সেটা পড়ছে একশ সত্তর থেকে পঁচাত্তর টাকা। তার ওপরে লাভ বসিয়ে মাল বাজারে ছাড়া হচ্ছে। এই লাভের সবটাই মালিকের। যা কামিয়াদের মজুরীর কয়েক গুণ।**"[১২] ব্রাহ্মণ পতিত ইঁটভাটায় চা বিক্রি করে। তার চায়ের দোকানের আয়ু ভাটার সমান। ভাটা বন্ধ হলে তার চায়ের দোকানও বন্ধ হয়। কারণ ভাটার কামিয়ারাই মূলত তার চায়ের ক্রেতা। ভাটার সকলে চা খাওয়ার পাশাপাশি তার সঙ্গে ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখের গল্প করে। এছাড়া নিরস ভাটার জীবনে পতিত-এর দোকান তাদের জিরিয়ে নেওয়ার ও চিত্ত বিনোদনের একমাত্র জায়গা। বস্তুত ভাটার মানুষদের সংগ্রামী ইতিহাসের একমাত্র সাক্ষী এই পতিত।

পুরুষদের সহযোগিতার পাশাপাশি নারীরা ভাটার একাধিক কাজের সঙ্গে যুক্ত। নারীরাই মূলত মাটি ভেজানোর জন্য জলের ব্যবস্থা করে। দুয়ারা রাধারানীর সহযোগিতায় বারোটার মধ্যে চারশো ইঁট কাটে। আর রাধারানীরা ফুরসত না নিয়ে ফর্মাতে ব্যবহৃত বালি আনতে দৌড় দেয়। কাঁচা ইঁট যাতে কাঠের ফর্মাতে লেগে না যায়, তাই বালির প্রয়োজন। বালি সংগ্রহের কাজও মেয়েরা করে অতিরিক্ত এক টাকার জন্য—"**পোড়ান থেকে চল্লিশ গজ হেঁটে নেমে গেলেই নদী। খাদিয়ারা ইঁট গড়তে গড়তে বালির প্রয়োজনে এখানে আসে। হাজার ইটের ষোল টাকা মজুরির সঙ্গে বালির দাম বাবদ একটি টাকা তারা আলাদা পায়।**"[১৩] পুরুষদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে কাজ করে মঞ্জরী, বুলানি, কাল্লা, সেবী, রেবতী, জিলাপি, আঙুরী, সৈঞ্চা ও লীলাবতী সহ নামহীন সব বয়সের মেয়েরা।

বস্তুত দরিদ্রতা থেকে নিষ্কৃতি পেতে কামিয়ারা নিজেদের জীবনের সবকিছু বিসর্জন দিয়ে ভাটায় আসে। ইঁটের কাজ করতে এসে কিশোর-কিশোরীদের খেলাধুলার বয়স হয় বিপন্ন। উপন্যাসিকের ভাষায়—"**সেই কীর্তিস্তম্ভের বলি শুধু লীলমণি না, পরিমল না, কিশোর-কিশোরী নির্বিশেষে আরো অনেক অনেক স্বভূমি থেকে উৎখাত হয়ে আসা নিঃস্ব গ্রামবাসীর দল। যারা নিরীহ এবং অনন্যোপায়।**"[১৪] রাবিশ থেকে কয়লা বাছাই করা, ইঁট চিমনিতে লোডকরা এবং মাটি কাটার কাজও মেয়েদের দ্বারাই সম্পন্ন হয়। ঘোষেদের ভাটায় ইটের বিক্রি কম বলে মজুরি তেমন পাওয়া যায় না। এই কারণেই বুলানি কয়েকজন সঙ্গীকে নিয়ে খোকনবাবুর ভাটায় রেজার কাজ করতে আসে। কাজের ক্ষেত্রে পুরুষদের থেকে এরা কোন অংশেই কম নয়। লীলাবতী ইঁট ভর্তি মাথায় শরীরের দুলুনি ছন্দ নিয়ে ছুটতে পারে বেশ ভালো। আর কাল্লা পুরুষদের সমান মাথায় দশটি ইঁট নিয়ে অনায়াসে ছুটে চলে। প্রত্যেক রেজারা সমসংখ্যক ইঁট প্রত্যেকবার নিয়ে আসে চিমনির উদ্দেশ্যে। ইঁট সবাই সমান নিতে পারে না, কেউ বেশি নেয়, কেউ কম। মাথায় নিয়ে আসা ইঁটের সংখ্যা অনুযায়ী কড়িম্যান পরিমল বিভিন্ন রঙের কড়ি দেয়। সপ্তাহের শেষে কড়ি গুণে ও তার রঙ দেখে সকলকে মজুরি দেওয়া হয়। হাজার ইঁট বহন করে পায় মাত্র চার টাকা। যারা প্রতিদিন কাজে আসে তাদের থেকে রিলিফে কাজ করা শ্রমিকদের অবস্থা আরো শোচনীয়। দিনমণি ল্যালহার বউ রিলিফে মাটি কাটে। প্রতিদিন রিলিফের কাজ পাওয়া যায় না বলে বাধ্য হয় অন্য কাজ করতে।

সভ্যতার অগ্রগতিতে ইটের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। কামিয়াদের রক্তের আগুনে পোড়া ইটে নির্মিত ছোট বড় অট্টালিকায় বসবাস করে কত শত মানুষ। মুন্সির দৃষ্টিতে ইঁটভাটার সঙ্গে তাদের প্রাণের সম্পর্ক। অথচ কামিয়ারাই নিজের কুড়ে ঘরের জন্য প্রয়োজনীয় ইটের জোগাড় করতে পারে না। বাড়ির বউ বাচ্চাদের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষা বিসর্জন দিয়ে কঠোর পরিশ্রম করে ইঁট নির্মাণ করলেও এদের ঘরই থেকে যায় ভগ্নদশা অবস্থায়। মুন্সি আবেগ নিয়ে সাজানো ইঁট স্পর্শ করতে করতে তার মনে পড়ে যায় পাগলের নিষ্ঠুর পরিহাসের কথা। বছরের-পর-বছর ইঁটভাটায় কাজ করে সে সংগ্রহ করতে পারেনি নিজের ঘর তৈরির প্রয়োজনীয় ইঁট। এইসব ভাবতে ভাবতে মুন্সির অবাক লাগে—"**শহরের ইমারতগুলি খাড়া করার জন্য এই তের বছর ধরে সে এক কোটি কুড়ি লক্ষ তিন হাজার পাঁচশ পঞ্চাশটি ইঁট যোগান দিয়ে গেছে। অথচ তার কয়েকটা খণ্ড দিয়ে সে তার নিজের ফাটল ধরা ঘরের মাটির পাঁচিল ভেঙে দিয়ে গড়তে পারেনি একটা শক্ত দেওয়ালও।**

মুন্সির মানস চোখে গ্রামের সমস্ত কুঁড়েঘরগুলো যেন তার প্রতি কটাক্ষ, বিদ্রুপ আর ঘৃণার জীবন্ত প্রতিমূর্তি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে।"[১৫] শহরের সৌন্দর্য বিভূষিত ইমারত গড়ার কাজে এরা কোটি-কোটি ইঁট নির্মাণ করে। অথচ বাস্তব বড় নিষ্ঠুর। গৃহ নির্মাণের জন্য ভাটার কামিয়ারা কখনো পর্যাপ্ত পরিমাণে ইঁট জোগাড় করতে পারে না। কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য **'মিঠেকড়া'** (১৩৫৮ বঙ্গাব্দ) কাব্যগ্রন্থের **'পুরনো ধাঁধা'** কবিতায় সমাজ বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে জিজ্ঞাসা করেছেন—

"বলতে পারো বড়মানুষ মোটর কেন চড়বে?'
গরীব কেন সেই মোটরের তলায় চাপা পড়বে?
বড়মানুষ ভোজের পাতে ফেলে লুচি-মিষ্টি,
গরীবরা পায় খোলামকুচি, একি অনাসৃষ্টি?
বলতে পারো ধনীর বাড়ি তৈরি যারা করছে,
কুঁড়েঘরেই তারা কেন মাছির মতো মরছে?"[১৬]

—কবির এইসব জিজ্ঞাসার বাস্তব ভিত্তি আছে। আজও ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর হয়তো কারও কাছেই নেই।

খাদিয়াদের রোজগার কেবল নিরলস পরিশ্রমের ওপরে নির্ভর করে না, নির্ভর করে আবহাওয়ার ওপরে। রোদের তাপ বেশি থাকলে তাড়াতাড়ি ইঁট শুকিয়ে যায়। ফলে পোড়ান খালি হয়ে শুকনো ইঁট চলে যায় চুল্লিতে। পোড়ান খালি থাকলে ইঁট কাটার কাজে গতি আসে। কিন্তু প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে ঝড় বৃষ্টি হলে কাঁচা ইটে জল পড়ে তা ফুটো ফুটো হয়ে যায়। ইটের এই ত্রুটির নাম জলদাগী। ভাটায় পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকার কারণে ইটের এমন অবস্থা হয়। জলদাগী ইটের ক্ষতির ভার মালিকের হওয়া উচিত। কিন্তু মালিকপক্ষ তা চাপিয়ে দেয় নিরক্ষর দারিদ্র্যপীড়িত খাদিয়াদের ওপর। আর অশিক্ষিত খাদিয়ারা ভাবে এতে সত্যিই তাদের ত্রুটি রয়েছে। তাই তারা কোনোরূপ বাকবিতণ্ডায় না জড়িয়ে অর্ধেক মজুরি নিয়ে সন্তুষ্ট থাকে—"**জলে ধুয়ে যাওয়া অর্ধেক মজুরি, সামান্য হলেও খাদিয়াদের পক্ষে তা ঢের। মুন্সিকে তাদের কিছু বলার থাকে না। তাদের দেখাদেখি মুন্সিও যে কপাল চাপড়ায়।**"[১৭] আসলে এক বিচিত্র নিয়মে খাদিয়াদের শ্রম ও সময়কে বরবাদ করে দেওয়া হয়। এভাবেই বিভিন্ন প্রকার অজুহাতে তাদের নিরন্তর শোষণ করেই চলে মালিকপক্ষ।

ইঁট ভাটার কাজ খুব একটা নিরাপদ নয়। সাজানো ইঁট পড়ে অনেক সময় কামিয়ারা পঙ্গু হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের মৃত্যু ঘটে। এতে মালিকরা কোনরূপ বিচলিত হয় না। পূর্বের নিয়মে আবার চলতে থাকে ভাটার কাজ। ফায়ারম্যান আগুনের কাছাকাছি থাকে বলে তাদের কাজে ঝুঁকি আরও বেশি। জ্বলন্ত আগুনে

বিপদ যেন ওঁত পেতে থাকে। মুন্সি পল্টনের ভাই গোবিন্দ ছিল ডলডাঁড়ি ভাটার ফায়ারম্যান। তার বউ উর্মিলা ছিল ওই ভাটারই রেজা। কিন্তু বিয়ের পরের বছর রাবিশেঢাকা ইঁটের পাটি খুলে উর্মিলার পা চুল্লিতেপড়ে যায়। ভাটার লোকজন তাকে টানাটানি করে বের করে। শহরমুখী লোডিং ট্রাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে আসলেও তাকে প্রাণে বাঁচানো যায়নি। সেই থেকে ভাটা হয়ে যায় গোবিন্দর পরম শত্রু। এরপর সে জীবনে কখনো ভাটামুখী হয়নি। এই প্রসঙ্গে উপন্যাসিক সৈকত রক্ষিত বলেছেন—"**ছাই-ঢাকা আগুনের তলে তলে, যার জিভ দিন নেই রাত নেই লকলক করে চলছে।**"[১৮]

সুদূর অতীতকাল থেকে বর্তমানেও ভাটায় ভাটায় খাদিয়াদের জীবন চলছে একই নিয়মে। এখনও তাদের আর্থিক উন্নতির পথ অবরুদ্ধ। কয়েক মাস ইঁট নির্মাণের পর বর্ষার আগে আগে ভাটা বন্ধ হয়ে যায়। তারা পুনরায় ফিরে যায় যে যার গ্রামে চাষবাসের কাজে। দীর্ঘদিন কঠোর পরিশ্রম করে তাদের ক্লান্ত দেহ যেন মুক্তি পায়। ভাটার কাজ করতে করতে তারা পরস্পর এক অচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ হয়। আসন্ন বিরহে হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়ে ওঠে। যদিও মনের কোণে লুকিয়ে থাকে পুনর্মিলনের সুপ্ত বাসনা। তাদের অবস্থা পরিবর্তন না হলেও পরের বছর পুনরায় তারা ভাটার টানে কাজ করতে আসে। বিষয়টি সম্পর্কে উপন্যাসিকের তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য—"**হাসি-মস্করা ছলে, বিদায়ের ছড়া কাটলেও এর মধ্যে তাদের একটা ক্ষীণ আশা ও প্রত্যয় থেকেই যায়। যদিও ভাটারূপ প্রতিমাটির কোনো বিসর্জন নেই, আছে শুধু আবাহন। সেই আবাহনে মলিন্দরা আবার সাড়া দেবে। যেমন সাড়া দিয়ে এসেছে তারা সুদুর অতীত থেকে।**"[১৬] আসলে এরা হয়তো চিরকালই দাসত্ব করে চলবে দরিদ্রতার এবং গড়ে চলবে সভ্যতার ইমারত।

ফুলের মানুষ

পুজো হোক বা উপাসনা, আয়ুর্বেদ হোক বা ভেষজ ঔষধি—জবাফুল বাঙালি জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। সাহিত্য অথবা গানের লাইনেও বারংবার প্রতিফলিত হয়েছে জবার সৌন্দর্যের বিভিন্ন দিক। প্রকৃতিতে অনেক ফুল আছে সেগুলির সৌরভ ও সৌন্দর্য জবার তুলনায় অনেক বেশি মনমুগ্ধকর হলেও রক্ত জবা দিয়েই তো হয় মাতৃ শক্তির আরাধনা। এই কারণে কবি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিখ্যাত শ্যামাসঙ্গীতে বলেছেন—

"বলরে জবা বল্।
কোন্ সাধনায় পেলি শ্যামা মায়ের চরণতল।।"[২০]

—জবা ফুলের সৌরভ সৌন্দর্য আমরা প্রাণভরে উপভোগ করলেও এই ফুলচাষে কতজনের জীবন যন্ত্রণার কাহিনি চাপা পড়ে থাকে তা আমরা হৃদয় দিয়ে অনুভব করিনা। 'স্বজনভূমি', 'সমুদ্র দুয়ার', 'চরপূর্ণিমা', 'সহিস' উপন্যাসের স্রষ্টা ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'ফুলের মানুষ' উপন্যাসে এক বিক্ষুব্ধ সময়ে দক্ষিণবঙ্গের গ্রামের পর গ্রাম জবা ফুলের চাষকে কেন্দ্র করে ফুলের মানুষদের দিনযাপনের বৃত্তান্তকে তুলে ধরেছেন। ভীম সামন্ত, হামিদুল, মাঝিদের, মোড়লদের ও বাগেদের বাগানে ফুলতুলুনিরা জবার এক আঙুল লম্বা কুঁড়ি ছিড়ে ও মালা গেঁথে কিভাবে নিজেদের অন্নসংস্থান করে তার অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায় এই উপন্যাসে।

পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের অর্থোপার্জনের দিকটিও বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছে 'ফুলের মানুষ' উপন্যাসে। যদিও সুধারানী, সুভদ্রা, ছবি বউ, চায়না, মলিনা, কমলারানী, ষাট-বাষট্টি বয়সের বৃদ্ধা ও কিশোর-কিশোরীদের জবার কুঁড়ি তুলে কিংবা মালা গেঁথে অর্থসংস্থানের প্রেক্ষিত একেক জনের একক রকম। ফুলতুলুনিরা কেউ বিধবা বলে সংসার সচল রাখার তাগিদে এই কাজে যুক্ত, কেউবা দরিদ্র সংসারে স্বামীর সহযোগী হতে ছেলে মেয়েদের নিয়ে এই পথ বেছে নিয়েছে, আবার বাগান মালিকদের বধূরা বাড়তি হাত খরচ সংগ্রহের জন্য জবা ফুলের কুঁড়ি কাটে। উপন্যাসটি সম্পর্কে উপন্যাসিক ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় 'জীয়নকাঠি' পত্রিকার সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন—"**ফুলের মানুষ উপন্যাসের আমার বিচিত্র ব্যাপার—হাজারটা ফুল তুললে ১ টাকা, ৫ হাজারটা জবাফুল তুললে—৫ টাকা। বউরা, মেয়েরা বাড়ির কাজ সেরে টুকটুক করে জবাফুলে বোঁটা কাটে—কুঁড়িয়ে যাওয়া ফুলের।**" স্বয়ং ঔপন্যাসিকের এই সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট জবা ফুল চাষ নারীদের অর্থোপার্জনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত।

ধান চাষ বা অন্যান্য চাষের তুলনায় লাভজনক বলে বাগান মালিকরা জবা ফুলের চাষ করে। এই কাজের সঙ্গে গ্রামীণ মেয়েরা যুক্ত বলে কম মজুরি দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেওয়া যায় সহজেই। এছাড়া মজুরি বৃদ্ধির অছিলায় বিদ্রোহের কোনও ঝক্কি নেই। কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে ফুল চাষের কাজগুলি সুচারুরূপে সম্পাদন করে নারীরা। লাভের পরিমাণ বেশি ও সুবিধাজনক বলে জমির মালিক ভীম সামন্ত, হামিদুল, মাঝিরা অন্যান্য ফসল ফলানোর পরিবর্তে জবা বাগানের প্রতি বেশী আগ্রহী। জীতেন বাগ ধান ও সবজি চাষের ঝামেলার কথা বললে ভীম সামন্ত জানায়—"**সাধে আমরা ধানের বদলে তিন তিনটে জমিতে জবা চাষ করেছি। কোনও লেবার মজুর ধরার বালাই নেই। এ বছর মজুরির রেট চল্লিশ ধান কাটার সময় পঞ্চাশ পরের বছর ষাট—এসব ঝক্কি নেই। শুধু জবার কুঁড়ি ছেঁড়ো আর খাও—। —যেমন ছিঁড়বে তেমন গুনে**

গুনে পয়সা পাবে—বাস।"[২১] প্রস্ফুটিত ফুলের পরিবর্তে কুঁড়ি সংগ্রহে জমির মালিকদের বেশি লাভ হয় বলে নির্দিষ্ট সময়ে ফুলতুলুনিদের দিয়ে সামান্য মূল্যের বিনিময়ে কুঁড়ি সংগ্রহ করে নেয়। এক হাজার কুঁড়ি সংগ্রহ করলে ফুলতুলুনিরা পায় মাত্র দুই টাকা। আর জবা বাগানের মালিকরা অধিক পরিমাণে অর্থ উপার্জন করে নিজেদের আর্থিক স্বচ্ছলতা বজায় রাখে। বস্তুত জবা ফুলের চাষে বাগান মালিক ও ফুলতুলুনিরা অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত থাকলেও এদের মধ্যে চরম আকারের আর্থিক বৈষম্য দেখা যায়। ফুলতুলুনিরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই কাজে যুক্ত হয়, আর মালিকরা অধিক মুনাফা লাভের আশায়।

উপন্যাসের শুরুতেই বর্ণিত হয়েছে দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত বিধবা সুভদ্রার কথা। তার দুই মেয়ে ষোল-সতের বছরের পদ্মা ও পম্পা এবং একমাত্র ছেলে ন'দশ বছরের দীপক। কিশোরী কালউত্তীর্ণ যুবতী পদ্মার সস্তা শাড়িতে '**গা বুক ঢাকে, আড়াল হয় না।**'[২২] বাল্য ও কৈশোরের আনন্দধারায় খেলাধুলা ও পড়াশোনার পরিবর্তে অভাবের তাড়নায় নিজের অজান্তেই এরা এসে পড়ে ভীম সামন্তের তিন বিঘে বাগান। ফুল নিয়ে নয়, বাগানে মালিকদের কারবার এক আঙুল লম্বা কুঁড়ি নিয়ে। তাই গৃহের কাজকর্ম সেরে পান্তাভাত ও আঁকশি হাতে সকাল সকাল এদের বেরিয়ে পড়তে হয়। আসলে এদের দিনের শুরুতেই সূচনা হয় '**এক ঝলক ভোরের হাওয়ায় তাদের সংসারে শুভ্র শ্রমময় সকাল।**'[২৩] বাড়ি থেকে বাগানের উদ্দেশ্যে দু'মুঠো অন্নের আশায় এদের যাত্রা প্রসঙ্গে উপন্যাসিক বলেছেন—"**শিশু কিশোর-কিশোরী যুবতী তরুণীদের মিছিল। কোনো দাবি আদায় বা শত্রুর মোকাবিলাও নয়। প্রকৃতির কাছে দিনের অন্ন সংগ্রহের সারিবদ্ধ যাত্রা।**"[২৪] এদের যাওয়ার পথে লেখক সুকৌশলে বাগান সংলগ্ন নতুন করে গজিয়ে ওঠা রিসোর্টে শহর থেকে আসা যুবক যুবতীদের ফূর্তি করার চিত্রটি এঁকেছেন। রিসোর্টে আসা নর-নারীর জীবন এদের কাছে স্বপ্নচারীর মতো। অথচ পদ্মা ও পম্পারা প্রয়োজনের তাগিদে বাধ্য হয় বাল্য-কৈশোর বিসর্জন দিতে। সুভদ্রার মতো বিধবা সীতা নিজের ছেলেকে কলকাতায় দিদিমার কাছে পাঠিয়ে একাকী জীবনে ফুলতুলুনির পেশাকে বেছে নেয়। নিরু বাগের আড়াই বিঘে জবাবাড়ির মধ্যে কাজ করে বত্রিশের ছবি বউ, কুড়ি বছরের অনূঢ়া রোগা কালো চায়না আর জনক মাঝির চার বিঘের বাগানে ঠাকুরমা ও তার দুই নাতনি। বেলা দশটার মধ্যে বাগান মালিক সংগৃহীত কুঁড়ি বিক্রি করতে শহরে নিয়ে যায়। আর এই কারণে নির্দিষ্ট সময়ে তারা গভীর মনোযোগ সহকারে আঁকশি দিয়ে টেনে দুই আঙুলের চাপে পুট্ পুট্ শব্দে কেটে চলে কুঁড়ি। এই কুঁড়ি সংগ্রহের বিষয়টিকে উপন্যাসিক চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন—"**এতজন**

নারী-পুরুষ শিশু কিশোর কিশোরী ফুলতুলুনি। বৃন্ত কাটার পুট্ পুট্ শব্দ বাগান থেকে বাগানে ছড়িয়ে আবার বাগানগুলোকে ঘিরে বাজনার মহাবৃত্ত রচনা করে।"[২৫] নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় মালিককে গণনা দিয়ে সংগ্রহ করে যৎসামান্য মজুরি। রক্তবা তুলতে তুলতে ফুলতুলুনিদের আঙুলগুলো ফুটে লাল রক্ত নির্গত হলেও এদের সাপ্তাহিক রোজগার হয় মাত্র নব্বই থেকে একশো টাকা। অথচ বাগান মালিকরা লাভ করে অনেক বেশি। আবার বাজারে ফুলের চাহিদা লাভের পরিমাণ অধিক হয়। কিন্তু ফুলতুলুনিদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয় না।

ফুল তোলার কাজ খুব একটা সহজ নয়। কুঁড়ি সংগ্রহ করতে করতে এদের আঙুলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। পদ্মা সাড়ে তিন হাজার ফুল সংগ্রহ করলে তার আঙুলে ক্ষতের সৃষ্টি হয়। কিন্তু অর্থের অভাবে তা নিরাময়ের কোন ব্যবস্থা করতে পারে না। এছাড়াও বর্ষার সময় বাগানে রয়েছে সাপের ভয়। মাঝে মাঝে জোঁকেরও উপদ্রব দেখা যায়। ফুলতুলুনি রানীর পায়ে জোঁক লাগে। অনেক চেষ্টা করেও তা ছাড়াতে পারছিল না। জোঁকটা শোষণ করে চলেছিল তার রক্ত। পায়ের যন্ত্রমা ক্রমশ তারপায়ের চামড়া থেকে সর্বশরীরে প্রবেশ করে। অবশেষে একটা বউ পান্তাভাতের সঙ্গে আনা নুন দিয়ে জোঁক ছাড়াই। রানী আক্ষেপ করে বলে—"**মাগো-রক্ত ঝরিয়ে ফুল তোলা। হাজার কুঁড়িতে সেই দু-টাকা। তবু যদি চারটে টাকা করত...।**"[২৬] নুন আনা বউটা তার সঙ্গে সুর মিলিয়ে বলে বাবুদের ফুলবাজার ভালো গেলেও ফুলতুলুনিদের যা রেট, মাঝারি গেলেও তাই রেট। এছাড়াও রয়েছে নারীদের নিরাপত্তার অভাব। ভীম সামন্ত পদ্মাকে কিছু কুঁড়ি তুলে দিয়ে সাহায্য করে এবং কোঁচড়ে রাখতে গিয়ে—"**কাপড় চুইয়ে পেটের চামড়ায় হাত ছুঁয়ে যায়। এই মধ্য বয়সেও সামন্তর সর্বশরীরে চিক্কির!**"[২৭] পদ্মার অজান্তেই সামন্ত তার শরীরের স্পর্শে এক প্রকার হিন্দোল অনুভব করে। এখানে ঔপন্যাসিক ইঙ্গিতের সাহায্যে কিশোরীদের নিরাপত্তাহীন জীবনের বিষয়টিকে দেখিয়েছেন। সবাই মিলে খেতে যাওয়ার সময় ফুলতুলুনি মাসি জানায়, ফাঁকা বাগানে বাবুদের ছেলের সঙ্গে ফুলতুলুনি বেলীর ভাবের কথা। বাগানে অঙ্গ বিনিময়ের সময় লোকের চোখে ধরা পড়ে। কিন্তু গ্রাম্য সালিশিতে বাবুর ছেলেকে মাত্র দুই হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এমনকি ছেলের বড়লোক বাপ অন্য লোক মারফত দুশো টাকা পাঠিয়ে বাকি টাকাটাও দেয়নি। সেই থেকে তার নাম হয়ে যায় দুশো টাকা বেলী। পরবর্তীতে তার জীবনের পরিণতি মর্মান্তিক হয়েছিল একথা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাকে কেউ স্মরণেও রাখেনি, কেবলমাত্র '**ফুলতুলুনিদের মুখে মুখে বেঁচে থাকে সে এক ফুলতুলুনি বেলী।**'

জবা ফুলের চাষের সঙ্গে বাগান মালিক ও ফুলতুলুনিরা ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত

থাকলেও এদের মধ্যে চরম আকারে বৈষম্য দেখা যায়। ফুলতুলুনিরা অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার জন্য এই কাজে যুক্ত হয়, আর মালিকরা অধিক মুনাফা লাভের আশায়। বাগান মালিক সামন্তের বউ কমলারানী নিজের ব্যক্তিগত শখ পূরণের জন্য কুঁড়ি কাটে। কিন্তু দুলাল দলুই-এর মতো দরিদ্র পরিবারের মেয়েরা অসহায় অবস্থায় বাধ্য হয়ে প্রবেশ করে ফুলের বাগানে। দুলালের স্ত্রী সুধারানী ও তার ছেলে মেয়েদের নিয়ে হামিদুলের পৈত্রিক বাগানে কুঁড়ি কাটে। এই একই বাগানে মলিনা তার ন'দশ বছরের মেয়ে গীতা ও ছয়-সাত বছরের ছেলে গোপালকে সঙ্গে নিয়ে কুঁড়ি তোলার কাজ করে। হামিদুলের বাগানে তারা কুঁড়ি কাটার বিনিময়ে ফুলসংগ্রহ করে। সংগৃহীত ফুল মুরারীর গোডাউনে বিক্রি করে। মুরারীর কাছ থেকে ঔষধ কোম্পানিরা শুকনো ফুল সংগ্রহ করে। মলিনা ও সুধাদের সঙ্গে হামিদুলের হৃদ্যতা ও রঙ্গ রসিকতার এক পবিত্র সম্পর্ক দেখা যায়। এখানে লেখক হয়তো অসাম্প্রদায়িক মনোভাব ব্যক্ত করতে চেয়েছেন। গোপালের কাছে বাল্যকালের শখ পূরণের মাধ্যমে এই ফুল তোলা। সে বাগানে পড়ে থাকা ফুল সংগ্রহ করে মুরারীর গোডাউনে বিক্রি করে চকোলেট আর ঘুড়ি কিনতে চায়। এই বয়সেই তার মধ্যে স্বনির্ভর হওয়ার একটা দিক লক্ষ্য করা যায়—"**আমার ভাগের ফুল বেচে কিনবো, বলেই উঠোনে পলি চটে বিছানো শুখনো জবা ফুল গুলো দু-হাতে এক জায়গায় স্তূপ করে। নিজের শ্রমে চয়ন করা ফুল। ক্রমে স্বনির্ভরতার আকাঙ্ক্ষা ফোটে এইটুকু বয়সে।**"[২৮] মুরারীর দোকানে এক কিলো শুকনো ফুল বিক্রি করে পায় মাত্র পঞ্চাশ পয়সা কিংবা এক টাকা। গোপালের আশঙ্কা তার শখ পূরণ করার প্রয়োজনীয় অর্থসংস্থান হবে কিনা? সে প্রয়োজনীয় অর্থ না হলে একটা শখ বিসর্জন দেওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকে। বস্তুত গোপালরা তাদের সংসারে যা চায় তার কিয়দংশ পায় কিয়দংশ পায় না। নিয়মিত পরিশ্রম করলেও শিশুসুলভ সামান্য শখ পূরণ হয় না এদের। অথচ কমলারানী শখ পূরণ করতে পারে ফুল তুলে অতিরিক্ত অর্থ উপার্জন করে অনায়াসেই।

শুধুমাত্র অর্থের বিনিময়ে নয়, ফুল নেওয়ার জন্য কুঁড়ি তুলে দেয় সুধারা। স্বামী দুলাল নিজের দশ কাঠা এবং হামিদুলের পিতা আব্দুল সাহেবের কাছ থেকে বার্ষিক সাড়ে বারো হাজার টাকার মূল্যে লিজ নেওয়া এক বিঘা জমিতে ফুল চাষ করে। হামিদুলের পিতার কাছ থেকে লিজে জমি নিতে সর্বস্বান্ত হতে হয় তাকে। তবুও দুলাল এক বছরের মতো নিরাপত্তায় ফুল তুলে হাতের ক্ষত জীইয়ে রাখতে চায়। সাংসারিক কাজকর্ম করার পরেও সুধারানীর স্বামী দুলাল দলুই, কিশোরী কন্যা টিঙ্কু এবং এগারো ক্লাসে পাঠরত পুত্র প্রবীরকে নিয়ে দারিদ্রতাড়িত জীবন থেকে উত্তরণের আপ্রাণ চেষ্টা করে। উপন্যাসে পুত্র প্রবীরের

পড়াশোনার উল্লেখ থাকলেও কন্যা টিঙ্কু এক্ষেত্রে বঞ্চিতই থেকে গেছে। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর বঞ্চনার দিকটি এখানে বেশ স্পষ্ট। মেয়ে ছেলেদের নিয়ে নিজের বাগানের পাশপাশি হামিদুলের বাগান থেকে সংগৃহীত কুঁড়ির মালা তৈরি করে। সেই মালা বিক্রি করতে যায় প্রবীর। কিন্তু মন্দার বাজার কিংবা দখিনা বাতাসে কুঁড়ি ফেটে ফুলে পরিণত হলে সুধা চিন্তাগ্রস্থ হয়ে পড়ে। কারণ কুঁড়ির অভাবে মালা তৈরি হবে না, উপার্জনের পথও হবে সংকুচিত। এমন সময় তাদের প্রতি সপ্তাহে চুক্তির দুশো ষাট টাকা দিতে রীতিমতো হিমশিম খেতে হয়। আর্থিক অনটনের এই যন্ত্রণাময় জীবনে সংকট আরো বেশি ঘনীভূত হয়। যদিও বৃষ্টি শ্রমের ভারে ক্লান্ত মানুষগুলোকে নতুন আশা দেয়। বৃষ্টি হলে গাঁথা ফুলের পাপড়ি চকচক করে। ফলে মালা ক্রেতার মনকে আকর্ষণ করবে এবং দামও বেশি পাওয়া যাবে। আবার শহরে ফুলের বাজারে আকাল পড়লে এরা মূল্য পায় একটু বেশি। যদিও এমন সময় তাদের জীবনে খুব কম আসে।

উপন্যাসের শেষপর্বে উপন্যাসিক এক সংকটের চিত্র অঙ্কন করেছেন। শহরের কোম্পানিরা রিসোর্ট তৈরির অজুহাতে দুলাল দলুই সহ বড় বড় বাগান মালিকদের জমি অধিগ্রহণের আপ্রাণ চেষ্টা চালায়। এদের যোগ্য সঙ্গ দেয় গ্রামের কীর্তনীয়া রূপেন, পাড়ার ভাগনা ধীরেন ও প্রাক্তন প্রধান যোগানন্দ কাঁসারির মতো বিভীষণরা। একসময় গ্রামের লোকেরা একটু বেশি মুনাফা লাভের আশায় দলবেঁধে শহরে যায় ফুল বিক্রি করতে। গঙ্গা তীরবর্তী এই ফুল বাজারে রয়েছে দুশো পঁচিশটা দোকান, কুড়ি হাজার ক্রেতা। এখানে প্রায় প্রতিদিন পঞ্চাশ থেকে ষাট টাকার ফুল বেচাকেনা হয়। নারীরাও এখানে আসে ফুল বিক্রি করতে। বিধবা মেছেদা বৌদি বিক্রি করে রজনীগন্ধা। কিন্তু এখানে এসেই তারা দুঃসংবাদ পায়। ফুল বাজার সমিতির ঘোষণায় আশঙ্কায় পড়ে তারা। সমিতি মাইকে ঘোষণা করে—"**...এ হেন গুরুত্বপূর্ণ ফুল বাজারটিকে সম্প্রতি 'গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানে' গঙ্গাকে মনোরম করার কর্মসূচির অজুহাতে উচ্ছেদ করার পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। খবরে প্রকাশ, গঙ্গার পাশের রাস্তা চওড়া করা এবং পর্যটকদের আকর্ষিত করবার জন্য বিলাসবহুল লজ ও সুদৃশ্য পার্ক তৈরির উদ্দেশ্যে মল্লিকঘাট সহ বাবুঘাট থেকে বাগবাজার পর্যন্ত গঙ্গা ধার বরাবর উচ্ছেদ করা হবে...।**"[২৯] ভবিষ্যৎ আশঙ্কায় চিন্তিত এই ফুলের মানুষেরা গ্রামগঞ্জে সমিতি গঠন করে প্রতিরোধ করতে চাই। মেয়েরাও প্রতিরোধে অংশগ্রহণ করে। ফুলের বাজার বন্ধ হলে '**জবা ফুলগুলো বাগানে জন্মাবে...বাগানেই পচবে?**"[৩০] আব্দুল চিন্তিত হয়ে বলে—"**তোমাদের কালী পুজো দুগ্গা পুজো হয় বলে আমার বাগানের জবাগুলো...খুঁটে খুঁটে নিয়ে যায় ব্যাপারিরা—আর আমার বাগানের ফুলগুলো?**

সেসব কি মানুষ ভাতে দিয়ে খায়। ওই পুজো আচ্চার জন্যেই বিক্রি হয়—দুটো পয়সার মুখ দেখি...গলার স্বর বাক্যে ফুরোবার আগ্রহ নেই। তবুও ভাষা পুষ্টি পায় না মননহীনতায়।"[৩১] এই সংকটের সময় নতুন করে গজিয়ে ওঠা রিসোর্টে গ্রামের কিশোর-কিশোরীদের বাবুদের সঙ্গিনী করার জন্য হোটেল মালিকরা লোকলাগিয়ে সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করে। ভীম সামন্ত উপন্যাসের শেষে ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলে ওঠে, '**আমাদের সামনে যে বড্ড বিপদ গো...**"।[৩২] বস্তুত এইসব নিম্নবর্গের মানুষদের আর্থিক উত্তরণের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র বা সমাজের কোন সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। ফলে অতীতকাল থেকেই প্রান্তেবাসীরা ইতিহাসের একই পথে পদচারণা করে চলেছে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। সৈকত রক্ষিত, অক্ষৌহিণী, বাগর্থ প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

২। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ফুলের মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি, ২০০০

৩। দীনবন্ধু মণ্ডল, সত্তর পরবর্তী বাংলা উপন্যাসে গ্রামজীবনের রূপরেখা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১৮

৪। রাহুল দাশগুপ্ত, বাংলা উপন্যাসকোশ, প্রতিভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১৭

৫। আতিউর রহমান, রবীন্দ্রভাবনায় সমাজ, সংস্কৃতি ও অর্থনীতি, অ্যাডার্ন পাবলিকেশন, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি ২০০৮

৬। তপনকুমার চট্টোপাধ্যায়, শাক্ত পদ সমীক্ষা, প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ মার্চ ২০০৪

৭। নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯২৮

৮। সুকান্ত ভট্টাচার্য, মিঠেকড়া, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ শ্রাবণ ১৩৫৮

৯। শাশ্বতী ঘোষ, অর্ধেক অর্থনীতি, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৯৭

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, বিশভারতী, কলকাতা, ১৯৫৩

তথ্যসূত্র :

১। নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর ১৯২৮, পৃষ্ঠা : ৭৮

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সমবায়নীতি, বিশ্বভারতী,কলকাতা, ১৯৫৩, পৃষ্ঠা : ১৯

৩। সৈকত রক্ষিত, অক্ষৌহিণী, বাগর্থ প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬, পৃষ্ঠা : ২

৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ৪

৫। তদেব,পৃষ্ঠা : ৩৬

৬। তদেব, পৃষ্ঠা : ২১

৭। তদেব, পৃষ্ঠা : ২২

৮। তদেব,পৃষ্ঠা : ২৩

৯। তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৩
১০। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৩
১১। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৫
১২। তদেব, পৃষ্ঠা : ১০১
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৫
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৭
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৬
১৬। সুকান্ত ভট্টাচার্য, মিঠেকড়া, সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম খণ্ড শ্রাবণ ১৩৫৮, পৃষ্ঠা : ১৯
১৭। সৈকত রক্ষিত, অক্ষৌহিণী, বাগর্থ প্রকাশনী, পুরুলিয়া, ফেব্রুয়ার ১৯৯৬, পৃষ্ঠা : ৭১
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা : ৩৯
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা : ১০৭
২০। নজরুল ইসলাম, সঞ্চিতা, ডি. এম. লাইব্রেরী, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ অক্টোবর, ১৯২৮, তদেব, পৃষ্ঠা : ৭৮
২১। ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, ফুলের মানুষ, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০০, পৃষ্ঠা : ৪৭
২২। তদেব, পৃষ্ঠা : ১১
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা : ১২
২৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৭
২৫। তদেব, পৃষ্ঠা : ২০
২৬। তদেব, পৃষ্ঠা : ১২৩
২৭। তদেব, পৃষ্ঠা : ৪০
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা : ৮৩
২৯। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৩৪
৩০। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৩৭
৩১। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৩৮
৩২। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৪৩

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ. ডি. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নির্বাচিত উপন্যাসে নারীর কর্মজীবনের পরিচয়

সুনন্দা ব্যানার্জী

সারসংক্ষেপ :

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় সমাজসংস্কার আন্দোলনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন, যার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নারীশিক্ষার বিস্তার। সেই শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল 'সুগৃহিণী' ও 'সুমাতা' রূপে নারীদের প্রস্তুতি। কালক্রমে সেই শিক্ষা নারীর মধ্যে এনে দিয়েছিল আত্মচেতনা। ক্রমশ নারীরা অনুভব করেছেন যে স্বনির্ভরতার অন্যতম অংশ হল আর্থিক স্বাধীনতা। আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নারীরা জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন। নারীর স্বাধীন জীবিকা অর্জন বিষয়ে সমাজের প্রাথমিক বিরূপতা সত্ত্বেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বাঙালি সমাজে কিভাবে ধীরে ধীরে মান্যতা পেয়েছে, তার পরিচয় বিধৃত হয়েছে বাঙালি নারী-ঔপন্যাসিকদের কলমে। কিন্তু বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী যুগে নারীদের অভীষ্ট কর্মক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। কিন্তু ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নারীর কর্মক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত হল। নারীরা তথাকথিত 'নারীসুলভ' পেশার বাইরে আরও নানা কর্মে নিযুক্ত হতে শুরু করলেন। এই অর্থনৈতিক উদারীকরণের কাছাকাছি সময় থেকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য কথাসাহিত্যিক হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন। তাই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের রচনায় বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী যুগের শহুরে মধ্যবিত্ত নারীর কর্মজীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর রচনায় বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগের শহুরে মধ্যবিত্ত নারীর কর্মজীবনের উপস্থাপনাই বেশি পাওয়া যায়। এই উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কর্মরতা নারীর কর্মজীবনের নানা দিক, নারীর কর্মজীবনে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব এবং নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রভাব ঠিক কতখানি, এই বিষয়গুলি সম্পর্কে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের কি ধারণা প্রকাশিত হয়েছে, তা অনুসন্ধান করাই এই প্রবন্ধের অন্বিষ্ট বিষয়।

মূল শব্দ : সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নারীর কর্মজীবন, নারীস্বাধীনতা।

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে ভারতীয় সমাজসংস্কার আন্দোলনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল নারীর সামাজিক অবস্থার উন্নতিসাধন, যার অন্যতম

গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল নারীশিক্ষার বিস্তার। সেই শিক্ষার প্রাথমিক উদ্দেশ্য ছিল 'সুগৃহিণী' ও 'সুমাতা' রূপে নারীদের প্রস্তুতি। কালক্রমে সেই শিক্ষা নারীর মধ্যে এনে দিয়েছিল আত্মচেতনা। সুদক্ষিণা ঘোষ বলেন—

> 'নানা বাঁক ফেরার মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে একসময় শিক্ষা নারীর আত্মনির্ভরতার হাতিয়ার, আপনাকে জানার প্রয়াসও হয়ে উঠতে শুরু করেছে।'[১]

ক্রমশ নারীরা অনুভব করেছেন যে স্বনির্ভরতার অন্যতম অংশ হল আর্থিক স্বাধীনতা। আর্থিক স্বাধীনতা অর্জনের জন্য নারীরা জীবিকা অর্জনের প্রয়োজনে কর্মক্ষেত্রে যোগদান করেছেন। নারীর স্বাধীন জীবিকা অর্জন বিষয়ে সমাজের প্রাথমিক বিরূপতাসত্ত্বেও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তা বাঙালি সমাজে কিভাবে ধীরে ধীরে মান্যতা পেয়েছে, তার বিধৃত হয়েছে বাঙালি নারী-ঔপন্যাসিকদের কলমে। কিন্তু বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী যুগে নারীদের অভীষ্ট কর্মক্ষেত্র ছিল সীমাবদ্ধ। শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন—

> 'উদারনীতিবাদের পূর্বযুগে ভারতের মধ্যবিত্ত মহিলারা প্রথাগত ও 'নরম' জীবিকা যেমন বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয় বা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাদান কিংবা বড়জোর ব্যাঙ্কের চাকরিতেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যুক্ত ছিলেন।'[২]

কিন্তু ১৯৯১ সালের অর্থনৈতিক উদারীকরণের সঙ্গে সঙ্গে নারীর কর্মক্ষেত্র অনেকটা বিস্তৃত হল। নারীরা তথাকথিত 'নারীসুলভ' পেশার বাইরে আরও নানা কর্মে নিযুক্ত হতে শুরু করলেন। সুদক্ষিণা গুপ্ত বলেছেন—

> 'বিশ্বায়ন পরিষেবা ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বাড়িয়েছে।...এর ফলে এই সমস্ত সংস্থায় মহিলাদের কাজের সুযোগ অনেক বেশি সৃষ্টি হয়েছে।'[৩]

এই অর্থনৈতিক উদারীকরণের কাছাকাছি সময় থেকে সুচিত্রা ভট্টাচার্য কথাসাহিত্যিক হিসাবে জনপ্রিয়তা লাভ করেন, যে প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা শম্পা চৌধুরী বলেছেন—

> 'হয়তো নেহাতই আপতিক কিন্তু একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই যে...অর্থনৈতিক উদারীরকরণ তথা বিশ্বায়ন এবং জনপ্রিয় কথাসাহিত্যিক হিসাবে সুচিত্রা ভট্টাচার্য-র স্বীকৃতি একেবারেই সমসময়ের ঘটনা।...'৯২ সালে শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত *কাঁচের দেওয়াল* উপন্যাসটির অভাবনীয় পাঠকপ্রিয়তাই তাঁকে লেখার ব্যাপারে যথার্থ আগ্রহী করে তোলে...'[৪]

তাই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের রচনায় বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী যুগের শহুরে মধ্যবিত্ত নারীর কর্মজীবনের কিছু পরিচয় পাওয়া গেলেও তাঁর রচনায় বিশ্বায়ন পরবর্তী যুগের শহুরে মধ্যবিত্ত নারীর কর্মজীবনের উপস্থাপনাই বেশি পাওয়া যায়। এই

উপস্থাপনার মধ্যে দিয়ে কর্মরতা নারীর কর্মজীবনের নানা দিক, নারীর কর্মজীবনে পুরুষতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণের প্রভাব এবং নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তার অর্থনৈতিক স্বাধীনতার প্রভাব ঠিক কতখানি, সে বিষয়গুলিও সুচিত্রা ভট্টাচার্য বারবার দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসগুলিতে।

বহু বিচিত্র পেশার মধ্যবিত্ত শহুরে বাঙালি নারীচরিত্র উপস্থাপিত হয়েছেন সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলিতে যার মধ্যে আছেন শিক্ষিকা ও অধ্যাপিকা, সরকারি ও বেসরকারি অফিসে চাকুরিরতা নারী, সাংবাদিক, ডাক্তার, নার্স, অভিনেত্রী, চিত্রশিল্পী, গোয়েন্দা ইত্যাদি। কিন্তু একথা লক্ষণীয় যে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসগুলিতে চিত্রিত বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী যুগের অধিকাংশ মহিলা চরিত্রই শিক্ষাক্ষেত্রে নিযুক্ত। লেখিকার এই উপস্থাপনা যে সমাজসত্যের অনুসারী, তা বোঝা যায় যখন গবেষণায় বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ের নারীদের কর্মসংস্থান বিষয়ে প্রাপ্ত তথ্যের তুলনামূলক আলোচনায় দেখা যায় যুগপৎ বিশ্বায়ন পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে—

> 'অধিকাংশ মহিলারা শিক্ষাগত ক্ষেত্রে নিযুক্ত হন...'[৫]

শিক্ষাক্ষেত্রকে কিভাবে নারীর, এমনকি যেসব নারী শিক্ষাগত ক্ষেত্রে যোগদান করবার জন্য আগ্রহী নন তাঁদেরও, স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র বলে মনে করা হয় তার চিত্রণ দেখা যায় সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে। 'ঠিকানা নেই' উপন্যাসে টিভি চ্যানেলের সাংবাদিক স্বাতীর চাকরি নিয়ে তার স্বামী গৌতম ও তার পরিবারবর্গ আপত্তি করেছে ও বলেছে—

> '...চাকরি ছাড়ো, চাকরি ছাড়ো, একান্তই করতে হলে বাড়ির কাছাকাছি মাস্টারি ফাস্টারি কিছু জুটিয়ে নাও...'[৬]

'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসের চরিত্র অধ্যাপক রাখাল নাথের গলায় শোনা যায়—

> 'পড়ানোর কাজটাই প্রমীলাকুলের আসে ভাল। ঘরে বাইরে সর্বত্রই তো আপনারা দিদিমণি...'[৭]

'দহন' উপন্যাসে সুনীতা সেনগুপ্ত ঝিনুককে বলেন—

> 'বাচ্চাদের পড়ানোর জন্য কেন মেয়েদের প্রেফার করা হয় জানিস? বাচ্চারা যাতে একটা কোমল স্নেহের সান্নিধ্য বড় হয়ে উঠতে পারে। টিচারদের মধ্যে তারা মাকে দেখতে চায়। আই মিন মায়ের মত একজনকে। টেন্ডার। অ্যাফেকশনেট।'[৮]

সুচিত্রা এই উক্তিগুলিতে কেবল ব্যক্তিক নয়, সমগ্র সমাজের স্বরকেই উপস্থাপন করতে চেয়েছেন। সমাজের এই ধারণার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে নিবেদিতা মেনন মনে করেছেন—

> '...this 'feminization' of teaching and nursing because such work is seen as an extension of nurturing work that women do within the home.'[৯]

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে অধিকাংশ নারীচরিত্রের পেশার নির্বাচন যেন সমাজের প্রবণতাকেই প্রতিফলিত করে।

কর্মরতা নারীদের কর্মক্ষেত্রের সঙ্গে সাংসারিক দায়দায়িত্ব সামলানোর চিত্রটিও উঠে এসেছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে। সুদক্ষিণা গুপ্ত বলেছেন—

> 'শহুরে ভারতীয় মহিলাদের পক্ষে জীবিকা অর্জন প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছে তাদের পরিবারের দায়িত্ব নেওয়ার জন্য...বিশ্বায়নের যুগে এর পরিণামস্বরূপ এই মহিলাদের দায়িত্ব দ্বিগুণিত হয়েছে যেহেতু তাদের পরিবার ও কর্মক্ষেত্র দুটি দিকেই লক্ষ রাখতে হয়।'[১০]

আর পরিবার ও কর্মক্ষেত্র, এই দুই দায়িত্বই কিভাবে কর্মরতা নারীদের পালন করতে হয় তা বারবার উঠে আসে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে। 'দহন' উপন্যাসে ঝিনুকের সহকর্মী মাধুরী চাকরি করার সঙ্গে সঙ্গে একাই সংসারের সমস্ত কাজ ও বৃদ্ধা শাশুড়ির সেবা করে কারণ শুচিবায়ুগ্রস্ততার কারণে তার শাশুড়ি বাড়িতে গৃহপরিচারিকা রাখবার অনুমতি দেন না। তাকে দেখে ঝিনুকের মনে হয়েছে—

> 'অন্তহীন পরিশ্রমের পরও কি করে যে সিনেমা দেখার, মেলায় ছোটার উৎসাহ থাকে তার! হয়তো এটাই মাধুরীর সুপ্ত বিদ্রোহ। দমবন্ধ করা খাটুনির বিরুদ্ধে। অবিচারের বিরুদ্ধে!'[১১]

'উড়ো মেঘ' উপন্যাসে দেয়া সারাদিন সংবাদপত্রের অফিসে চাকরি করবার পরও সংসারের প্রয়োজনীয় কেনাকাটার সমস্ত দায়িত্ব তাকে সামলাতে হয়—

> 'সংসারের যাবতীয় বাজারহাট করাটা দেয়ারই কাজ, সৌম্যর সময় কোথায়?...আর ছুটির দিনে তো সে হাফ নবাব। সামনের দোকানে যেতে বললেও এমন বিটকেল বিটকেল বাহানা জোড়ে।'[১২]

'শূণ্য থেকে শূণ্য' উপন্যাসে পুত্রবধূ রিয়াকে সারাদিন চাকরি করার পর সংসারের যাবতীয় দায়িত্ব পালন করতে দেখে বন্দনার মনে হয়েছে—

> 'মেয়েটা দশভূজা হয়ে চাকরি সংসার দুকূল সামলায়। বাজারহাটের দায়িত্বটা পর্যন্ত বাপ্পা চাপিয়ে রেখেছে রিয়ার ঘাড়ে। কী রে যুগ এল, মাছের বাজারে ঘোরাটাও এখন মেয়েদের কাজ!'[১৩]

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে কর্মরতা মেয়েদের সাংসারিক দায়িত্বের ভার কিভাবে একটু একটু করে বেড়েছে, তা ধরা পড়েছে ঔপন্যাসিকের কলমে। আর সুচিত্রা ভট্টাচার্য দেখান, একসঙ্গে সংসার ও কর্মক্ষেত্র, এই দুইয়েরই দায়িত্ব পালন করাটা

কর্মরতা মেয়েদের যেন অবশ্য কর্তব্য তা ভাবতে শেখায় নারীর পারিপার্শ্বিক সমাজ, যার মধ্যে অবশ্যই প্রাধান্য পায় সাংসারিক দায়দায়িত্ব। 'আলোছায়া' উপন্যাসে শরণ্যার ঠাকুমা অন্নপূর্ণা শরণ্যাকে বলেন—

> '...মেয়েমানুষের কি ঘরসংসার অবহেলা করলে চলে? শত কাজের মধ্যেও ফুরসত করে নিতে হয়।...ওরে মেয়েমানুষ বেশি বারমুখো হলে সংসার ভেসে যায়।'[১৪]

বোঝা যায় অন্নপূর্ণার এই বক্তব্যের মূলে আছে সমাজের প্রথাগত ধারণা যে সাংসারিক দায়িত্ব পালনই নারীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য। নিবেদিতা মেনন বলেছেন—

> 'The sexual division of labour ensures that women will always end up having to priortize unpaid domestic work over paid work.'[১৫]

সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসে বারবার দেখান, যখন সাংসারিক দায়দায়িত্বের সঙ্গে নারীর কর্মক্ষেত্রের দ্বন্দ্ব দেখা যায়, তখন সমাজ আশা করে মেয়েটি তার পেশাগত উচ্চাশা ত্যাগ করে সংসারকেই প্রাধান্য দেবে। 'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসে এণাক্ষী পারমিতাকে বলেছে—

> '...এখনও ফ্যামিলি কোড অনুযায়ী মায়েরই তো দায়িত্ব বেশি। ছেলেরা বউ-বাচ্চা ভুলে কাজে ডুবে থাকতে পারে। সেটা তাদের গুণ। আর মেয়েরা তেমনটা করলে তারা হয় সৃষ্টিছাড়া। অতএব কেরিয়ারটা মেয়েদেরই স্যাক্রিফাইস করতে হবে।...আপ্ত বাক্যটা জানিস তো, সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে।'[১৬]

শ্রমবিভাজনের ক্ষেত্রে সমাজের দ্বৈত মানদণ্ডকেই সুচিত্রা ভট্টাচার্য এখানে প্রকাশ করেছেন।

নারীর কর্মজীবন সম্পর্কে পুরুষের ধারণাকেও সুচিত্রা ভট্টাচার্য দেখাতে চেয়েছেন বারবার। 'ফিরে দেখা' উপন্যাসে শ্রীময়ী যখন চাকরি করতে চেয়েছিলেন, তখন চাকরি করবার কারণ জানতে চেয়ে তার স্বামী সোমনাথ বলেছিল—

> 'কেন? তোমার কি ভাতকাপড়ের অভাব হয়েছে?'[১৭]

শুধু 'ভাতকাপড়' নয়, শ্রীময়ীর আকাঙ্ক্ষা ছিল নিজের স্বাধীনতার। কিন্তু এই স্বনির্ভরতার জন্য শ্রীময়ীর চাকরির প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করতে চায়নি সোমনাথ। 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাসে চাকরি চলে যাওয়ার পর অজয় সিনহা রাইকিশোরীকে বলেছে—

> '...মেয়েদের ঠিক কোন না কোন চাকরি জুটে যায়। কিছুদিন বেকার

বসে থাকলেও যায় আসে না।'[১৮]

তখন রাইকিশোরীর রাগ হয়নি, বরং খানিকটা কৌতুকের সঙ্গে সে ভেবেছে যে নারীর কর্মজীবন সম্পর্কে হয়তো এটাই প্রচলিত ধারণা। 'দহন' উপন্যাসে তূণীরের মনে হয়েছে—

> 'মেয়েদের সার্ভিস লাইফ আর ছেলেদের সার্ভিস লাইফ আকাশপাতাল তফাৎ।'[১৯]

তাই তার মায়ের সরকারি চাকরিকে সে 'উলবোনা আর পরনিন্দা পরচর্চার চাকরি!'[২০] বলে মনে করে আর নিজের চাকরিকে সে তার দিদি তনিমার—'কলেজে পড়ানোর চাকরি থেকে অনেক বেশি রেসপন্সেবেল কাজ'[২১] বলে মনে করে। আর দিদির চাকরি সম্পর্কে তার অভিমত—

> 'বুবাই-এর পড়াশোনা দ্যাখ, বিজনদার শরীরস্বাস্থ্যের খবর রাখ, ভালোমন্দ রান্নাবান্না কর আর মাঝে মাঝে কলেজে গিয়ে মাইনেটা তুলে নিয়ে আয়।...ক্লাস তো তোদের না নিলেও চলে।'[২২]

দিদির চাকরি সম্পর্কে তার এই অবমাননাকর মন্তব্য থেকে তার মানসিকতার আভাস পাওয়া যায়। এই মানসিকতা থেকেই সহকর্মী নীলম, যার পেশাগত যোগ্যতা তূণীরের থেকেও বেশি, তার কথা উঠলেই—

> 'তূণীর নীলমের অযোগ্যতার লিস্ট তৈরি করতে শুরু করে।'[২৩]

'গভীর অসুখ' উপন্যাসে অধ্যাপক অভিজিৎ মহিলা সহকর্মীদের দেখে মনে করেছে—

> '...বলতে গেলে সব অধ্যাপিকাই ডবল ইনকাম গ্রুপের মানুষ, এরা তো টিউশনিকে নাক কুঁচকে দেখবেই।'[২৪]

'উড়ো মেঘ' উপন্যাসে শ্রাবণীর সহকর্মী হীরেন প্রায় একই সুরে বলে—

> 'মহিলা এমপ্লয়ি মানে ডবল ইনকাম গ্রুপ।'[২৫]

এবং এই কথার ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন—

> '...তোমরা তো একটু অ্যাডভান্টেজিয়াস অবস্থায় থাকোই। দিব্যি বর সংসার চালিয়ে দিচ্ছে,...মেইন কনট্রিবিউশানটা হাজব্যান্ডেরই। তোমাদের টাকাটায় বাড়তি কিছু হয়।'[২৬]

অর্থাৎ নারীর কর্মদক্ষতাকে পুরুষের থেকে স্বাভাবিকভাবে কম মনে করে ও নারীর কর্মজীবনকে আর্থিক প্রয়োজনীয়তার দিক থেকে বিবেচনা না করে প্রথাগত দৃষ্টি থেকে কিভাবে দেখা হয়, তা সুচিত্রা ভট্টাচার্য বারবার দেখিয়েছেন তাঁর উপন্যাসে।

সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে নারীর কর্মজীবনের প্রসঙ্গে একটি বিষয় বারবার

উঠে আসে। সুচিত্রা ভট্টাচার্য তাঁর উপন্যাসে অনুসন্ধান করতে চান নারীর কর্মজীবনে পুরুষ বা পিতৃতান্ত্রিক অবস্থান থেকে নেওয়া সিদ্ধান্ত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে। এই বিষয়টি বারবার উপস্থাপিত হয়েছে তাঁর বিভিন্ন উপন্যাসে। 'হেমন্তের পাখি' উপন্যাসে অদিতির বন্ধু সুজাতার তর্ক করবার প্রতিভা দেখে ছোটবেলায় তার বন্ধুরা বলত—

> 'সুজাতা বড় হয়ে উকিল না হয়ে যাবে না।'[২৭]

পরবর্তীকালে সুজাতা উকিল হয়ে প্র্যাকটিস শুরু করেছিল। কিন্তু যে স্বামীর সঙ্গে তার আলাপ হয়েছিল আদালতে, বিয়ের পরে তার ও শ্বশুর-শাশুড়ির আপত্তিতে তাকে প্র্যাকটিস ছেড়ে দিতে হয়। এরপর স্বামীর কথাতেই সে চাকরির চেষ্টা করতে থাকে। সুজাতা বলেছে—

> 'বরই বলল, ঘরে চুপচাপ বসে থেকে কি করবে, একটা সাদামাটা সরকারি চাকরির চেষ্টা কর। বয়সটা ছিল, পরীক্ষায় বসলাম, জুটেও গেল। সব দিকে শান্তি।'[২৮]

কিন্তু এই অপছন্দের চাকরি ছাড়বার সিদ্ধান্ত সুজাতা নিজে নিতে পারেনা, কারণ তার উপার্জিত অর্থ সংসার চালানোর কাজে তার স্বামী ব্যবহার করেন।

আবার 'অন্য বসন্ত' উপন্যাসের তন্নিষ্ঠা গৃহবধূ হতে চায়নি, কারণ—

> '...জন্ম থেকে মাকে চাকরি করতে দেখেছে তন্নিষ্ঠা, অচেতনে সেই ছবিটাই মাথায় গাঁথা থাকে সর্বক্ষণ, চাকরি সম্পর্কে উদাসীন হয়ে থাকার কথা তন্নিষ্ঠা ভাবতেই পারে না।'[২৯]

তন্নিষ্ঠা যখন অনেক পরিশ্রমে অধ্যাপনার চাকরির লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ইন্টারভিউ পর্বের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, তখন তার হবু স্বামী শৌনক নতুন চাকরি পায় দিল্লিতে। তন্নিষ্ঠা দিল্লি যেতে চায় না, কারণ গেলে চাকরিটা সে করতে পারবে না। তার আপত্তির কারণ শুনে শৌনক তাকে অবলীলায় বলে—

> 'স্লেট ফ্লেট গুলি মারো...ওখানে তোমার সারাদিন অখণ্ড অবসর, নেট ফেটে লড়ে যেও...আর নেট যদি নাও লাগে কুছ পরোয়া নেই। টুসকি বাজালে দিল্লিতে স্কুলের চাকরি পেয়ে যাবে।...আরে বাবা, আমি তোমাকে টোটাল স্বাধীনতা দিয়ে দেব।'[৩০]

এই 'স্বাধীনতা দিয়ে' দেওয়ার কথা শুনে তন্নিষ্ঠার মনে হয়—

> 'কী উদারচেতা! কত অবলীলায় স্বাধীনতা দান করে দিল ভাবী স্ত্রীকে।'[৩১]

ব্যজস্তুতিতে ভাবা তন্নিষ্ঠার এই ভাবনা যেন তার অনুক্ত বেদনাকেই প্রকাশ করে। এর বিপরীতে আরও একটি কাহিনি তুলে ধরেছেন ঔপন্যাসিক। তন্নিষ্ঠার হবু শাশুড়ি, সমাজসেবার কাজে যুক্ত বীথিকা, তাঁর সম্পর্কে শৌনক জানিয়েছে—

> 'আমার মা একসময় কলেজে চাকরি পেয়েছিল, বাবা অ্যালাও করেনি। বলেছিল ঘর সামলাও, ছেলেটাকে মানুষ করো...'[৩২]

আর এই ঘটনার উল্লেখ করে শৌনক বলেছে—

> '...বিয়ের পরে পরেই তোমার চাকরি নিয়ে সুকুমার রায়চৌধুরী কী রিঅ্যাক্ট করবে প্রেডিক্ট করা কঠিন। তুলনায় দিল্লিতে তোমার টোটাল আজাদি।'[৩৩]

অর্থাৎ ঔপন্যাসিক দেখাতে চেয়েছেন, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে নারীর চাকরি করা সম্পর্কে ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে সামাজিক ও অর্থনৈতিক কারণে। কিন্তু নারীর কর্মজীবন সম্পর্কে পুরুষের সিদ্ধান্তের প্রাধান্য যে কতখানি ও সময়ের সঙ্গে সঙ্গেও তা কতখানি অপরিবর্তিত। শৌনকের বাবা তাঁর স্ত্রীকে চাকরি করবার অনুমতি দেননি, শৌনক তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছে—সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এইটুকু পার্থক্য ঘটেছে। বীথিকার চাকরির ইচ্ছার যেমন কোন গুরুত্ব ছিল না, তন্নিষ্ঠার একটি নির্দিষ্ট চাকরি করবার ইচ্ছাও তেমনই গুরুত্বহীন। অর্থাৎ নারীর ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা যোগ্যতার প্রশ্ন ছাপিয়ে কিভাবে গুরুত্ব পায় পুরুষের মতামতের প্রসঙ্গ, তা ঔপন্যাসিক দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন।

'অন্য বসন্ত' উপন্যাসে তন্নিষ্ঠা যে শৌনকের সঙ্গে তার কর্মক্ষেত্রে যাবে এই বিষয়ে কারও কোন সংশয় ছিল না। 'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র পারমিতার জীবনে চাকরি না চাকরি ছেড়ে তার স্বামীর সঙ্গে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে যাওয়া—কোনটা গুরুত্বপূর্ণ তা নিয়ে যে টানাপোড়েন, তা অবলম্বনে গড়ে উঠেছে এই উপন্যাসের কাহিনি। কলেজের অধ্যাপিকা পারমিতা তার মা-বাবার একমাত্র সন্তান। দায়িত্বপূর্ণ পদে চাকরি করবার পর সংসার, অসুস্থ বাবার দেখাশোনা সমস্ত দায়িত্ব পালন করে চলেছিল সে। কিন্তু কাহিনিতে জটিলতার সৃষ্টি হয়, যখন পারমিতার স্বামী রাজা কর্মসূত্রে বেঙ্গালুরু যাত্রা করে। প্রথমে রাজাই বলেছিল পারমিতা তার সঙ্গে না গেলেও সে কোন আপত্তি করবে না। কিন্তু ক্রমে রাজা ও তার পরিবারের সকলে পরোক্ষভাবে পারমিতাকে জোর করতে থাকে, যেন সে চাকরি ত্যাগ করে স্বামীর কর্মক্ষেত্রে গিয়ে সংসারের দায়িত্ব পালন করে। এমনকি শেষ অবধি যখন পারমিতার একদা কর্মরতা মা তাকে বলেন—

> 'সংসারের প্রয়োজনে মেয়েরা চাকরি করে, আবার সংসার চাইলে চাকরি ছেড়েও দেয়।...নিজের সাধআহ্লাদ মেটাতে সংসারটা ভাসিয়ে দিবি? কেমন বউ তুই? কেমন মা?'[৩৪]

তখন পারমিতা আশ্চর্য হয়ে ভাবে—

> 'একটা নিজস্ব জগৎ খোঁজার আকাঙ্ক্ষা কি তাহলে নিছকই সাধআহ্লাদ? শুধ বউ আর মা হয়ে টিকে থাকাতেই মেয়েদের অস্তিত্ব? পারমিতা নিজে কিছু নয়? হায় রে!'[৩৫]

উপন্যাসের শুরুতে পারমিতা তার গৃহপরিচারিকা সরস্বতীর প্রতিটি সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রে তার স্বামীর প্রভাব দেখে বিস্মিত হয়েছিল। উপন্যাসের শেষে গিয়ে পারমিতা অনুভব করে নিজের জীবন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে তার অবস্থানও সরস্বতীর থেকে কিছু আলাদা নয়। পারমিতা শেষপর্যন্ত কি সিদ্ধান্ত নেয়, তা ঔপন্যাসিক পাঠকের সামনে স্পষ্ট করেন না, কিন্তু এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে পুরুষ বা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সিদ্ধান্ত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে তারই একটি অনুপুঙ্খ চিত্রণ এই উপন্যাসে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন।

'নীল ঘূর্ণি' উপন্যাসে দয়িতা চাকরি করবার কথা ভেবেছিল 'নিজের একটা ভুবন'[৩৬] গড়ে রাখবার জন্য। কিন্তু যখন দয়িতা চাকরি পায় তখন বোধিসত্ত্ব তার 'নিজস্ব জগৎ। নিজের জানলা'[৩৭] খোঁজার উদ্যোগকে নস্যাৎ করে দিয়ে সাংসারিক প্রয়োজনের কথা বলে ও নিজের যুক্তিতে দয়িতার সিদ্ধান্তকে টলাতে না পেরে বলে—

> 'স্বাধীন ভাবে তো অন্য কাজও করতে পারে। যেমন ধরো, ওই যে পপুলার সায়েন্সের বইটা লিখব লিখব করছি তুমি বসে বসে সেটার খসড়া করো। কাজটা তোমার খারাপ লাগবে না।'[৩৮]

তখন দয়িতা অনুভব করে—

> 'অর্থাৎ কিনা তোমার গণ্ডি টেনে দেওয়া ঘরেই আমাকে থাকতে হবে, তাই তো?'[৩৯]

এই 'গণ্ডি' আসলে নারীর কর্মজগৎ বিষয়ে পুরুষের নেওয়া সিদ্ধান্তের প্রভাবের কথাই বলে। এইভাবেই নারীর কর্মজীবনে পুরুষের তথা পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সিদ্ধান্ত কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে, তা সুচিত্রা ভট্টাচার্য দেখাতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে।

কিন্তু এর ব্যতিক্রমও চোখে পড়ে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে। 'আমি রাইকিশোরী' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র রাইকিশোরী স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা নির্যাতিত হয়ে পিতৃগৃহে ফিরে এসেছিল। বিবাহবিচ্ছেদের পর রাইকিশোরী তার দাদার উদ্যোগে কলকাতায় চাকরি করতে যায়। যদিও এতে রাইকিশোরীর মা-বাবার সমর্থন ছিল না। তাঁরা মনে করেছিল—

> 'কী দরকার। রাই তো আর জলে পড়ে নেই। ঈশ্বরের কৃপায় মেয়ে

> যখন ফিরে পেয়েছি তখন আমাদের কাছেই থাক। পড়াশোনা করুক। গানবাজনা করুক। আমাদের চাট্টি জুটলে ওরও জুটে যাবে।'[৪০]

কিন্তু রাইকিশোরীর দাদা বুঝেছিল শুধু অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান নয়, রাইকিশোরীর প্রয়োজন স্বনির্ভরতা, যা তার গুঁড়িয়ে যাওয়া আত্মবিশ্বাসকে ফিরিয়ে আনতে পারে। তাই সকলের মতের বিরুদ্ধে রাইকে জোর করে কলকাতায় চাকরি করতে পাঠিয়েছিল তার দাদা। কিন্তু এতে তার বাড়ির লোকের সমর্থন ছিল না। রাইকিশোরী তার পিসির আনা বিবাহের প্রস্তাব প্রত্যাখান করলে তার পিসি বলেন—

> '...মেয়েদের স্বাধীনভাবে চলতে দিলে এরকমই কথা শুনতে হয়। তখনই বলেছিলাম বাইরে চাকরি করতে পাঠিয়ো না। দাদা কি মেয়েকে খাওয়াতে পারত না?...সবাই মিলে চাইলে মেয়ে নিজের পায়ে দাঁড়াক, দ্যাখো কেমন দাঁড়িয়েছে।'[৪১]

ঘরে-বাইরে এত প্রতিকূলতা, বাধা পেরিয়ে কর্মজীবনের মধ্যে দিয়ে যেতে যেতে রাইকিশোরী অনুধাবন করেছে তার পারিপার্শ্বিক অবস্থাকে, বুঝতে শিখেছে নারীর সামাজিক অবস্থানকে, একা একা কর্মজীবনের নানা সমস্যা পেরিয়ে চলতে চলতে রাইকিশোরী শেষপর্যন্ত নিজের পরিচয়কে, আত্মবিশ্বাসকে খুঁজে পেয়েছে। এইভাবে রাইয়ের আর্থিক স্বনির্ভরতা তার নিজের নতুন পরিচয় খোঁজার সহায়ক হয়ে উঠেছে।

'ফিরে দেখা' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র শ্রীময়ী সংসারের বদ্ধতায় আবদ্ধ না থেকে চাকরি করতে চাইলেও এতে তাঁর স্বামী ও শ্বশুর-শাশুড়ির সমর্থন ছিল না। তাঁদের না জানিয়ে শ্রীময়ী চাকরির আবেদন করে চাকরি পেলে তার স্বামী সোমনাথ শ্রীময়ীর কর্মস্থলে গিয়ে তার উর্দ্ধতন বড়সাহেবকে অপমান করে বলেন—

> 'আমি জানতে চাই কেন আপনারা চাকরি দিয়েছেন আমার স্ত্রীকে?...আমার কনসেন্ট ছাড়া আমার ওয়াইফকে আপনি পয়সা দিয়ে পুষতে পারেন না।'[৪২]

শ্রীময়ী অবশ্য এই অপমান নীরবে মেনে নেননি। বরং স্বামীগৃহ ত্যাগ করে তিনি সন্তান মিতুল সহ ফিরে যান পিতৃগৃহে। পরবর্তীকালে তিনি নিজেকে অধ্যাপিকা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেন ও প্রায় একা হাতে সন্তান মিতুলকে মানুষ করে তোলেন। শ্রীময়ীর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনচেতা মনোভাব তো বটেই, শ্রীময়ীর অর্থনৈতিক স্বাধীনতা তাঁকে একা জীবনের পথ পরিক্রমা করবার সাহস

দিয়েছে।

'অর্ধেক আকাশ' উপন্যাসে পারমিতার বর্ষীয়ান সহকর্মী শর্বরী ও তার স্বামী বিদ্যালয়ে পড়াতেন। কিন্তু স্ত্রী কলেজে অধ্যাপনার চাকরি পাওয়ার স্ত্রীর চাকরি করাতে স্বামী আপত্তি জানান। এরপর শর্বরী কাজের সুবিধার জন্য তাঁর স্বামীকে বাড়ি ছেড়ে তাঁদের কর্মক্ষেত্রের কাছাকাছি বাড়ি ভাড়া করবার কথা বললে স্বামী রাজি হননি, তার কারণ হিসাবে শর্বরীর মনে হয়েছে—

> 'একেই স্কুলটিচারের অধ্যাপিকা বউ, তাতেই মান খোওয়া গেছে। তার ওপর সেই বউয়ের সুবিধার্থেই বাড়ি ছাড়তে হবে?...বুঝলাম, ভীষণভাবে চাইছে আমি যেন কলেজটা ছাড়তে বাধ্য হই...'[৪৩]

কিন্তু শর্বরী আত্মসমর্পণ করেননি। তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যান। চাকরি করেন, মেয়েকে মানুষ করেন। পরে স্বামী বহুবার সাধ্যসাধনা করলেও তিনি আর বাড়ি ফিরে যাননি। পারমিতা যখন তাঁকে প্রশ্ন করেন এই 'জেদ' করে তিনি কী পেলেন সে কথার উত্তরে শর্বরী বলেন—

> 'মেটিরিয়ালি দেখতে গেলে কিছুই না। তবে হ্যাঁ, জীবনটা তো নিজের টার্মসে কাটাতে পেরেছি। একটা মেয়ের পক্ষে এই পারাটা কি একটা অ্যাচিভমেন্ট নয়?'[৪৪]

তাই সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় তাঁর উপন্যাসে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা কখনও নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার সহায়ক হয়েছে, আবার কখনও তা হয়নি। আসলে সুচিত্রা ভট্টাচার্য যে নারীর অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতাকেই তার ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একমাত্র উপকরণ বলে মনে করেননি। 'দহন' উপন্যাসে মৃণালিনী বলেন—

> 'এটা বুঝিস না, ছেলেরা যতটা ছাড়বে ঠিক ততটাই জমি পাবি তোরা?...ছেলেরা একা সংসার চালাতে পারছিল না কিংবা বলা যায়, সংসারের প্রয়োজন হল, তাই তোরা চাকরি করতে বেরোলি।...আর সেটাকেই তোরা স্বাধীনতা ভেবে ছাগলছানার মতো লাফাচ্ছিস। এটা স্বাধীনতা নয় রে দিদি, স্বাধীনতার মরীচিকা। স্বাধীনতা হল মনের অনুভূতি।'[৪৫]

এই বক্তব্যকে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের নিজের বক্তব্যের সঙ্গে মিলিয়ে নেওয়া যায়। সুচিত্রা ভট্টাচার্য বলেছেন—

> 'মেয়েরা যতই নিজেদের আপ-টু-ডেট ভাবুক, শিক্ষিত মনে করুক, বাইরের জগতে গিয়ে সেল্ফ-ডিপেনডেন্ট হোক, সমাজে তাদের

জায়গাটা খুব একটা স্পষ্ট নয়। কারণ, আমাদের ভাবনাচিন্তা, অবস্থান পুরোটাই ভীষণ ঘোলাটে।'[৪৬]

তিনি আরও বলেছেন—

'একজন সম্পূর্ণ মানুষ হিসেবে অন্তরে মানবিকতাবোধকে উদ্দীপিত করার নামই মুক্তি।...এই মুক্তিতেই আসবে প্রকৃত স্বাধীনতা।'[৪৭]

অর্থাৎ সুচিত্রা ভট্টাচার্য মনে করেছেন, কেবল অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতার একমাত্র মাপকাঠি নয়। তাঁর নানা উপন্যাসে নারীর কর্মজীবন বিষয়ে আলোচনার সূত্রে এই ধারণা কাহিনি ও চরিত্র চিত্রণের মাধ্যমে পরিস্ফুট হয়েছে।

আশাপূর্ণা দেবীর 'সুবর্ণলতা' উপন্যাসে সুবর্ণলতা ভেবেছিল—

'...সমস্ত মেয়েমানুষ জাতটাই একটা অপমানের পঙ্ককুণ্ডে পড়ে ছটফটাচ্ছে।...কারণ? কারণ তারা রোজগার করে না, অপরের ভাত খায়। হ্যাঁ, এই একমাত্র কারণ।'[৪৮]

আর অনেকটা সময় পেরিয়ে এসে যখন নারী অর্থনৈতিক ভাবে স্বনির্ভর হয়েছে, তখন সুচিত্রা ভট্টাচার্য দেখাতে চেয়েছেন কেবল আর্থিক স্বনির্ভরতাই নারীর ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পারে না, নারীর সামগ্রিক স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পারে নারীর নিজের সচেতনতা। এইভাবে শহুরে মধ্যবিত্ত বাঙালী নারীর কর্মজীবনের নানা দিক ও সে বিষয়ে ধারণা প্রকাশিত হয়েছে সুচিত্রা ভট্টাচার্যের উপন্যাসে।

তথ্যসূত্র :

১। সুদক্ষিণা ঘোষ, মেয়েদের উপন্যাসে মেয়েদের কথা 'কাহাকে' থেকে 'সুবর্ণলতা', কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১০৩

২। শর্মিষ্ঠা বন্দ্যোপাধ্যায়, বিশ্বায়ন ও শহরবাসী ভারতীয় নারীর কর্ম ও জীবিকা, সুদক্ষিণা গুপ্ত (সম্পা.), বিশ্বায়ন ও শহরবাসী ভারতীয় নারী, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৭৯

৩। সুদক্ষিণা গুপ্ত, বিশ্বায়ন: কিছু কথা, সুদক্ষিণা গুপ্ত (সম্পা.), বিশ্বায়ন ও শহরবাসী ভারতীয় নারী, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৪১

৪। শম্পা চৌধুরী, ৯০-এর মধ্যবিত্ত ও বাংলা উপন্যাসের কয়েকটি প্রবণতা, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা ২০১৮-২০১৯ (বাংলা বিভাগ) যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, সম্পাদক-শেখর সমাদ্দার, অক্টোবর ২০১৮, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, দ্বাবিংশতি সংখ্যা, ২০১৮-২০১৯, পৃষ্ঠা : ১২৯

৫। সুদক্ষিণা গুপ্ত, বিশ্বায়ন: কিছু কথা, সুদক্ষিণা গুপ্ত (সম্পা.), বিশ্বায়ন ও শহরবাসী ভারতীয় নারী, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৪৮

৬। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ঠিকানা নেই, কলকাতা, সাহিত্যম, ২০১২, পৃষ্ঠা : ৯৮
৭। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অর্ধেক আকাশ, কলকাতা,আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃষ্ঠা :৮৪
৮। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ১০৩
৯। Menon Nivedita,Seeing Like A Feminist, Gurgaon, Penguin Random House India Pvt.Ltd., 2012, Page-12
১০। সুদক্ষিণা গুপ্ত, বিশ্বায়ন: কিছু কথা, সুদক্ষিণা গুপ্ত (সম্পা.), বিশ্বায়ন ও শহরবাসী ভারতীয় নারী, কলকাতা, অনুষ্টুপ, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৩৯
১১। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ৩৭
১২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, উড়ো মেঘ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, উড়ো মেঘ অলীক সুখ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃষ্ঠা : ১২১
১৩। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, শূণ্য থেকে শূণ্য, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, একের মধ্যে অনেক, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০১৩, পৃষ্ঠা : ৩১
১৪। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আলোছায়া, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, উপন্যাসসমগ্র ৪,কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৯, পৃষ্ঠা : ৪৩৮
১৫। Menon Nivedita,Seeing Like A Feminist, Gurgaon, Penguin Random House India Pvt.Ltd., 2012, Page-12
১৬। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অর্ধেক আকাশ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃষ্ঠা : ১০৩
১৭। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ফিরে দেখা, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ৩৬৭
১৮। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আমি রাইকিশোরী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ৭৯
১৯। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ১২০
২০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১২০
২১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১২০
২২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১২০
২৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৭২
২৪। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, গভীর অসুখ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ২৮৮
২৫। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, উড়ো মেঘ, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, উড়ো মেঘ অলীক সুখ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০২, পৃষ্ঠা : ১৭০
২৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭০
২৭। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, হেমন্তের পাখি, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ৪৪৫
২৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪৪৬
২৯। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অন্য বসন্ত, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০০, পৃষ্ঠা : ৫৩
৩০। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০১-১০২
৩১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০২

৩২। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০২
৩৩। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১০২
৩৪। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অর্ধেক আকাশ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ১৬৬-১৬৭
৩৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৬৭
৩৬। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নীল ঘূর্ণি, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ১৪১
৩৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৫৪
৩৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৫৫
৩৯। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৫৫
৪০। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, আমি রাইকিশোরী, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ৩০
৪১। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৬১
৪২। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ফিরে দেখা, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দশটি উপন্যাস, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০০১, পৃষ্ঠা : ৩৭১
৪৩। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, অর্ধেক আকাশ, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১২, পৃষ্ঠা : ১২৪-১২৫
৪৪। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১২৬
৪৫। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, দহন, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা : ১৬৬
৪৬। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, ছেলে-মেয়েতে বিভেদ মেয়েরাই তৈরি করে, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বর্ণময়, কলকাতা, লালমাটি, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ১৬৮
৪৭। সুচিত্রা ভট্টাচার্য, মেয়েদের অচেতনতা, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, বর্ণময়, কলকাতা, লালমাটি, ২০১৬, পৃষ্ঠা : ৩৬৪
৪৮। আশাপূর্ণা দেবী, সুবর্ণলতা, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ১৯৬৭, পৃষ্ঠা : ৪১৬-৪১৭

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ. ডি. গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও—প্রসঙ্গ বোয়ালের নাট্য-ভাবধারা

নীলাঞ্জন হালদার

সারসংক্ষেপ :

ব্রাজিলিয়ান শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরি এবং নাট্যকার অগাস্তো বোয়াল মার্ক্সিয় চেতনায় বিশ্বাসী হয়ে উঠে ভেবেছিলেন এমন একটি সমাজব্যবস্থার যেখানে শিক্ষা এবং সংস্কৃতি চর্চা হবে একটি পারস্পরিক আদানপ্রদানের বিষয়। ল্যাটিন আমেরিকার বঞ্চিত শোষিত মানুষের তথা সামগ্রিক বিশ্বের লাঞ্ছিত মানবাত্মার মুক্তিকামী এই প্রয়াসকে যুগে যুগেই বিভিন্ন দেশের বরেণ্য মুক্তচিন্তকেরা সাধুবাদ জানিয়েছেন এবং সহমত পোষণ করেছেন। আমাদের দেশীয় তার্কিক শিখনপ্রণীলাতেও এই চর্চার বীজ রয়েছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও এই কথাটিকেই তাঁর বিভিন্ন প্রবন্ধে বক্তৃতায় নানাভাবে বলেছেন। 'শিক্ষা-সংস্কৃতি'র জরোদ্গাব অবস্থানটিকে ভেঙে সঠিক এবং সার্বিক মুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে গেলে প্রয়োজন আমাদের শিকড়ের দিকে ফিরে তাকানোর, প্রয়োজন আমাদের লৌকিক প্রবাদ-প্রবচনগুলির দিকে বিশ্লেষণী অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে দেখার, প্রয়োজন বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটটিকে মাথায় রেখে বোয়াল-ফ্রেইরি-রবীন্দ্রনাথ সহ আরো বরেণ্য মানুষের মৌলিক চিন্তাগুলিকে ছুঁয়ে দেখার।

সূচক শব্দ : শিক্ষা, অগাস্তো, বোয়াল, পাওলো ফ্রেইরি, নাটক, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সময়টা ১৯৬১ পরবর্তী। ব্রাজিলের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতি উত্তপ্ত। ব্রাজিলের এরিনা থিয়েটার অফ সাওপালোর (Teatro de Arena) তৎকালীন ডিরেক্টর (১৯৫৬-৭১) অগাস্তো বোয়াল (Augusto Boal, 1931-2009) দায়িত্বভার নেওয়ার পর থেকেই দর্শকের আরো কতটা কাছাকাছি পৌঁছানো যায় সেই নিয়ে গভীর পরীক্ষায় মগ্ন। John Steinbeck-এর (১৯০২-১৯৬৮) অফ মাইনস এন্ড মেন্ (Ratos y Meno ১৯৫৬) করার পরে জুম্বি (*Arena tells of Zumbi* ১৯৬৪) তার্তুফ (*Tartuffe* ১৯৬৫) দ্য ম্যানড্রেক (*The Mandragora* ১৯৬৬) সাওপাওলো ফেয়ার অফ ওপিনিয়ন (*First Sao Paulo Fair of Opinion* ১৯৬৮) প্রভৃতি নাটকগুলি করে ফেলেছেন। এই সময় ১৯৬৮ সাল নাগাদ ব্রাজিলিয়ান মার্ক্সিস্ট শিক্ষাবিদ পাওলো ফ্রেইরির (১৯২১-১৯৯৭) Pedagogy of the Oppressed ১৯৬৮) গ্রন্থটি বোয়ালের ভাবনাপ্রণালীতে এক উদ্দাম ঝড়ের সূত্রপাত ঘটায়। ব্রাজিলিয়ান ওয়ার্কার্স পার্টি-র (*Partido*

dos Trabalhadores) সমর্থনে তিনি গ্রাম গ্রামান্তরে তখন বিপ্লবী চিন্তাধারা ছড়িয়ে দেওয়ার কাজটি করে চলেছেন একনিষ্ঠভাবে। জার্মান নাট্যকার Bertolt Brecht-এর (১৯৯৮-১৯৫৬) চিন্তাধারা থেকে পুষ্ট তাঁর তৎকালীন এই কর্মকাণ্ড। Power, Resistence and Conflict in the Contemporary Wrold : Social Movements, Networks and Hierarchies (Routledge, 2009) বইয়ের এক্টিভিস্ট লেখক, রাজনৈতি বিশ্লেষক Andy McLaverty-Robinson তার CEASEFIRE ম্যাগাজিনের প্রবন্ধে (Tuesday, August 30, 2016) বোয়ালের ব্রেখট-প্রীতি সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন "Boal suggest that his approach is inspired partly by Bertolt Brecht. He sees this German Marxist playwright as the first to break with classical Aristotelian conventions. Brecht used a style of theatre which sought to raise worker's consciousness, sometimes called agitprop or agitation propaganda theatre."[১]

বোয়াল এরকমই একটি অ্যাজিট-প্রপ থিয়েটার করাকালীন ব্রাজিলের উত্তর-পূর্ব সীমান্তে এক প্রত্যন্ত গ্রামের চাষি ভার্জিলিও নাটকের শেষে নাটকের বার্তায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এসে বোয়াল-সহ সমস্ত কুশীলবকে বন্দুক হাতে তুলে নিয়ে শ্রেণিশত্রু এক জোতদারের বাড়ি আক্রমণ করার আহ্বান জানান। বোয়াল তাঁর The Rainbow of Desire : The Boal Method of Theatre and therapy (১৯৯৫) বইয়ে ঘটনাটি এভাবে জানাচ্ছেন (ঘটনাটি হুবহু ওনার বই থেকে উদ্ধৃত করা হল)—

'So, one fine day, were performing one of these splendid musical plays for and audience of peasants in a small village in the north-east and we sang the heroic text 'Let us spill our blood'. At the end of the show a huge peasant, a great big strapping colossus man,came up to us, on the verge of tears :

'Here's a fine thing–people like you, young people, town people, who think exactly like us. We're right with you, we also think we must give blood for our land'.[২]

গর্বিত আনন্দিত বোয়াল এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা এই উৎসাহী দর্শকের কথায় আরো আনন্দিত হলেন এবং তখনই এই দর্শকটি তাঁদের বোয়ালের দুপুরের খাবার একসাথে খেয়ে তারা যেন তাঁদের এক বিপন্ন কমরেডকে উদ্ধার করতে বন্দুক নিয়ে এগিয়ে আসেন অর্থাৎ একেবারে সাক্ষাৎ বিপ্লবের লড়াইয়ের আহ্বান! বোয়াল বুঝিয়েসুঝিয়ে নিরস্ত করার জন্য বললেন তাঁদের এই বন্দুকগুলি সব নাটকের প্রপ্স—এগুলি নকল বন্দুক। আগত দর্শকটি তখন বললেন "OK, since

the guns are fakes, lets chuck them. But you people aren't fakes, you're genuine, I saw you singing about how blood must be spilt, I was there. You are geniune, so come with us, we have guns enough for everyone".[৩]

বোয়াল এবং তাঁর সঙ্গীসাথীরা ততক্ষণে এই অত্যুৎসাহী সরলমতি দর্শকের সামনে একেবারে ল্যাজেগোবরে অবস্থায়, তারা তাকে বোঝাতে চাইলেন নাটকের প্রয়োজনে দর্শককে উদ্বুদ্ধ করার জন্যই তারা রক্ত ঝরাবার মতো সেইসব বৈপ্লবিক স্লোগান দিয়েছিলেন।

দর্শকটি জিজ্ঞাসা করলেন, "So, when you true artist talk of the blood that must be spilt, this blood you sing about spiling–it's our blood you mean, not yours, isn't that so?"[৪]

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বোয়াল উত্তরে বলেছেন "We are true to the cause, absolutely, but we are true artists not true peasants! Virgilio, come back, let's talk about it...Come back".[৫]

তারপর বোয়াল আর কোনোদিন ভার্জিলিওকে দেখতে পাননি তবে এই ঘটনা তাঁর বোধের অন্দরে ভীষণভাবে ধাক্কা দিয়েছিল। বোয়াল জানাচ্ছেন এই সময়েই Che Guevera-র (১৯২৮-১৯৬৭) একটি অসাধারণ উক্তির কথা 'Solidarity means running the same risk'[৬]। পাওলো ফ্রেইরিও তাঁর বইয়ে প্রায় একই অর্থের একটি কথা বলেছেন 'সংহতি' (solidarity) দাবী করে প্রকৃত সংযোগ (ture communication)'।[৭] অ্যাজিট-প্রপ নাটকের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে এই সময়েই বোয়াল সচেতন হন এবং তিনি এরপর থেকে আর কোনো নাটক লেখেননি বা চর্চা করেননি যাতে দর্শকদের প্রতি আর কোনোরকম বার্তা বা কর্তব্য চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে। বোয়াল এ বিষয়ে জানাচ্ছেন "Agit-prop is fine, what was not fine was that we were incapable of following our own advice. We white men from the big city, there was very little we could teach black women of the country..."[৮] ব্রেখটিয়ান থিয়েটারের মূল বৈশিষ্ট্য হিসেবে আমরা দেখতে পাই তাঁর নাটকের চরিত্রগুলি অর্থ-সামাজিক দিক থেকে এতটাই প্রভাবিত যে তারা একক মানুষ হয়ে উঠতে সক্ষম হয় না কখনোই ফলে দেখা যায় একজন ধনী বড়োলোক শ্রেণির মানুষ সর্বদাই তাঁর নাটকের কোনো বুর্জোয়া অত্যাচারীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। চরিত্রগুলির মানবিক যে গুণাবলী সেগুলিকে সর্বদাই ছাপিয়ে প্রকট হয় চরিত্র সৃষ্টিকারী নাটককারের অন্তরমানসে প্রতিষ্ঠিত তাঁর নিজস্ব ভাবনা। অর্থাৎ ব্যক্তি ব্রেখটের মননে যেভাবে একজনকে ধরা থাকে সেই দৃষ্টিরই ছাপ পড়ে নাটককার ব্রেখট

সৃষ্ট চরিত্রে, অতএব এখানে ব্যক্তি ব্রেখটের মননটিকে আমরা যদি পাওলো ফ্রেইরির ভাষায় আমানতে গচ্ছিত একটি ব্যাংক হিসেবে ধরে নিই তবে সেই আমানতের সুদ হিসেবে আমরা পাবো এমন একটি চরিত্র যিনি ওই আমানতেরই স্বভাব বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন ফসল। এখানে সার্বিক মানবিক গুণাবলীকে অস্বীকার করা হচ্ছে অর্থাৎ একজন মানুষ যে সম্পূর্ণ আলাদারকম সেই মৌলিকত্ব আর বজায় থাকছে না ফলে সেই চরিত্রের অগ্রগতিকেও নিয়ন্ত্রণ করছে মৌলিকত্বহীন সেই নাটককারের মন মানসিকতা। বোয়াল ঠিক এই জায়গাটিকেই অস্বীকার করতে চেয়েছেন।

শ্রীলঙ্কান ফোরাম থিয়েটার গবেষক-প্রাবন্ধিক তমন্না মহম্মদ তার প্রবন্ধে (The Joker system of Augusto Boal) এই বিষয়ে লিখছেন "While Boal praises Brecht's approach, he also tries to move beyond it. Boal's main criticism of Brecht is that the division between actor and spectator is still in place. The actor or director is still in a position of telling a story to a passive audience, even if the story reflects what the director takes to be reality. This means that there is still only one of thinking allowed to the spectator. The spectator no longer delegets power to think but still delegets power to act. The finished worldview is that of the enlightened vanguard. For Boal, this keeps the spectator alienated".[৯]

অর্থাৎ ব্রেখটিয়ান নাটকে সমস্ত ক্ষমতাই কুক্ষিগত হয়ে থাকছে ডিরেক্টরেরই হাতে যেখানে অভিনেতা তার হাতের পুতুল মাত্র; সে কেবল দর্শকদের শেখাতে চাইছে নিজেরই শেখানো বুলি যা কিনা ডিরেক্টর নিজের পছন্দমতো অভিনেতাকে শিখিয়ে দিতে সক্ষম। অ্যারিস্টটলিয়ান ক্যাথার্সিস থেকে বেরিয়ে এসে দর্শক হয়তো একটা intellectual disturbance-এর মধ্যে পড়েন তবে এখানেও কিন্তু দর্শককে ডিরেক্টর চাইলেই নিজস্ব পছন্দমতো পথেই পরিচালিত করতে পারে যা একইসাথে বৃহত্তর সমাজের পক্ষে যেমন বিপজ্জনক তেমনি সমাজের একক হিসেবে একজন মানুষের সৃজনীশক্তির প্রতি অবিশ্বাসের মাধ্যমে তার প্রতি অমর্যাদাকর এক পরিস্থিতি। ফ্রেইরি এই অবস্থাটিকে বলছেন *ব্যাঙ্কিং-শিক্ষা ব্যবস্থা* এবং এর ফলে সমস্ত প্রচেষ্টাটিই একটি বিচ্ছিন্নতা-সৃষ্টিকারী নিছক বাগাড়ম্বরে পর্যবসিত হয়। শিক্ষার ব্যাঙ্কিং তত্ত্বে জ্ঞান হল একটি উপহার, যারা নিজেদের জ্ঞানী বলে মনে করেন তারা যাদের মূর্খ বলে ধরে নেন তাঁদের ওপর এই 'জ্ঞান' বর্ষণ করেন। শিক্ষা এইভাবেই একটি গচ্ছিত রাখার মতো আমানতে পরিণত হয়। এতে একপক্ষ হয় আমানতকারী এবং একপক্ষ নিষ্প্রাণ ভাণ্ডার।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'শিক্ষা সমস্যা' প্রবন্ধে বলেছেন—"ইস্কুল বলিতে আমরা যাহা বুঝি সে একটা শিক্ষা দিবার কল। মাস্টার এই কারখানার একটা অংশ। সাড়ে দশটার সময় ঘণ্টা বাজাইয়া কারখানা খোলে। কল চলিতে আরম্ভ হয়, মাস্টারেরও মুখ চলিতে থাকে। চারটার সময় কারখানা বন্ধ হয়, মাস্টার-কলও তখন মুখ বন্ধ করেন, ছাত্ররা দুই-চার পাত কলে ছাঁটা বিদ্যা লইয়া বাড়ি ফেরে। তার পর পরীক্ষার সময় এই বিদ্যাই যাচাই হইয়া তাহার উপরে মার্কা পড়িয়া যায়। কলের একটা সুবিধা, ঠিক মাপে ঠিক ফরমাশ-দেওয়া জিনিসটা পাওয়া যায়—এক কলের সঙ্গে আর-এক কলের উৎপন্ন সামগ্রীর বড়ো-একটা তফাৎ থাকে না, মার্কা দিবার সুবিধা হয়। কিন্তু এক মানুষের সঙ্গে আর-এক মানুষের অনেক তফাৎ। এমন-কি, একই মানুষের একদিনের সঙ্গে আর-একদিনের ইতর-বিশেষ ঘটে। তবু মানুষের কাছ হইতে মানুষ যাহা পায় কলের কাছে হইতে তাহা পাইতে পারে না। কল সম্মুখে উপস্থিত করে কিন্তু দান করে না—তাহা তেল দিতে পারে কিন্তু আলো জ্বালাইবার সাধ্য তাহার নাই।"[১০]

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যা বললেন রূপকের আড়ালে, ফ্রেইরি তা-ই বলতে চাইলেন দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আর বোয়াল সেই বক্তব্যটিকেই হাতেকলমে কাজে লাগাতে চাইলেন। কিন্তু তখনও সঠিক উপায়টি তিনি হাতড়ে বেড়াচ্ছেন। ১৯৭৩ সালে হুয়ান ভেলাস্কো আলভারাদোর (১৯১০-১৯৭৭, পেরুর রাষ্ট্রপতি ১৯৬৮-৭৫) পেরুভিয়ান সরকারের আয়োজনে পাওলো ফ্রেইরি শিক্ষানীতি দ্বারা উদ্বুদ্ধ একটি জাতীয় শিক্ষা কর্মশালায় (ALFIN-Operciòn Alfabetisaciòn Integral) বোয়াল যোগ দেন। পেরুর বিভিন্ন প্রদেশের বিভিন্ন মানুষের ভাষাবৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে বোয়াল শরীরভিত্তিক কিছু গেমসের আশ্রয় নেন এবং কর্মশালায় আগত শিক্ষার্থীদের নিয়ে একটি নাটকের নির্মাণ করেন। এরকমই একটি নাটকের প্রদর্শনী চলাকালীন একজন মহিলা বোয়ালের কাছে জানতে চান নাটকের প্রোটাগনিস্টের সেই নাটকের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সেই মুহূর্তে কেন নাটকে দেখানো কাজটিই করণীয়? অন্য কিছু কেন নয়? মহিলাটির থেকে উপদেশ নিয়ে যতবারই বোয়াল নির্দেশিত পথে অভিনেতারা অভিনয় করে দেখাতে লাগলেন ততবারই মহিলাটি হতাশ এবং বিরক্ত হলেন। শেষ পর্যন্ত বোয়াল একপ্রকার হতোদ্যম হয়েই মহিলাটিকে স্টেজে এসে প্রোটাগনিস্টের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে বলেন। বিংশ শতাব্দীর বিশ্বনাট্য গ্রন্থে রথীন চক্রবর্তী এই সম্পর্কে লিখছেন,সহসা (মহিলার প্রতিক্রিয়া জানানোর পরেই) উল্লাসে ফেটে পড়েন বোয়াল, ঘোষণা করেন, এই মঞ্চে এই মুহূর্তে স্পেক্টেটরের ভিতর থেকে জন্ম নিল স্পেক্টএক্টর (Spect-actor)। এরপর থেকেই বোয়াল তাঁর প্রতিটি নাট্য প্রদর্শনীর পরে দর্শককে

আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মঞ্চে এবং আবিষ্কার করেছেন নানাবিধ বৈচিত্র্যময় দর্শক মনন যেখানে প্রথাগত ইমেজের পরিবর্তন ঘটিয়ে সাধারণ দর্শক পারছেন বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান ঘটাতে। তাঁর কাছে এই মঞ্চে উঠে আসা নানা মতামত আসলে সমাজ পরিবর্তনের মহড়া এবং এখানে এই সমাজের পরিবর্তন ঘটানোর উপায়গুলি ব্যাঙ্কিং শিক্ষাব্যবস্থার দাসানুদাস হয়ে কেবলমাত্র অনুকরণভিত্তিক নয় বরং তা হলো সৃজনাত্মক এক উপায়। ব্যাঙ্কিং-শিক্ষাব্যবস্থাভিত্তিক উপায়ে মনে করা হয় মানুষ হলো এমন এক সত্তা, যাকে উপযোগী করে তোলা যায় এবং বাগ মানানো যায়। এখানে শিক্ষার্থী হিসেবে যাদের মনে করা হচ্ছে সেইসমস্ত গৌণ-প্রাণেরা তাঁদের উপর বর্ষিত জ্ঞানকে যত বেশি করে নিজেদের মস্তিষ্কে আমানত হিসেবে ধারণ করার জায়গা দিতে থাকবে, তাঁদের নিজস্ব চিন্তাভাবনার ভিতর থেকে উঠে আসা চেতনা স্বাভাবিক প্রতিবর্ত ক্রিয়ার ততবেশি কোণঠাসা হয়ে পড়বে যাকে ফ্রেইরি নাম দিয়েছেন *parrotting*। Frantz Fanon-এর (১৯২৫-১৯৬১)Wretched of the Earth (১৯৬১) বইয়ের preface অংশে Jean-Paul Sartre (১৯০৫-১৯৮০) এই ব্যাঙ্কিং-কলোনিয়ালিস্টিক-মাইন্ডসেট ভিত্তিক শিক্ষার বর্বর রূপটির সম্পর্কে লিখছেন—'the European elite undertook to manufacture a native elite. They picked out promising adolescents; they branded them, as with a rod-hot-iron, with the principles of western culture; they stuffed their mouths full with high-sounding phrases, grand glutinous words that stuck to the teeth. After a short stay in the mother country they were sent home, white washed. These walking lies had nothing left to say to their brothers; they only echoed.'[১১]

বোয়াল এই ধরনের চর্বিত-চর্বণভিত্তিক নাট্যচর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন না, তাই তিনি গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এমন এক উপায় যেখানে পারস্পরিক বিনিময়ের মাধ্যমে একে-অপরকে আরও সম্পৃক্ত করে তোলার দিকে নিয়ে যাওয়া যায় এবং এই বৌদ্ধিকভাবে সম্পৃক্ত হয়ে চলাকে সীমাবদ্ধতার বাধা যাবে না কোনোদিনই। বোয়াল এই পারস্পরিক শিখনপ্রণালী সম্পর্কে বলছেন—"I began to use a new form of theatre, which I named simultaneous dramaturgy. Simultaneous dramaturgy consisted of this: we would present a play that chronicled a problem to which we wanted to find a solution. The play would run its course up to the moment of crisis–the crucial point at which the protagonist had to make a decision. At this point, we should stop performing and ask the

audience what the protagonist should do. Everyone would make their own suggestions. And on stage the performers would improvise each of these suggestions, till all had been exahusted. This was already in progress. We were no longer giving advice, we were learning together."[১২]

বোয়াল বা ফ্রেইরি বা সার্ত্র বা রবীন্দ্রনাথ যে সমস্ত কথাগুলি বলেছেন সেইসব নিয়ে আমরা এই প্রবন্ধে খানিক আলোচনা করলাম কিন্তু এই আলোচিত বিষয়ের নির্যাস কিন্তু আমাদের দেশীয় লৌকিক শিক্ষার মধ্যেই রয়েছে। এক্ষেত্রে একটি গল্পের শরণ নেওয়া যাক, প্রসঙ্গত গল্পটি মহানবী হজরত মহম্মদ এবং রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব-সহ বিভিন্ন সামাজিক-গুরুজনের নামেই প্রচলিত আছে যার মূলকথাটি এইরকম—একটি প্রচণ্ড মিষ্টান্নলোভী বালককে মিষ্টি সম্পর্কে উপদেশ দেওয়ার জন্য গুরুদেব/মহানবী স্বয়ং দুই সপ্তাহের চেষ্টায় মিষ্টির লোভ পরিত্যাগ করে তবে সেই বালককে অতিরিক্ত মিষ্টি খাওয়া সম্পর্কে সচেতনাতমূলক উপদেশ দেন। অর্থাৎ আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাও! সুতরাং দেখা যাচ্ছে আমাদেরই প্রচলিত কোনো গল্প উপকথা ঢুঁড়ে দেখলেই আমরা খুঁজে পেতে পারি স্বাবলম্বীভাবে শিক্ষা-সংস্কৃতিচর্চার উপযুক্ত ব্যবস্থা কিন্তু সেই পথ অবলম্বন না করে আমরা ক্রমশ উপনিবেশবাদী এক চক্রবৃদ্ধিহারের ফাঁদে পা দিয়ে চলেছি। একজন নিপীড়িতকে যত বেশি করে নিপীড়ক একটি পরিবেশের সাথে খাপ খাইয়ে নিতে শেখানো যাবে ততই তাকে বিশ্বাস করানো সহজতর হয়ে উঠবে যে এই পরিস্থিতির জন্য সে-ই দায়ী এবং তাকে দৈব ইত্যাদির প্রতিও বিশ্বাস করতে শেখানো যাবে। পরবর্তীকালে নিপীড়িক প্রভুটিই সেই দৈবের আসনটি দখল করে সম্পূর্ণ অধীনস্থ করে নেবেন নিপীড়িত সমাজটিকে, আর এ ভাবেই সৃষ্টি হয় উপনিবেশ। এই উপনিবেশ আর্থিক নয় বরং সাংস্কৃতিক প্রভুত্ব করা আরো বেশি সহজ কারণ মানুষের বোধ এবং চিন্তাশক্তিই তাঁর যাবতীয় চাহিদার উৎসমুখ। Simone de Beauvoir (১৯০৮-১৯৮৬) তাঁর *La pensée de droite, aujord'hui*-তে এ বিষয়ে বলছেন যে, পরিস্থিতি নিপীড়িতদের পীড়ন করে প্রকৃতপক্ষে তাকে বদলে না দিয়ে তাদের (অর্থাৎ নিপীড়িতদের) চিন্তা চেতনাকেই বদলে দেওয়ার মধ্যেই নিপীড়কের স্বার্থ লুকিয়ে থাকে। এই লক্ষ্যে পৌঁছতে, নিপীড়কেরা একটি 'সদাশয় অভিভাবকসুলভ সামাজিক সক্রিয়তা'-র ভঙ্গিমার সঙ্গে শিক্ষার ব্যাঙ্কিং তত্ত্বকে ব্যবহার করে। আর এই প্রক্রিয়ার মাঝখানে নিপীড়িতেরা রূঢ়, অপ্রিয় উক্তির পরিবর্তে তথাকথিত একটি কোমল বিশেষণে ভূষিত হয়; হিতপ্রাপক বা welfare reciepients। তাদেরকে সমাজ বিচ্ছিন্ন একক হিসেবে ধরে নেওয়া হয়, এইসব ব্যাঙ্কিং-শিক্ষায় শিক্ষিত ঔপনিবেশিক

প্রভুদের ভাষায় কুঁড়ে অক্ষম অকর্মণ্য মানুষদের অভিভাবকসম পদে আসীন হয়ে নিজস্ব পছন্দের কাঠামো অনুযায়ী 'দাগিয়ে দেওয়া' হয়। ব্রেখট এই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলেছিলেন (ক্যাথারসিসের আবহে ভেসে যেতে না দিয়ে বরং দর্শককে এলিয়েনেট করে) কিন্তু বোয়াল সেই আওয়াজের সারবত্তা পরীক্ষা করার (ফ্রেইরি নির্দেশিত পথে) মধ্যে দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন বিপ্লবের মহড়া হিসেবে Theatre of the Oppressed যা কিনা Forum থিয়েটার নামেও পরিচিত। পরিশেষে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'শিক্ষার হেরফের' বক্তৃতার কিছু অংশ উদ্ধৃত করা যাক যেখানে এই শিক্ষার অসাড়তা সম্পর্কে একেবারে হাতেগরম উদাহরণ পাওয়া যায়—

"এইজন্য যখন দেখা যায় একই লোক এক দিকে য়ুরোপীয়দর্শন বিজ্ঞান এবং ন্যায়শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, অন্যদিকে চিরকুসংস্কারগুলিকে সযত্নে পোষণ করিতেছেন, এক দিকে স্বাধীনতার উজ্জ্বল আদর্শ মুখে প্রচার করিতেছেন, অন্যদিকে অধীনতার শত সহস্র লুতাতন্তুপাশে আপনাকে এবং অন্যকে প্রতি মুহূর্তে আচ্ছন্ন ও দুর্বল করিয়া ফেলিতেছেন, এক দিকে বিচিত্রভাবপূর্ণ সাহিত্য স্বতন্ত্রভাবে সম্ভোগ করিতেছেন, অন্য দিকে জীবনকে ভাবের উচ্চশিখরে অধিরূঢ় করিয়া রাখিতেছেন না, কেবল ধনোপার্জন এবং বৈষয়িক উন্নতি সাধনেই ব্যস্ত, তখন আর আশ্চর্য বোধ হয় না। কারণ, তাঁহাদের বিদ্যা এবং ব্যবহারের মধ্যে একটা সত্যকার দুর্ভেদ্য ব্যবধান আছে, উভয়ে কখনো সুসংলগ্নভাবে মিলিত হইতে পারে না।"[১৩]

গ্রন্থপঞ্জি

১। শুভঙ্কর চন্দ তীর্থঙ্কর চন্দ, নিপীড়িতের শিক্ষাবিজ্ঞানে পাওলো ফ্রেইরি (মূল পর্তুগীজ গ্রন্থের মাইরা র‍্যামোস বার্গম্যান কৃত ইংরাজি ভাষান্তর থেকে অনূদিত), তথ্য তক্কো অণুগ্রন্থমালা, কাছাড়, আসাম, দ্বিতীয় প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২১।

২। সলিল বিশ্বাস সবিতা বিশ্বাস, মুক্তির জন্য সাংস্কৃতিক প্রয়াস (Cultural Action for Freedom-Paulo Freire), বুবুক, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ ২০২০।

৩। সুবীর রায়চৌধুরী—বিলাতিযাত্রা থেকে স্বদেশী থিয়েটার, দেজ পাবলিশিং, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ জুন ২০১৬

৪। শিশিরকুমার দাশ—অ্যারিস্টটল কাব্যতত্ত্ব, প্যাপিরাস, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ মার্চ ২০১৫

৫। রথীন চক্রবর্তী, বিংশ শতাব্দীর বিশ্ব নাট্য, নাট্যচিন্তা, কলকাতা, প্রথম প্রকাশনা ২০০৫

৬। Augusto Boal, The Rainbow of Desire (Translated by Adrian Jackson), Routeldge,Abingdon, First Publication 1995

৭। Augusto Boal, Theatre of the Oppressed, London, Pluto Press Ann Arbor, Michigan ProQuest 2019

৮। Grotowski Jerzy, *Towards A Poor Theatre*, Routledge, New York, First Routledge Edition 2002 (PDF Version)

৯। Simone de Beauvoir, La pensée de droite, aujourd'hui, Priviléges.– Paris : Gallimard.–1955, p.-91-200

তথ্যসূত্র :

১। Andy McLaverty-Robison, An A to Z of Theory | Augusto Boal : Brecht and Beyond–The Method, CEASEFIRE, https://ceasefiremagazine.co.uk/augusto-boal-brecht-boal-method/Tuesday, August 30, 2016 11:57

২। Augusto Boal, The Rainbow of Desire (Translated by Adrian Jackson), Routledge, Abingdon, First Publication 1995. Page-2

৩। Augusto Boal, The Rainbow of Desire (Translated by Adrian Jackson), Routledge, Abingdon, First Publication 1995. Page-3

৪। Augusto Boal, The Rainbow of Desire (Translated by Adrian Jackson), Routledge, Abingdon, First Publication 1995. Page-3

৫। Augusto Boal, The Rainbow of Desire (Translated by Adrian Jackson), Routledge, Abingdon, First Publication 1995. Page-4

৬। Sophie Coudry, The Theatre of the Oppressed, https://www.culturematters.org.uk/index.php/arts/ theatre/item/2455-the-theatre-of-the-oppressed, Saturday, 28 January 2017 17:26

৭। শুভঙ্কর চন্দ তীর্থঙ্কর চন্দ, নিপীড়িতদের শিক্ষাবিজ্ঞান পাওলো ফ্রেইরি (মূল পর্তুগীজ গ্রন্থের মাইরা র‍্যামোস বার্গম্যান কৃত ইংরাজি ভাষান্তর থেকে অনূদিত),তথ্য তক্কো অণুগ্রন্থমালা, কাছাড়, আসাম, দ্বিতীয় প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০২১, পৃষ্ঠা-৭০

৮। Augusto Boal, The Rainbow of Desire (Translated by Adrian Jackson), Routledge, Abingdon, First Publication 1995. Page-3

৯। Tamanna Mohammaed, The Joker system of Augusto Boal, https://www.academia.edu/32400733/The_Joker_system_of_Augusto_Boal

১০। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, বিভাস, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ জুন ২০১১, পৃষ্ঠা-৩৮

১১। Fanon Frantz, The Wretched of The Earth, Penguin, London, 2001, Page-15

১২। Augusto Boal, Theatre of the Oppressed, London, Pluto Press Ann Arbor, Michigan ProQuest 2019, Page-126

১৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শিক্ষা, বিভাস, বাংলাদেশ, প্রথম প্রকাশ জুন, ২০১১, পৃষ্ঠা-৭

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ. ডি. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

মনোজ মিত্রের চোখে সীতা ও তার জীবন : ভেলায় ভাসে সীতা

তনিমা বিশ্বাস

সারসংক্ষেপ :

রামায়ণ মূলত মহর্ষি বাল্মীকির সৃষ্টি। রামায়ণের মধ্যস্থ মূল নারী চরিত্র সীতা। সেই চরিত্রকে কেন্দ্র করেই মনোজ মিত্রের 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকের সৃষ্টি। এ নাটকে সীতার পাশাপাশি রাম, লক্ষ্মণ, শূর্পণখা, রাবণ, মন্দোদরী,শরভঙ্গ, উতথ্য প্রমুখ চরিত্র স্থান পেয়েছে। কাহিনিতে সীতার জন্ম কথার পাশাপাশি তার প্রকৃতি প্রেম যেমন জানতে পারা যায় তেমনই তার ভাগ্য বিড়ম্বনাও প্রতিটি পদক্ষেপেই চোখে পড়ে। সীতার জীবনের প্রতিটি পদক্ষেপেই সীতা রামকে বিশ্বাস করেছেন। রামের বিরুদ্ধে কটু বাক্য বা ব্যঙ্গ শুনতে তিনি কখনোই রাজি হন নি। করেছেন তার প্রতিবাদ। কিন্তু সেই রাম প্রতিটি পদক্ষেপে সীতাকে করেছেন লাঞ্ছিত। সীতার বিশ্বাসে হেনেছেন আঘাত। লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে আহত করার পর প্রতিবাদ করতে গিয়ে সীতাই হয়েছেন রামের চোখে আসামী। পরে সীতার পরিবর্তে শরভঙ্গ নির্মিত মায়াসীতাই হয়ে উঠেছেন রামের কাছে যথার্থ। তাই শরভঙ্গের সীতার উদ্দেশ্যে কঠোর চক্রান্তের প্রস্তাবকেও নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছেন রাম। আবার রামের কারণেই সীতাকে নানান অপমান, কটু বাক্য অন্যের কাছ থেকে লাভ করতে হয়েছে। রাবণের সীতাকে হরণ করার পরে সীতার দৃঢ়তায় মুক্তি দানকেও উদারতার চোখে দেখেন নি রাম। শেষ পর্যন্ত মুক্তি লাভর পরেও সীতাকে দেখা গেছে রামের হৃদয়বিদারক কটু বাক্যে আহত হয়ে পুনরায় লঙ্কায় ফিরে যেতে। এছাড়া জন্মদাত্রী মায়ের কাছেও সীতা হয়েছেন অযাচিত। মন্দোদরীর নিজের কলঙ্কের বোঝা ও কৃতকর্মের ফল সকলই লাভ করতে হয়েছে সীতাকে। এক কথায় সীতা চরিত্রটি সমাজের বহু নিপীড়িত, অসহায় নারীর প্রতিভূ হয়ে উঠেছেন।

মূল শব্দ : সীতা, রামচন্দ্র, পঞ্চবটী, বাল্মীকি

বিশ্লেষণ : পুরাকালে নানান সাহিত্য সৃষ্টির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই সাহিত্যের কারণে আমরা বহু চরিত্রের সঙ্গে পরিচিত হই। এদের মধ্যে অন্যতম হলেন সীতা। এক কথায় সীতাও একটি পৌরাণিক চরিত্র। এই চরিত্রটির স্রষ্টা হলেন মহর্ষি বাল্মীকি। সীতা হলেন রাজা জনকের ভূমিসূতা। রাজা দশরথের পুত্রবধূ। দশরথ পুত্র রামের স্ত্রী। বাল্মীকি তাঁর রচনায় চরিত্রগুলি সৃষ্টি করলেও পরবর্তীকালের

বহু রচয়িতার হাতেই চরিত্রগুলির নব নির্মাণ ঘটেছে দিনের পর দিন। ঠিক সেইভাবেই সাহিত্যিক মনোজ মিত্র তাঁর 'ভেলায় ভাসে সীতা' নাটকে রাম, লক্ষ্মণ, রাবণ, মন্দোদরী, শূর্পণখা, শরভঙ্গ, প্রমুখ চরিত্রের পাশাপাশি সীতা চরিত্রটিকে অঙ্কন করেছেন।

কাহিনির শুরুতেই দেখা যায় সীতা পঞ্চবটী বনের সৌন্দর্য আস্বাদন করেছেন এবং চোদ্দ বছর পর রামের বনবাসকাল অতিবাহিত হলে প্রকৃতি কন্যা সীতা অযোধ্যায় ফিরে গিয়ে পঞ্চবটীকে তথা পঞ্চবটীর সৌন্দর্যকে ছেড়ে কেমন করে থাকবেন তা নিয়ে প্রবলভাবে চিন্তান্বিতা হয়ে পড়েছেন। এমতাবস্থায় তিনি বলে উঠেছেন "ও পঞ্চবটী, মা আমার তোকে ছেড়ে থাকবো কী করে?"[১] সীতার পঞ্চবটীকে এরূপ মা সম্বোধন করায় মুগ্ধ হয়ে পঞ্চবটীর রানি শূর্পণখা তার সঙ্গে সখ্যতা স্থাপন করেন ও তাকে আলিঙ্গন করতে চান। এরই প্রেক্ষিতে সীতা তার জন্মকথা ও নিজের পরিচয় জানান শূর্পণখার কাছে। তার থেকেই জানা যায় সীতা ভূমিসূতা। প্রকৃতিকন্যা হওয়ার কারণেই তার প্রকৃতি, বনানী তথা ভূমির প্রতি প্রবল টান। আবার শূর্পণখা এরপর সখি সীতার কাছে রামের উদ্দেশ্যে বিদ্রূপ করলে সীতা স্পষ্টই জানান তিনি রামচন্দ্রের নিন্দা শুনবেন না। সীতা এই প্রেক্ষিতে রামের সপক্ষে নানান কথা বললে শূর্পণখা রামের রাশি রাশি অস্ত্র পেটিকা পঞ্চবটী বনে আনয়নের কারণ জানতে চাইলে সীতাও উত্তর দিতে পারেন না। কিন্তু শূর্পণখাই রামের মূল উদ্দেশ্য যে সাম্রাজ্য বৃদ্ধি তা তুলে ধরেন সীতার কাছে। এমনকি রাক্ষসদের হত্যার প্রসঙ্গও সীতাকে তিনি বলেন। তাতে 'রাক্ষসজাতি স্বভাবে দুষ্ট!'[২] বলেন সীতা স্বামীর কথাকে অনুসরণ করে। তাই সীতাকে শূর্পণখা তোতাপাখিও বলেছেন। আবার সীতা রাক্ষস কর্তৃক সাধু-সন্ন্যাসীদের উপর অত্যাচারের কথা বললে, শূর্পণখাও জানান তার রাজ্যে যদি সত্যিই মুনি-ঋষিদের উপর অত্যাচার করা হত, তাহলে তারা কখনওই উত্তরাবর্তের বনজঙ্গল ছেড়ে পঞ্চবটীতে আখড়া তৈরি করতেন না। এ কথা অবশ্যই অতীব যুক্তিসঙ্গত। কোনো জীব যেখানে নিপীড়িত, অত্যাচারিত সেখানে অবশ্যই থাকতে চাইবেন না বা থাকবে না। কিন্তু পঞ্চবটীকেই মুনিরা তাদের আশ্রমের জন্য যথার্থ স্থান বলে মনে করেন এর থেকেই বোঝা যায় যে পঞ্চবটী নিবাসী রাক্ষসদের সম্পর্কে সীতার অভিযোগ যথার্থ নয়। এই স্থানে সীতা যেমন পতিপরায়ণা হয়ে উঠেছেন তেমনই স্বামীর কথাকেই যথার্থ বলে মনে করে চলেছেন। তাই কোনো কিছু বিচার না করেই তিনি শূর্পণখার কাছে রামের সপক্ষে বক্তব্য প্রকাশ করেন। তবে স্বামীর প্রতি তার এই অটল বিশ্বাস বেশিক্ষণ স্থায়ী হয় নি। স্বামীর বিরুদ্ধেই হয়ে উঠতে হয়েছে প্রতিবাদী। কারণ এরপর রামের সঙ্গে যুক্তি করেই লক্ষ্মণ শূর্পণখাকে সমুদ্র তীরে নিয়ে গিয়ে শূর্পণখার মুখে খড়্গ দ্বারা ক্ষতের সৃষ্টি

করেন। আবার হাসতে হাসতে ফিরে এসে সে কথা রাম-সীতাকে জানান। এছাড়া রাম, লক্ষ্মণের চরিত্রের পাশাপাশি শূর্পখার চরিত্রের উপরও আঙুল তুলেছেন ঊর্মিলা থাকা সত্ত্বেও লক্ষ্মণের প্রেমাভিলাষে শূর্পণখাকে সমুদ্রতীরে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে। প্রথম থেকে সীতা রামের প্রতি প্রেমের কারণে রামের হয়ে কথা বললেও এরপর আর চুপ থাকতে পারেন নি। একে তো শূর্পণখা পঞ্চবটীর রানি হলেও রাম-লক্ষ্মণের কাছ থেকে কোনো সম্মান পান নি। আবার তাকে করা হয়েছে আহত। এ যেমন একদিকে নারীর অপমান তেমনই অন্যদিকে সন্ত্রাসও বটে। তাই তো সীতা প্রতিবাদী হয়ে উঠে একটা ভারি প্রস্তরখণ্ড তুলে লক্ষ্মণের দিকে ছুঁড়তে যান। কিন্তু তার এই প্রতিবাদ রাম-লক্ষ্মণ মেনে নিতে পারেন নি। তারা হয়েছেন অবাক। এরই উপর আবার ঋষি শরভঙ্গের আাবির্ভাব ঘটে ও তিনি বলেন "...দূর স্বর্ণলঙ্কা অবধি বিস্তৃত থাকবে তোমার একচ্ছত্র আধিপত্য! রাম, বীরশ্রেষ্ঠ, তোমার পথ চেয়ে কতো কাল আমরা পঞ্চবটীতে বসে আছি—অনার্যশক্তির বিনাশ ঘটাও! দেবতার ইচ্ছায়, তোমার হাত দিয়ে দক্ষিণ দিগন্তে ঘটুক আর্যায়ন!"[৩] শরভঙ্গের এই উক্তির থেকেই রামের পঞ্চবটীতে আগমনের প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটিত হয়েছে, আবার পিতৃসত্য পালন বলতে সীতা কেবল বনবাস গমনকেই বোঝেন। যা সরলা সীতার বোঝার ভুল। তার এই সরলতার সুযোগই নিয়েছেন রাম, যে তার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ। তিনি হয়েছেন নিরাশ। তাই তো শরভঙ্গ মুনি শূর্পণখাকে সমুদ্রের তীর ধরে ছুটে চলতে দেখে সীতার ক্ষতির আশঙ্কা করে ছুটে এসে সীতার বিপদশঙ্কায় তার আগমনের কথা জানালে সীতার স্পষ্ট উক্তি "আমার নয়, তারই বিপদ! মহা বিপদ!"[৪] এর মধ্যে দিয়ে শূর্পণখার প্রতি তার সহমর্মিতা প্রকাশিত হয়েছে। আর তা যে ছলনা নয় তাও পরিষ্কার। একজন নারী হয়ে অপর নারীর এই লাঞ্ছনা, ক্ষতি তাকেও কাঁদিয়েছে, তার হৃদয়ে এনেছে আলোড়ন। স্বামী দেবরের এরূপ আচরণ তাকে করেছে হতবাক।

এরপর দেখা যায় পঞ্চবটী বনে ঋষি শরভঙ্গের আশ্রমে গিয়ে শরভঙ্গের কাছ থেকে রাম-লক্ষ্মণ পঞ্চবটী থেকে বিদায়ের অনুমতি লাভের জন্য যান। রাম সেখানে গিয়ে বলেন "সঙ্কটে পড়েছি প্রভু। রাক্ষসবিনাশ বুঝি আমাকে দিয়ে হবার নয় মহর্ষি!"[৫] কারণ হিসাবে সীতার যুদ্ধে রাজি না হওয়াকে দায়ি করলে মুনি শরভঙ্গ তাকে যুদ্ধে প্রলুব্ধ করেন। আবার সীতার এরূপ যুদ্ধে বাধা দানের কারণে সীতাকে পঞ্চবটীতে সঙ্গে আনা রামের নির্বুদ্ধিতার কাজ হয়েছে বলেও জানান। এর প্রেক্ষিতে লক্ষ্মণ ঊর্মিলার করুণ আর্তিতে তাকে সঙ্গে না আনার প্রসঙ্গ তুলে বলেন "সবাই জানে রণে বনে এবং শ্মশানে মহিলারা অবস্থা খারাপ করে দেয়!"[৬] এ কথার মধ্যে দিয় লক্ষ্মণ পুনরায় নারীজাতিকে বৃহৎভাবে অপমান

করেন। এ সমস্ত বাগ্-বিতণ্ডা থেকে মুক্তির জন্য মুনি শরভঙ্গ তার নির্মিত কন্যা তথা মায়া সীতাকে নিজ শিষ্য উতথ্যকে নিয়ে আসতে বলেন প্রকৃত সীতাকে বাদ দিয়ে রামের সহধর্মিণী করে রাখার জন্য। তাতে শিষ্য উতথ্য রামচন্দ্র এরূপ চক্রান্ত সুলভ ব্যবস্থা মেনে নেবেন কিনা জানতে চাইলে নির্বিকারে শরভঙ্গ বলেন "নেবে, নিতে হবে। বৃহৎ লক্ষ্য পূরণে ক্ষুদ্র সুখ বিসর্জনে পাঠাবে রামচন্দ্র!"[৭] নিজের স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও অন্য নারী বা নারীমূর্তির সঙ্গে থাকা কেবল নারীজাতি নয়, পুরুষেরও অপমান। এ কাজ পুরুষের চারিত্রিক অবক্ষয়কেই চিহ্নিত করে। তথাপি প্রবল বিশ্বাসের সঙ্গেই সেই লাঞ্ছনাজনক কাজই করতে অগ্রণী ভূমিকা নিতে দেখা গেছে। কারণ শরভঙ্গের দ্বারা নির্মিত সীতা কেবল প্রকৃত সীতার মতোই দেখতে। যা হিংস্রতাকে প্রকাশ করেছে তা প্রকৃত সীতার কাছে অবাঞ্ছিত, অযাচিত, বেদনাদায়ক। শরভঙ্গ নির্মিত মায়া সীতা কেবল রামের তোতাপাখি যেন। রাম-লক্ষ্মণকৃত সকল কাজই তার কাছে যথার্থ। মায়া সীতার এক স্থানে রামের উদ্দেশ্যে উক্তি "আমি তাঁর অনুগত দাসী। তিনি যে পথে হাঁটবেন...দাসী তাঁর পায়ে পায়ে চলবে।"[৮] মায়া সীতার এইরূপ ভাবনা অবশ্যই নারীজাতির অবমাননা। নিজেকেই হীন মনে করা। যা অবলীলায় শরভঙ্গের দ্বারা নির্মিত মায়া সীতা করেছে। এইরূপ পুতুলরূপী মায়া সীতা তাই রাম-লক্ষ্মণের প্রিয় হয়ে উঠেছে, মূলত রাম-লক্ষ্মণের মতের বিরুদ্ধে না চলার জন্য। আরও একটি কারণে রাম ও লক্ষ্মণকে আনন্দিত হতে দেখা যায়, মায়া সীতাকে দিয়ে তারা রাবণকে বোকা বানাতে পারবেন মনে করে। এই সবের মধ্যে প্রকৃত সীতা এই ব্যবস্থাপনাকেই কীরূপে নেবেন তা রাম, লক্ষ্মণ, শরভঙ্গ কেউই ভাবেন নি। যেন তাকে নিয়ে ভাবার প্রয়োজনই নেই। তবে কেবল শরভঙ্গের শিষ্য উতথ্য ভেবেছেন সীতার কথা। সীতার এ সকলের পরে মনের যে অবস্থা হবে তা ভেবে তার মন কেঁদে উঠেছে। তাই মায়া সীতাকে রামের সঙ্গে পাঠিয়ে প্রকৃত সীতাকে এক বৎসরকাল যোগনিদ্রায় আচ্ছন্ন করে যজ্ঞের আগুন দ্বারা ঘেরা কক্ষে রাখার শরভঙ্গের পরিকল্পনাকে তিনি সমর্থন করতে পারেননি। তাই শেষপর্যন্ত উতথ্যর কণ্ঠে হতাশাজনক উক্তি উঠে আসে "দেব, মার্জনা করুন, বিধাতা এক সীতাকে সৃষ্টি করেছিলেন, আমরা আর এক সীতাকে এনে তাঁকেই বিভ্রান্ত করছি নাকি? এর ফলে কি..."[৯] শরভঙ্গের চক্রান্তকে নানাভাবে আটকানোর প্রয়াসের শেষেই উতথ্যের এই হতাশাজনক বাক্য প্রয়োগ। কারণ প্রকৃতপক্ষে মানুষ নিজে যতই অন্যকে ঠকাতে সমর্থন হোন না কেন বিধাতা অবশ্যই তার উর্ধ্বে। নিজের কৃতকর্মের ফল মানুষকে যথার্থই ভোগ করতে হয়।

পরে দেখা যায় শরভঙ্গ মুনির আশ্রম থেকে রাম কুটির প্রাঙ্গণে এসে সীতাকে মায়া সীতা যে অবিকল সীতারই প্রতিচ্ছবি তা জানালে প্রথমে সীতাকে আনন্দিত

ও উৎফুল্ল হতে দেখা যায়। কিন্তু শরভঙ্গের এইরূপ মায়া সীতা নির্মাণের কারণ না খুঁজে পেয়ে মনের দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়। নারী মন তাই যেন নির্দ্বিধায় উপলব্ধি করে ঘটমান সত্যের। তিনি বুঝতে পারেন তার স্বামীর চক্রান্ত। মায়া সীতাকে নিয়েই রাম থাকবেন প্রকৃত সীতাকে সরিয়ে রেখে। তাই সীতা বলে উঠেছেন "...আচ্ছা এমন তো নয় রাম, এখন থেকে আমাকে ছেড়ে তুমি ওই মায়াসীতাকে নিয়েই কাল কাটাবে?...কাল আমার বাগানে যে ফুলটা ফুটবে, আমি তাকে দেখতে পাবো না—তার গন্ধে ভরে উঠবে মায়াসীতার বুক! ওই যে সরোবরের নীলপদ্মটা—ভোরবেলা যেটা সাঁতার দিয়ে তুলে এনে আমার বুকের ওপর রাখার নিত্যদিনের অভ্যাস তোমার—হয়তো সেটা কাল পাবে ওই মায়াসীতা!"[১০] নারীর এই উপলব্ধির কথা রামের পুরুষ মন ভাবতেও পারেন নি। তাই তো অবলীলায় তিনি ছলনার দ্বারা সীতাকে শরভঙ্গের আশ্রমে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস করেন ও সীতা তাই বুঝতে পারায় চমকে ওঠেন। সীতার নারী মন পরিষ্কারই বুঝতে পারে রামের মনের মতো কথা বা কাজ করবে মায়া সীতা। তাইই রামের শরভঙ্গের প্রস্তাবে রাজি হওয়া ও ভূমিসূতা সীতাকে সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রয়াস। আবার সীতা তখন এও জানতে পারেন যে শরভঙ্গের আশ্রমে তাকে রাখা হবে যোগনিদ্রায় তিনি আরও প্রতিবাদী হয়ে ওঠেন ও জানান এক লহমার জন্যও তিনি নিদ্রিত থাকবেন না জেগে থেকে রামের প্রতিটি কার্য দেখবেন। এ সকলের পর রাম সীতাকে বোঝাতে অসমর্থ হলে সীতাকে প্রলোভন দেখান স্বর্ণলঙ্কা জয় করে সেই সোনার দ্বীপ রাম তাকে উপহার দেবেন। কিন্তু নির্লোভ, আত্মসম্মানী, সদাচারী সীতা তাই নির্দ্বিধায় প্রত্যাখ্যান করে বলেন "রক্তমাখা ভূমি নেয় না ভূমিসূত! আর রক্তমাখা হাত থেকেও নেবে না কোনদিন! জ্ঞানে কিংবা অজ্ঞানে কক্ষনো সে রাক্ষসের নিগ্রহের কারণ হবে না।"[১১] এই সমস্ত কিছুর পর রাম সীতার প্রতি বিরক্ত হয়ে লক্ষ্মণকে আদেশ করেন সীতাকে শরভঙ্গের আশ্রমে নিয়ে যেতে তাতে লক্ষ্মণ অগ্রসর হলে সীতা নানাভাবে লক্ষ্মণকে তিরস্কার করেন। মনে করিয়ে দেন ঊর্মিলাকে দেওয়া লক্ষ্মণের কষ্টের কথা। কিন্তু তাতে লক্ষ্মণ কর্ণপাত না করায় বিদ্রোহী সীতা লক্ষ্মণের উদ্দেশ্যে বলেছেন "এই পাষণ্ড ফিরে তাকালো না! আনুগত্য দাসত্ব পদসেবা—গণ্ডমূর্খের মহৎ গুণ!"[১২]

এরপর দেখা যায় রাবণ শূর্পণখার হওয়া অপমানের বদলা নিতে অনুচরের সঙ্গে শূর্পণখার বলা সময়ে সীতাকে বুঝিয়ে পঞ্চবটী ত্যাগে রাজি করাতে আসেন সন্ন্যাসীবেশে। কিন্তু সীতাকে দেখে সীতার রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে স্বর্গের কিন্নরীদের থেকেও সুন্দরী বলে ওঠেন তিনি। এ সময় রাবণের অনুচর রামের কণ্ঠস্বরের ন্যায় কণ্ঠস্বরের দ্বারা চিৎকার করে বাঁচার আর্তি করে উঠলেই লক্ষ্মণ ও সীতা রামের কাতর আর্তি মনে করে সীতার কথায় লক্ষ্মণ রামকে রক্ষা করতে ছোটেন

চিৎকার অনুসরণ করে। এই সুযোগে রাবণ সীতাকে হরণ করেন। এ অবস্থা থেকে জটায়ু সীতাকে উদ্ধার করতে গেলে রাবণের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত হয়ে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে। অন্যদিকে রাম একটি গাছের আড়ালে থেকে সমস্ত ঘটনা দেখে আনন্দ নিতে থাকেন। কারণ রামের মতে হৃত সীতা মূলত মায়া সীতা। তিনি মায়া সীতা হলেও সেখানে রামের গাছের আড়ালে না থেকে সীতাকে রক্ষা করার প্রয়াস করা উচিত ছিল। কিন্তু দুর্বুদ্ধি সম্পন্ন রাম তা করেননি। যেখানে জটায়ুর নারীর সম্মান রক্ষার কথা মাথায় আসে সেখানে জটায়ুর চোখে দেবতা হয়ে বসে থাকার রামে সেই বোধ হতে দেখা যায় না। এছাড়া জটায়ুর আহত হওয়া বা মৃত্যু তার কাছে নশ্বর বিষয় হয়ে উঠেছে। সীতা প্রকৃতই হোক বা মায়া তাকে রক্ষার দায়িত্ব প্রকৃতপক্ষে তার স্বামী রামেরই। তাই তো শ্রেষ্ঠ বীরের সঙ্গে রাজা জনক প্রাণপ্রিয় কন্যা সীতার বিবাহ দেন। কিন্তু কোথায় রামের বীরত্ব? সর্বক্ষণই স্ত্রী সীতাকে রক্ষার দায়কে এড়িয়ে চলেছেন রাম। তার মন কেবল সাম্রাজ্য বৃদ্ধিতে। রামের কাজ দেখে ধরে নেওয়া যায় সাম্রাজ্য বৃদ্ধির জন্যই সীতার সঙ্গে তার বিবাহ। সাম্রাজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশ্য ও লোভ সফল করার ব্যাকুলতায় তিনি প্রতিনিয়ত কেবল স্ত্রী সীতাই নয় সমগ্র নারী জাতির সম্মান হানি করেছেন। নারীর এরূপ লাঞ্ছনা, অবমাননার জন্য দায়ি হয়েও রাম থেকেছেন নির্বিকার যা অতীব লজ্জাজ্জনক হওয়া উচিত রামের কাছে। কিন্তু এতেও রাম নিজের বীরত্ব খুঁজে পেয়েছেন। সীতা নানাভাবে প্রতিবাদ করেও নিজেকে রক্ষা করতে পারেন নি, পারেন নি স্বামী রামের দুর্মতির পরিবর্তন আনতে। বরং লক্ষ্মণ যখন বৌঠান বলে চিৎকার করে রাবণ কোন পথে সীতাকে নিয়ে গেছেন তা জানতে চেয়ে ছুটে বেরিয়ে পড়েন তখন মায়া সীতা মনে করে রাম তাকে আটকাতে যান। পরে যদিও রাম প্রকৃত সত্য জানতে পারেন রাবণ অনুচরের কাছ থেকে। তখনই তিনি ছুটে যান শরভঙ্গের আশ্রমে ও উতথ্যের কাছে সত্যতা যাচাই করতে। সেখানে জানা যায় রাম ব্যতীত প্রত্যেকেই জানেন রাবণ দ্বারা হৃত সীতা মায়া সীতা নন প্রকৃত সীতাই। মূলত অসহায় নারীকে সহায়তা করা বীরত্বের এক অন্যতম নজির। সেখানে মূলত রাম পরিচয় দিয়েছেন তার স্বার্থপরতা, হীন মানসিকতার। কারণ সীতাই হোক বা অন্য কোনো নারী তার অপমান আটকানো যে কোনো মানুষের ধর্ম। রামের কৃতকর্ম তার অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছে। লক্ষ্মণও এক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত প্রকৃত সীতার যোগনিদ্রা সমর্থন না করে মুক্তি দানই যথার্থ বলে মনে করেছেন। লক্ষ্মণের হৃদয়ও এরূপ কঠিন কাজে কেঁপে ওঠে। পরে রামের হৃদয়ও মায়া সীতা নয় সীতাহরণ হয়েছেন জেনে কেঁপে ওঠে। মনে করেন শরভঙ্গের অজ্ঞাতেই এসকল সংঘটিত হয়েছে। কিন্তু শরভঙ্গ সকলেই জানতেন জেনে তিনি যখন ভেঙ্গে পড়েন তখন শরভঙ্গ বলেন "অগোচরে

নয়। সবই জানি। তবে সীতা কিংবা মায়াসীতা—তাতে আমাদের মূল উদ্দেশ্যের কোনো পরিবর্তন হয় না বৎস রাম। বরং অশোককানন থেকে মায়াসীতা উদ্ধারে যে রামকে আমরা পেতাম এবার আসল সীতা উদ্ধারে নিশ্চয় তার চেয়ে অধিক দৃঢ় আর বিধ্বংশী রামচন্দ্রকেই পাবো।"[১৩] নারীর তথা সীতার প্রতি শরভঙ্গের এইরূ নির্দয় মনোভাব একেবারেই সমর্থনযোগ্য নয়। মূলত সীতাকে তিনি রামের ন্যায় যুদ্ধের জন্য তুরুপের তাস হিসেবে ব্যবহার করতে চেয়েছেন এবং করেছেন। সচেতন ভাবে তিনি একজন নারীকে করেছেন অপমানিত। মুনি হয়ে এই রকম আচরণ একেবারেই কাম্য নয় তার কাছে। নারীর প্রতি তার থাকা উচিত ছিল শ্রদ্ধা। যার অভাবে মুনি শরভঙ্গের মধ্যে স্পষ্ট দৃষ্ট।

অন্যদিকে লঙ্কাপুরীর অশোককাননে বন্দি সীতাকে রাবণের চেড়িরা নানাভাবে উৎপীড়ন করে রাবণের প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার জন্য। কিন্তু আত্মসম্মানী সীতা অকথ্য উৎপীড়ন সহ্য করেও তাতে সম্মত হন নি। মন্দোদরীর নানান অনুনয়েও তিনি নিজ সিদ্ধান্তে অনড় থাকেন। লঙ্কাপুরীর অগাধ ঐশ্বর্য তাকে প্রলুব্ধ করতে পারে না। নির্লোভ সীতা নিজ দৃঢ় চরিত্রে অটল থাকেন। এ ঘটনার মধ্যেই মন্দোদরী সীতাকে দেখে চমকে ওঠেন কারণ হিসেবে মন্দোদরী বলেন "মাগো! এ কে! এদিক দিয়ে দেখলে যেন আমার সেই সন্তানটির মুখটা বসানো! কুমারীকালের গর্ভ! আমার লজ্জাজড়ানো প্রথম ফসল! জ্যোতিষী বলেছিলেন বংশ ধ্বংস করবে। ভয়ে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলাম! কে জানে সাতঘাট ঘুরে সে আবার শোধ তুলতে ফিরে এলো কিনা!..."[১৪] এ ঘটনার কথা জানার পর এটা স্পষ্ট যে সীতার ভাগ্য সীতার প্রতি অতীব বিরূপ। তাইতো গর্ভধারিণী মা নিজের বংশ রক্ষাই সর্বতোভাবে প্রধান কাজ মনে করে নিজের সদ্যোজাত সন্তানকে নদীতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন। এর ফলে সন্তানের প্রাণসংশয়ের আশঙ্কা থাকতে পারে তাও তিনি ভাবেন নি। আবার পুনরায় সন্তানকে ফিরে পেয়ে তার মধ্যে নেই কোনো আনন্দ। নিজের চারিত্রিক কলঙ্ককে ঢাকতে উপায়টি তিনি শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। তার অবমাননা ফল লাভ করতে হয়েছে সীতাকে জন্মের সময়। পরেও সীতা প্রকৃত মায়ের কাছে লাভ করেছেন কটু বাক্য। রাবণ সীতার কাছ থেকে পরবর্তী সময় মালা পরতে এলে দেখা যায় মন্দোদরী সীতাকে সে কাজে নানাভাবে প্রলুব্ধ করার প্রয়াস করেন এ কথা বলে যে তারও সীতার মতোই অবস্থা হয়েছিল। মা হয়েও সীতাকে আগুনে ফেলে দেওয়ার মতো কাজ করেছেন মন্দোদরী। সীতার ভাগ্য বিড়ম্বনাই এটি। তবে শেষে সীতা রাবণকে লাথি দেখালে রাবণ তাকে হত্যা করতে উদ্যত হলে মন্দোদরী কন্যা সীতাকে রক্ষা করেন। আবার শূর্পণখা মায়াসীতা মনে করে খড়্গ হাতে নিয়ে সীতার দিকে অগ্রসর হয়ে তার ক্ষোভ উগরে দিলে সীতা বলেন "...পঞ্চবটীকে তুমিও

ভালোবেসেছিলে, আমিও। দুজনের কেউই আমরা পঞ্চবটীতে থাকতে পারিনি। জানকীর জন্য তুমি পঞ্চবটী ছাড়োনি, কিন্তু তোমার জন্য জানকীকে ছাড়তে হয়েছে! সখি, সেদিন তোমার সেই রক্ত মাখা মুখখানা দেখার পর—"[১৫] এ সমস্ত উক্তির মধ্য দিয়ে সীতার শূর্পণখার প্রতি ভালোবাসা, সহমর্মিতা যেমন প্রকাশ পেয়েছে তেমনই তাদের নিজেদের জন্যে আফসোসও প্রকাশিত। শূর্পণখার প্রতি হওয়া অন্যায় সীতা যে কখনোই সমর্থন করেন নি তা পরিষ্কারভাবে ফুটে উঠেছে সীতার উক্তিতে। স্বামী দেবরের কাজে তিনি সন্তুষ্ট নন। শূর্পণখার এ লাঞ্ছনা কেবল শূর্পণখারই নয় তারও, তা প্রতিভাত হয়েছে। সমগ্র নারীজাতি এতে অপমানিত। দুই গোষ্ঠীর মধ্যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি যে রাম করেছেন তাতে সীতা হতবাক ও লজ্জিত।

শেষে দেখা যায় পঞ্চবটীর সমুদ্রের তীরে দূরে পর্বতের চূড়ায় বসে জটায়ুর অথর্ব দাদা সম্পাতি লঙ্কা থেকে ভেলায় সীতাকে পঞ্চবটীর দিকে আসতে দেখে। সেখানে সীতা মুক্তির আনন্দে পঞ্চবটীতে স্বামীর কাছে ফিরে আসেন। সীতার প্রথমে সম্পাতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সম্পাতি সীতাকে দেখে এতটাই উৎফুল্ল হয় যে বলে সে ক্ষমতা থাকলে আকাশে উড়ে পঞ্চবটীকে জাগিয়ে দিত। কথা প্রেক্ষিতে সম্পাতি গুহার বাইরে ভিক্ষা লাভের জন্য বসে থাকে জানালে দয়াময়ী সীতা তাকে খাবার এনে দেবেন বলে জানান। এ কাজ করতে সীতা শুধু দয়াপরবশ হয়ে চান নি পাশাপাশি জটায়ুর প্রতি কৃতজ্ঞতার প্রকাশও এটি। যে কৃতজ্ঞতাটুকুও রামের মধ্যে ছিল না। এরপর রাম সীতাকে দেখে হতবাক হলে আনন্দিত সীতার বুকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে পরম শান্তি লাভ করেন। কিন্তু তার এই শান্তি রাম নিজেই হরণ করেন মুক্তির পরেও সীতাকে পুনরায় লঙ্কায় ফিরে যেতে বলার মধ্য দিয়ে। সীতা যখন বলেন "আমার জেদের কাছে, আমার হার-না-মানা প্রতিজ্ঞার কাছে হার মেনেছে রাবণ! মরণপণ প্রতিজ্ঞা! আমাকে কেউ জয় করতে পারবে না! জয় করেছে একজন—সেই কবে হরধনু ভঙ্গ করে!...ভাবতে পারো রাম, লঙ্কার লোকেরা আমায় ভেলায় তুলে দিচ্ছে, আর লঙ্কেশ্বর মাথা নিচু করে দাঁড়িয়ে রয়েছে!"[১৬] এ কথা জেনেও রাম সীতার বিনা যুদ্ধে আগমনকে মেনে নিতে পারেন নি। সীতার ফিরে আসাকে স্বাভাবিকভাবে না মেনে নিতে পারার কারণেই সীতার উক্তির পর তিনি ব্যঙ্গ করেছেন। রাবণ বা লঙ্কাবাসীর প্রতি তিনি মোটেই কৃতজ্ঞ নন। বরং সীতাকে পুনরায় ফিরে যেতে বলে অপমান করেছেন সীতা সহ সমগ্র লঙ্কাবাসীকে। রাম বল প্রয়োগের দ্বারা সীতাকে উদ্ধার সম্পন্ন করবেন জেনে সীতা পরিষ্কার বুঝতে পারেন তিনি নন, রামের কাছে যুদ্ধই বেশি আবশ্যক। তিনি কেবল যুদ্ধের টোপ। এরপরও ক্ষান্ত হন নি রাম, আরও অপমান করেছেন, "সীতা, রাবণ দুষ্ট অভিলাষে তোমাকে নিয়ে গেছে,

পাপের চোখে তোমাকে দেখেছে,তোমাকে এই মুহূর্তে পুনর্গ্রহণ করা আমার পক্ষে অযশস্কর।...শোন সীতা, নিজেকে বাঁচাতে তুমি যা খুশি করতে পারো। যাকে ইচ্ছা মালাও দিতে পারো। আমার কিছু বলবার নেই।..."[১৭] কথার মধ্যে দিয়ে। এ সকল কথার দ্বারা রাম কেবল রাবণকেই নয়, নিজের স্ত্রী সীতাকেও অপমান করেছেন। যে সীতা নানান বিপদ স্বামী রামের জন্য সহাস্য বদনে মেনে নিয়েছেন সেই সীতাকে নির্দ্বিধায় কলঙ্কিত করেছেন রাম প্রতিটি পদে পদে। সীতার আত্মসম্মানে যে আঘাত হেনেছেন রাম তারই প্রতিবাদস্বরূপ সীতা লঙ্কায় পুনরায় ফেরার উদ্যোগ নিয়েছেন এবং মায়া সীতাই রামের কাম্য তাও স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন। কারণ মায়া সীতা রামের মন মতো কাজ করবেন কথা বলবেন। মায়া সীতা থাকুক না থাকুক এরূপ কথা সীতার প্রবল অভিমানকেই প্রকাশ করেছেন। প্রচুর যন্ত্রণা লাভ করেছেন তিনি। রামের অবিশ্বাসজনক, অপমানজনক কথায় হয়েছেন আহত। তাইতো তার শেষ উক্তি "আমি ওদের কাছে যাবো, ওরা আমায় রক্ষা করবে!"[১৮]

প্রথমে সীতা তার পঞ্চবটীতে আগমনকে আনন্দের সঙ্গেই উপভোগ করেন এ কাহিনিতে। প্রকৃতির সঙ্গে মিশে গিয়েই তার পঞ্চবটীকে মা বলে সম্বোধন, শূর্পণখার সঙ্গে বন্ধুত্ব। কিন্তু অল্প কিছু সময় পর থেকেই সীতা উপলব্ধি করতে থাকেন পঞ্চবটীতে তাকে আনয়নের কারণ। আর তার থেকেই শুরু হয় নানান সমস্যার। লক্ষ্মণ নিজের ও রামের চক্রান্তে শূর্পণখাকে আহত করলে সীতা হয়ে ওঠেন প্রতিবাদী। সীতার প্রতিবাদকে বন্ধ করার নানান প্রয়াস করেন রাম। কিন্তু হন অসফল। বারংবার রাম সীতার বিশ্বাসে আনেন আঘাত। সীতাকে রাবণ হরণ করলে নির্বিকার রাম তা প্রত্যক্ষ করেন প্রতিহত করার চেষ্টা না করে। আবার সীতা তার মনোবলের দৃঢ়তার দ্বারা রাবণকে তাকে মুক্ত করতে বাধ্য করলেও তাকে হতে হয় কলঙ্কের দ্বারা ক্ষতবিক্ষত। নানান কটু কথায় ভরিয়ে তোলেন রাম যা অবশ্যই কোনো নারীর পক্ষে সহ্য করা অসম্ভব। তাইতো স্বামীর কাছে ফিরে আসার আনন্দ হারিয়ে যায় সীতার মধ্যে। সীতা রাম বা রাবণ উভয়ের আশ্রয়ই হারান। এর জন্য দায়ি অবশ্যই রাম। আবার নিজের জন্মদাত্রীর কাছেও তিনি লাভ করেন উপেক্ষা। জন্মের সময় সীতাকে তিনি ভাসিয়ে দেন জলে। পরবর্তী সময়ে তাকে লাভ করেও মাতৃ হৃদয়ের আনন্দ খুঁজে পাওয়া যায় না মন্দোদরীর মধ্যে। প্রথম থেকেই সীতার জীবন ভাসমান। পরেও তার জীবন পরিণতি একই। দোলাচলতাই সীতার জীবনের অঙ্গ হয়ে ওঠে। মূলত মনোজ মিত্র অঙ্কিত সীতা সমাজের বহু নারীর আয়না। এইভাবেই নানান অবহেলায় জীবন অতিবাহিত হয় সমাজের বহু সীতার। গলা টিপে খুন করা হয় তাদের আত্মসম্মানকে। প্রতিবাদী হলে মেলে চরম বঞ্চনা। সমাজের সেই সীতাদেরই জীবন চিত্র ফুটে উঠেছে সাহিত্যিক মনোজ মিত্রের লেখনীতে।

গ্রন্থপঞ্জি :

১। আকর গ্রন্থ : মনোজ মিত্র, রামায়ণী মহাভারতী, ভেলায় ভাসে সীতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০ ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ : আগস্ট ২০১৯, শ্রাবণ ১৪২৬

তথ্যসূত্র :

১। মনোজ মিত্র, রামায়ণী মহাভারতী, ভেলায় ভাসে সীতা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা ৭০০০ ৭৩, দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট ২০১৯, শ্রাবণ ১৪২৬; পৃষ্ঠা : ১১৮
২। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১১৯
৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১২৩
৪। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১২৪
৫। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩১
৬। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩২
৭। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩২
৮। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩৩
৯। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩৫
১০। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩৬
১১। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩৭
১২। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৩৭
১৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৫২
১৪। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৪৬
১৫। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৫০
১৬। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৫৫
১৭। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৫৫-১৫৬
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা নং-১৫৬

লেখক পরিচিতি :
পি এইচ. ডি. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

গল্পকার নারায়ণ দেবনাথ (১৯২৫-২০২২)

বিদিশা নন্দী

সারসংক্ষেপ :

নারায়ণ দেবনাথ নামটি একটি নির্দিষ্ট প্রজন্মের ছেলেবেলার আর এক নাম বা নামান্তর বলা যায়। আজ বাংলা কমিক্স জগতে এই নামটি একটি 'Institution'-এ পরিণত। ১৮ই জানুয়ারি ২০২২, এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটি আমাদের ছেড়ে পাড়ি দিয়েছেন তারাদের দেশে, যা বাংলা সাহিত্য জগতের নক্ষত্র পতন তা বলাই বাহুল্য। তাঁকে সম্মান জানানোর প্রকৃত পন্থা তাঁর কাজকে নিয়ে আরও বেশি বেশি চর্চা করা। তাই এই প্রবন্ধে আমাদের চেনা-জানা নারায়ণ দেবনাথকে একটু অন্যরকম ভাবে দেখার প্রচেষ্টা করা হল, সেখানে তাঁর কাজের অচেনা বিশ্বকে খুব সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। এবার আসি মূল প্রসঙ্গে, ওই যে নারায়ণ বাবুর অচেনা লিখন-বিশ্ব প্রসঙ্গে। আমরা প্রত্যেক পাঠক বা পড়ুয়া মানুষ নন্টে-ফন্টে, বাঁটুল, কেমিক্যাল দাদু-খাদু, গোয়েন্দা কৌশিক চরিত্রগুলির সাথে কমবেশি পরিচিত, কিন্তু 'গোবিন্দর গোয়েন্দাগিরি', 'এক প্রজাপতির মৃত্যু', নামক গল্প লিখে নারায়ণ বাবু রেখে গেছেন তাঁর কলমের দাগ, সেই লেখার সংখ্যা কম (মাত্র ৩টি গল্প), হলেও তা নিয়ে বেশি বেশি আলোচনা তাঁর সৃষ্ট আর এক অজানা বিশ্বকে জানতে সাহায্য করবে, সাহায্য করবে নারায়ণ বাবুকে নতুন করে আবিষ্কার করতে। তাই এই ছোট প্রয়াস। (আমাদের আলোচনা নারায়ণ বাবুর তিনটি গল্পকে কেন্দ্র করেই হবে, তাঁর কমিক্সে গল্পরস আমাদের আলোচ্য নয়)।।

সূচক শব্দ (Key word) : নারায়ণ দেবনাথ, পাঠক, কমিক্স/কমিকস।

মূল প্রবন্ধ : ২০২২ সাল, ১৮ই জানুয়ারি নারায়ণ দেবনাথ এর মৃত্যু বাংলা সাহিত্যের দুনিয়ার নক্ষত্র পতন সে কথা আলাদা করে বলার বিশেষ প্রয়োজন নেই। এই প্রবাদপ্রতিম মানুষটি যিনি 'সাত রাজার ধনের দুনিয়া'-কে নানারঙে, নানা গল্পে ভরিয়ে তুলেছেন। সেই দুনিয়া আজ পিতৃহারা হল, হল খানিক অনাথ। তবে মৃত্যুর পর একজন শিল্পীকে সম্মান জানানোর একমাত্র পন্থা হল তাঁর কাজকে নিয়ে আর বেশি বেশি চর্চা করা, নানান 'angle' দিয়ে তাঁর কাজের আলোচনা করা। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক চেনা নারায়ণ দেবনাথকে। ১৯২৫ সালে হাওড়া শিবপুরে যে মানুষটির জন্ম হল হেমচন্দ্র দেবনাথের পুত্রসন্তান হিসেবে, ২০২২ সালে মৃত্যু, সুদীর্ঘ ৯৭ বছরের এই 'JOURNEY' কে একটি

প্রবন্ধে ধরা অসম্ভব। তবু চেষ্টা করা যাক। আমাদের চেনা নারায়ণ দেবনাথ ১৯৫০ এর দশক, শুকতারার অলঙ্করণ শিল্পী হিসেবে আজকের 'লেজেণ্ড' সেদিনের যুবার আত্মপ্রকাশ। ১৯৬১ সালের মে মাসে সাহিত্যিক বিমল ঘোষ লিখিত ও নারায়ণ দেবনাথ চিত্রিত কমিকস **'রবি ছবি'** প্রকাশিত হয় আনন্দবাজার পত্রিকাতে। কমিক্স জগতে সেই পথ চলা শুরু তাঁর। কৌশিক মজুমদার তাঁর **"কমিকস ইতিবৃত্ত"** বইতে বলেছেন—"অস্বীকার করে লাভ নেই, যতই নারায়ণ দেবনাথ নিজেকে আদতে ইলাস্ট্রেটর বলুন না কেন, পরবর্তীকালে কমিকস আঁকিয়ে নারায়ণ দেবনাথ প্রায় সম্পূর্ণরূপেই গ্রাস করেছেন ইলাস্ট্রেটর নারায়ণ দেবনাথকে। ষাটের দশকের প্রথম থকে সেই যে কমিকস আঁকা শুরু করলেন, তার ধারা আজও ব্যাপৃত।" আপাতত কমিক্স আঁকিয়ে নারায়ণ দেবনাথের প্রসঙ্গ এখানেই মুলতুবী করা হল। তবে অজানা নারায়ণ দেবনাথকে জানার আগে আমরা বুঝে নেব আমাদের জানা নারায়ণ দেবনাথ (যাঁর কাজের ৯৫% ই কমিক্স) তাঁর স্থান বাংলা সাহিত্য ঠিক কোথায়।

বিজ্ঞজনের অন্দরমহলে এই বিষয়টি নিয়ে তর্কের শেষ নেই বললেই চলে। এই প্রসঙ্গে **কৌশিক মজুমদারের—'কমিকস্'—এক অনন্য শিশুসাহিত্য'** প্রবন্ধে কট্টর পাঠকের মানসিকতার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় যখন তিনি লেখেন—"বিপদ বাড়ল যখন সাহিত্য আকাদেমি দুম করে শিশু সাহিত্যের জন্য নারায়ণ দেবনাথকে পুরষ্কৃত করে বসলেন। অনেক বিপ্লবী মুখ লুকালেন। অনেকে তীব্রতর সোচ্চারে মাতলেন। দুজনের মন্তব্য তুলে দিচ্ছি (অবশ্যই নাম না করে)—একজন বললেন, 'সাহিত্য আকাদেমি তার কৌলীন্য হারাল। নারায়ণ দেবনাথ কি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নাকি, যে তাঁকে নিয়ে এত নাচানাচি করতে হবে?' অন্যজন বয়স্ক, ফলে মৃদু। তিনি জানালেন,'এসব যুগের হাওয়া। আজকাল ছেলেরা আম আর আমড়ার তফাত জানে না, তাই কমিকসকেও শিশুসাহিত্য বলে'। ফলত বোঝাই যায় কমিক্স শিল্পী নারায়ণ বাবু আজও কিছুটা হলেও ব্রাত্য। তবে নারায়ণ বাবু কি বলেছেন এই প্রসঙ্গে সেটা জেনে নেওয়া যাক, মলয় মণ্ডলের 'কমিকস কথা' বইয়ের একটা সাক্ষাৎকারের একটি অংশ তুলে ধরা যাক—

"**মলয় মণ্ডল :** আপনি একবার একটি সাক্ষাৎকারে বলেছেন আপনি কার্টুনিস্ট নন, শিশুসাহিত্যিক। যেহেতু সাহিত্য এই সংরূপ এর বাইরে অন্য কোন মাধ্যম স্বীকৃত নয়, তাহলে কমিকসকে কী আপনি সাহিত্য বলবেন? কিংবা আপনি নিজেকেই বা শিশুসাহিত্যিক কেন বলবেন?

নারায়ণ দেবনাথ : এই প্রশ্নের উত্তর আগেও অনেককে দিয়েছি। আমার

নামে আজকাল যে চিঠিগুলি আসে সেখানেও লেখা থাকে শিশুসাহিত্যিক। ধরা যাক, সাহিত্যিকরা দু'তিন পাতা জুড়ে একটা গল্প লিখে সাহিত্যিক হল, আমি যদি নন্টে ফন্টেকে নিয়ে গল্প লিখতাম, তাহলে সেটা কী হত? ছবি তো নয়, শুধু গল্পটা,তাহলে? মুশকিল হচ্ছে, যারা বোদ্ধা তারা শুধু ছবিটা দেখে, কিন্তু গল্পটা কোথা থেকে এল, সেটা তাদের মাথায় নেই।"

এবার আসি মূল প্রসঙ্গে, যে কথা বলতে গিয়ে এতও বড় এবং পাঠকের পক্ষে বড়ই ক্লান্তিকর কথামুখ লিখতে হয় তার জন্য পাঠকের কাছে মাপ চাইছি। আমরা পাঠকরা অনেকেই জানিনা যে নারায়ণ দেবনাথ শুধু অলঙ্করণ করেন নি, তিনি শুধু কমিকস লেখেননি, খুব কম সংখ্যক হলেও তিনি লিখেছেন গল্প। কৌশিক মজুমদার '**প্রহর**' নামক আন্তর্জালিক পত্রিকা তে বলেছেন—'নারায়ণ দেবনাথ চলে গেলেন। প্রকৃতির স্বাভাবিক নিয়মেই। তবু কিছু রহিয়া যায়। নারায়ণ দেবনাথ মানেই যে বাঁটুল, হাঁদাভোঁদা কিংবা নন্টে ফন্টে নয়, তাঁর তুলি আর কালি-কলমের ব্যাপ্তি যে আরও বহু বহুদূর ছড়িয়ে, তা নিয়ে বহু আলোচনা হয়েছে, আরও হবে। তাঁর অতুলনীয় সিনেম্যাটিক ইলাস্ট্রেশন, কালো ক্রোক্যুইল নিবের ব্যবহার এখন মিথ। কিন্তু এর ফাঁকেই হারিয়ে যান একজন লেখক নারায়ণ দেবনাথ।' তিনি আরও বলেন 'শুনে একটু চমক জাগে, কিন্তু সে চমক নিতান্ত ক্ষণিক। একটু ভেবে দেখলেই দেখি, পৃথিবীর দীর্ঘতম ওয়ান ম্যান কমিকস ইন্ডাস্ট্রি ছিলেন যে মানুষটি, তাঁর প্রতি কমিকসের মজার দৃশ্য, সংলাপ, শট বিভাজন, সবটাই তাঁর নিজের হাতের সৃষ্টি। একজন দক্ষ লেখক ছাড়া এই কাজ অসম্ভব। কিন্তু নিজেকে কোনদিন লেখক বলেননি তিনি। দারুণ সব পাঞ্চলাইন লিখেও সংলাপ রচয়িতার খেতাব চাননি। আগাগোড়া নিজেকে বলতেন ছবি আঁকিয়ে। ইলাস্ট্রেটার। জীবনের একেবারে শেষ পাদে এসে তাঁরও কি সাধ হয়েছিল গল্প লেখার? যে ছবি তাঁর বাহন, তাঁকে একটু পাশে সরিয়ে রেখে কমলকে হাতে তুলে নিয়েছিলেন তিনি। লং হ্যান্ডে লিখেছিলেন তিনটি গল্প আর একটা স্মৃতিকথা। শেষটা অসম্পূর্ণ। তবু এই লেখাগুলো আমাদের কাছে অন্য এক নারায়ণ দেবনাথের সন্ধান দেয়।' ২০০২ সালে **শৈব ভারতী পূজাবার্ষিকী** তে একটি গল্প প্রকাশিত হয় নাম '**গোবিন্দর গোয়েন্দাগিরি**' লেখায় ও রেখায় নারায়ণ দেবনাথ। গল্পটি শুরু হয়েছে এই ভাবে—'নাম গোবিন্দ। গোবিন্দ পাল বন্ধুরা ডাকে গবু, গবা, যার যেমন খুশি। গোবিন্দর একটা প্রধান গুণ আছে যার জন্য বন্ধুরা ওঁকে খুবই পছন্দ করে। সেটা হল ওঁর তাৎক্ষণিক বুদ্ধির জোরে সব সমস্যার সমাধান করতে পারে। সেই কারণে বন্ধুরা ওকে খুবই ভালোবাসে এবং

কথা শোনে, আর ওর কথামতো কাজ করে।' গল্পে দেখা যায় গোবিন্দর একটি দল আছে, 'ওদের দলটা নানা খেলাধুলায়ও পারদর্শী। বলাবাহুল্য গোবিন্দই ওদের দলের দলপতি।' গল্প যত এগিয়েছে তত দেখা যায় গোবিন্দ তার বোলার বন্ধু পল্টুর ঘাস মেশিনকে আটোমেটিক করে দেয়—'তবে তোর বাগানের ঘাস আটোমেটিক কাটা হয়ে যাবে সে ব্যবস্থা আমি করে দিচ্ছি। এই বলে মেশিটনাতে একটু এদিক-ওদিক করে জ্বালানি হিসেবে একটু পেট্রোল দিয়ে বাগানের মধ্যিখানে একটা গাছের সঙ্গে লম্বা দড়ি দিয়ে বেঁধে চালিয়ে দিল ওটা দিব্যি ঘুরে ঘুরে ঘাস কাটা শুরু করে দিল।' এরপর পার্কের দিকে যেতে গিয়ে এক বাচ্ছা ছেলেকে কাঁদতে দেখে গোবিন্দ জানতে পারলো যে ছেলেটির পেনসিল কাটা ছুরি ঝাঁঝরির ফাঁক গলে নর্দমায় পরে গেছে। গোবিন্দ তা জানতে পেরে—'আমি দেখছি বলে পকেট থেকে একটা চুম্বক বের করে সুতোয় বেঁধে ঝাঁঝরি ফাঁক দিয়ে গলিয়ে দিল, পরক্ষণেই চুম্বকে আটকে ছুরিটা উঠে এল।' এরপর অল্প অন্যদিকে মোড় নিল যখন পার্কের ভিতর খেলার জায়গায় বেশ হৈ চৈ শুরু হলে এক মধ্যবয়সী লোকের ঘুমের ব্যাঘাত হওয়ার জন্য সে যখন রাগত ভাবে উঠে দাঁড়াল—আর সঙ্গে সঙ্গেই একটা রত্নখচিত ব্রোচ মাটিতে পড়ল।' পুলিশের জবানী থেকে জানা যায়—'আজই সকালে কাছাকাছি এক বাড়ি থেকে অভিযোগ করে গেছে যে তাদের একটা রত্নখচিত ব্রোচ চুরি গেছে।' এমন সময় গোবিন্দর কাছে থাকা চুম্বকটি একটি কাক নিয়ে চলে যায়। কীভাবে গোবিন্দ চুম্বকটি উদ্ধার করবে, আদৌ পারবে কিনা, সেই সঙ্গে আরও বড় কোনও রহস্যের জট সমাধান করতে পারবে কিনা সেটাই গল্পের মূল বিষয়। তবে গল্পটির 'Targeted Readers' মূলত ছোটোরা। কৌশিক মজুমদার বলেছেন—'গল্পটির সঙ্গে টিনটিনের '**পান্না কোথায়**' গল্পের অদ্ভুত মিল মনে রেখেও বলতে হয় নারায়ণী লেখার গুণে গল্পটি একেবারে বাংলার রস গন্ধ পেয়েছে।'

এরপর যে গল্পদুটির কথা বলব তাদের নাম '**এক প্রজাপতির মৃত্যু**' এবং '**কৌতূহলের বিপদ**'। দুটি গল্পেরই লেখা ও রেখায় নারায়ণ বাবু। ২০১২ সালে লেখা গল্প '**এক প্রজাপতির মৃত্যু**'। গল্পটির পরিণতি বড়ই মর্মান্তিক। গল্পটি একটি 'tragic' গল্প। গল্পটি একটু ছোট করে বলি—গ্রামের এক বছর ছয়-সাতের বাচ্চা মেয়ে প্রজাপতি, তার বাবা খেত-মজুর। 'গরিব ঘরের ছোট্ট একটি মেয়ে। ফুটফুটে সুন্দর মেয়ে হয়েছে; তাই বাবা, মা আদর করে নাম রেখেছিল প্রজাপতি। আর প্রজাপতির মতই সে উড়ে উড়ে বেড়াত। গ্রামের সবাই ওকে ভালবাসত।' কিন্তু হঠাৎ প্রজাপতির বাবা জমি সংক্রান্ত বিষয়ে খুন হন। কিছুদিন পর দুর্গাপূজা

এল, সেই পূজায় ফুল সংগ্রহের দায়িত্ব পেল ছোট্ট প্রজাপতি। ভোরবেলা বেড়িয়ে একাই ফুল সংগ্রহ করে সে, শেষে পদ্মফুল নিতে গিয়ে জলে ডুবে মারা যায় প্রজাপতি। 'দেখল তারই আদরের প্রজাপতির নিথর দেহ পরে আছে। আর আশ্চর্যের ব্যাপার এক ঝাঁক প্রজাপতি ওর শরীর ঘিরে উড়ছে, যেন বলতে চাইছে, শুয়ে আছ কেন? ওঠো, আমাদের সঙ্গে উড়বে চলো।' এরপর যে গল্পটি আলোচনা করব তা হল '**কৌতূহলের বিপদ**'। গল্পটি উত্তম পুরুষে বর্ণিত। কথকরা তিন বন্ধু মিলে এক সন্ধ্যায় কৌতূহলের কারণে এক মাতাল লোকের পিছু নিতে গিয়ে কি পরিস্থিতির মধ্যে পড়েছিল, এবং কি ভাবে সেই পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পায় তা নিয়েই গল্প। গল্পটি পূর্বে কবে কোথায় প্রকাশিত তা জানা যায়নি, তবে '**নারায়ণ দেবনাথ কমিকস সমগ্র : ৩**' খণ্ডে গল্পটি পুনর্মুদ্রিত। গল্পটির শুরু এই ভাবে—'কৌতূহল মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। কৌতূহল জিনিসটা প্রায় সকলের মধ্যেই কমবেশি বর্তমান।' যথারীতি ভূমিকা সেরে নারায়ণবাবু মূল গল্প শুরু করেছেন এই ভাবে—'একবার আমরা তিন বন্ধু এইরকম এক কৌতূহলের বশে সাংঘাতিক বিপদের মুখে প্রায় পড়ে গিয়েছিলাম। সেই ঘটনার কথাই এখানে বলছি। তখন ব্রিটিশ আমল, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। তখন এখনকার মতো রাস্তায় লোকজন ছিল না।...আর সন্ধের পর রাস্তায় লোকজন প্রায় থাকে না। তার ওপর যুদ্ধের জন্যে রাস্তা নিষ্প্রদীপ অর্থাৎ আলোর মুখে ঠুলি লাগা, যাতে আলো ছড়িয়ে না পড়ে।' গল্প চলতে চলতে আমরা দেখতে পাই তিন বন্ধুর বেপরোয়া হয়ে মাতালের পিছু নেওয়া,—'বুঝতে পারলাম লোকটা নেশাচ্ছন্ন হয়েছে। হঠাৎ আমাদের মধ্যে কৌতূহল জেগে উঠলো, লোকটা এই অবস্থায় কোথায় যায়? এর ফলে যে বিপদ হতে পারে সেটা তখন মাথায় এল না। তখন জানার কৌতূহলটাই প্রবল হয়ে উঠেছে।' নিছক দুলকি চালে স্মৃতি রোমন্থনের 'STYLE' এ গল্পটি যেন পাঠককে শুনিয়েছেন কথক। এ যেন স্মৃতির নিয়ন আলোয় ভেসে চলেছেন কথক নিজে, আর ভাসাচ্ছেন আমাদেরও। গবেষক কৌশিক মজুমদার বলেছেন—'তাঁর অন্য গল্প 'কৌতূহলের বিপদ'-এ নারায়ণ দেবনাথের হিউমার বজায় আছে পুরো'। আরও বলেছেন—'গোটা গল্পে সেই হাঁদা ভোঁদা বা বাঁটুলের মতো উত্তর কলকাতার পাড়া কালচারের ছাপ।'

আমরা যদি নারায়ণ বাবু সৃষ্ট যে কোনো কমিক্স তুলে নিই সেখানে কি ধরনের গল্পের চলন তা দেখে নেওয়া যাক, যেমন '**নন্টে আর ফন্টে**'-র একটা গল্প নেওয়া যাক যেখানে হোস্টেলের ওয়ার্ডেন খুব কমে একটি টিয়া পাখি কিনে

তাকে হরিনাম শেখাতে দায়িত্ব দেন কেল্টুর উপর, কেলটু দাদাগিরি দেখিয়ে সেই দায়িত্ব দেয় নন্টে-ফন্টে কে। তিন সপ্তাহ পরে কেল্টু শিক্ষিত টিয়াকে নিয়ে স্যারের কাছে গেলে টিয়া হরিনামের বদলে বলে—'দূর হতচ্ছাড়া! মোটকা ভুঁড়ো টেকো মুড়ো—কক্', অন্যদিকে অন্যের দ্বারা কাজ হাসিল করে বাহবা নিতে চাওয়া কেল্টুর পরিণাম সবচেয়ে হাসির ও মজাদার—'সবজান্তা মর্কটটা গেলো কোথায়? ডাণ্ডা দিয়ে আজ আমি হতচ্ছাড়াকে ঠাণ্ডা করে ছাড়বো!' (ওয়ার্ডেন) গল্পের শেষে দেখা যায় এটা আসলে নন্টে-ফন্টের বুদ্ধি, যা দিয়ে কেল্টুকে ওরা জব্দ করে। এই কমিক্সের গল্পে আমরা যেমন মজাদার ছোট্ট অথচ সহজ একটা গল্প পাই তেমন পাই হিউমার, তেমন কিছু দুর্দান্ত পাঞ্চলাইন, আর ছবি তো এক্ষেত্রে বাড়তি পাওনা। কিন্তু নারায়ণ বাবুর গল্পে অলঙ্করণ থাকলেও প্যানেল এর পর প্যানেল ছবি নেই, নেই কোন পাঞ্চলাইন। গল্পে তা থাকার কথাও নয়। ধরা যাক '**একটি প্রজাপতির মৃত্যু**' গল্পটি ট্র্যাজিক, একটা সাদামাটা দুঃখের গল্প আবার '**গোবিন্দর গোয়েন্দাগিরি**' গল্পে আছে উপস্থিত বুদ্ধির খেলা, বরং '**কৌতূহলের বিপদ**' গল্পে হিউমার বজায় আছে, এখানেও উপস্থিত বুদ্ধির প্রয়োগ হয়েছে, তবে তা কমিক্সের দুনিয়ার গল্পগুলির মতো তাঁর লেখা তিনটি 'main stream' গল্প সরেস হয়ে ওঠেনি তবে সহজ হয়ে উঠেছে সেকথা বলাই যায়। তবু বলা যায় নারায়ণ বাবুর তিনটি গল্প তিন ভিন্ন স্বাদের ছোটদের গল্প একই সাথে বড়োদের ও, এবং সারাজীবন যিনি একজন কমিকস শিল্পী সেই কমিক্স শিল্পীর লেখা গল্প হিসেবে বেশ ব্যতিক্রমী ও অভিনব।

আমরা পাঠকেরা বড়ো 'Stereotype', যিনি কবিতা লেখেন বেশি মাত্রায় তাঁকে আমরা 'কবি' বলতেই বেশি পছন্দ করি, তেমন যিনি গল্প লেখেন তিনি 'গল্পকার' এরকম আর কি...ঠিক এই ভাবেই যিনি সারাজীবন কমিক্স এঁকেছেন, লিখেছেন তাঁকেও আমরা 'illustrator' বলি কিংবা বড়োজোর কমিক্স শিল্পী এই তকমা পান তিনি পাঠকের কাছে, তবু সাহিত্যিক বলতে কুণ্ঠা বোধ হয় আমাদের, আমরা জানতে চাই না, বুঝতে চাই না যে সেই 'illustrator' মানুষটি কি ভাবে ভাবছেন, কি বলতে চাইছেন সেটা আমাদের মাথা ঘামানোর বিষয়ের মধ্যেই পরে না, একজন কমিক্স শিল্পীও যে শেষ বয়সে এসে main stream গল্প লিখে আমাদের চমকে দেওয়ার চেষ্টা করতে পারেন সেই চেষ্টার আমরা খোঁজ রাখি না, যেমন আমরা জানতে চাইনা, খোঁজ রাখতে চাইনা সেই অচেনা-অজানা আর একটি 'galaxy'-র যা প্রতিদিন প্রতিনিয়ত বুনে চলেন এই সব মানুষরা।

উৎস

১। নারায়ণ দেবনাথ কমিকস সমগ্র; ০৩; লালমাটি প্রকাশন
২। নারায়ণ দেবনাথ কমিকস সমগ্র; ০৪; লালমাটি প্রকাশন
৩। কমিকস ইতিবৃত্ত : কৌশিক মজুমদার; লালমাটি প্রকাশন
৪। প্রবন্ধ : কমিকস-এক অনন্য শিশুসাহিত্য : কৌশিক মজুমদার; কমিক্স ও গ্রাফিক্স ৪র্থ সংখ্যা
৫। প্রবন্ধ : শুধু কমিকস্‌ই নয়, পুরোদস্তুর গল্পও লিখেছেন নারায়ণ দেবনাথ! কৌশিক মজুমদার; প্রহর আন্তর্জালিক পত্রিকা; ১৮ জানুয়ারি, ২০২২
৬। কমিসক কথা : মলয় মণ্ডল; অভিযান পাবলিশার্স

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ. ডি. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

দ্বিজ বংশীদাস ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গল-কাব্য : কাহিনি ও বিষয় ভিত্তিক তুলনামূলক পর্যালোচনা

মিজানুর মণ্ডল

সারসংক্ষেপ :

মনসা সর্পের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই দিক থেকে বলা যায় মনসার পূজা প্রাচীনকাল থেকেই সমাজে প্রচলিত ছিল। ভয় ভক্তির দেবতা হিসেবে দীর্ঘকাল ধরে পূজা পেয়ে আসছেন। তবে সাপের পূজা অতি প্রাচীনকাল থেকেই এদেশ প্রচলিত থাকলেও মনসা এবং মনসামঙ্গলের প্রাচীনত্ব নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে বিস্তর মত পার্থক্য লক্ষ করা যায়। কেউ কেউ মনে করেন মধ্য এশিয়ার কোন কোন জাতির সর্পপূজা এদশে এসেছে। আবার অনেকে মনে করেন সর্পপূজা বিভিন্ন জাতির মধ্যে আদি থেকেই প্রচলিত ছিল। আচার্য সুকমার সেন ঋকবেদের একটি শ্লোকে মনসার সন্ধান পেয়েছেন। আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন বৌদ্ধ পাল রাজাদের রাজত্বের অবসানের পর সেন রাজাদের রাজত্বকালে অন্যান্য লৌকিক দেব দেবীর মতো মনসারও আবির্ভাব ঘটেছিল। ক্ষিতিমোহন সেন আবার দক্ষিণ ভারতের মঞ্চমার সঙ্গে মনসাকে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। মনসার সঙ্গে অন্যান্য দেবীর সাদৃশ্যের কথা অনেকে বলেছেন। জৈন দেবী 'পদ্মাবতীর' সঙ্গে মনসার মিলের কথাও কেউ কেউ বলছেন। মনসার অপর এক নাম পদ্মা বা পদ্মাবতী এবং কাব্যের নাম 'পদ্মাপুরাণ'। মনসার সঙ্গে আর এক জৈনদেবী 'পন্নগা'র সম্পর্কের কথা বলেছন সুধীভূষণ ভট্টাচার্য। তবে মনসামঙ্গলের কাহিনি যে লোককথা থেকেই এসেছে এ বিষয়ে সকলেই একমত।

সুদীর্ঘকাল ধরে মনসামঙ্গল কাব্য রচনার গতানুগতিক ছকে বাঁধা পথ ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কবিদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার কোন সুযোগ সে যুগে ততখানি ছিল না তাসত্ত্বেও যুগ-পরিবেশ,সমাজ-সংস্কৃতি, আঞ্চলিকতা, ভাষা ব্যবহার, চৈতন্যদেব ও পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব তাঁদের রচনাশৈলী ও কাহিনি বয়ানে পার্থক্য ঘটিয়েছিল। আর এখানেই সৃষ্টি হয়েছে অভিনবত্ব।

মূল শব্দ : মনসা, সর্প, মঙ্গলকাব্য, দেবী, পূজা, কেতকদাস ক্ষেমানন্দ, দ্বিজ বংশীদাস।

মঙ্গলকাব্যগুলোর মধ্যে মনসামঙ্গলই প্রাচীনতম। সর্পদেবী মনসার পূজা প্রচারের কাহিনি বর্ণনা করাই মনসামঙ্গলকাব্যের উদ্দেশ্যে। খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে তুর্কি অভিযানের পটভূমিকায় বাংলাদেশের উচ্চবর্ণের হিন্দু সমাজকে নিজেদের দুর্গ শক্তিশালী করবার প্রতিক্রিয়ার নিম্নবর্ণের অনেক আচার ও বিশ্বাসের সঙ্গে

আপোষ করতে হয়েছে। উচ্চবর্ণের প্রতিভূ চাঁদ সদাগর মনসাদেবীর শত নির্যাতন, বিড়ম্বনার মধ্যেও মাথা নিচু করেনি। অবশেষে স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে নিয়ে বামহাতে মনসার পূজা করেন। আসলে অনার্য দেবতা মনসাকে কতটা অভ্যন্তর বাধা বিপত্তি এবং সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আর্য সমাজে স্থান করে নিতে হয়েছিল। বাংলার সর্বত্রই কবিগণ এই কাহিনি অবলম্বনে কাব্য রচনা করেছেন।

এই ধারার দুজন উল্লেখযোগ্য কবি হলেন দ্বিজ বংশীদাস ও কেতকদাস ক্ষেমানন্দ। পূর্ববঙ্গের ধারার মনসামঙ্গলের অন্যতম প্রধান কবি দ্বিজ বংশীদাস। তিনি ছিলেন বাংলা সাহিত্যের প্রথম মহিলা কবি চন্দ্রাবতীর পিতা। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে সর্বপ্রথম এই কবির পরিচয় উদ্ধার করেন। প্রাচীন পালাগান সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার দে ময়মনসিংহ থেকে লোকমুখে প্রচলিত পালাগান সংগ্রহ করতে গিয়ে বংশীদাসের বিস্তারিত পরিচয় সংগ্রহ করেন। এবং সেই সমস্ত তথ্য 'সৌরভ' পত্রিকায় দুই কিস্তিতে প্রকাশ করেন ১৩২০ সালে। ১৩১৮ সালে দ্বারকানাথ চক্রবর্তী ও রামনাথ চক্রবর্তী সম্পাদনায় সর্বপ্রথম দ্বিজ বংশীদাসের 'পদ্মাপুরাণ' সম্পাদিত হয়ে প্রকশিত হয়। এতে বংশীদাসের কবি পরিচয় সম্পর্কে অনেক তথ্য বিবৃত হয়েছে। দ্বিজ বংশীদাসের মুদ্রিত পুঁথিতে যে আত্মবিবরণী আছে, তা থেকে বোঝা যায় যে কবির এক পূর্বপুরুষ রাঢ় দেশ ত্যাগ করে পূর্ববঙ্গে ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহাকুমার অন্তর্গত পাতোয়ারি গ্রামে বসবাস করতেন। এখানেই দ্বিজ বংশীদাসের জন্ম হয়। তাঁর পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম অঞ্জনা। বংশীদাসের আত্মবিবরণীতে কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি রয়েছে তা হল—

'জলধির বামেতে ভুবন মাঝে দ্বার
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার।'[১]

এটির অর্থ হল বংশীদাস ১৪৯৭ শকাব্দে বা ১৫৭৫ খ্রিস্টাব্দে পদ্মাপুরাণ রচনা করেন। কিন্তু ড. সুকুমার সেন, ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য প্রমুখ পণ্ডিতগণ বংশীদাসকে এত প্রাচীন কবি বলে মনে করেন না। সাধারণত বংশীদাসকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্থাপন করা হয়। বংশীদাসের কাব্যে আত্মবিবরণীতে হাজারাদি পরগণার অন্তর্গত পাতুয়ারী গ্রামের কথা বলা হয়েছে। ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য দেখিয়েছেন যে ১৫৯৫ খ্রিস্টাব্দে বার ভুঁইয়ার অন্যতম ঈশা খাঁ মানসিংহ দ্বারা পরাজিত হওয়ার পরে হাজরাদি পরগণার সৃষ্টি হয়েছে।[২] দ্বিজ বংশীদাসের রচনায় মগ, ফিরিঙ্গির উল্লেখ আছে। সে কালে পর্তুগীজদের ফিরিঙ্গি বলা হত। এই উল্লেখের জন্য অনেকেই বংশীদাসের পূর্বোক্ত কাল সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেছন। আবার ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ জানিয়েছেন—'রালফফিচ' (১৬০৬ খ্রিস্টাব্দ) পূর্ববঙ্গে

ঈসাখাঁর রাজ্যে অনেক পর্তুগীজকে বসবাস করিতে ও প্রভুত্ব খাটাইতে দেখিয়াছেন। কাজেই ফিরিঙ্গিদের উল্লেখের জন্য বংশীদাকে ১৫৭৫-৭৬ খ্রিস্টাব্দে এর পরবর্তী মনে করিবার কোনও কারণ নাই।[৩] আবার আশুতোষ ভট্টাচার্য মন্তব্য করেছেন যে, দ্বিজ বংশীদাস সতেরো শতকের পূর্ববর্তী লোক হতে পারেন না। তবে সব দিক বিবেচনা করে তিনি দ্বিজ বংশীদাসকে সতেরো শতকের মধ্যবর্তী লোক বলে মনে করেছেন। কবি তাঁর কাব্যে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়েছেন—

'বন্দ্যঘাটি গাই গোত্র রাঢ়ীর প্রধান।
শাণ্ডিল্য গোত্র বলি যাহার বাখান।।
গৌতম মুনির শাখা তৃতীয় প্রবর।
দাস উদ্ধব ধারা সামদেব পর।।
বংশ বীজ পূর্বে গোঁসাই চক্রপানি।
ভূত ভবিষ্যৎ আদি ত্রিকাল সে জ্ঞানী।।'[৪]

তাছাড়া দ্বিজ বংশীদাসের সুযোগ্য কন্যা বাংলার সুপরিচিত 'মহিলা কৃত্তিবাস' চন্দ্রাবতী তাঁর অনূদিত রামায়ণে পিতার যে পরিচয় দিয়েছেন তাহল—

'ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়
বসতি যাদবনান্দ করেন তথায়
ভট্টাচার্য বংশে জন্ম, অঞ্জনা ঘরনী
বাঁশের পালায় ঘর ছনের ছাউনী।
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়
কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে জায়।'[৫]

এছাড়াও চন্দ্রাবতী রচিত 'ময়মনসিংহ গীতিকায়' 'দস্যু কেনারামর পালা' থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে সুকণ্ঠ গায়ক কবি দ্বিজ বংশীদাস মনসার ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। এই গান শুনেই দস্যু কেনারামের পাষাণ মনও দ্রবীভূত হয়ে গিয়েছিল। এবং সে বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছিল। ঘটনাটি ছিল এই রূপ একবার দ্বিজ বংশীদাস তাঁর মনসার গানের দল নিয়ে কোন এক স্থানে যাচ্ছিলেন। পথের মধ্যে কেনারামের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাত হয়। কেনারাম দলবল সহ তাঁকে হত্যা করতে উদ্যত হল। বংশীদাস জন্মের শেষ মত একবার মনসার গান করবার আবেদন করলেন। কেনারাম সম্মত হল। দ্বিজ বংশীদাস গান আরম্ভ করলেন, কেনারাম শুনতে লাগলেন। যখন বংশীদাস বেহুলার ভাসান অংশ গাইলেন, তখন কেনারাম হাতের খাঁড়া দূরে ফেলে দিয়ে দ্বিজ বংশীর পায়ের উপর লুটিয়ে পড়ল। আজন্ম সঞ্চিত পাপের জন্য তার অনুতাপের সীমা রইলনা—

'শুন মোর কথা দেবদয়া যে করিয়া।
উদ্ধার করহ মোরে পদ স্থান দিয়া।।
তোমার চরণে মোর এহি নিবেদন।
অধম বলিয়া নাহি ঠেলো গুরুধন।।
পাপ কার্যে রত আমি পাপী মোর হিয়া।
আমার করহ পার পদতরী দিয়া।।'[৬]

এইভাবেই দ্বিজ বংশীদাস হয়ে উঠেছিলেন পূর্ববঙ্গের প্রাণের কবি। গ্রামে গ্রামে দলে দলে সুকণ্ঠ গায়কগণ ও কবি দ্বিজ বংশীদাস দল বেঁধে কবিকৃত মনসার ভাসান গান গেয়ে বেড়াতেন। গ্রামের দিকে প্রথমে মানুষজন সখ করে ধান, চাল, পয়সাকড়ি দিয়ে গান শুনত। কিন্তু ক্রমে তিনি ভাবের প্লাবনে দেশকে মাতিয়ে তুললেন। আর সেই অমর সঙ্গীতে কেনারামের পাষাণ হৃদয়ও গলে গেল। অবশেষে নিজেকে কবির চরণে নিবেদন করতে চাইলেন। কবির ভক্তির প্লাবনে ও ভালোবাসায় দেশের সমস্ত কুরীতি কুপ্রথা যেন দূরীভূত হল। তাই চন্দ্রকুমার দে মন্তব্য করেছেন—'বহু শতাব্দী পার হইয়া গিয়াছে, আজও পূর্ববঙ্গে সে স্বর্গীয় সুধার আশ্বাস ভুলিতে পারে নাই, আজও মনসা পূর্ববঙ্গে সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা, আজও মেঘভরা আকাশ ভুলে পল্লী কুটিরে বসিয়া লোকে সেই অমর সঙ্গীত গান করে। আজও সেই গীত শুনিয়া বরিষার ধারার ন্যায় কুল কামিনীগণ অশ্রু ধারা বর্ষণ করেন। আজও ময়মনসিংহের শিক্ষিতা ও অশিক্ষিতা ও অর্ধশিক্ষিতা কুলললনাগণ নাটক নোবেলের কথা দূরে রাখিয়া পদ্মপুরাণে নায়িকা বেহুলার পূত চরিত্রের কথা ভাবিতে তন্ময় হইয়া পড়েন।'[৭]

প্রথমেই বলা হয়েছে মনসামঙ্গল কাব্য ধারায় দ্বিজ বংশীদাস একজন শীর্ষস্থানীয় কবি। মনসামঙ্গল গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ছিল স্ত্রী দেবতা মনসার সঙ্গে শিব সাধক চন্দ্রধরের বিরুপতা। বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ মনসার সেই বিরোধের কাহিনি পরিবর্তিত হয়েছে। তাঁর মনসামঙ্গল কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে বৈষ্ণবধর্ম প্রভাবিত সমন্বয়মূলক মনোভাব। আর এই কারণেই তাঁর চাঁদ সওদাগর প্রথমে চণ্ডী ও মনসা এই উভয় দেবীর প্রতি সমদর্শী ছিলেন। কিন্তু পরে চণ্ডীর তাড়নায় চাঁদ মনসার সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়ে। শৈব চাঁদের সঙ্গে মনসার দ্বন্দ্বের পরিবর্তে চণ্ডী ও মনসরা বিবাদের কথা এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অর্থাৎ এটা মূলত চণ্ডী ও মনসার বিবাদ চাঁদ সদাগর উপলক্ষ মাত্র। চৈতন্য পরবর্তী কবি দ্বিজ বংশীদাস মনসামঙ্গল কাব্যের বিবাদের পটভূমি রচনা করেছেন শিবের পারিবারিক কোন্দলের মধ্যে। জীবন রসের সাধক বংশীদাস এমনিভাবে বাঙালি জীবনের প্রতিটি বৈচিত্র্য বৈশিষ্ট্যকে প্রাণস্পর্শী ভাষায় রসরূপ দান করেছেন—তাই তিনি পূর্ববঙ্গের প্রাণের কবি। কেতকদাস ক্ষেমানন্দ মনসামঙ্গলকাব্য ধারার আর একজন খ্যাতিমান কবি।

বাংলা সাহিত্যের অনেক কবিই মনসামঙ্গলকাব্য রচনা করলেও তাঁর কাব্যই প্রচুর জনপ্রিয়তা ছিল। ১৮৪৪ খ্রিস্টাব্দে তাঁর কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয়েছিল। পরবর্তীতে ১৮৫২ খ্রিস্টাব্দে এটি দ্বিতীয় বার মুদ্রণ সৌভাগ্য লাভ করে। এই কারণেই হয়তো তাঁর কাব্য বেশি প্রচার লাভ করে। বাংলা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাসকার রামগতি ন্যায়রত্ন তাঁর 'বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব' (১৮৭২) এ ক্ষেমানন্দের নাম করেছিলেন। এছাড়া তিনি আর অপর কোন কবির নাম করেননি। মনে হয় পূর্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কবিদের কথা তিনি জানতেন না। বটতলা থেকেও ক্ষেমানন্দের কাব্যের কয়েকটি মুদ্রণ হয়েছিল। ১৯৪৩ খ্রিস্টাব্দে যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য ক্ষেমানন্দের ৬৬টি পুঁথি অবলম্বনে একটি গ্রন্থ সম্পাদনা করেছিলেন। তবে তিনি ভিন্ন ভিন্ন পুঁথি থেকে ভিন্ন ভিন্ন পালা নিয়ে সম্পাদনা করেছিলেন। এতে কোন আদর্শ পাঠ নির্ণয় করা সম্ভব হয় না। তাছাড়া তিনি হাসান-হোসেন পালাটা ছাপেননি। এটিও সম্পাদনার পক্ষে ত্রুটি বলতে হয়। বর্তমানে ১৩৪৮ সালে অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেবর সম্পাদনায় কেতকাদাসের মনসামঙ্গল প্রকাশিত হয়েছে। কেতকাদাসের কাব্য বহুল পরিমাণে জনপ্রিয় ছিল। তাঁর কাব্যের পুঁথির সংখ্যাও কম নয়।

কবি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যের মধ্যে কোথাও কেতকাদাস, আবার কোথাও ক্ষেমানন্দ এই উভয় ভণিতাই ব্যবহার করেছেন। তার ফলে কোনটা কবির আসল নাম কোনটা উপাধি তা নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয়েছে। আচার্য সুকুমার সেন বলেছেন—'কেতকদাসই কবির আসল নাম বলিয়া গণ্য করা উচিত। এখন আমি তাহাই করিতেছি।'[৮] অন্যদিকে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেছেন কবির নাম ক্ষেমানন্দ, কেতকাদাস তাঁর উপাধি।'[৯] এইভাবে কেতকাদাস ও ক্ষেমানন্দকে দুজন কবি হিসাবে চিহ্নিত করলেও কম বেশি সকলেই এই সিদ্ধান্ত উপনীত হয়েছে যে কবি বিনয়বশত কেতকাদাস অর্থাৎ দাস বা ভক্ত অর্থে নিজের ক্ষেমানন্দ নামের আগে কেতকাদাস ভণিতা যুক্ত করেছেন। কেননা তাঁর কাব্যে মনসার জন্ম কেয়া পাতার হাওয়ায় মনসার অপর নাম কেতকা—

'কিআ পাতে জন্ম হৈল কেতকা সুন্দরী।'[১০]

কেতকাদাসের আবির্ভাবকাল সম্বন্ধে তেমন কোন সূত্র ছিল না। এতদিন পর্যন্ত যে নানা পুঁথি আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে কবির আত্মবিবরণী পাওয়া গেলেও কোন রচনাকাল সম্পর্কিত শ্লোক পাওয়া যায়নি। আত্মবিবরণীতে সেলিমবাদের শাসনকর্তা বারা খাঁর উল্লেখ আছে। এটা দেখে কেতকাদাসের কাব্য রচনাকাল সম্পর্কে ধারণা করা যায়। দীনেশচন্দ্র সেন, সুকুমার সেন, আশুতোষ ভট্টাচার্য, অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখেরা মনে করেন কেতকাদাস সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে কাব্য রচনা করেছিলেন। কিন্তু এই মতের পিছনে আত্মবিবরণী বড়

প্রমাণ হলেও, কোন রচনাকালজ্ঞাপক সন তারিখ ছিল না। কিন্তু পরবর্তীতে অক্ষয়কুমার কয়াল ও চিত্রা দেব সম্পাদিত কেতকাদাসের কাব্যে একটি রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোক পাওয়া যায়। যাইহোক এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পণ্ডিতেরা স্বীকার করেছেন।

কবি কাব্যের মধ্যে যে আত্মবিবরণী দিয়েছেন তা থেকে এবার আমরা প্রয়োজনীয় সূত্র উদ্ধার করতে পারি—

'রণে পড়ে বারা খাঁ বিপাকে ছারিব গাঁ
যুক্তি করে জননীজনক
দিন কথা ছাড়া যাই তবে সে নিস্তার পাই।
দেয়ানে হইল বড় ঠক।।
নিজ গ্রাম ছাড়া যাই জগন্নাথপুর পাই।
হেনকালে নিশি অবসান।।
তথা তেলি লম্বোদর উতরিতে দিল ঘর।
চালু হাঁড়ি সিধা গুয়া পান।।
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাহারে ভেটিতে যাই।
নাম তার রায় ভারমল্ল।।
তিনি দিয়া ফুলপান আর গ্রাম পাঁচখান।
বসতি করিতে দিলা স্থল।।'[১১]

এই আত্মপরিচয় থেকে আমরা অবগত হতে পারি যে, কবি রাঢ় বঙ্গের মানুষ ছিলেন। কবির আত্মপরিচয় বিবরণী থেকে জানা যায় যে কবির জন্ম বর্ধমান জেলার কাঁথড়ায়। কবির পিতার নাম ছিল শঙ্কর মণ্ডল। কবি তাঁর কাব্যে ভারমল্ল, বারা খাঁ, বিষ্ণু দাস ইত্যাদি রাঢ়ের শাসন কর্তাদের নাম করেছেন। এই সব দৃষ্টান্ত দেখে অনুমান করা হয় কবি ছিলেন সপ্তদশ শতাব্দীর। কবির পিতা শঙ্কর মণ্ডলের পৃষ্ঠপোষক যুদ্ধে মারা যান। এমতাবস্থায় আস্করন রায়েণ পরামর্শে কবির পিতা গ্রাম ত্যাগ করে জগন্নাথপুরে নীলাম্বরের বাড়িতে আতিথ্য করেন। নীলাম্বর তাঁদের চাল, পান, সুপারি দিয়ে অভ্যর্থনা জানান। এরপর বিষ্ণুদাসের ভাই ভারমল্ল কবির পিতাকে তিনখানি গ্রাম দান করেন। এই অবস্থায় কবি ও কবির পিতা মাতা সেখানে বসবাস করতে থাকেন। কবির আর এক ভাইয়ের নাম ছিল অভিরাম। মায়ের কথায় অভিরামকে নিয়ে জলা জমিতে খড় কাটতে গিয়ে কবি দেখেন কিছু বালক সেখানে মাছ ধরছে। কবি সেই সব বালকদের সঙ্গে ঝগড়া করে মাছগুলো তাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে অভিরামকে দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দেন। গালমন্দ করে বালকেরা মাঠ থেকে চলে যায়। এদিকে সন্ধ্যা হয়ে আসে। মাঠে কোথাও খড় দেখতে পান না কবি। আকাশে মেখ ওঠে ঝড়

হয়। আলো আঁধারের মাঝে কবি প্রথমে একটি মুচিনীকে মুহূর্তের জন্য দেখেন। মুচিনী তাঁর কাছে কাপড় আছে কিনা জানতে চাইলেন; ঠিক তখনই কবির পায়ে এক পিঁপড়ে কামড়ায়। সেদিকে দৃষ্টিপাত করতেই মুচিনী অন্তর্হিত হয়। ঘটনার ঘোর কাটাতে না কাটাতেই স্বরূপে দেবী আবির্ভূত হয়ে নির্দেশ দেন—

'শুন পুত্র ক্ষেমানন্দ/কবিত্ব করিয়া বন্ধ/আমার মঙ্গল গ্যায়া বুল।'[১২]

দেবীর নির্দেশে অতঃপর ক্ষেমানন্দ মনসার মাহাত্ম্যকথা লিখতে অগ্রসর হলেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের নাম 'জগতীমঙ্গল'। কাব্যটির রচনাকাল সম্পর্কে মতভেদ দেখা যায়। তবে কাব্যে কালজ্ঞাপক যে শ্লোকটি পাওয়া যায় তাহল—

'শূন্য রস বান শশী শিয়রে মনসা আসি
আদেশিল রচিত মঙ্গল।'[১৩]

অর্থাৎ ১৫৬০ শকাব্দ বা ১৬৩৮ খ্রিস্টাব্দে কাব্যটি রচনা করেন।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ছিলেন রাঢ়বঙ্গের কবি। কিন্তু মনসা ছিল সর্পের দেবতা। পূর্ববঙ্গের জলাজঙ্গলপূর্ণ লোকজীবনের সঙ্গেই যেন ছিল তাঁর একছত্র অধিকার। আর আমরা জানি রাঢ়ের লোকজীবনের জাতীয় দেবতা ধর্মঠাকুর। সেই সামাজিক ঐতিহ্য কেতকাদাসের কাব্যে নানাভাবে পরিস্ফুট হয়েছে। দেবদেবী বন্দনা অংশে কবি লিখছেন—

'প্রথমে বন্দিনু গুরু ধর্ম নিরঞ্জন।'[১৪]

আলাদাভাবে কেতকাদাসের কাব্যে ধর্মের বন্দনা নেই। কিন্তু গুরুবন্দনার প্রচলিত নিয়ম অনুসরণ করতে গিয়ে গুরুকে কবি ধর্ম নিরঞ্জনের সঙ্গে অভিন্ন কল্পনা করেছেন। আমরা জানি মঙ্গলকাব্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি অনুযায়ী কবিরা কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকেই একছত্র প্রাধান্য দিয়ে থাকেন। আলোচ্য কাব্যের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রমী নয়। তা সত্ত্বেও বলতে হয় সামাজিক ঐতিহ্যের প্রভাবেই হয়ত অন্যমনস্কভাবেও ধর্মঠাকুরের কথা কাব্যের নানা স্থানে এসেছে। নিজের অজ্ঞাতেই যেন পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রতিচ্ছবি অঙ্কন করেছেন আলোচ্য কাব্যে।

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যের মূল উপজীব্য বিষয় হল ঊষা-অনিরুদ্ধের শাপ গ্রস্ত হয়ে জন্মগ্রহণ, বেহুলার মৃত স্বামী লখিন্দরের স্বর্গে গিয়ে প্রাণ বাঁচানও এবং চাঁদ মনসার বিবাদের শেষে স্নেহের কাছে নতিস্বীকার ও মনসার দেবী রূপে প্রতিষ্ঠালাভ। কেতকাদাস তাঁর কাব্য রচনায় এই গতানুগতিক পথ মেনে নিয়েও ভিন্ন পথে চলার চেষ্টাও করেছেন। তিনি তাঁর কাব্যকে মথন, উষাহরণ, রাখালপূজা, ধন্বন্তরি, বেহুলা-লখিন্দর প্রভৃতি কতকগুলি খণ্ড খণ্ড পালায় বিভক্ত করেছেন।

সুদীর্ঘকাল ধরে মনসামঙ্গলকাব্য রচনার গতানুগতিক ছকে বাঁধা পথ ছিল। সেখান থেকে বেরিয়ে এসে কবিদের স্বাতন্ত্র্য দেখাবার কোন সুযোগ সে যুগে ততখানি ছিল না। তাসত্ত্বেও বলা যায় কবিদের অভিজ্ঞতায় যুগ-পরিবেশ, সমাজ-সংস্কৃতি, আঞ্চলিকতা, ভাষা ব্যবহার, চৈতন্যদেব ও পূর্ববর্তী কবিদের প্রভাব তাঁদের রচনাশৈলী ও কাহিনি বয়ানে পার্থক্য ঘটিয়েছিল। আর এখানেই সৃষ্টি হয়েছে অভিনবত্ব। দ্বিজ বংশীদাস চৈতন্যপরবর্তী যুগের কবি। চৈতন্যের বৈষ্ণবধর্মের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য সংস্কৃতি তখন প্লাবিত। চৈতন্যের পবিত্র জীবন, তাঁর আধ্যাত্মিকতা তৎকালীন সময়ে কবিদের উপর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। মনসামঙ্গলের কবি দ্বিজ বংশীদাসও তার ব্যতিক্রম নয়। তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে সমন্বয়মূলক মনোভাব। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য দেখা যায় চাঁদ সদাগরের ইষ্টদেবতা শিব নয়, শিবের পত্নী চণ্ডী। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে চাঁদ শিবের উপাসক। আর বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ চণ্ডীর উপাসক। এখানে মনসার সঙ্গে চণ্ডীর বিবাদ। দেবতা আর মানবের মধ্যে তিনি কোন বিবাদ ঘটালেন না। এমনকি চাঁদ সদাগর চণ্ডীর ভক্ত হলেও অন্য দেবতার প্রতি বিদ্বেষপরায়ণ নয়। তিনি যখন সনকাকে প্রথম পূজা করতে দেখলেন, তখন কোন ক্রোধ প্রকাশ করলেন না। বরং চণ্ডী ও মনসা যে অভিন্ন এই ভেবে স্তব করলেন—

‘করযোড়ে ভক্তিভাবে করিলেক স্তুতি।
ব্রহ্ম স্বরূপিনী তুমি আদ্যা প্রকৃতি।।
যেই দুর্গা সেই তুমি জগতের মাতা।
অভেদ চণ্ডিকা তুমি নাহিক অন্যথা।।’[১৫]

এইভাবে মনসামঙ্গল মূল আখ্যানের মধ্যে যে সব ছোট ছোট কাহিনি আছে সেগুলোকে উভয় কবিই পাল্টে দিচ্ছেন। ফলে কাহিনি বর্ণনায় ঘটেছে অভিনবত্ব। এইভাবে আখ্যানগত দিক থেকে দ্বিজ বংশীদাস ও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের তুলনামূলক দিকগুলো আলোচনা করে দেখান যেতে পারে।

কাহিনি বিন্যাসের দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে দ্বিজ বংশীদাস চারটি খণ্ডে কাহিনিকে বিস্তার করেছেন। যথা—বন্দনা অংশ, গোত্রাবলী, দেবখণ্ড এবং মানব খণ্ড। এইভাবে খণ্ডে ভাগ করে সেগুলোকে আবার কয়েকটি পর্বে বিন্যাস্ত করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ চোদ্দটি পালায় বিভক্ত করে সমগ্র উপাখ্যানটি হাজির করেছেন। বন্দনা অংশে দেখা যায় দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের শুরুতেই রয়েছে গণেশ বন্দনা, তারপর নারায়ণ, সরস্বতী, পদ্মা, ব্রহ্ম, দশ অবতারের বন্দনা এবং সর্বদেব বন্দনা দিয়ে কবি তাঁর বন্দনা অংশে সমাপ্ত করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ তাঁর কাব্যে আলাদা করে চৈতন্য বন্দনা করেছেন। কিন্তু দ্বিজ বংশীদাস চৈতন্য পরবর্তী কবি হলেও আলাদা করে চৈতন্য বন্দনা করেননি।

মনসামঙ্গলকাব্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাহিনি হল মনসার জন্ম কাহিনি। কারণ এই আখ্যানের মাধ্যমেই পৌরাণিক শিবের সঙ্গে লোকউৎসজাত মনসার সম্পর্ক নির্ণয় করা হয়। মনসার জন্ম কাহিনি বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবে দিয়েছেন। তাঁদের বিবরণে অনেক ক্ষেত্রে স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসার জন্ম কাহিনি যেন এক আকস্মিক ঘটনা। পাটনি বেশিনী পার্বতী দেখে চিনতে না পেরে শিব পরস্ত্রী লোলুপ হয়ে উঠলেন। শিবের মধ্যে কামবেগ জাগিয়ে অন্তর্হিত হন পার্বতী। এমতাবস্থায় মনোমুগ্ধকর সুশীতলবায়ু, সুধা কালো মেঘ বয়ে নিয়ে এল সুধাবৃষ্টি। ভ্রমরের গুঞ্জরে মুখরিত হল উদ্যান। এই পরিবেশে তিনি এক প্রেমাকুল চক্রবাক দম্পতিকে দেখে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। তাঁর বীর্যপাত হল পদ্মপত্রের উপর। তারপর পদ্মের মৃণাল বেয়ে নামল পাতালপুরীতে। এরপর—

‘গড়িয়া পড়িল বীর্য বাসুকির কোলে।
যত্নে বাসুকি লয়্যা থুইল তাম্র খোলে।।
বাসুকি আনিঞা দিল বিধাতার স্থান।
বিধাতা পাইয়া তাহা করিল নির্ম্মান।।’[১৬]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে মনসারা জন্ম কাহিনি বর্ণনায় অভিনবত্বের প্রকাশ ঘটেছে। এক্ষেত্রে দেবগণের নিকট ব্রহ্মা ধ্যানে জানতে পারলেন যে, মহাদেব এসেছে কমলের বনে। তাঁর প্রকৃতির রূপে মহামায়া শিবের শরীর হতে উদ্ভূত হয় জন্মের কারণে। এরপর পাতাল প্রবেশ করে বিষহরী অবতারকে সৃষ্টির কারণে। ব্রহ্মা তখন শিবের লক্ষণযুক্ত ত্রিনয়ী এক কন্যাকে কদ্রুর কোলেতে নির্মাণ করলেন—

‘কদ্রুর কোলেতে জন্ম অদ্ধ অঙ্গনাগ।
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অদ্ধ ভাগ।।
নাগের লক্ষণ ধরে শিরে অষ্টফণা।
রক্ত গৌর কান্তি অঙ্গ প্রতি সুলক্ষণা।
নাগ অলঙ্কারে বস্ত্রে করিয়া সুবেশ।
নানা আভরণে পুনঃ সাজিল বিশেষ।।
দেখি সুলক্ষণা কন্যা এতি শুদ্ধ চারু।
বিলক্ষণ নাম ব্রহ্ম থুইল জরৎকারু।।’[১৭]

মনসামঙ্গলের একটি অন্যতম চরিত্র নেত। এই নেত ‘দেবখণ্ড’, ‘মানবখণ্ড’ উভয় অংশেই উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে। দেবখণ্ডে নেতর জন্ম। তিনি কাহিনির অপ্রধান চরিত্র, তথাপি মনসার জন্মের পর তাঁর পূজা প্রচারের জন্য মনসাকে সমস্ত রকম সাহায্য ও উপদেশ প্রদান করেছে। তাই মনসামঙ্গলের

কবিরা নেতকে উপেক্ষা করতে পারেননি। নেত সাধারণত শিবের কন্যা, মনসার জ্যেষ্ঠ ভগিনী, স্বর্গের ধোপানী, মনসরা সহচরী রূপে কল্পিত হয়েছে। এই নেতর জন্ম প্রসঙ্গের কথাকে বিভিন্ন কবি বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেছেন। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায় চণ্ডীকে বিদায় করে মহাদেব এলেন কমলবনে। কমলবনের, মনোরম পরিবেশ, সুশীতলবায়ু, পক্ষীগণ পুষ্পের ডালে বসে গীত মুখরিত করছে। যত জীবজন্তুগণ মহানন্দে কেলি করছে। এমতাবস্থায় চণ্ডীকে মনে পড়ল শিবের। তখন তিনি চণ্ডীকে ফেলে একা একা বনে আসার জন্য আক্ষেপ করতে লাগলেন। এবং ভ্রমরের গীত শুনে মহাদেব কাম বিহ্বল হয়ে নাচতে লাগলেন। এই সময় মহামায়া নিজের জন্ম হেতু শিবের মনে প্রবেশ করে। কৃষ্ণাপঞ্চমী তিথি শ্রাবণে নাগ পঞ্চমীর দিনে কন্যা জন্ম হয়। একথা জেনে শিব ধ্যানে বসলেন। কিন্তু কন্যার কল্পনা তাঁর মনে ছিল। তারপর—

'তাহাতে চক্ষুর জল পড়িল ভূমিত।
কামরূপা কুমারী জন্মিল আচম্বিত।।
পরম পুরুষ সঙ্গে প্রকৃতির মেলা।
নেত্রজলে পদ্মিনী জন্মিল অংশকলা।।'[১৮]

অর্থাৎ দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে শিবের নেত্রজল থেকে নেতর জন্ম হয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে নেতর জন্ম মনসার জন্মের পূর্বেই হয়েছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসার সহচরীকে 'নেত' বলে উল্লেখ করেছেন। দ্বিজ বংশীদাস বলেছেন 'নেত্রাবতী'। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে শিবের নেত্রজল থেকে তার আবির্ভাব বলা হলেও কেতকাদাস লিখেছেন—

'পথ শ্রমে শ্রম যুত হর হৈলা শ্লথ।
টলিল ঘর্ম্মের কণা তাহে হৈল নেত।।'[১৯]

অর্থাৎ কেতকাদাসের কাব্যে শিবের ঘামের কণা থেকে নেতর জন্ম হয়েছে। মনসাকে রক্ষণাবেক্ষণ, বল, বুদ্ধি, পরামর্শদান করার জন্যই তার আবির্ভাব।

মনসামঙ্গল কাব্যের একটি উল্লেখযোগ্য প্রসঙ্গ হল পদ্মার প্রথম পূজালাভ। প্রত্যেক কবিই এই প্রসঙ্গের বর্ণনা করেছেন। কিন্তু কবি ভেদে ভিন্নতা এসেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে দেখা যায় পুষ্পবনে পিতা পুত্রীর সাক্ষাৎ, ফুলের সাজিতে করে পদ্মাকে গৃহে নিয়ে আসা, চণ্ডী-মনসার দ্বন্দ্ব, পদ্মার সিজুয়া পর্বতে গমন, শিবের বিষপান, মনসার বিবাহ, মুনি কর্তৃক মনসাকে ত্যাগ প্রভৃতি ঘটনাগুলোর পর মনসা এবার নিজেই পূজা লাভের বাঞ্ছা করেছেন। মনসার নিজের কোথাও মনে হচ্ছে এবার একটা স্থান দরকার। কেননা তাঁর পিতা মহাদেব চৌদ্দ ভুবনের স্থিতি। তাঁর কন্যা হয়ে কেও তাঁকে পূজা করে না। ভালোমত জানেনা তাঁর পরিচয়। এইভাবে একটি বঞ্চনার যন্ত্রণা মনসাকে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছিল। এবার

তিনি নিজে মাঠে নেমে পড়লেন—

'শুনহ বহিনী নেত কিছু নহে করিয়ত
যদি পুজে নহে ত্রিভুবনে।।'[২০]

পরামর্শ অনুযায়ী দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশ ধারণ করে রাখালবালকদের ছলনা করে রাখালবালকদের দ্বারায় পূজিত হন।

কিন্তু দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায়, রাখালগণ কর্তৃক পদ্মাকে পূজার অনেক পূর্বেই 'পদ্মার প্রথম পূজা' বলে একটি প্রসঙ্গ আছে। এবং এখানেই পদ্মার প্রথম পূজা হয়। বিষয়টি এইরূপ—পদ্মা ব্রহ্মার নিকট অবগত হলেন তাঁর পরিচয় সম্পর্কে। পদ্মবনে পিতা-পুত্রীর সাক্ষাৎ ঘটল। তখন শিবের মনে পড়ল নিজ বীর্যে অযোনি সম্ভবা মনসার জন্মের কথা। তখন শিব মনসাকে সাদরে কোলে নিয়ে মস্তকে চুম্বন করলেন। পরবর্তীতে একটা আখ্যান দ্বিজ বংশীদাস সংযোজন করেছেন সেটা আমরা কেতকাদাসের কাব্যে পাইনা। বাছাইর নগরে সর্বলোকে হৃষ্ট পুষ্ট হয়ে সুখে বসবাস করে। আর সেই রাজ্য জুড়েই বাস করে বাছাই অধিকারী। পিতার নাম গুণাকর মাতা মালতী। ধনে ধান্যে পূর্ণ অতি মনোহর রাজ্য বাছাইর নগর। তা দেখে, শিব ভাবলেন মাতাহীন সংসারে মনসাকে লালন-পালন করবে কে? বরং এই বাছাই তার উপযুক্তস্থান। অতএব এইরাজ্যেই তাঁর পূজা প্রচার করব—

'ইহা দেখি অন্তরে ভাবেন শূলপাণি।
এই রাজ্যে কন্যারে করিব পূজ্য মানী।।
মাতা নাহি কন্যারে পুষিবে কোন জনে।
সংসারে পূজুক তারে আপনার গুনে।।'[২১]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে কিন্তু শিব নয়, মনসা নিজেই পূজা প্রচার করতে চেয়েছেন।

চণ্ডী মসনসার দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গটি মনসামঙ্গল কাব্যের দেবখণ্ডের এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মনসামঙ্গলের সমস্ত কবিই এই প্রসঙ্গ গতানুগতিকভাবে বর্ণনা করেছেন। তবে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে পুষ্পবন থেকে ফিরে পুষ্পের করণ্ডীতে পদ্মাকে লুকিয়ে রেখে শিব অন্যত্র যাত্রা করেন। চণ্ডী করমণ্ডীতে অপূর্ব সুন্দরী কন্যাকে দেখে সতিনী ভেবে প্রহার করতে থাকেন—

'পদ্মা বলে ছাড় সতই বড় দুঃখ পাই।
শঙ্কর আমার বাপ তুমি যে সতাই।।
পদ্মবন হতে পিতা আনিয়াছে ঘরে।"[২২]

কবিরা স্বাতন্ত্র্য দেখিয়েছেন। যেমন দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে বর্ণিত আছে—চণ্ডী এতেও নিরাশ না হলে গঙ্গা তখন চণ্ডীর নিন্দা শুরু করে। চণ্ডীকে এইভাবে

গঙ্গার নিন্দামন্দ করার বিষয়টি দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে অভিনবত্বের সূচনা করেছে। এটা আমরা কেতকাদাসের কাব্যে পাইনা। তাছাড়া মনসাকে চণ্ডীর প্রহার করবার সময় মনসার চেখ কানা করবার ঘটনা আছে, সেটা বর্ণনা করতে গিয়েও—

'এত বলি কোপে চণ্ডী না করিল আন।
নখাঘাত করি বামচক্ষু কৈল কাণ।।'[২৩]

অপরদিকে কেতকাদাসের কাব্যে মনসার চোখ অন্ধ হয় দগ্ধ অঙ্গারের দহনে—

'দাহন অঙ্গারে দেবী মনসারে।
বামচক্ষু কৈল অন্ধ।।'[২৪]

মনসামঙ্গলের কাহিনিতে মনসার বিবাহ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বিবাহ মানেই সুখ, দুঃখ, আনন্দ, ভালোবাসার অনুভূতি। বিবাহ মানুষের জীবনে একটা আনন্দময়তা দান করেন। কিন্তু মনসার ক্ষেত্রে এগুলো কোনটাই ঘটেনি। বরং বিবাহ তাঁকে এক চরম দুর্দশা ও হতাশার মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। বংশীদাসের কাব্যে শিব মনসরা বিয়ের জন্য নারদের সহায়তা না নিয়ে ব্রহ্মার শরণাপন্ন হলেন। ব্রহ্মার সঙ্গে আলাপ আলোচনা করে শিব জরৎকারুর খোঁজ পেয়ে ব্রহ্মাকে সঙ্গে করে নিয়ে তপোবনে গিয়ে হাজির হলেন। জরৎকারু তখন তপস্যামগ্ন। তপস্যা ভাঙলে ব্রহ্মা জরৎকারুকে মনসাকে বিবাহ করতে বলেন। জরৎকারু পিতৃপুরুষের বাণী স্মরণ করে ব্রহ্মার দেওয়া প্রস্তাবে শর্ত অনুযায়ী রাজী হলেন। ব্রহ্মা শর্ত মেনে নিয়ে মনসার সঙ্গে জরৎকারুর বিয়ে সম্পূর্ণ করেন। মনসা এদিকে শর্তের ব্যাপারে কিছুই জানতেন না। বিবাহের পর একদিন মসার উরুতে জরৎকারু মুনি দিবানিদ্রা গিয়েছিলেন। এমন সময় সাগরপারে রমণক দ্বীপে কালিনাগের সঙ্গে গরুড়ের বিবাদে কালিনাগ পরাজিত হয়। তখন ক্রোধবশত কালিনাগের ফণায় সূর্য ক্ষণিকের জন্য ঢাকা পড়ে যায়। মনসা সন্ধ্যাকাল ভেবে স্বামীকে জাগিয়ে তোলেন। কিন্তু একটু পরেই আকাশ পরিষ্কার হয়। মনসার এই অপরাধে ক্রুদ্ধ হয়ে জরৎকারু মনসাকে পরিত্যাগ করেন—

'আজি হনে তোমার আমার দায় নাই।
তুমি একা সুখে থাক আমি বনে যাই।।
ই বলিয়া চলে মুনি ছাড়ি গৃহবাস।
দণ্ড কুমণ্ডল হাতে ধরিয়া সন্ন্যাস।।'[২৫]

কেতকাদাসের কাব্যে শিব মনসার বিয়ের ব্যাপারে নারদের পরামর্শ চাইলে দেবী ভাগবতী শিবকে খোঁটা দিয়ে নানান কথা শুনিয়ে দেন। কিন্তু মহাদেব ভগবতীর কথায় কর্ণপাত না করে মনসাকে ঋষিকুলে বিয়ে দেবেন এই ধারণায় অনড় থাকলেন। এবং নারদকে ঋষি কুলের কোন পাত্র নির্বাচন করতে বলেন। শিবের কথা মত নারদ তপস্যারত জরৎকারুর নিকট হাজির হয়ে তাঁর অভিপ্রায়

জানালে জরৎকারু কটাক্ষ করে বলেন—

'বিভাতে নাহিক নাগ রাশি কন্যা।
কি কব হরের কথা কহিতে আপার।।
জন্ম কম্ম জানি তার কুলের বিচার।।'[২৬]

জরৎকারুর এই কটাক্ষ নারদকে দুঃখ দেয়। তখন তিনি শিবের মাহাত্ম্যের কথা জরৎকারুর নিকট বর্ণনা করলেন। এত করেও যখন কোন ফল হল না তখন তিনি কৈলাসে ফিরে শিবকে সব কথা জানালেন। শিব এবার কৌশল কাজ হাসিল করার জন্য যমালয়ে যান শিবের কথায় যম জরৎকারুর পিতৃপুরুষের উপর নারকাবাসের অত্যাচার শুরু করেন। যমের অসহ্য অত্যাচারে যন্ত্রণায় ভোগ করতে করতে তাঁরা জরৎকারুকে মনসা বিবাহের জন্য অনুরোধ করেন। জরৎকারু পিতৃপুরুষের যন্ত্রণার দিকে চেয়ে বিবাহে সম্মতি দেন। যথারীতি বিবাহ হয়। বিয়ের পর মনসা জরৎকারু নিশি যাপনের জন্য বাসর ঘরে যান। চণ্ডী কৌতুকবশত ঘরে মায়াভেক ছেড়ে দেন। এতে মনসার নাগেরা বেড়িয়ে আসে। ভয়ে জরৎকারু মুনি মনসাকে পরিত্যাগ করেন—

'চণ্ডীর কৌতুক দেখিয়া মণ্ডুক।
উঠিল গজ্জ্যা।।
আশে পাশে ফণী ত্রাসে মহামুনি।
তেজিল পুষ্পের শয্যা।।'[২৭]

পুরাণের সমুদ্র মন্থন কাহিনিকে মনসামঙ্গলের কবিগণ তঁদের কাব্যে প্রযুক্ত করেছেন। কেতকাদাসের কাব্যে বিষয়টি একটু ভিন্নভাবে বর্ণিত হয়েছে। সমুদ্রমন্থনের উদ্দেশ্য বিষয়ে প্রচলিত পুরাণের সঙ্গে কেতকাদাসের পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। পুরাণে বর্ণিত আছে যে দেবতারা অমর হওয়ার জন্য অমৃতলাভে লালায়িত ছিলেন। আর সেই অমৃত লুকানো ছিল সমুদ্রগর্ভে তাকে তুলে আনার জন্য সমুদ্রমন্থন জরুরি ছিল। এই মন্থনের আর একটি উদ্দেশ্য ছিল সাগর জলে ডুবে থাকা লক্ষ্মীর পুনরুদ্ধার। কিন্তু এসবের পাশাপাশি কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ বর্ণনা করেছেন একাদশে উদ্ভূত হলেন অগ্নি। দেবতারা এরপর শিবকে ক্ষান্ত হতে বললেন। কিন্তু তিনি তা শোনবার পাত্র নন। এরপরেই কেতকাদাস লিখছেন—

'দেখি কালকূটি বিষ দেবগণ বিমরিষ।
হরি ব্রহ্মা গনিল হুতাশ।।'[২৮]

দেবতারা শঙ্কিত হলে শিব সবাইকে আশ্বস্ত করে নিজেই গলধঃকরণ করলেন সেই তীব্র বিষ। বিষের জ্বালায় তাঁর কণ্ঠ জ্বলতে লাগল। সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি মূর্ছিত হলেন। তখন দেবী বিষহরীকে আনার পরামর্শ দিলেন দেবতারা। মনসা এসে বিষ তুলে ফেলার ব্যবস্থা করলেন। শিবের কণ্ঠ থেকে

নির্গত হওয়া বিষ মৌমাছি বিছা, পোকামাকড় ও সর্পের শরীরে আশ্রয় নিল। অপরদিকে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে লক্ষ্মীকে পুনরায় দেবলোকে ফিরিয়ে নিয়ে আসার জন্য মিলিত সমুদ্রমন্থন আরম্ভ করেন। বারুণী দেবী, উচ্চৈশ্রবা, ঘোড়া, চন্দ্র প্রভৃতি উঠে আসে—

'মথিতে মথিতে বিষ উঠে তার পরে।
নাগ গণে পাই বিষ উঠিল সাগরে।।
উঠিল ধন্বন্তরি শিঙ্গা ডম্বুর ধরি।
অমৃত সহিত উঠে কমণ্ডুল ভরি।।'[২৯]

পরিশেষে লক্ষ্মী উঠে এলে আনন্দে সবাই হরিধ্বনি শুরু করতে লাগলেন। বংশীদাসের কাব্যে সমুদ্রমন্থনের কাহিনি অনেক পূর্বেই বর্ণিত। আর এক্ষেত্রে সমুদ্রমন্থন বিষপানে শিবের মূর্ছা যাওয়া, মনসা কর্তৃক পুনর্জীবন দানের ব্যাপারটি নেই। এক্ষেত্রে সমুদ্রমন্থনের একমাত্র উদ্দেশ্য লক্ষ্মী দেবীকে পুনরুদ্ধার। তাই এক্ষেত্রে কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ ও দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে আখ্যানগত পার্থক্য সূচিত হয়েছে।

চাঁদ মনসার বিবাদের ক্ষেত্রে উভয় কবই কিছু কিছু নতুন তথ্য সংযোজনের চেষ্টা করেছেন। যেমন চাঁদের নাখরা বন ধ্বংস বা গুয়াবাড়ি কাটার ক্ষেত্রে কেতকাদাসের কাব্যে লক্ষ করা যায় মনসা স্বয়ং নন, তাঁর নির্দেশে হনুমান এই কাজটি সমাধান করেছেন—

'দেবী কহে হনুমান পরনের সুত।
বাপার সমন্ধে তুমি বট মোর পুত।।
সীতার উদ্ধারকালে পবন নন্দন।
লঙ্কায় ভাঙ্গিলে যেন অশোকের বন।।
সেইমত মোর আছি হবে ত্বরা।
অবিলম্বে কাটি পাড় চাঁদের নাখরা।।'[৩০]

আর দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায়—

'মনুষ্য শরীর ধরি সর্প রূপ এড়ি।
কুড়াল হাতে লৈয়া কাটে বাগোয়ান বাড়ি।।'[৩১]

চাঁদের নাখরা বাগান ধ্বংস করতে গিযে অপমানিত মনসার প্রতিহিংসা দ্বিগুণ হয়। মনসা নেতর সঙ্গে পরামর্শ করে নটীবেশে চাঁদের মহাজ্ঞান হরণ করতে প্রবৃত্ত হয়। এই ঘটনা বর্ণনায় উভয় কবির মধ্যে স্বাতন্ত্র্য লক্ষণীয়। কেতকাদাসের কাব্য বর্ণনায় আমরা অবগত হতে পারি যে, চাঁদ সদাগর মহাজ্ঞানের অধিকারী বলে তাঁর অহঙ্কার আছে। সে কিছুতেই মনসার পূজা করবে না। চাঁদের দ্বারা মনসা পূজা না পেয়ে নেতর সঙ্গে পরামর্শ করে নটীবেশে চাঁদের মন মোহিত

করে মহাজ্ঞান হরণ করেছেন নটীর নানা ছলনায়, কৌশলে চাঁদের মোহ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পেতে থাকে। অমূল্যরতন, সাত মরাই টাকা,কঙ্কনকাঠি প্রভৃতির বিনিময়ে চাঁদ নটীর আলিঙ্গন কামনা করে। চাঁদের দুর্বলতা বুঝে নটী চাঁদের সামনে শর্ত আরোপ করেন—

'শিরে জটা ধরা যতি বেউশ্যা সম্ভোগ।
আমার অধম্ম তুমি পাসরিবে যোগ।।
ছিণ্ডিয়া মাথার জট রাখ পৃথিবীতে।
এড়হ অন্তর তব যেবা লয় চিত্তে।।'[৩২]

এই কথা শুনে সচেতন হয়ে উঠলে নটী তাকে মোহবাণে মোহিত করে তুলল। তখন তিনি মাথার জট ছিন্ন করে পৃথিবীতে রাখলেন।

দ্বিজ বংশীদাসের বর্ণনা সম্পূর্ণ আলাদা। এক্ষেত্রে মনসার মহাজ্ঞান হরণ অংশে নেতর পরামর্শে বনে গিয়ে তপস্যার ছলনা করেন পদ্মা। নেতা হরিণ রূপ ধারণ করে ভুলিয়ে ভালিয়ে চাঁদকে পদ্মার নিকট হাজির করেন। এই অংশের আখ্যান বর্ণনায় তিনি রামায়ণ কাহিনির আশ্রয় নিয়েছেন। রামায়ণে যেমন মারীচের মায়ায় রামচন্দ্র বন থেকে বনান্তরে ছুটে বেড়িয়েছেন, তেমনি এখানেও নেত হরিণী ছদ্মবেশে চাঁদকে বন থেকে বনান্তরে ঘুরিয়ে মনসার নিকট হাজির করেছেন। বনে তপস্যারত পরমাসুন্দরীকে দেখে চাঁদ বলেছন—

'কে তুমি সুন্দরী কহ থাক কোনস্থানে।
এমত যৌবনকালে কেন তপোবনে।।'[৩৩]

একথার উত্তরে ছলনাময়ী মনসা জানিয়েছেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতির সর্পাঘাতে মৃত্যু ঘটে। তাই তিনি প্রতিজ্ঞা করেন যে পুরুষ মহাজ্ঞানের অধিকারী তিনি তাকেই বিয়ে করবেন। নচেৎ তপস্যায় জীবন ত্যাগ করবেন। একথা শুনে চাঁদ বলেন—

'আমারে করহ বিয়া না ভাবিহ আন।
সদাই ও নিবা বাদ্য বিষহরী মুড়ান।।'[৩৪]

চাঁদের এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে মনসা তাঁর মহাজ্ঞান মন্ত্র পাবার আশা প্রকাশ করলে, চাঁদ আড়াই অক্ষরের মন্ত্র উচ্চারণ করলেন। মন্ত্র পেয়ে হরষিত মনসা তার সত্যতা যাচাই করবার জন্য একটু বাঁকা সুরে চাঁদকে কটাক্ষ করেন। চাঁদ তখন মরামাছি মনসার হাতে দেয়। মনসার মহাজ্ঞান প্রয়োগে মরামাছি প্রাণ পায়। মনসা চাঁদের সম্মুখ থেকে সহসা অন্তর্হিত হন।

দ্বিজ বংশীদাস কাব্যে চাঁদের ছয় পুত্রের মৃত্যু কাহিনি অভিনব। কেননা কেতকাদাসের কাব্যে দেখা যায়, মনসার কোপে ধন্বন্তরি মরল। তবুও চাঁদ সদাগর

মনসার পূজা করতে অরাজি। মনসা এবার চাঁদকে বড় আঘাত দিতে বেছে নিলেন চাঁদের ছয় পুত্রকে। তিনি এবার স্নেহ বাৎসল্যের মূলে কঠোর আঘাত করতে চাইলেন। ভাবলেন এতেই বোধহয় চাঁদ দুর্বল হয়ে তাঁর পূজা করতে বাধ্য হবে। এই জন্যই তিনি বিঘতিয়া নাগকে পাঠালেন চাঁদের বাড়ি। সে চুপিসারে চাঁদের বাড়িতে প্রবেশ করে বিষাক্ত অন্ন দ্বারা চাঁদের ছয় পুত্রকে হত্যা করে—

'বিঘতিয়া গেল তথা দেবীর বচনে।
উগরিল কালকূটি ওজন ব্যঞ্জনে।।
মধ্যাহ্নের কালে ভুঞ্জে তনয় সকল।
ছয়পুত্র মৈল তার খাইয়া গরল।।'[৩৫]

দ্বিজ বংশীদাস এক্ষেত্রে আখ্যানটিকে পাঠকের কাছে আকর্ষণীয় করতে পাঠককে একটু টানটান উত্তেজনা রাখতে তিনি ছয় পুত্রকে একই সঙ্গে মৃত্যু ঘটালেন না। মনসাকে দিয়ে এক এক করে ছয়টি নাগকে দিয়ে ছয় বারে চাঁদের ছয় পুত্রকে দংশন করিয়াছেন—

'চান্দর প্রধান পুত্র নাম শ্রীকর।
বাহির খণ্ডেতে বসি থাকে নিরন্তর।।
ধামলা আসিয়া বৃদ্ধ বিপ্র রূপ ধরি।।
পুষ্পমালা হাতে দিল আশীর্বাদ করি।।
ভ্রমরের রূপ হৈয়া পুষ্পে থাকি নাগে।
শোকিতে কামড় দিল নাসিকার আগে।।'[৩৬]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে হাসান হোসেন পালা বিস্তৃত। হাসান হোসেন দুই ভাই। তাঁদের ধর্ম ইসলাম। স্বভাবতই তারা মনসা বিদ্বেষী। হাসান হাটিতে তাঁদের রাজ্য। তাঁদের রাজ্যের মধ্যেই কচুয়ার তীরে রাখালরা দেবী মনসার পূজার আয়োজন করেছে। খবর পাওয়া মাত্র দূত সাদ্যাকে পাঠালেন ব্যাপারটা জানতে। স্যাদা এসে পূজার উপকরণ বিনষ্ট করলে রাখালরা তাকে লাঞ্ছিত করে। সাদ্যা ফিরে এসে হাসানকে ঘটনাটা জানালেন। হাসান যবনসেনা নিয়ে কচুয়াতট ঘিরে ফেললেন বিধর্মীদের উচিত শিক্ষা দিতে। মনসা তাঁর ভক্তদের বিপদ দেখে কৌশলে বিষধর ভীমরুল ও প্রচণ্ড চুলকানি যুক্ত আলকুশি দ্বারা যবন সেনাকে উপযুক্ত শাস্তি দিলেন। তখন যবন সেনা যে যার মতো ছত্রভঙ্গ হল। পরবর্তীতে দেবী হাসানহাটি ধ্বংস করেন। সকালে নিঃশব্দ পুরী দেখে কপালে করাঘাত করতে থাকেন হাসান হোসেন। তাঁদের মনে পড়ে গেল জননীর কথা। যিনি হিন্দু দেবীর সঙ্গে বিবাদ করতে নিষেধ করেছিলেন। এমতাবস্থায় অন্যত্র পালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় দুইভাই। কিন্তু রাত্রে দেবী স্বপ্নাদেশ দিলেন—

'শুনহ হাসান রাজা আমি খরতরি।
যেই দেবী মজাইল তোর নিজ পুরী।।

অদাতক আছে তোর বাপের মোকাম।
মসিদ ভাঙ্গিয়া কর দেহার নির্মাণ।।
জীবে যদি বাঞ্ছা হেন থাকে তোর মনে।
মোরে পুর ছাড়ি দিয়া যাহ অন্য স্থানে।।'[৩৭]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে হাসান হোসেন পালার নাম হয়েছে—'কাজির বিড়ম্বনা।' এবং আলোচ্য অংশে হিন্দু-মুসলমান সম্পর্কের সম্প্রীতির কথা আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে দেখা যায় গোপ বালকগণ দ্বারা মনসা পূজার সময় এক কাজি এসে উপস্থিত হন। তিনি তাদের পূজাকে ভূতপূজা বলে বিড়ম্বনা শুরু করেন। তখন সকল কাজি মিলে বলে উঠলেন—

'পূজা ভাঙ্গি বাড়িয়ে ভাঙ্গিল ঘট বারি।
আসন করণ্ডী ভাঙ্গি কৈল খান চারি।।'[৩৮]

তৎকালীন ছিল মুসলমান রাজত্ব। সমাজে কাজিদের প্রাধান্য ছিল খুব বেশি। মাঝে মাঝে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ প্রতিরোধও গড়ে উঠেছিল। আমরা আলোচ্য দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে লক্ষ্য করি ক্ষমতাবলে মূর্তি ভেঙ্গে ফেলেছে কাজীর লোকজন। কিন্তু সকলে তো সমান নয়। সমাজে কিছু শুভবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরও দেখা মেলে। তাইতো এদের মধ্যে একজন কাজির আবার অন্য ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা দেখা যায়। সে এটাকে মেনে নিতে পারেনা। তাই সে এই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে বলে ওঠেন—

'তার মাঝে একজন জাতি মুসলমান।
সে বলে, উচিত নহে, রাখ হিন্দুয়ান।।
একই ঈশ্বর দেখ হিন্দু মুসলমান।
যার তার কর্ম সেই করে ধর্মজ্ঞান।
সকলের কুচার সৃজিলা গোঁসাই।
পাষণ্ড হইয়া তাতে কোন কার্য নাই।।'[৩৯]

কাজিদের উৎপীড়নে বালকগণ সকলে মিলিত কাজিদের উপর পাল্টা আক্রমণ করে। কাজিরা তখন পালিয়ে গিয়ে হাসান হোসেনকে এ সংবাদ জ্ঞাপন করল। এর ফলে হাসান হোসেন যুদ্ধযাত্রা করে। বালকগণ তখন তাদের পূজার স্থান ছেড়ে পলায়ন করে। তারা মনসা দেবীর শরণাপন্ন হন। দেবীর আদেশে বিঘতিয়া নাগ সমস্ত যবনপুরী দংশন করে দেয়। পরবর্তীতে আবার হাসান হোসেনের মা মতিজা বিবির ক্রন্দনে এবং নিজ পূজার বিনিময়ে মনসা তাদের পুনর্জীবন দেন। আসলে দীর্ঘদিন সহবস্থানের ফলে মিলেমিশে যায় আমাদের সংস্কৃতি। তাই দ্বিজ বংশীদাসও মনসার মাহাত্ম্য প্রচারে বলেছেন—

'কলিযুগে মাও, তুমি সাক্ষাৎ দেবতা।
হিন্দু কি যবন তুমি সকলের মাতা।।'[৪০]

আসলে মনসামঙ্গলকাব্য হিন্দু-মুসলিম সকলের কাছেই প্রিয়। বিশেষত বেহুলাকে শ্রদ্ধা না জানিয়ে কারুরই উপায় থাকে না। এইভাবে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যের আলোচ্য অংশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অসাধারণ চিত্র লক্ষ করি। যেটা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাই না।

বিবাহযোগ্য লখিন্দরের বিবাহের ব্যবস্থার জন্য চাঁদ সদাগর পাত্রীর সন্ধানে বের হন। নানা পরীক্ষা করে উজানী নগরের সাহা সদাগরের কন্যা বেহুলাকে যোগ্য পাত্রীরূপে বিবেচনা করেন। কবিরা এই প্রসঙ্গটিকে কিছু কিছু নতুন তথ্য যোগ করে কাহিনিতে বৈচিত্র্য সৃষ্টি করেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে আছে বিবাহযোগ্য পুত্র লখিন্দরকে নিয়ে চাঁদ সদাকর সর্বদা চিন্তিত। দিন রাত তিনি সনকার সঙ্গে যুক্তি করেন কোথায় কীভাবে পুত্র লখিন্দরকে বিবাহ দেবেন। সনকার সঙ্গে যুক্তি করে তিনি কুলপুরোহিত জনার্দনকে সমস্ত বিষয়ে অবগত করে বললেন—

'কুলে শীলে অর্থে হব আমার সোসর।
ঘটক হইয়া তুমি যাহ তার ঘর।।"[৪১]

অপরদিকে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে চাঁদ পাত্রী নির্বাচন করবার উদ্দেশ্যে লখিন্দরকে সঙ্গে করে প্রবাসীর বেশে সাহ সদাগরের বাড়িতে উপস্থিত হন—

'ধুতি উত্তরি পরি প্রবাসীর মতে।
অতিথির বেশে চলিলেন পিতাপুত্রে।।'[৪২]

স্নেহের কাছে বশ্যতা স্বীকার করে বাম হাতে পূজা দিতে রাজি হয় চাঁদ সদাগর। চাঁদ কর্তৃক মনসার পূজা করার বিষয়টি বর্ণনা করার ক্ষেত্রে উভয় কবি স্বতন্ত্রতার পরিচয় দিয়েছেন। সাত পুত্র চৌদ্দ ডিঙ্গা ফিরে পাবার পর সকলে মিলে চাঁদকে মনসার পূজা করার জন্য বলেন। চাঁদও মনসা পূজার মনস্থ করেন। কেতকাদাসের চাঁদ এক্ষেত্রে অনেকটাই দ্বিধাগ্রস্ত। এত দিনের সংস্কার যেমন তিনি সহজেই বিসর্জন দিতে পারছেন না। তেমনি আবার অপরদিকে এত লাঞ্ছনার পরেও সবকিছু নতুন করে ফিরে পাবার আশা। সব মিলিয়ে অনেকটা দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে তিনি মনসার পূজা দেন—

'সাবিত্রী সমান হৈল পুত্রবধূ মোর।
ঘরেতে পাইলু বস্যা চৌদ্দ মধুকর।।
হেন মনসার পূজা নাঞি করি যদি।
বিপাকে হারাই পাছে পায়্যা পঞ্চনিধি।।'[৪৩]

আর দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায় চাঁদ মনসার পূজা করতে অস্বীকার করলে, পাত্র, মিত্র, সকলে পদ্ম পূজার পরামর্শ দেয়। চাঁদ তখন চণ্ডীকে স্মরণ করেন। চণ্ডী তাঁকে জানায় পদ্ম ও চণ্ডীর অভিন্নতার কথা। এর এখানেই দ্বিজ বংশীদাস তিনি তাঁর কাহিনিতে এক উন্নত আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রকাশে ঘটিয়েছেন—

'চান্দরে স্মরণে চণ্ডী কৈলা অধিষ্ঠান।
চান্দরে বলয়ে পুত্র না ভাবিও আন।।
যোহি পদ্মা সেহি আমি জানিও নিশ্চয়।
পদ্মা পূজা কর পুত্র না ভাব বিস্ময়।।'[৪৪]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে বেহুলা লখিন্দরের স্বর্গে যাবার মানসে মনসা কলি মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন।

'যে করিবে ধম্মভয় কম্ম তার সিদ্ধ নয়।
কলিযুগ দোষের প্রকৃতি।
পুরুষের বশ নব অবলা প্রবল হর।
নারী হব কুলের দেবতা।।
পিতৃনিন্দা করে পুত্র গুরু নিন্দা করে ছাত্র।
কলিযুগ অধর্মের কথা।।"[৪৫]

মনসার নিকট কলিযুগের বর্ণনা শুনে বেহুলা আর এই জগৎ সংসারে থাকতে চাইলেন না। একথা শুনে চাঁদ সদাগরও পুত্র বধূর স্নেহে কেঁদে ফেলেন। তখন বেহুলা চাঁদ সদাগরকে সান্ত্বনা দেয় যে জগৎ সংসারে যা কিছু ঘটেছে তা সবাই মায়ার কারণে। ধন,জন, পুত্র, পরিবার এসব কেউ কারো না। আসলে সব কিছু একটা মায়ারজালে আবদ্ধ সংসারে। বেহুলা চাঁদ সদাগরকে জানায় যে বেহুলা লখিন্দরের জন্য যেন অকারণে কাতর না হন। তিনি যেন ছয় পুত্রকে নিয়ে সুখে সংসার করেন। একথা বলার পর—

'এত বলি বেহুলা লখাই ধরি হাথে।
জয় দিয়া জগতী উঠিল পুষ্পরথে।।
পৃথিবী মণ্ডলে গেলা দিয়া শুভদৃষ্টি।
স্বর্গে ইন্দ্র কৈল পুষ্প চন্দনের বৃষ্টি।।'[৪৬]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায়, বেহুলা লখিন্দরসহ ছয় ভাইয়ের প্রাণ বাঁচিয়ে আনন্দমনে ঘরে ফিরল। তখন চাঁদ সদাগর জাতি, কুটুম্ব, পাত্র, মিত্র সকলকে বললেন বেহুলাকে পাক পরশ করবেন। কেননা চাঁদের মতে বেহুলা ছয মাস দেবপুরে ভেসে গেছে। এতে পরীক্ষা ব্যতীত তিনি বেহুলাকে ঘরে নিতে নারাজ। এক্ষেত্রে বেহুলাকে কঠিন পরীক্ষা দিয়ে লখিন্দরসহ রথে স্বর্গে যাত্রা করেন—

'যদি সতী কন্যা হই কায় বাক্য মনে।
উদ্ধে তুলি লইয়া চল দেবের ভুবনে।।
রথে তুলি লৈয়া পদ্মা করিল গমন।'[৪৭]

নিজেদের কাব্যকে অন্যদের তুলনায় স্বতন্ত্র করে তুলবার জন্য উভয় কবিই দু একটি প্রসঙ্গ এমনভাবে নির্মাণ করেছেন, যা অন্যত্র দেখা যায় না। চাঁদ বেনের জন্মকথা নিয়ে বেশিরভাগ কবিই নীরব থেকেছেন কিন্তু কবি দ্বিজ বংশীদাস তাঁর কাব্যে চাঁদের জন্মকথা নিয়ে আলোচনা করেছেন। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্য থেকে জানা যায়, চাঁদ পূর্বজন্মে পশুসখা নামে এক তপস্বী ছিলেন। একদিন গঙ্গাতীরে তপস্যাকালে তিনি দেখেন—দুটি পক্ষীশাবক স্রোতে ভেসে যাচ্ছে। একদিন তপস্বীর অনুপস্থিতিতে একটি সর্প পক্ষীশাবকগুলোকে ভক্ষণ করে। দুঃখে তপস্বী কাব্যতীর্থে গিয়ে এই কামনা নিয়ে দেহত্যাগ করেন যে, পরজন্মে তিনি হবেন সর্পের বৈরী।' তপস্বীর এই কামনা থেকেই পরজন্মে চাঁদের সঙ্গে মনসার বৈরিতার সূচনা।

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে বাসর ঘরে লখিন্দর বেহুলার কথোপকথন অংশে ব্রাহ্মণ কুমারে মৃত্যুকাহিনি বর্ণনার বিষয়টিও কেতকাদাসের মনসামঙ্গলকাব্যে নেই। আবার দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে দেখা যায় পদ্মা একদিন গঙ্গাস্নানে গেছেন, তাঁকে দেখে উগ্রতপা মুনি কামবিবশ হয়ে তাঁর কামনা পূর্ণ করতে বললেন। আর যদি তাঁরকামনা পূর্ণ না করে তাহলে তিনি পদ্মাকে ব্রহ্মশাপ দেবেন। পদ্মা তখন নেতকে আপন বসন-ভূষণ পরিয়ে মুনির কাছে পাঠিয়ে দিলেন। মুনির সঙ্গে নেতর গান্ধর্ব বিবাহ হল। অতপর মুনির এক পুত্র জন্মাল, তার নাম ধনঞ্জয়। আর একদিন পদ্মা গঙ্গাস্নানে গেছেন, তাঁকে দেখে মুনি খুব শ্রদ্ধা প্রকাশ করতে লাগলেন। নেতা হেসে বলল সে তার ছোট বোন। সব জেনে শুনে মুনি বললেন যে দাসী দিয়ে তুমি আমাকে বঞ্চনা করেছ,তাই স্বামী তোমাকে ছেড়ে যাবে। এই কাহিনিও কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে লক্ষ্য করা যায় না। আবার কেতকাদাসের কাব্যে দেখা যায়, ভেলা দেবপুরের নিকটে এলে বেহুলা নেতা ধোপানীর সঙ্গে আত্মীয়তা করলেন। নেতা তাকে দেবপুরে দেবতাগণের নিকট হাজির করলেন। এই নেতা ধোপানী সংক্রান্ত প্রসঙ্গটি বংশীদাসের কাব্যে নেই। তাঁর বেহুলা দেবপুরের নিকট এলে সম্মুখে এক সেতু দেখতে পান। এটার নাম ধর্মসেতু। দুই দিকে দুটি শোলার খুঁটি, উপরে একগাছি চুল, নিচে গভীর খাদ। চুলের উপর দিয়ে হেঁটে আপন ধর্মবলে এই সেতু পার হয়ে দেবসভায় হাজির হলেন বেহুলা—

'কি মতে সাঁকোতে হৈবা পার
দুকূলে শোলার খুঁটি কেশের উপরে হাটি
পড়িলেত না দেখি নিস্তার।।'[৪৮]

আবার কেতকদাসের কাব্যে দেখা যায়, সমুদ্রের জল শ্বেতবর্ণ দেখে ব্রহ্মাকে

জিজ্ঞাসা করে অবগত হলেন যে এটি দুগ্ধসমুদ্র। শিবের বাসনা হল দুধসাগরকে পঞ্চামৃত বানাবেন। দধি তৈরির জন্য অম্লের প্রয়োজন। শিব তার অনুসন্ধান করে পেলেন ব্রহ্মারকাছে। অম্ল বা তেঁতুল রয়েছে অগম্য লঙ্কাপুরীতে, যেখানে রাক্ষসরাজ রাবণের অবস্থান। সেখানে পাখি ভিন্ন আর কোন কিছুই যেতে পারে না। শিব তখন সমস্ত পক্ষীকুলকে ডাক দিলেন। এবং একে একে সব পাখিকে যেতে সক্ষম কিনা জানতে চাইলেন, তখন সবাই চুপ করে রইল। একমাত্র টিয়াই রাজি হল যেতে। পরিশেষে মহাদেবের নির্দেশে রাবণের প্রসাদে দক্ষিণে তেঁতুলের বনে গিয়ে মনের আনন্দে তেঁতুল খেয়ে একটি তেঁতুল মুখে করে নিয়ে এল। এই ঘটনা আমরা দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে পাইনা।

চাঁদের নিজের গৃহে ফিরে আসার মুহূর্তটিকেও কেতকাদাস দারুণভাবে উপস্থাপন করেছেন, যা আমরা দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে পাই না। সন্ধ্যার অন্ধকারে চোরের মতো প্রায় চুপিসাড়ে ঢুকলেন বাড়ির কলাবাগানে। বাড়ির পরিচারিকা ঝাউয়া তাঁকে চিনতে পারেনি। সে ভেবেছে হয়তো চোর। সে তখন সনকাকে চোরের সংবাদ দিল। সনকার আদেশ নাড়া লাফ দিল চাঁদের ঘাড়ে—

‘চোর চোর বলি তারে মারে কিল লাথি।
চিনা পরিচয় নাই অন্ধকার রাতি।।’[৪৯]

পুরাণের বিনির্মাণেও উভয় কবি দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য লক্ষা করা যায়। যেমন মনসামঙ্গল কাব্যের কেন্দ্রিয় চরিত্র মনসা। মনসামঙ্গল কাব্য তারই মাহাত্ম্যমূলক কাব্য। বিভিন্ন কবি বিভিন্ন ভাবে মনসার স্বৈরাচারী, হিংস্র ও প্রতিহিংসাপরায়ণের ছবিটা এঁকেছেন। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে মনসার জন্ম এক অলৌকিক উপায়ে। পাটনী বেশিনী পার্বতীকে দেখে চিনতে না পেরে শিব পরস্ত্রীলোলুপ হয়ে উঠলেন। শিবের মধ্য কামবেগ জাগ্রত হল। কামবিবশ হয়ে শিব এক চক্রবাক দম্পতিকে দেখে নিজেকে আর সংযত রাখতে পারলেন না। তাঁর বীর্যপাত ঘটল পদ্মপত্রের উপর। অতপর পদ্মের মৃণাল বেয়ে নামল পাতালপুরীতে। তারপরে—

‘গড়িয়া পড়িল বীর্য বাসুকির কোলে।
যত্নে বাসুকি লয়্যা থুইল অম্র খোলে।।
বাসুকি আনিয়া দিল বিধাতার স্থান।
বিধাতা পাইয়া তাহা করিল নিম্মান।।’[৫০]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যেও দেখা যায় শিব একা পুষ্পবণে গেলেন। কিন্তু সেখানে থেকে ফিরে আসার সময় তাঁর সঙ্গী হলেন তারই অযোনিসম্ভূত কন্যা মনসা। তবে দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে মনসার জন্ম কাহিনি অভিনব।

ব্রহ্মা ধ্যানযোগে জানতে পারলেন মহাদেব আসছেন পদ্মবনে। পারিপার্শ্বিক

পরিবেশে শিবের শরীরের অংশ পাতালে প্রবেশ করে। ব্রহ্মা তখন শিবের লক্ষণযুক্ত ত্রিনয়নী এককন্যাকে কদ্রুর কোলেতে নির্মাণ করেন—

'কদ্রুর কোলেতে জন্ম অদ্ধ নাগ।
শিবের ঔরসে জন্ম দেব অদ্ধ ভাগ।।'[৫১]

কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে শিবের পথশ্রমের ঘর্ম থেকে নেতর জন্ম হয়েছে। একাকিনী মনসার জন্য, তাঁর রক্ষণাবেক্ষণের জন্য, বল, বুদ্ধি, পরামর্শ ও নিসঙ্গতা দূর করবার জচন্য নেতর আবির্ভাব। মনসা নিজের মহিমা প্রচারের জন্য সর্বদা সক্রিয় ছিলেন। আর তাঁর পিছনে চালিকা শক্তি রূপে কাজ করেছে নেতর বুদ্ধি ও পরামর্শ। এই নেতর উপদেশ মনসা প্রথমে রাখাল বালকদের পূজা গ্রহণে আগ্রহ দেখিয়েছেন। হাসান-হুসেনকে শিক্ষাদানের জন্য নেতর কাছে যুক্তি চেয়েছেন। সমগ্র কাব্যে বারবার একটি কথায় নেতকে বলতে শোনা যায়—

'বুদ্ধি বল নেত গ উপায় বল মোরে।'[৫২]

দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে শিবের নেত্র জল থেকে নেতর জন্ম হয়েছে। তবে তাঁর কাব্যে নেতর জন্ম মনসার জন্মের পূর্বেই ঘটেছে। কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ মনসার সহচরীকে নেত বলে উল্লেখ করলেও, দ্বিজ বংশীদাস বলেছেন নেত্রাবতী। এখানেও মনসাকে বুদ্ধি, বল,পরামর্শ ও সঙ্গদানের জন্য নেতর আবির্ভাব। দ্বিজ বংশীদাসের কাব্যে নেতর গন্ধর্ব বিবাহের প্রসঙ্গ রয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমরা কেতকাদাসের কাব্যে পাই না। বংশীদাসের পদ্মপুরাণে দেখা যায়, পদ্মা একদিন গঙ্গা স্নানে গেছেন। তখন তাকে দেখে উগ্রতপা মুনি কামার্ত হয়ে কামনা পূরণ করতে বললেন। এবং ব্রহ্মশাপের ভয় দেখালেন। পদ্মা তখন নেতকে আপন-বসন-ভূষণ পরিধান করিয়া মুনির কাছে পাঠিয়ে দেন। মুনির সঙ্গে নেতার গন্ধর্ব বিবাহ হয়। এই প্রসঙ্গ আমরা কেতকাদাস ক্ষেমানন্দের কাব্যে পাইনা।

পরিশেষে বলতে হয় মনসামঙ্গল কাব্য বর্ণনা করতে গিয়ে কবিদের মধ্যে বিস্তর অসামঞ্জস্য তৈরি হয়েছে। আবার সামঞ্জস্যও কম নয়। উভয়কবিই পূর্ববর্তী কবি ও আঞ্চলিকতার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন।

উভয় কবির রচনার ক্ষেরে স্ব স্ব দক্ষতা ও নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন। উভয়েই নিজ নিজ প্রতিভা অনুযায়ী মনসামঙ্গল কাব্যের প্রকৃতিতে এক রেখে সাফল্য অর্জন করেছেন। তবে একথা বলতে হয় তাদের মধ্যে অসামঞ্জস্য প্রচুর। উভয় কবিই তাদের সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতির নানা বিষয়গুলি কাব্যের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে আখ্যানের ক্ষেত্রে কবিদের মধ্যে কিছু সাদৃশ্যও বর্তমান। আবার এঁদের মধ্যে বৈসাদৃশ্যও কম নয় একের সঙ্গে অন্যের রচনায় প্রকৃতিগত কিছু সাদৃশ্য থাকলেও প্রত্যেকেই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করেছেন। এবং মৌলিকতাও বজায় রেখেছেন। বিশেষ করে দুই কবির আবির্ভাব

কাল বা সময়ের পার্থক্য, তাঁদের সমকালীন সমাজ প্রেক্ষিত সর্বোপরি জীবন দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্যের কারণে কবিদের সাহিত্য কর্মের মধ্যেও ভিন্নতর সৃষ্টি হয়েছে। এইভাবে মঙ্গলকাব্যের চেনা ছকের মধ্যেও যেখানেই সুযোগ পেয়েছেন সেখানেই অভিনবত্ব দেখানোর চেষ্টা করেছেন উভয় কবিই।

তথ্যসূত্র :

১। চক্রবর্তী শ্রী রামনাথ ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত; বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ; ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১৪

২। ভট্টাচার্য আশুতোষ; বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস; এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, মে ২০১৫; পৃষ্ঠা : ২৭৮

৩। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ : বাংলা সাহিত্যের কথা; মাওলা ব্রাদাস; প্রথম সংস্করণ, মার্চ ১৯৬৫; পৃষ্ঠা : ১৩৬

৪। হিমেল বরকত সম্পাদিত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ ও প্রাসঙ্গিক পাঠ; মাওলা ব্রাদার্স; প্রথম প্রকাশ ফেব্রুয়ারি ২০১২; পৃষ্ঠা : ৮৩

৫। চক্রবর্তী শ্রী রামনাথ ও শ্রী দ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত; বংশীদাসের পদ্মপুরাণ; ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১৪

৬। দীনেশচন্দ্র সেন; মৈমনসিংহ গীতিকা, প্রজ্ঞাবিকাশ; পুনমুর্দ্রণ মে ২০১৬; পৃষ্ঠা : ২৬৬

৭। খান শামসুজ্জামান; চন্দ্রকুমার দে অগ্রস্থিত রচনা, (১ম খণ্ড) বাংলা একাডেমী, ঢাকা, জুন ১৯৯৩; পৃষ্ঠা : ৪৮

৮। সেন সুকুমার; বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, (দ্বিতীয় খণ্ড) আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২২৩

৯। ভট্টাচার্য আশুতোষ; বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস; এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ, মে ২০১৫; পৃষ্ঠা : ২৮৮

১০। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৫

১১। তদেব,পৃষ্ঠা : ৬

১২। তদেব, পৃষ্ঠা : ৭

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা : ৭

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ৪

১৫। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ; ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১৯৩

১৬। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ১৬

১৭। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত; বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ; ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১১৬
১৮। তদেব, পৃষ্ঠা : ১১৪
১৯। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া,কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২৭
২০। তদেব, পৃষ্ঠা : ৮০
২১। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১২১
২২। তদেব, পৃষ্ঠা : ১২৮
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা : ১২৮
২৪। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২০
২৫। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১৫৫
২৬। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৭৩
২৭। তদেব, পৃষ্ঠা : ৭৯
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা : ৫৬
২৯। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ৩৯
৩০। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ১৬৭
৩১। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১৯৭
৩২। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ১৬৩
৩৩। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ২০০
৩৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ২০১
৩৫। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ১৮৭
৩৬। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ২৭৬
৩৭। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ১২৯
৩৮। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১৭৭
৩৯। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৭৭
৪০। তদেব; পৃ-২৯৭

৪১। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২৪১
৪২। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ৪৬১
৪৩। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২৯০
৪৪। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ৬৪৬
৪৫। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২৯৬
৪৬। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৯৭
৪৭। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ৬৫৫
৪৮। তদেব, পৃষ্ঠা : ৫৯৫
৪৯। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ২৩৯
৫০। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৭
৫১। চক্রবর্তী, শ্রীরামনাথ ও শ্রীদ্বারকানাথ চক্রবর্তী সম্পাদিত, বংশীদাসের পদ্মপুরাণ, ভট্টাচার্য এন্ড সন্স; বৈশাখ ১৩১৮; পৃষ্ঠা : ১১৫
৫২। কয়াল অক্ষয়কুমার ও চিত্রা দেব; মনসামঙ্গল কেতকাদাস ক্ষেমানন্দ রচিত (সম্পাদিত), লেখাপড়া, কলকাতা, পৃষ্ঠা : ৬৩

লেখক পরিচিতি :

পি এইচ. ডি. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা ছোটোগল্পে নকশাল আন্দোলনের বিচিত্র রূপায়ণ

সৌত্রিক ঘোষাল

সারাংশ :

স্বাধীনতা-উত্তর বাংলার সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনগুলির মধ্যে অন্যতম নকশাল আন্দোলন। বিগত শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষলগ্নে এই আন্দোলনের সূত্রপাত এবং মোটামুটিভাবে এর বিস্তৃতি সাতের দশকের প্রথম কয়েক বছর পর্যন্ত। বাংলার সমাজ-রাজনীতি-অর্থনীতিতে এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী। আবার শুধুমাত্র সমাজ বা রাজনীতিতেই নয়, সেইসঙ্গে বাংলা সাহিত্যে, বিশেষত বাংলা ছোটোগল্পের ধারাতেও এই আন্দোলনের প্রভাব ছিল চোখে পড়ার মতো। নকশাল আন্দোলনের সমসাময়িক দিনগুলিতে তো বটেই, এমনকি পরবর্তী কয়েক দশকেও এই আন্দোলনের স্মৃতিকে ধারণ করে বহু ছোটোগল্প রচিত হয়েছে। এইসমস্ত গল্পের গল্পকাররা যে সকলেই নকশাল আন্দোলনকারীদের সপক্ষে কলম ধরেছেন তা নয়, কিন্তু বাংলার জনজীবনে এই আন্দোলনের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ প্রভাবকে আশ্রয় করে যেভাবে অজস্র গল্প রচিত হয়েছে তা থেকে এইটুকু অন্তত স্পষ্ট যে, এই আন্দোলন সমসাময়িক বাংলা কথাসাহিত্যিকদের মনোজগৎকে যথেষ্ট গভীরভাবেই আলোড়িত করেছিল। নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে রচিত গল্পগুলিতে তাই গল্পকাররা বহুবিচিত্র দৃষ্টিভঙ্গিতে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, পন্থা, পরিণতি ও প্রভাবের দিককে তুলে ধরেছেন। নকশাল আন্দোলনের প্রতি মধ্যবিত্তশ্রেণির মনোভাবের নিপুণ বিশ্লেষণ উপস্থাপিত হয়েছে কয়েকটি গল্পে। তাছাড়া নকশাল আন্দোলন ছিল এমন এক আন্দোলন যার বিস্তার ছিল কল্লোলিনী কলকাতা থেকে পল্লীবাংলা, এমনকি প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত। শিক্ষিত-স্বল্পশিক্ষিত নির্বিশেষে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষ এই আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে রচিত গল্পগুলিতে পাওয়া যায় সমাজের এই বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের চিত্র। আবার এই আন্দোলনে পুরুষের পাশাপাশি নারীসমাজের অংশগ্রহণও ছিল বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বিশেষ রাজনৈতিক দীক্ষায় দীক্ষিত হয়ে কিংবা নিজস্ব জীবনঅভিজ্ঞতায় ভর করে বহু নারী প্রত্যক্ষভাবে এই আন্দোলনের বহ্নিশিখায় নিজেদের আপাত নিস্তরঙ্গ সুখী জীবনের স্বপ্নকে ছারখার করেছিল, কেউ আবার আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশ না নিলেও পরোক্ষভাবে প্রভাবিত হয়েছিল এই আন্দোলনের দ্বারা। নকশাল

আন্দোলনকে নিয়ে রচিত গল্পে আমরা পাই এরকম বহু নারীচরিত্রকে, পারিবারিক ও শিক্ষাগত অবস্থানের নিরিখে যাদের অবস্থান সমাজের বিভিন্ন শ্রেণিতে। এছাড়া নকশাল আন্দোলননির্ভর কিছু গল্পে যেমন উঠে এসেছে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ আন্দোলনকারীদের চিত্র, তেমনি কিছু গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে রাষ্ট্রীয় মদতে আন্দোলন দমনে পুলিশের অতিসক্রিয়তার চিত্র। আবার পুলিশও যে একটা সিস্টেমের দাস, স্বাধীন ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সকল পুলিশ যে স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠেননি, তাঁদের মধ্যেও মানবিকতা সম্পূর্ণ অবসিত হয়নি, তাও ফুটিয়ে তুলেছেন কোনো কোনো গল্পকার তাঁদের গল্পে। বাংলার রাজনৈতিক-সমাজ ইতিহাসে নকশাল আন্দোলনের ইতিহাস মূলত খুন, জখম, রক্তপাত আর স্বজন হারানোর ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাসকে আশ্রয় করেও স্বার্থপরতা-প্রতিহিংসার সংকীর্ণ সরণী থেকে মানবিকতার প্রশস্ত রাজপথে উত্তরণের গল্প শুনিয়েছেন কোনো কোনো গল্পকার। বর্তমান প্রবন্ধে নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে লেখা এই বহুবিচিত্র ধরনের গল্পগুলির সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনার মধ্য দিয়ে আজ থেকে প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ফেলে আসা বাঙালির জীবন-ইতিহাসের সেই বিশেষ কালপর্বটিকে ফিরে দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। বলাবাহুল্য, নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে লেখা সমস্ত গল্পের পর্যালোচনা আলোচ্য প্রবন্ধে সম্ভব হয়নি। প্রবন্ধের সীমিত পরিসরের কথা স্মরণে রেখে বিভিন্ন ধরনের নির্বাচিত কয়েকটি গল্পকে আশ্রয় করেই আলোচনায় অগ্রসর হতে হয়েছে। বিন্দুতে সিন্ধুদর্শনের এই প্রয়াসের মাধ্যমে নকশাল আন্দোলনের চিত্র বাংলা ছোটোগল্পে কীভাবে উঠে এসেছে সেবিষয়টি যাতে উদ্ঘাটিত হয় এবং সেইসঙ্গে সমাজের সঙ্গে সাহিত্য বিশেষত বাংলা ছোটোগল্পের ধারার গভীরতর সম্পর্কের দিকটি যাতে আরেকবার নতুন করে আলোকোজ্জ্বল হয়ে ওঠে সেদিকেও নজর রাখা হয়েছে।

মূল শব্দ : নকশাল আন্দোলন, সাতের দশক, বাংলা ছোটোগল্প

সাহিত্যের সঙ্গে সময় ও সমাজের সম্পর্ক যেন প্রস্ফুটিত পুষ্পের সঙ্গে তার বৃন্তের সম্পর্কের মতো। কোনো সাহিত্যিক সাহিত্যের যে সংরূপ অর্থাৎ কাব্য, উপন্যাস, নাটক, ছোটোগল্প- যে আঙ্গিকটিকেই আশ্রয় করুন না কেন, মানুষ ও তার জীবনচর্যাকে তিনি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করতে পারেন না। আবার মানুষের এই জীবন গড়ে ওঠে সমকালীন সমাজ-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি প্রভৃতির প্রেক্ষাপটে। সাহিত্যের উপজীব্য প্রকৃতপক্ষে এই সমাজ-সংস্কৃতি শাসিত ও নিয়ন্ত্রিত মানবজীবন। সময়-সমাজের পরিবর্তনের সাথে সাথে তাই যখন বদলে যায় জীবনের ধারাপথ, তখন তার অনিবার্য ছায়া পড়ে সাহিত্যের আঙিনাতেও।

বাংলা সাহিত্য বিশেষত বাংলা ছোটোগল্পের জগৎও এর ব্যতিক্রম নয়। প্রাক্-স্বাধীনতাযুগ থেকে শুরু করে স্বাধীনতাকালীন সময়ের তেভাগা আন্দোলন, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, দেশভাগ, উদ্বাস্তু সমস্যা, বেকার সমস্যা ইত্যাদি বিভিন্ন সামাজিক-রাজনৈতিক ঘটনা তাই দেখা যায় বারবার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্থান করে নিয়েছে বাংলা ছোটোগল্পের কথা-শরীরে। বিগত শতাব্দীর সাতের দশকে এসে সময় ও সমাজের সাথে ছোটোগল্পের এই সম্পর্ক ও দায়বদ্ধতার দিকটিকে আরেকবার নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয় এ দশককে ছুঁয়ে থাকা এক বিশেষ রাজনৈতিক আন্দোলনের রক্তাক্ত দিনগুলির স্মৃতিচিহ্নকে বক্ষে ধারণ করে জন্ম নেওয়া একের পর এক বাংলা ছোটোগল্প।

বস্তুত সাতের দশক সমগ্র বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসেই চিরস্থায়ীভাবে রেখাপাত করে গেছে। আবার শুধুমাত্র সাহিত্য নয়, বৃহত্তর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করলে বলা যায়, এই দশক বাঙালি জাতির সামগ্রিক জীবন ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রেই ছিল এক বিশেষ তাৎপর্যময় দশক। বিশিষ্ট সাহিত্যিক-প্রাবন্ধিক বিজিত ঘোষ সাতের দশকের এই গুরুত্বটিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে তাই বলেছেন—

> "পক্ষের লোকেরা বলেন, মুক্তির দশক। বিপক্ষ জনেরা বলেন সন্ত্রাসের দশক। তবে সত্তর যে একটা বিশেষ দশক সে কথা অস্বীকার করার জো নেই। তাই দেখি, সেই আন্দোলনের স্পর্শকাতরতা সত্তর থেকে শতাব্দী শেষে নতুন শতাব্দীতে এসেও অব্যাহত। জনমানসে।"[১]

একবিংশ শতকে জন্ম নেওয়া সদ্য তরুণ সম্প্রদায় সাতের দশক সম্পর্কে কতটা সচেতন তা নিয়ে হয়তো কিছুটা সংশয় থাকতে পারে, কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, সমকালীন বাংলার প্রায় সর্বস্তরের মানুষের জীবনেই এই দশক ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। আর সাতের দশককে এই স্বাতন্ত্র্য দান করেছিল যে বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনটি তার নাম নকশাল আন্দোলন।

নকশাল আন্দোলনের সূত্রপাত মোটামুটিভাবে ১৯৬৭ সালে। ১৯৬৭ থেকে সত্তরের দশকের প্রথম কয়েক বছর এই আন্দোলনের প্রসারের কাল। আটের দশক শুরুর পূর্বেই এই আন্দোলন ক্রমশ স্তিমিত হয়ে পড়ে। নকশাল আন্দোলনকারীদের মতাদর্শের বিশ্লেষণ কিংবা এই আন্দোলনের ইতিহাস পর্যালোচনা বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। সে কাজ ঐতিহাসিকদের। কিন্তু বাংলা সাহিত্য, বিশেষত বাংলা ছোটোগল্পের ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, নকশাল আন্দোলনের সমসাময়িক দিনগুলিতে তো বটেই, এমনকি এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যাওয়ার পরে পরবর্তী দশকগুলিতেও নকশাল আন্দোলন ও তার স্মৃতিকে ধারণ করে বহু বাংলা ছোটোগল্প রচিত হয়েছে। আবার এইসমস্ত গল্পের গল্পকারদের

প্রত্যেকেই যে এই আন্দোলনকে সমর্থন করে কলম ধরেছেন তাও নয়। তবু নকশাল আন্দোলন সম্পর্কে বাংলা ছোটোগল্পকারদের যে ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিই তাঁদের গল্পের মধ্যে উঠে আসুক না কেন, একটি বিষয় স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, এ আন্দোলনের অভিঘাতটি যথেষ্ট গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল তদানীন্তন এমনকি তৎপরবর্তীকালেরও বেশ কয়েকজন গল্পকারের মনোজগৎকে। নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলা ছোটোগল্পের নদীতে তাই দেখা যায় নানা নতুন তরঙ্গ। সেইসমস্ত তরঙ্গের বর্ণালি বিশ্লেষণ করলে তার মধ্যে যেমন ফুটে ওঠে সমকালীন অগ্নিগর্ভ সময় ও সমাজের চিত্র, তেমনি স্পষ্ট হয়ে ওঠে রাষ্ট্রনীতি-রাজনীতি-সমাজনীতি প্রভৃতির সঙ্গে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের জীবনের কামনা-বাসনা, প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির সম্পর্কেরও বহুমাত্রিক সমীকরণের দিক।

নকশাল আন্দোলন ছিল এমনি এক আন্দোলন যা সমগ্র বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের শিকড় ধরে একটা প্রবল ঝাঁকুনি দিতে পেরেছিল। এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সেকালের যুবক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে প্রবল উন্মাদনা তা যেন স্বাধীনতা-উত্তর বাঙালি মধ্যবিত্তকে আত্মদর্পণের সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়। আন্দোলনের অভিঘাতে সৃষ্ট নিত্যনতুন ঘটনাগুলি নিজের স্ত্রী, পুত্র, পরিবার নিয়ে সংকীর্ণ সুখী গৃহকোণ রচনার স্বপ্নে মশগুল বাঙালি মধ্যবিত্তের আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনের শান্তি নষ্ট করে, প্রবলভাবে প্রভাবিত করে মধ্যবিত্তের দৈনন্দিন জীবনচর্যাকে। সমালোচক নির্মল ঘোষ এই প্রসঙ্গে লিখেছেন—

> "প্রকৃত প্রস্তাবে শহুরে মধ্যবিত্ত মানসিকতা, নকশালবাদী আন্দোলনের ফলে, এই প্রথম একটা বড়ো রকমের আঘাত পেল। অস্তিত্ব টিকিয়ে রেখে গা বাঁচিয়ে চলার অভ্যস্ত জীবনের সদর দরজা পেরিয়ে রাজনীতি সোজা চলে এল একেবারে অন্দর মহলে। ফলে এই প্রথম তাঁরা বুঝতে পারলেন তাঁরা বেঁচে নেই, টিকে আছেন।"[২]

এই টিকে থাকারই আপ্রাণ প্রচেষ্টায় মধ্যবিত্তের একাংশ চেষ্টা করে যথাসম্ভব এই আন্দোলনের আঁচ যেন নিজের বা নিজের পরিবারের সদস্যদের গায়ে না লাগে। কিন্তু মানুষ যা চায় তা তো সবসময় হয় না। আর হয় না বলেই দেখা যায়, পরিবারের সদস্যদের প্রবল অনিচ্ছাকে অগ্রাহ্য করেও সমকালীন বাংলার মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু শিক্ষিত যুবক-যুবতী জড়িয়ে পড়ে এই রক্তক্ষয়ী নকশাল আন্দোলনে। এইসমস্ত যুবক-যুবতীদের নিয়ে তাদের পরিবারের মানুষগুলোর দুশ্চিন্তার যেমন শেষ ছিল না, তেমনি নিজের নিশ্চিন্ত জীবনযাপন বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কায় এই যুবক-যুবতীদের প্রতি চাকুরীজীবী মধ্যবিত্তের একাংশের ক্ষোভেরও অন্ত ছিল

না। দিব্যেন্দু পালিতের 'মানুষের মুখ' গল্পে এমনি এক মধ্যবিত্ত পরিবারের চিত্র পাই, যে পরিবারের মধ্যম সন্তান অজয় সন্ধ্যাবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে অনেক রাত পর্যন্ত বাড়ি না ফেরায় পরিবারের সকলে দুশ্চিন্তান্বিত হয়ে পড়ে। কিন্তু অজয়ের জ্যেষ্ঠভ্রাতা বিভূতি যখন অফিস থেকে ফিরে অজয়ের বাড়ি না ফেরার সংবাদ জানতে পারে তখন সে ভাইয়ের বিপদ নিয়ে যতটা চিন্তিত হয় তার চেয়েও বেশি চিন্তিত হয়ে পড়ে সেই নিস্তব্ধ দাঙ্গাবিধ্বস্ত রাতে তাকেই ভাইকে খুঁজতে বেরোতে হবে একথা ভেবে। আসলে যেদিন থেকে দাঙ্গা-খুন-জখমের রাজনীতি শুরু হয়েছে সেদিন থেকেই বিভূতি জীবনের মূল্য সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হয়ে পড়েছে, নিজের জীবনের প্রতি মায়াও তার বহুগুণ বেড়ে গেছে। তাই বিভূতি এখন—

> "রাস্তা দিয়ে হাঁটে খুব সাবধানে, ভিড় বাঁচিয়ে, নিজেকে একটুও আহত না করে। হাঁটতে হাঁটতে অনুভব করে বুকের মধ্যে শিশুর মতো ঘুমিয়ে আছে হৃৎপিণ্ড।"[৩]

এই আত্মসুখপরায়ণতার কারণে নিজের ভাই অজয় তথা অজুকে খুঁজতে বেরোনোর আগে বিভূতি বারবার গড়িমসি করে, তাকে দেরি করে খবর দেওয়ার জন্য নিজের বাবার প্রতি নিষ্ফল ক্ষোভ প্রকাশ করে, এমনকি রাস্তায় বেরিয়ে ছুরিকাহত মুমূর্ষু যুবক একটু জলের জন্যে কাতর আবেদন করলেও নিজের প্রাণ বাঁচাতে সে সেখান থেকে ছুটে পালিয়ে যায়। তারপর পুলিশ পিকেট আর থানার নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে দাঁড়িয়ে বিভূতি নিজেকে সান্ত্বনা দিয়ে ভাবে—

> "অজু হলে সে নিশ্চয়ই ওকে বাঁচাবার চেষ্টা করত।"[৪]

এই আত্মপ্রতারণা, পলায়নপরমনোবৃত্তি, স্বার্থপর মানসিকতা বিভূতি যে শ্রেণিচরিত্রের অন্তর্গত সেই মধ্যবিত্ত তার নিজের স্বার্থে ঘা লাগলে যে কতটা অমানবিক, নিষ্ঠুর হয়ে উঠতে পারে তার একটা রূঢ়-বাস্তব দিক তুলে ধরে। আবার অসীম রায়ের 'অনি' গল্পে আমরা জানতে পারি আরেকটি মধ্যবিত্ত পরিবারের কথা, যে পরিবারের অভিভাবক অনির পিতা নিজেও একদা রাজনৈতিক কর্মী ছিলেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি বারবার চেষ্টা করেছেন পুত্র অনিকে এই আন্দোলন থেকে দূরে সরিয়ে আনতে। আবার একইসঙ্গে অনির পিতা একথাও অনুভব করেছেন—

> "আজ যদি অনিরা আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় আমার কিছু বলার নেই। অন্তত এটুকু বুঝেছি আমার জ্ঞান দেওয়া সাজে না। জ্ঞান দিতে গেলে রণক্ষেত্রে নামতে হবে, যুদ্ধে যেতে হবে। অনিরা যে সব প্রশ্ন তুলেছে তাকে আপ্তবাক্য দিয়ে ধামাচাপা না দিয়ে তার মোকাবিলা করতে হবে।"[৫]

অনির বাবা তাঁর মধ্যবিত্ত মানসিকতাকে বিসর্জন দিতে পারেননি। এই মধ্যবিত্ত মানসিকতার সঙ্গে আন্দোলনে উৎসর্গীকৃত যুবকদের মানসিকতার পার্থক্য ও

সংঘাতের দিকটি উঠে এসেছে অনি ও তার পিতার বাক্‌যুদ্ধের মধ্যে। অনির পিতার সঙ্গে মানসিকতায় অনেকটাই মিল পাওয়া যায় প্রলয় সেনের 'তপু চলে যাচ্ছে' গল্পের তপুর পিতা অবিনাশের। অবিনাশ জানতেন তপু 'নির্দোষ', তবু তপুকে পুলিশের সন্দেহদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে বালুরঘাট পাঠিয়ে দিতে চান অবিনাশ। আবার সেইসঙ্গে তিনি একথাও অনুভব করেন—

> "গণ্ডগোল কি শুধু কলকাতা শহরেই? সারা দেশটাই তো জ্বলছে। নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি কি কোথাও আছে?"[৬]

এই নিরাপত্তাহীনতাই হয়ে উঠেছিল এই আন্দোলনের প্রতি সেদিনের মধ্যবিত্তের বীতরাগের মূল কারণ। শত-সহস্র সামাজিক অসাম্য-অনাচারকে নীরবে মেনে নিয়ে, তার জন্য হা-হুতাশ করে, ঈশ্বরকে দোষ দিয়ে, অশ্রুপাত করে, বছরের কয়েকটা দিন অর্ধভুক্ত থেকেও মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় তাদের জীবন কাটিয়ে দিতে পারে। কিন্তু যখনই সেই অসাম্য-অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধের প্রশ্ন ওঠে, তখনই মধ্যবিত্ত খুলে বসে ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের হিসাবের খাতা। মেনে নিতে নিতে মানিয়ে নেওয়াই হয়ে ওঠে তাদের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য। তাই যে অবিনাশ ছোটোবেলা থেকে ছেলেকে বলে এসেছেন—

> "অন্যায় আর অসত্যের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়ানোটাই হল মনুষ্যত্ব।"[৭]

সেই অবিনাশই 'নির্দোষ' তপুর প্রতি পুলিশের অন্যায় আচরণকে মেনে নিয়ে ছেলেকে তার মামাবাড়িতে পাঠিয়ে দিতে চেয়েছেন। এধরনের আচরণ আত্মপ্রতারণারই নামান্তর। মহাশ্বেতা দেবীর 'রং নাম্বার' গল্পে আবার দেখা যায় মধ্যবিত্ত তীর্থবাবু তাঁর ছেলে নকশাল আন্দোলনকারী দীপঙ্করের মৃত্যুর পরেও সেই মৃত্যুকে মেনে নিতে পারেননি। এক অদ্ভুত মনোবিকারের শিকার হয়েছেন তিনি। আসলে স্ত্রী সবিতা আর পুত্র দীপঙ্করকে নিয়ে যে সুখী গৃহকোণ রচনার স্বপ্ন তীর্থবাবু দেখেছিলেন তা দীপঙ্করের মৃত্যুতে ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। এই আকস্মিক আঘাতকে তীর্থবাবু মেনে নিতে পারেননি। তাই ছেলে দীপঙ্কর নীরেনের কাছে লক্ষ্ণৌতে আছে, সেখান থেকে সে দিল্লিতে পড়াশোনা করতে যাবে—এমন একটা মিথ্যা কল্পনাকে গড়ে নিয়ে নিজের সুখস্বপ্নের মায়াজালকে অক্ষুণ্ণ রাখতে চান তীর্থবাবু। তবু নিষ্ঠুর বাস্তব তো পিছু ছাড়ে না, তাই তীর্থবাবুর মাঝে মাঝেই ভয় করে, তাঁর মনে হয়—

> "এ একটা অন্য কলকাতায় বাস করছেন তিনি, অন্য পশ্চিমবঙ্গে। দেখতে মনে হয় সেই শহর। সেই গড়ের মাঠ-মনুমেন্ট-ভবানীপুর-আলিপুর-চড়কডাঙার মোড়! সেই আষাঢ়ে রথের মেলা-চৈত্রে কালীঘাটে

গাজন-মাঘে বড়দিনের আলোকসজ্জা।

সে শহর নয়। এ একটা ভুল শহর। রং সিটি। ভুল ট্রেনে চড়ে ভুল শহরে এসেছেন তীর্থবাবু।”[৮]

তীর্থবাবুর এই মনোবিকার, মৃত সন্তানকে জীবিত বলে মেনে নেওয়ার এই আত্মপ্রবঞ্চনা হয়তো তাঁর প্রতি পাঠকদের মনে কিছুটা সমবেদনা জাগ্রত করে, বোঝা যায় তীর্থবাবু একান্তভাবেই পরিস্থিতির শিকার। তবে সকলেই যে তপুর বাবা অবিনাশবাবু বা দীপঙ্করের বাবা তীর্থবাবুর মতো পরিস্থিতির হাতে অসহায়, প্রতিকারহীন তা নয়, চিত্ত ঘোষালের ‘দারাসুত পরিবার’ গল্পে দেখতে পাই অন্য এক সত্তরোর্দ্ধ পিতাকে যিনি নকশাল আন্দোলনকারীদের খুন, জখম, প্রতিহিংসার রাজনীতিকে নৈতিকভাবে সমর্থন না করলেও নিরপরাধ এক হিন্দুস্থানী পরিবারের ছেলের অকাল মৃত্যুতে তাদের অসহায় অবস্থা প্রত্যক্ষ করে বদলে ফেলেন নিজের মন, মনুষ্যত্বের প্রতি দায়বদ্ধ থেকে শেষপর্যন্ত জার্মানপ্রবাসী ছেলে অলককে পত্রমারফৎ ফিরে আসতে বলেন নিজের দেশে। অনি কিংবা তপুর বাবার মতো একই মধ্যবিত্তশ্রেণির অন্তর্গত হলেও অলকের বাবা সামাজিক দায়বদ্ধতার প্রশ্নে শেষপর্যন্ত বিপরীত মেরুতে অবস্থান করেছেন। সাতের দশকের বাংলা ছোটোগল্পে এভাবেই বারবার উঠে আসে সমকালীন বাঙালি মধ্যবিত্তের মানসিকতার বহুবিচিত্র রামধনু, উন্মোচিত হয়ে যায় মধ্যবিত্তের মুখ আর মুখোশের প্রকৃত স্বরূপটা।

নকশাল আন্দোলন যে তদানীন্তন বাংলার জনসংখ্যার বৃহত্তর অংশকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কম-বেশি প্রভাবিত করতে পেরেছিল তার একটা বড়ো কারণ এই আন্দোলন কেবল শহরের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তা ছড়িয়ে পড়েছিল কৃষিপ্রধান বাংলার গ্রামাঞ্চলেও। এ আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল বাংলার কৃষকসমাজের এক বৃহৎ অংশ। কৃষকদের আপাত নিস্তরঙ্গ জীবনে বিক্ষোভের ঘন কালো মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছিল একদিনে নয়। দীর্ঘদিন ধরে অত্যাচার, বঞ্চনা সহ্য করেই তারা বাধ্য হয়েছিল সংঘবদ্ধ হতে। ঘুমন্ত আগ্নেয়গিরির হঠাৎ বিস্ফোরণের মতো কৃষক সম্প্রদায়ের জেগে ওঠার তেমনি এক চিত্র আমরা পাই ব্রজেন মজুমদারের ‘খোদহাটির ডাক’ গল্পে। এ গল্পে দেখি, গুমঘরে সিঁড়ির নীচে চাষিদের নেতা মধু মাহাতোর লাশ আবিষ্কার করেছে তারই ছেলে সোনা মাহাতো। কিন্তু পিতার এই নৃশংস হত্যাতে সে কান্নায় ভেঙে পড়েনি। পিতার লাশকে কাঁধে তুলে মধ্যরাত্রে উন্মত্তের মতো ছুটে গেছে খোদহাটির মাঠের উদ্দেশ্যে। মধু মাহাতোর শরীর থেকে তারই পিতৃপুরুষের জমির উপর চুঁইয়ে পড়া রক্তে সেখানে অভিষেক ঘটে গেছে আগামী দিনের বিদ্রোহের নেতা সোনা মাহাতোর। তারপর পিতার নিথর দেহকে মাটিতে শুইয়ে দিয়ে সোনা ডাক দিয়েছে—

"চাষি ভাই হো-ও-ও-ও! মধু মাহাতো খুন হয়ে গেছে গো-ও-ও-ও!"[৯] সোনার সেই ডাক বিদ্যাধরীর চর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে ভাবী বিদ্রোহ আর প্রতিরোধের আগুনে রাঙা করে তুলেছে খোদহাটির মাঠের দিগন্তকে। 'খোদহাটির ডাক' গল্পে যেমন পিতার মৃত্যুতে বিদ্রোহের চেতনায় দীক্ষিত হয়ে উঠেছে সোনা মাহাতো, অনেকটা তেমনই সনৎ বসু-র 'মৃত্যুহীন' গল্পে প্রাথমিক লড়াইয়ে জিতেও নেতা বুধুমাস্টারের মৃত্যুর পর আগামী দিনের নেতৃত্বের ভার স্বেচ্ছায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছে সুখন। গল্পকার লিখেছেন—

> "কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানেই সুখন সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। এতদিন সে ছিল এক গাঁয়ের সরদার, এখন তাকে দশ গাঁয়ের নেতৃত্বের দায়িত্ব কাঁধে নিতে হবে, লড়াইটাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে হবে।"[১০]

বুধুমাস্টারের অন্তরের শক্তি যেন কোনো অদৃশ্য মায়াবলে নিমেষে সঞ্চারিত হয়ে গেছে সুখনের মধ্যে। আবার সোনা মাহাতো কিংবা সুখনদের থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন বয়সে ভিন্ন পরিস্থিতিতে দাঁড়িয়েও বন্ধু ফটিকের খুন হওয়াকে কেন্দ্র করে একইধরনের প্রতিশোধস্পৃহার অগ্নিস্ফুলিঙ্গ ঝলসে উঠেছে শিক্ষক নরেশ মজুমদারের স্কুলের ফটিকের সহপাঠীদের চোখে ('রোহিতাশ্বের নামে', অমলেন্দু চক্রবর্তী)। নকশাল আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলিতে বিদ্রোহের উন্মাদনা এভাবেই হয়তো কোনো অদৃশ্য যোগসূত্রে ছড়িয়ে পড়ত এক নেতা থেকে অন্য নেতার হৃদয়ে। নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে লেখা অনেক গল্পে ধরা রয়েছে নকশাল আন্দোলনকারীদের সেই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মোৎসর্গের কাহিনি।

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে আন্দোলনের সমকাল এবং পরবর্তীকালে যেসমস্ত গল্পকাররা গল্প লিখেছেন তাঁদের আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে যথেষ্ট পার্থক্য ছিল। ফলে বহুবিচিত্র দৃষ্টিকোণ থেকে এই আন্দোলনের উদ্দেশ্য, পন্থা ও জনমানসে এর প্রভাবকে তাঁরা তুলে ধরেছেন নিজেদের গল্পে। নকশাল আন্দোলনকারীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিত্র যেমন উঠে এসেছে অনেক গল্পে, তেমনি এই আন্দোলনের সাথে সরাসরি যুক্ত না থাকলেও আন্দোলনের উত্তাল ঢেউ কীভাবে আছড়ে পড়েছিল অনেক সাধারণ-অরাজনৈতিক মানুষের জীবনে তারও মর্মন্তুদ আলেখ্য এঁকেছেন অনেক গল্পকার। এক বিশেষ রাজনৈতিক-সামাজিক আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও এইসমস্ত গল্পে কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির চারিত্রিক বিবর্তন ও উত্তরণের যে যৌক্তিক পথরেখা নির্মাণ করেছেন গল্পকাররা, তাতে তাঁদের গল্পগুলো বাংলা ছোটোগল্পধারার চিরকালের মূল্যবান সম্পদ হয়ে উঠেছে। অনিল ঘড়াই-এর 'চৌকিদার' গল্পটির কথা এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করতে পারি। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র গ্রামের প্রৌঢ় চৌকিদার সনাতন বরাবরই তার নিজের

কাজের প্রতি ছিল একনিষ্ঠ ও কতর্ব্যপরায়ণ। সেইসঙ্গে গ্রামের বেণুবাবুর কালো ষাঁড়টার প্রতি সনাতনের ছিল অপত্য স্নেহ। কেননা ষাঁড়টা নিরীহ, সৎ মানুষদের কোনো ক্ষতি করত না, তার যত রাগ ছিল গ্রামের অসৎ মানুষগুলোর উপর। তাছাড়া এই ষাঁড়টার প্রতি সনাতনের স্নেহের আরেকটি বড়ো কারণ ছিল ষাঁড়টার স্বভাব-চরিত্রের সঙ্গে সনাতনের একমাত্র পুত্র নকশালবাদী বিশুর স্বভাব-চরিত্রের সাদৃশ্য। গ্রামের মাধব এ সম্পর্কে সনাতনকে বলেছিল—

> "ষাঁড়টার স্বভাব অবিকল বিশুর মতন। দিনের বেলায় যার কাছে গেলে সমালোচনার ঝড় ওঠে, রাতের অন্ধকারে চুপিসাড়ে, তার কাছে যেতে কোনও বাধা নেই।"[১১]

সনাতনের ছেলে বিশু যেমন নকশাল আন্দোলনে যোগ দিয়ে জোতদাররাজ খতম করার স্বপ্ন দেখেছিল, বেণুবাবুর কালো ষাঁড়টারও তেমনি সবচেয়ে বেশি রাগ ছিল সনাতনের গ্রামের জোতদার হলধরবাবুর উপর। কিন্তু সনাতন এই ষাঁড়টাকে হলধরবাবুর রোষদৃষ্টি থেকে বাঁচাতে পারেনি। হলধরবাবুর নির্দেশে কালু শেখের ছোঁড়া বল্লমে ষাঁড়টা প্রথমে আহত হয়, তারপর বিনা চিকিৎসায় তিলে তিলে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। ষাঁড়টার মৃত্যুর দিনেই মৃত্যু হয় বিশুরও। এ যেন আশ্চর্য সমাপতন যা অবশ্যই গল্পকারের সুপরিকল্পনাপ্রসূত। বিশুর গুলিবিদ্ধ স্পন্দনহীন দেহটা চরম অবহেলায় সনাতনের অদূরে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে যায় পুলিশ অফিসাররা। নিজের একমাত্র সন্তানকে হারানোর বেদনায় প্রথমে ডুকরে কেঁদে ওঠে সনাতন। কিন্তু তারপর ভোরের আলোয় যখন ক্ষুধার্ত শকুনের দল উড়ে আসতে থাকে ভাগাড়ে, তখন একপাশে বেণুবাবুর সেই কালো ষাঁড়টার মৃতদেহ আর অন্যদিকে বিশুর নিথর দেহ—এই দু'য়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাবান্তর ঘটে যায় সনাতনের। গল্পকার জানান—

> "দুখানা মৃতদেহের মাঝখানে লাঠি হাতে টানটান শরীরে দাঁড়িয়ে থাকল সনাতন। কাক-শকুনের সাথে লড়তে তার আজ এক ফোঁটাও ভয় নেই। সে নিজে মরবে কিন্তু দখল দেবে না লাশের।"[১২]

যে সনাতন কোনো রাজনৈতিক চেতনায় দীক্ষিত ছিল না, সেই আপাত সাধারণ-নিরীহ সনাতন ঘটনার প্রতিক্রিয়ায় যেভাবে প্রতিবাদ-প্রতিরোধের চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে, গল্পের শেষে এসে তা পাঠককে যথেষ্ট বিস্ময়াবিষ্ট করে দেয়।

আবার অনিল ঘড়াই-এর 'চৌকিদার' গল্পের সনাতন কেবল প্রতিরোধের শপথ নিয়েছে। বিশুকে যে বা যারা হত্যা করেছে তাদের উপর প্রতিশোধগ্রহণের কোনো প্রতিজ্ঞা সনাতনের মধ্যে লক্ষ করা যায় না। মহাশ্বেতা দেবীর 'ধীবর' গল্পের জগৎ পুত্রহত্যার সেই প্রতিশোধও নিয়েছে সুপরিকল্পিত উপায়ে। মালিকের

পুকুরে মাছ ধরার কাজ চলে যাওয়ার পর জগতের নতুন কাজ ছিল থানার দারোগার হুকুমে রায়পুকুরে বাঁশ নিয়ে নেমে পুকুরের তলা থেকে নকশাল আন্দোলনে নিহতদের শবগুলোকে তুলে আনা। জগৎ অবশ্য জানত না সেই লাশগুলো কাদের, কীভাবেই বা সেগুলো পুকুরের তলায় পৌঁছায়। এরপর একদিন জগতের ছেলে অভয়ও মারা যায়। কীভাবে সে মারা যায় কিংবা কারা তাকে মারে—সেকথা জানতে পারে না জগৎ। শুধু এটুকু জানতে পারে যে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভয়কে থানায় ধরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, তারপর তাকে থানা থেকে ছেড়েও দেওয়া হয়েছিল। জগৎ বুঝতে পারে অভয়কে আসলে কে হত্যা করেছে। তাই এর কিছুদিন পর থানার দারোগা একদিন সাইকেলে বাড়ি ফেরার সময়ে নিখোঁজ হয়ে যায়। জগৎকে আবার নামতে হয় রায়পুকুরের জলে দারোগার লাশের সন্ধানে। কিন্তু এবার আর সে জলের তলা থেকে দারোগার লাশটা তোলে না—

> "জগৎ ইট-পাথরের চাপড় টেনে নিয়ে দারোগাবাবুর পেটের ওপর চাপা দেয়। এখন এইরকমই থাকুক। দুদিন বাদে দেখা যাবে আর কী ব্যবস্থা করা যায়।"[১৩]

জল থেকে উঠে আসার পর জগতের মুখের হাসিটা থানার ছোটো দারোগার কাছে 'দুর্বোধ্য' বলে মনে হলেও তার এই হাসিটার অর্থ পাঠকের কাছে অস্পষ্ট থাকে না। পুত্রের শবের পাশে হত্যাকারীর শবকে এইভাবে শুইয়ে দিয়ে আসার মধ্যে জগতের যে ক্রোধ আর ঘৃণার প্রকাশ ঘটেছে তা তার চরিত্রকে সাধারণ দারিদ্র্যগ্রস্ত অন্যায়ের সঙ্গে আপসকামী ধীবরের চরিত্র থেকে এক বৈপ্লবিক মাত্রায় উন্নীত করেছে। পুত্র হারানোর বেদনায় জগতের মধ্যে এই যে ক্রোধ আর ঘৃণা তার এক ভিন্নধর্মী প্রকাশ লক্ষ করা যায় মহাশ্বেতা দেবীরই 'পিণ্ডদান' গল্পের আরেক পুত্রহারানো পিতা দশরথের মধ্যে। দশরথের কাজ ছিল নকশাল আন্দোলনে মৃত যেসমস্ত যুবকদের দেহগুলো পুকুরের তলায় পাঁকে পুঁতে দেওয়া হত, তাদের কঙ্কালগুলো পুকুর থেকে তুলে পালবাবু আর বোসবাবুদের কাছে অর্থের বিনিময়ে বিক্রি করা। অখণ্ড কঙ্কাল দিতে পারলে দশরথের আয় হত বেশি। অন্যদিকে দশরথ জানত তার ছেলে রাম জেল খাটছে, জেলে সে সুখেই আছে। কিন্তু একদিন ওষুধ কোম্পানীর দিঘিতে 'ভালো মাল' এর সন্ধানে নেমে দশরথ নিজের হাতেই তুলে আনে তার ছেলে রামলালের কঙ্কাল। কঙ্কালের গলার পদকে লেখা 'রামলাল' কথাটা থেকে দশরথ বুঝতে পারে যে সেটা তারই ছেলের কঙ্কাল, সেইসঙ্গে আরো বুঝতে পারে এতদিন রামলাল জেলে আছে বলে দশরথকে ঠকিয়েছে পালবাবুরা। দশরথ আশা করেছিল মৃত্যুর পর তার

একমাত্র পুত্রের হাত থেকে সে পিণ্ড পাবে। দীর্ঘদিন ধরে লালিত তার সেই আশাভঙ্গের বেদনায় দশরথ এরপর স্বাভাবিকভাবেই বেদনায় ফেটে পড়ে। কিন্তু তার সেই যন্ত্রণার প্রকাশ ঘটে ক্রোধের আকারে। কঙ্কালের বদলে পালবাবুর কাছ থেকে পাওয়া একশো টাকা দিয়ে দশরথ দশ বোতল মদ কিনে আনে। তারপর দশরথের বউ অত রাতে মদ খাওয়ার জন্য পেঁয়াজ কাটতে আপত্তি জানালে দশরথ চিৎকার করে ওঠে—

> "চুপ যা মাগী। ই মদ লয়, আমারে আমি পিণ্ডি দিচ্ছি! রাম মোরে আবার রাজা করে দিয়্যাছে, তু জানবি কি? ক্যারেও বলতে দিব না দশরথ অপিণ্ডিয়া ছিল।"[১৪]

দশরথের এই চিৎকার একইসঙ্গে তার বেদনা আর ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তার এই ক্ষোভকে হয়তো ব্যক্তিগত যন্ত্রণাজাত বলে মনে হতে পারে, কিন্তু একটু সূক্ষ্মভাবে ভাবলে বোঝা যায় দশরথের এই চিৎকৃত প্রতিবাদ আসলে নকশাল আন্দোলনে পুত্রহারা দশরথের মতো আরো অনেক অসহায় পিতার নিষ্ফল ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ্য, 'চৌকিদার' গল্পের সনাতন, 'ধীবর' গল্পের জগৎ কিংবা 'পিণ্ডদান' গল্পের দশরথ-এরা কিন্তু কেউই প্রত্যক্ষভাবে নকশাল আন্দোলনে অংশ নেয়নি কিংবা বিশেষ কোনো রাজনৈতিক মতেও বিশ্বাসী ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও ঘটনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় এইসব চরিত্রের যে চারিত্রিক বিবর্তন ঘটে গেছে, এদের যে ক্ষোভ-বেদনা-প্রতিরোধ ও প্রতিবাদীচেতনার স্ফুলিঙ্গ বিচ্ছুরিত হয়েছে তাতেই এই চরিত্রগুলি শৈল্পিক সার্থকতায় উন্নীত হয়ে গেছে।

নকশাল আন্দোলনের বহ্নিশিখা একদিকে যেমন বাংলার কৃষকজীবনকে স্পর্শ করে কৃষকদের আপাত শান্ত জীবনকে উত্তপ্ত করে তুলেছিল, তেমনি এই আন্দোলনের লেলিহান শিখা প্রবেশ করেছিল বাঙালি নারীজীবনের অন্দরমহলেও। নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত ছোটোগল্প রচিত হয়েছে সেইসমস্ত গল্পের নারীচরিত্রগুলিকে যদি আলাদা করে পর্যবেক্ষণ করা যায় তাহলে দেখা যাবে এই আন্দোলন কত বিচিত্রভাবে প্রভাবিত করেছিল বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির নারীকে। বিংশ শতাব্দীর ছয়ের দশকের শেষলগ্নে নকশাল আন্দোলন যখন দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, তার বহু পূর্বেই বাঙালি নারীর শুধুমাত্র অন্তঃপুরচারিণীরূপের অবসান ঘটেছিল। দু-দুটো বিশ্বযুদ্ধ এদেশের নারীদের গৃহের আপাত নিশ্চিন্ত-নিস্তরঙ্গ জীবন থেকে অর্থ ও ক্ষমতালাভের বিরামহীন প্রতিযোগিতায় দীর্ণ-ক্লেদাক্ত বহিঃবিশ্বের কর্মচঞ্চল জগতে টেনে আনে। এর আগে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও নারীদের অংশগ্রহণ ও সক্রিয়তা ছিল যথেষ্ট গৌরবজনক। স্বাধীনতার

পর অর্থনৈতিক কারণে বহির্জগতে মেয়েদের এই পথচলা আরো বৃদ্ধি পায়। সেইসঙ্গে সামাজিক অসাম্য-অনাচারের রূপগুলো মেয়েরা আরো গভীরভাবে অনুভব করতে পারে। স্বাধীনতার পর সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনগুলিতে মেয়েদের অংশগ্রহণ তাই ক্রমশ বৃদ্ধি পায়। নকশাল আন্দোলনেও প্রথম থেকেই নারীসমাজের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। নকশাল আন্দোলনকে প্রেক্ষাপটে রেখে যেসমস্ত বাংলা ছোটোগল্প রচিত হয়েছে সেগুলোতে দেখা যায় ফুটে উঠেছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির বহুবিচিত্র ধরনের নারীচরিত্রের চিত্র। আলোচনার সুবিধার্থে এইসমস্ত নারীচরিত্রগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যেতে পারে—

(ক) নকশাল আন্দোলনের উপর লেখা কিছু গল্পে ফুটে উঠেছে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির এমন কিছু নারীর চিত্র যারা এই আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছে।

(খ) কিছু গল্পে ফুটে উঠেছে আরেক ধরনের নারীর চিত্র, অন্তঃপুরে থেকেও কখনো প্রত্যক্ষ কখনো বা পরোক্ষভাবে এই আন্দোলন যাদের জীবনে তৈরী করেছে প্রবল ঘূর্ণাবর্ত।

বাংলা ছোটোগল্পে নকশাল আন্দোলনে যোগদানকারী যেসব নারীদের চিত্র ফুটে উঠেছে তাঁদের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে সমাজের শিক্ষিত অংশের অন্তর্গত নাগরিক জীবনে অভ্যস্ত রাজনৈতিক চেতনায় সমৃদ্ধ নারীরা, তেমনি আবার রয়েছে সম্পূর্ণ জীবন-অভিজ্ঞতায় ভর করে সামাজিক সাম্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখা শ্রমজীবী সম্প্রদায়ের নারীরাও। স্বামী-পুত্র-সংসার নিয়ে সুখী দাম্পত্যজীবন পালনের স্বপ্নকে স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে 'মুক্তির দশক' আনবার স্বপ্নে বিভোর 'সোমা' নামের এমনি এক নারীকে দেখতে পাই মৃণাল চৌধুরীর 'রৌদ্রদীপ্ত' গল্পে। স্বামী দীপেনের কারারুদ্ধ হওয়া কিংবা মৃত্যু মধ্যবিত্ত ঘরের রমণী সোমাকে বিন্দুমাত্র দমাতে পারেনি। পুলিশের গুলিতে কারাবন্দী অবস্থাতেই মৃত স্বামী দীপেনকে লেখা শেষ চিঠিতে সে সগর্বে জানিয়েছে—

> "তুমি নেই! এই মহাশূন্যতা আমাকে গ্রাস করতে চায়। আমি মানবো না। আমার সত্তা, আমার অস্তিত্ব, তোমার সঙ্গেই মিশে থাকবে। মানুষকে ভালোবেসেছিলে তুমি। ভালোবেসেছিলে শ্যামল বাংলা তথা ভারতের শোষিত মানুষকে এবং তার এক 'শ্যামলা' মেয়েকে। তোমার শত্রুর সঙ্গে লড়াই করে, আমৃত্যু তোমার এ ভালোবাসার মর্যাদা আমি রাখবই কমরেড..."[১৫]

সোমা তার সেই প্রতিজ্ঞা রেখেছে। দীপেনের মৃত্যুর দুদিন পর সোমাও প্রাণ

দিয়েছে কলকাতার রাজপথে গুলিবিদ্ধ হয়ে। প্রেমের মর্যাদা ও আন্দোলনের প্রতি দায়বদ্ধতা যেন এখানে একাকার হয়ে গিয়েছে, ব্যক্তি স্বার্থের ক্ষুদ্র নদীটি সার্থকতা পেয়েছে বৃহত্তর স্বার্থের সমুদ্রে অবগাহন করে। আবার সোমা যেমন তার স্বামীর ভালোবাসা থেকে শক্তি পেয়েছে পুলিশের গুলির সামনে বুক পেতে দেবার, জয়া মিত্রের 'স্বজন বিজন' গল্পের কমরেড-কথক মীরাও তেমনি কারারুদ্ধ অবস্থায় পুলিশের আসন্ন পাশবিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর মনোবল ফিরে পেয়েছে একই সেলে কারারুদ্ধ অন্য দুই অসহায় নারীর কমরেডদের প্রতি অবিচল শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস দেখে। পুলিশি অত্যাচারের ভয়কে তুচ্ছ করে তখন সে বলতে পেরেছে—

"নরকের ভিতর দরজা দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু একা যাচ্ছি না।"[১৬]

'রৌদ্রদীপ্ত' গল্পের সোমা কিংবা 'স্বজন বিজন' গল্পের মীরার মতো নারীরা কোনো ধরনের চাপে বাধ্য হয়ে নয়, আপন অন্তরের তাগিদ থেকেই এই আন্দোলনে সামিল হয়েছে, তার মধ্যেই খুঁজে পেয়েছে নারীশক্তির পূর্ণ প্রকাশের সুযোগ। বাংলা ছোটোগল্পের আসরে সোমাদের প্রসঙ্গে তাই প্রাসঙ্গিকভাবে মনে পড়ে যায় অন্য আরেক বামপন্থী কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সুবিখ্যাত 'সুন্দর' কবিতাটির কথা, নারীর সৌন্দর্যের সম্পূর্ণ এক ভিন্নতর ভাষ্য নির্মাণ করতে গিয়ে যেখানে 'পদাতিক'-এর কবি লিখেছিলেন—

"যখন তোমার আঁচল দম্‌কা হাওয়ায় একা একা উড়ছিল
তখনও নয়...
উত্তোলিত বাহুর তরঙ্গে তোমাকে ঢেকে দিল
যখন তোমাকে আর দেখা গেল না—
তখনই
আশ্চর্য সুন্দর দেখাল তোমাকে।"[১৭]

আমাদের আলোচ্য গল্পের সোমা কিংবা মীরারাও মিছিলের পথে পা মিলিয়েই তাদের জীবনের সার্থকতা খুঁজে পেয়েছে, খুঁজে নিতে চেয়েছে তাদের বাকি জীবনের বেঁচে থাকার রসদ। সীমিত শক্তির সঙ্গে বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের মিশেলে বিদ্রোহের বহ্নিতে দীপ্যমান হয়ে এইসমস্ত নারীরা যেন এক স্বতন্ত্র সৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে উঠেছে।

স্বাধীনতা-উত্তর ভারতে নকশাল আন্দোলন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি—সব দিক দিয়েই নতুন চেতনার জন্ম দিয়েছিল। অধ্যাপিকা সুমিতা চক্রবর্তী এ প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন—

"নকশালবাড়ি আন্দোলনের অভিঘাত প্রবিষ্ট হয়েছিল বাংলার সর্বস্তরের

মানুষের চেতনায়। দলমত-নির্বিশেষে কয়েকটি বিষয় তাঁরা নতুন করে লক্ষ করেছিলেন। দেখেছিলেন ভারতের প্রকৃত সামাজিক পরিস্থিতি স্বাধীনতার কুড়ি বছর পার হয়ে গেলেও অতীব অসাম্যময় এবং ক্রম-শোচনীয়।"[১৮]

এই অসাম্য-অনাচারের অবসানের লক্ষ্যে শুধুমাত্র শহরের নারীরা নয়, সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিল গ্রামবাংলার নারীসমাজও। দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে গ্রামাঞ্চলে জোতদারদের অত্যাচার, বঞ্চনা, লোভ-লালসার সামনে পুতুলের মতোই ক্রীড়নক হয়ে থাকতে বাধ্য হয়েছিল যে শ্রমজীবী নারীরা তারাও নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে দিন বদলের স্বপ্ন দেখেছিল। অপরিসীম দুঃসাহসে ভর করে নিজেদের সীমিত সামর্থটুকুকেই তাই তারা উজাড় করে দিয়েছিল আন্দোলনকে সার্থক করে তুলতে। স্বর্ণ মিত্রের 'প্রসব' গল্পে দেখা পাই 'আন্না' নামের এমনি এক নারীর। সহযোদ্ধাদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র পৌঁছে দিতে সে কম্যান্ডো সাহেবের সামনে গর্ভবতী নারীর নিপুণ অভিনয় করেছে। নিজের 'টাঁউস ভুঁড়িটা' নিয়ে সাঙাতদের সামনে যখন সে পৌঁছেছে তখন শেষপর্যন্ত দেখা যায়—

"...পোয়াতি আন্না প্রসব করল—চারটে রিভলভার, অনেকগুলো দলিলপত্র এবং- আপত্তিকর লাল বই!"[১৯]

বিপ্লবের প্রতি সন্তানসম স্নেহে আন্না এখানে শুধুমাত্র নকশালদের এক ক্যুরিয়ার হয়ে থাকেনি, যথার্থই হয়ে উঠেছে বিপ্লবের ধাত্রী। নকশাল আন্দোলনকারীদের সাহায্য করতে আন্না যেমন তার নারীদেহকে কাজে লাগিয়ে ভাবী মাতৃত্বের অভিনয় করেছে, অমর মিত্রের 'ডাইন' গল্পে হরি নায়েকের স্ত্রীও তেমনি তার সতীত্বকে বাজি রেখে স্বেচ্ছায় 'ডাইনী'র অপবাদ বরণ করে নিয়েছে। হরি নায়েকের মৃত্যুর সংবাদে কীর্তনিয়াশোলের অত্যাচারী বাবুরা যাতে আবার 'বাঘ' না হয়ে উঠতে পারে, তাই স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ গোপনে রেখে হরি নায়েকের স্ত্রী সধবা সেজেছে, পাপ-পুণ্যের প্রচলিত সংস্কারকে বিসর্জন দিয়ে গ্রামের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যকল্পে উৎসর্গীকৃতপ্রাণ এই নারী অবিচলিত কণ্ঠে বলেছে—

"শাখা ভাঙলে গাঁসুদ্ধ মানুষ মরবে, নায়েক মরলে সকলের মরণ!... লাশ পুঁতে ফেল, রটাই দে নায়েক পলাইছে, মু সিঁদুর পরি।...আগে বাঁচি পরে পাপ, গাঁ বাঁচলে বড়ো পুণ্যি।"[২০]

মহাশ্বেতা দেবীর 'শরীর' গল্পে আমরা এরকম আরো এক নারীকে দেখতে পাই যে আত্মবলিদানের মধ্য দিয়ে তাঁর প্রতিবাদ জানিয়েছে। উপজাতি সম্প্রদায়ের অন্তর্গত এই মেয়েটি 'অনুপম' নামের যে ছেলেটিকে ভালোবাসতো সেই নকশাল অনুপমকেই ধরার টোপ হিসেবে মেয়েটিকে ব্যবহার করে নৃপতি, অতনু ও তার দলের অন্যান্যরা। অনুপমের ধরা পড়ার পর সে রাতে মেয়েটির ফ্ল্যাটে নৃপতিদের

উন্মত্ত আনন্দের আসর বসে। মেয়েটি চাইলে তখন নৃপতিদের গুলি করতে পারত, মদে বিষও মিশিয়ে দিতে পারত, কিন্তু তা সে করেনি, লেখিকা জানিয়েছেন—

> "ও বাথরুমের দরজা বন্ধ করেছিল। তারপর একটা শব্দ হয়। নিচে চিৎকার। নৃপতি আর এম পাশাপাশি মুখ বাড়িয়ে দেখেছিলেন আটতলা নিচের ফুটপাথে একটা ভাঙাচোরা আশ্চর্য শরীর পড়ে আছে।"[২১]

মেয়েটির এই আত্মবলিদানের মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে নিজের প্রেমিককে ধরিয়ে দেওয়ার অনুশোচনাবোধ, তেমনি তার যে শরীরকে কাজে লাগিয়ে নৃপতির দল অনুপমকে ধরেছে, সেই শরীরকে শেষ করে দেওয়ার মধ্যে মেয়েটির যে একধরনের অনুচ্চার প্রতিবাদও ধ্বনিত হয়েছে তাও বুঝতে অসুবিধা হয় না। আন্না, হরি নায়েকের স্ত্রী কিংবা মহাশ্বেতা দেবীর 'শরীর' গল্পের এই অনাম্নী অঙ্গনারা এভাবে পরোক্ষভাবে আন্দোলনের জন্যই তাদের জীবন উৎসর্গ করেছে। কিন্তু মহাশ্বেতা দেবীরই আরেক জনপ্রিয় গল্প 'দ্রৌপদী'-র কেন্দ্রীয় চরিত্র দ্রৌপদী এভাবে পরোক্ষভাবে আন্দোলনে অংশ নেয়নি। সে সরাসরি নিজের হাতে জোতদার সূর্য সাউকে নিঃশেষ করেছে। দ্রৌপদীর গেরিলা যুদ্ধের অভিনব কৌশল ও আত্মগোপনের নৈপুণ্য প্রবল পরাক্রমী সেনা অধিনায়কের মনেও রীতিমতো ত্রাসের সঞ্চার করেছে। কিন্তু শেষপর্যন্ত সেই দ্রৌপদীকেও ধরা পড়তে হয়েছে তারই সহকর্মীদের বিশ্বাসঘাতকতায়। তারপর সারা রাত জুড়ে এই কলিযুগের দ্রৌপদীর উপর চলেছে গণতন্ত্রের রক্ষাকর্তার মুখোশধারী এ যুগের দুর্যোধনদের পাশবিক অত্যাচার। কিন্তু এরপর রাত্রি শেষে সেনানায়কের সামনে যখন দ্রৌপদীকে হাজির করবার আদেশ হয়, তখনই এক অভাবনীয় আকস্মিক দাবানলের মতো জ্বলে ওঠে অরণ্যকন্যা দ্রৌপদী। গণধর্ষিতা উলঙ্গ দ্রৌপদী এগিয়ে আসতে থাকে সেনানায়কের দিকে, আর তারপর—

> "চারদিকে চেয়ে দ্রৌপদী রক্তমাখা থুথু ফেলতে সেনানায়কের সাদা বুশ শার্টটা বেছে নেয় এবং সেখানে থুথু ফেলে বলে, হেথা কেও পুরুষ নাই সে লাজ করব। কাপড় মোরে পরাতে দিব না। আর কী করঠব? লেঃ কাঁউটার কর্, লেঃ কাঁউটার কর্-?"[২২]

দ্রৌপদীর এই থুথু যেন সেনানায়কের সাদা শার্টটিকে নয়, আসলে কালিমালিপ্ত করে দেয় গণতন্ত্রের ধ্বজাধারী অত্যাচারী রাষ্ট্রশক্তির ভণ্ডামি আর ভালোমানুষির শুভ্র মুখোশটাকেই। দ্রৌপদী, আন্নার মতো সেদিনের অজস্র নারীরা যারা হয়তো কমিউনিজমের তাত্ত্বিক মতাদর্শ জানত না, কিন্তু নিজেদের জীবনঅভিজ্ঞতায় ভর করে তারা সেদিন যেভাবে রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধেও চোখে চোখ রেখে লড়াই করেছিল, তারই স্বরূপ সাহিত্যের পাতায় ধরে রেখেছেন মহাশ্বেতা দেবী, অমর

মিত্রের মতো সেকালের অনেক ছোটোগল্পকাররা।

দ্রৌপদী, আন্নারা যখন সরাসরি গৃহের অবরোধ ভেঙে ফেলে পথে নেমেছিল নকশাল আন্দোলনকে সফল করে জোতদার, জমিদাররাজকে উৎখাত করতে, তখন আরেকদল নারী নীরবে গৃহের অন্তঃপুরে থেকে নিজেদের গায়ে মেখেছিল এই আন্দোলনের উত্তাপ-ভস্মাবশেষ। সমরেশ বসুর 'শহীদের মা' গল্পের শহীদ বাদলের মা বিমলা এই শ্রেণির নারীদের অন্তর্গত। একই পরিবারের চার সদস্যের চাররকম রাজনৈতিক মতাদর্শের দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে 'শহীদের মা' গল্পের বাদলের মা বিমলার অন্তঃকরণ। শেষপর্যন্ত নিজেরই অন্য কোনো সন্তান বা নিজের স্বামীর রাজনৈতিক দলের হাতে বিমলা হারিয়েছেন তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান বাদলকে। রাজনীতির সঙ্গে ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক সম্পর্কের সমীকরণের চিত্র এর আগে আমরা পেয়েছিলাম সতীনাথ ভাদুড়ীর 'জাগরী' উপন্যাসে। এ গল্পেও সেই একইধরনের চিত্র ভিন্ন সময়কালের ও ভিন্ন রাজনৈতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত। তবু 'জাগরী' উপন্যাসে বিলু-নিলুর মা-কে শেষপর্যন্ত সন্তানহারা হতে হয়নি। সমরেশ বসুর গল্পে বিমলার মা'র জীবনে নেমে এসেছে সেই চরম আঘাতটিও। মানবেন্দ্র পালের 'অভিনয়' গল্পেও দরিদ্র পিওন মহাদেবের সন্তান অনিলের একইভাবে প্রাণ গেছে এই আন্দোলনে। তবু সামাজিক মর্যাদা ও সম্মান রক্ষার্থে সন্তান হারানোর বেদনাকে অশ্রুজলে ভাসিয়ে দিতে পারেননি অনিলের মা। কান্নার অধিকারটুকুও যেন এসব অসহায় মায়েদের থেকে কেড়ে নিয়েছে সভ্যসমাজ। শুকদেব চট্টোপাধ্যায়ের 'তরাইয়ের মা' গল্পে আবার দেখি মাতৃত্বের এক ভিন্নরূপ। পুত্র কল্যাণের মৃত্যু সংবাদকে অনুধাবন করেও আকস্মিক কান্নায় ভেঙে পড়েননি তার মা। বরং কল্যাণের বন্ধু শান্তনুর হাতে তুলে দিয়েছেন তার খোকনের জন্য পরম যত্নে নিজের হাতে বোনা সোয়েটারটি, যে ভূমিহীন খেতমজুরদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য তাঁর খোকন প্রাণ দিয়েছে, সেই খেত মজুরদেরই কাছে তিনি সেই জামাটি পৌঁছে দিতে বলেছেন। স্নেহ-বাৎসল্যের এমন বেদনাবিধুর কঠিন সংযমীমূর্তি কল্যাণের মা-কে দেখে শান্তনুর তাই মনে হয়েছে—

> "ভারতের মানচিত্রের মতো মায়ের মুখ।...তার সামনে হ্যারিকেনের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছেন এক মা। বিশাল। তাঁর মাথা ছুঁয়েছে আকাশ, পা ছুঁয়েছে ধরণীতল। ক্রমশ বেড়ে উঠছেন তিনি। ঘর ছাড়িয়ে গলি। আকাশ আর সমুদ্রের মতো।"[২৩]

বাদল, অনিল বা তরাইয়ের মায়েরা যেন ব্যক্তিগত দুঃখ-যন্ত্রণার অনুভব থেকে

পৌঁছে গিয়েছেন নৈর্ব্যক্তিক অনুভবের সাগরকিনারে, হয়ে উঠেছেন দেশমাতৃকার উন্নতিকল্পে অকালে ঝরে যাওয়া প্রতিটি তাজা-তরুণ প্রাণের মায়েদের প্রতিমূর্তি।

বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি ও সাহিত্যের ইতিহাসে নকশাল আন্দোলন অবিস্মরণীয় হয়ে আছে বিশেষ দুটি দিক থেকে—

(ক) একদিকে এই আন্দোলন দেখিয়েছিল যৌবনের শক্তি, বিপ্লবকে সার্থক করে সত্তরের দশককে মুক্তির দশকে পরিণত করার স্বপ্নে বিভোর হাজারো তরুণ-তরুণীর আত্মবলিদান। সেইসমস্ত তরুণ-তরুণীদের মত ও পথের যাথার্থ বা ভ্রান্তি সম্পর্কে যত বিতর্কই থাকুক না কেন, এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যৌবনের যে শক্তি দেখা গিয়েছিল তা নিঃসন্দেহে আজও বিস্ময়াবিষ্ট করে।

(খ) অন্যদিকে এই আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই স্বাধীনতা-উত্তরযুগে দেখা গিয়েছিল গণতন্ত্র রক্ষার জন্য শাসনযন্ত্রের অতিসক্রিয়তা।

নকশাল আন্দোলনকারীরা সংসদীয় গণতন্ত্রকে বর্জন করে উগ্র হিংসাত্মক পথ বেছে নেয়। এর ফলে নকশাল আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য পুলিশ বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়ে বিদ্রোহী যুবকদের ওপর। উভয়পক্ষের এই সংঘর্ষে সেদিন যে ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় তার পরিচয় দিতে গিয়ে বিজিত ঘোষ লিখেছেন—

> "সংঘর্ষ, হিংসা, প্রতিহিংসা আর দমন নীতির তাণ্ডবে চতুর্দিকে তখন এক ভয়ংকর অবস্থা। পুলিশী দমননীতির মাঝেও বিপ্লবীদের শ্রেণিশত্রু খতম করার অভিযান চলতেই থাকে। হাজার হাজার যুবক নিরুদ্দেশ হয়। গ্রেফতার হয় অসংখ্য তরুণ। বিভিন্ন জেলখানায় পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় অনেককেই। গুলিবিদ্ধ হয়েও অসংখ্য বিপ্লবী কর্মীর জীবনাবসান ঘটে।"[২৪]

এই সংঘর্ষের রক্তাক্ত ছবি ফুটে উঠেছে বাংলা ছোটোগল্পের পাতাতেও। আন্দোলনের সেই ভয়াবহ দিনগুলোতে মানুষের জীবন আর তার শরীরটার দাম যে কতটা অবমূল্যায়িত হয়েছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় নবারুণ ভট্টাচার্যের 'খোঁচড়' গল্পে। বহুদিন ফেরার নকশাল আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা ও সংগঠক গৌতম বিশ্বাস 'কালীতলা যুবক সমিতি'র জলসায় গান শুনছে এমন একটা খবর আকস্মিকভাবে পুলিশ পেয়ে যাওয়ায় সেই অবস্থাতেই পুলিশবাহিনী গিয়ে তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করে। বিনা বিচারে এমন হত্যা যেন পুলিশের রোজনামচা। তাই এই মর্মান্তিক ঘটনার পরও তাঁরা অবলীলায় যেন কিছুই হয়নি এমন ভাব করে জলসার উদ্যোক্তাদের বলে—

> "শুরু করতে বলুন-জলসা ফলসা থামানো চলবে না, গান হোক, গান চলুক—আমরা লাশ বার করে নিয়ে যাচ্ছি—শুরু করতে বলুন।"[২৫]

মনুষ্যেতর প্রাণীর মরা দেহের মতোই তারা এরপর নিয়ে চলে যায় গৌতমের

নিথর দেহটা। মনুষ্যত্বহীনতার এমন অসংকোচ-উলঙ্গ মূর্তি শুধু বেদনাদায়ক নয়, ত্রাসসঞ্চারকও বটে। আবার অত্যাচার তো শুধু শারীরিক নয়, সেইসঙ্গে ছিল পুলিশ লকআপে আন্দোলনকারীদের উপর নানাভাবে মানসিক চাপ তৈরি করে তাদের থেকে স্বীকারোক্তি আদায় করার প্রক্রিয়া। বিমল করের আত্মকথনধর্মী 'নিগ্রহ' গল্পে পুলিশ লকআপে এক নকশাল আন্দোলনকারীকে দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করানোর এমনি এক হিমশীতল রুদ্ধশ্বাস বর্ণনা পাই। 'সুবোধ হালদার' নামক সেই নকশালবাদী যুবককে দিয়ে স্বীকারোক্তি আদায় করাবার জন্য গল্পকথক প্রথমে সুবোধের বোনের সম্পর্কে কুৎসিত মন্তব্য করে সুবোধকে উত্যক্ত করে। তারপর সুবোধকে একটা সরু ঘরে দমবন্ধকর পরিস্থিতির মধ্যে নিয়ে গিয়ে পেনসিলের মতো একটা সরু ছয় ইঞ্চি লম্বা চকচকে জিনিস বের করে সুবোধকে প্রচ্ছন্ন হুমকির সুরে বলে—

> "এটা ইলেকট্রনিক্যালি অপারেটেড একরকম টর্চ, ইন্‌ফ্রারেড রে বেরুবে জ্বাললে। তোমার চোখের পাতায় আলোটা দিয়ে রাখলে ভীষণ যন্ত্রণা হবে। গরম লাগবে খুব। মনে হবে চোখের পাতা, মণি পুড়ে যাচ্ছে। বেশিক্ষণ রাখলে অন্ধও হয়ে যেতে পার।"[২৬]

আতঙ্কে এরপর সুবোধ তার সমগ্র জীবনের কথা বলতে বাধ্য হয়েছে পুলিশ অফিসারটির কাছে। নকশাল আন্দোলনের সময়ে এই আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের উপর নানা বিচিত্র উপায়ে নির্মম পুলিশি অত্যাচারের চিত্র যেমন ফুটে উঠেছে অনেক বাংলা ছোটোগল্পে, তেমনি পুলিশের রক্তচক্ষুর হাত থেকে যে রক্ষা পায়নি অনেক নিরপরাধ মানুষ—সে বিষয়টিও ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন অনেক গল্পকার। এইসমস্ত নিরপরাধ নিরীহ মানুষগুলো অনেক সময় বুঝেও উঠতে পারেনি কোন্ অপরাধে পুলিশ তাদের কারারুদ্ধ করেছে। মণি মুখোপাধ্যায়ের 'গণতন্ত্র এবং গোপাল কাহার' গল্পের গোপাল কাহার এমনি একজন, যে জানে না গণতন্ত্রের সংজ্ঞা কী, কেমন তার স্বরূপ। তাই থানার ওসি-র প্রশ্নের উত্তরে সে অকপটে বলতে পারে—

> "ওই যে—কী নাম বইললেন, গণতন্ত্র না কী। বিশ্বাস করেন বাবু, ওনাকে আমি চিনিও না। কুন দিন দেখি নাই। কোথায় থাকেন, তাও জানিনে।"[২৭]

এহেন গোপালকেই দীর্ঘ সাত মাস বিনা বিচারে জেলখানায় বন্দী থাকতে হয়। গোপালের বাঁ হাতখানাও কাটা যায়। কিন্তু কারামুক্তির পর গোপাল ঠিক করে ফেলে সে সমিতির অফিসে যাবে—

> "কেননা, সে স্থির করিয়া ফেলিয়াছে, যে গণতন্ত্রের জন্য সে বাঁ হাতখানি

সেলামি দিয়াছে, সেই গণতন্ত্রকে ভাঙিয়া সকলের ব্যবহারযোগ্য একটা নতুন গণতন্ত্রের জন্য সে তাহার দক্ষিণ হাতখানিও সেলামি দিবে।"[২৮]

গণতন্ত্রের বিনষ্টি থেকেই এখানে এক নতুনতর গণতান্ত্রিক চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে উঠেছে গোপাল কাহার। শুধুমাত্র নিরপরাধ গোপাল কাহারদেরই যে অত্যাচারিত হতে হয়েছিল তা নয়, সাতের দশকের সেই রক্তাক্ত দিনগুলিতে আন্দোলনের অভিঘাতে অকালে ঝরে গিয়েছিল বহু তরুণ তাজা প্রাণও। সুরজিৎ দাশগুপ্তের 'পরিচয়হারা' গল্পে দেখি এমনি এক নিরীহ, রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত দরিদ্র ছাত্র বিজনকে এক রাত্রের মধ্যেই বিনা অপরাধে এনকাউন্টারে হত্যা করা হয়। তারপর তারই দাদাকে দিয়ে জোর করে লিখিয়ে নেওয়া হয় বিজনের নামে মিথ্যা অভিযোগ—

"ট্রায়েড টু রান অ্যাওয়ে ফ্রম দি পোলিস কাস্টোডি..হোয়েন হি ওয়াজ শট ডেড।।"[২৯]

তবে একথাও ঠিক রাষ্ট্রের দেওয়া স্বাধীনতা ও ক্ষমতার সুযোগ নিয়ে সেদিনের সকল পুলিশ অফিসারই যে সম্পূর্ণভাবে বিবেক-মনুষ্যত্বহীন হয়ে পড়েছিলেন তা নয়। তাঁদের মধ্যেও ছিলেন কিছু ব্যতিক্রমী মানুষ। মিহির আচার্যের 'লোহার খুর' গল্পে দেখতে পাই তেমনি এক পুলিশ অফিসারকে, কার্জন পার্কে সাম্রাজ্যবাদবিরোধী নাটক মঞ্চস্থ করার অপরাধে যাঁর নেতৃত্বে অপরাজিতা-রমেনের একমাত্র পুত্র সুধীরকে পুলিশ হত্যা করে। তারপর সেই পুলিশ অফিসারই অপরাজিতাকে বলেন—

"আসল কথা হচ্ছে সিস্টেম, সেটাকে বদলাতে না পারলে আপনাদের, আমাদের কারোরই মুক্তি নেই।...একই সিস্টেমের অনুগত দাসত্ব করতে গিয়ে ধরা পড়ে যাই আমরা, আর সিস্টেম থাকে অক্ষত। কর্তব্য-অকর্তব্য ঘুলিয়ে যায়।"[৩০]

পেশাগত দায়বদ্ধতার কাছে পুলিশও যে কতটা অসহায়, তা বিবেকের দংশনে দগ্ধ এই পুলিশ অফিসারের বয়ানে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন গল্পকার।

পূর্বেই উল্লেখ করেছি নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে বাংলায় যেসমস্ত ছোটোগল্প রচিত হয়েছে সেইসমস্ত গল্পের গল্পকাররা যে সকলেই এই আন্দোলনের সপক্ষে কলম ধরেছেন তা নয়। গল্পগুলির বিষয়, আঙ্গিক ও কাহিনিগত পরিণামের দিকে লক্ষ রাখলে দেখা যায়, কয়েকজন গল্পকারের গল্পে এই আন্দোলনের লক্ষ্য ও আন্দোলনকারীদের প্রতি কিছুটা সহানুভূতিশীল মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে। আরেকদল গল্পকার আবার নকশাল আন্দোলনের উগ্র ধ্বংসাত্মক নেতিবাচক দিকগুলিকে তাঁদের গল্পের মধ্যে বিশেষভাবে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে

নকশাল আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যের যাথার্থ সম্পর্কে যা কিছু বিতর্কই থাকুক না কেন, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়ায় কিছুদিনের জন্য তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গ বিশেষত কলকাতার কয়েকটি অঞ্চল কার্যত বধ্যভূমিতে পরিণত হয়েছিল। আন্দোলনকারীদের নিজেদের মধ্যে ছিল যথাযথ পরিকল্পনার অভাব, নানা মতভেদ, দলাদলি, পারস্পরিক হিংসা ও অবিশ্বাস। নকশাল আন্দোলনের পক্ষ ও বিপক্ষ মতাবলম্বীদের মধ্যেকার সেই অন্তর্কলহ, পারস্পরিক খুন-জখমের পৈশাচিকতার দিকটিকে ফুটিয়ে তুলে সেই যুগের সংকটময় আবহটিকে বাংলা ছোটোগল্পের পাতায় চিরস্থায়ীভাবে ধরে রাখতে চেয়েছেন অনেক গল্পকার। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ও তাঁর 'পলাতক ও অনুসরণকারী' গল্পটির কথা এ প্রসঙ্গে প্রথমেই স্মরণে আসে। এ গল্পে দেখা যায়, 'রবি' নামে এক যুবককে হত্যা করার উদ্দেশ্যে তার পিছু নিয়েছে তিন যুবক। রবি প্রথমে তার পিসেমশাইয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। তারপর সেখান থেকে বন্ধু চন্দনের বাড়িতে প্রত্যাখ্যাত হয়ে আরেক বন্ধু সুশান্তের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে। কিন্তু যেখানেই রবি উপস্থিত হয়েছে, সেখানেই ঐ তিনজন যুবক তার পিছু ধাওয়া করে উপস্থিত হয়েছে। অবশেষে নির্জন মাঠের মধ্যে রবিকে ধরে ফেলে তাকে নৃশংসভাবে হত্যা করেছে ঐ তিন যুবক। কিন্তু গল্পটির মূল চমক রবিকে হত্যা করার মধ্যে নয়, এর পরবর্তী অংশে। রবিকে ঐ তিনজন যুবক হত্যা করার পরেই দেখা যায় আরো আট-দশ জন লোক ছুটে আসছে ঐ তিন হত্যাকারীর দিকে। আর তারপর ঐ ঘাতক তিনজন—

> "...কোনও ঝুঁকি নিল না। তৎক্ষণাৎ এরা উঠে দাঁড়িয়ে ছুটতে লাগল, পালাবার সুবিধার জন্য তিনজন তিন দিকে।...একটু আগে যে ছিল এক নং অনুসরণকারী, এখন সে এক নং পলাতক তাকে যারা তাড়া করে আসছে তাদের মধ্যে এক নং অনুসরণকারী তিন নং অনুসরণকারীকে বলল, 'যাবে কোথায়? পকেট থেকে কাগজটা বার ক'র। দেখে নে।"[৩১]

নকশাল আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক খুনোখুনি আর সন্ত্রাসের রাজনীতির স্বরূপ আপাত নির্লিপ্ত ভঙ্গিমায় এ গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন গল্পকার। আবার এই খুনোখুনির রাজনীতিরই অন্যধরনের টানটান উত্তেজনাপূর্ণ বর্ণনা পাওয়া যায় স্বপন সেনের 'সাদা রুমাল' গল্পে। বন্ধু বসিরের বাড়ি বকরিদে নিমন্ত্রণ খেতে যাওয়ার সময়ে এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটিকে বিজন ভেবে তার পিছু নেয় তিনজন যুবক। যুবক তিনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল তাদের বিপরীত পক্ষের 'বিজন' নামের যুবকটিকে হত্যা করা। বিজনের সঙ্গে আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির সাদৃশ্য থাকাতেই তারা বিজন ভেবে ঐ নিরীহ যুবকটিকে শেষপর্যন্ত হত্যা করে।

কিন্তু এই হত্যার পূর্বে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির ভাবনার সূত্রে লেখক যেন তাঁর নিজের মতকেই প্রকাশ করেছেন—

> "রাজনীতির বাইরে থেকে তার বারবারই মনে হয়েছে দেশজুড়ে একটা পরিবর্তন আসছে। সঙ্কীর্ণ দলীয় রাজনীতির ওপরে, মানুষ দেশ-কালের নতুন সংজ্ঞা নির্ণয় হবে অতীতের সমস্ত ইতিহাসের বুকে। পরিবর্তন সেও আশা করেছিল, তাই মাঝে মাঝে তার রাজনীতিহীন মধ্যবিত্ততাকে দোষারোপ করেছে। অথচ আজ যে রাজনীতির চেহারা প্রত্যক্ষ করছে তা শুধু পাঁক আর কাদা ঘেঁটে কতকগুলো সন্দেহের বুদবুদ বুকে নিয়ে আরও পাঁকের গভীরে ডুবে যাওয়া। এ কোন আদর্শবাদ? যেখানে দলগুলো মানুষের বৃহত্তর স্বার্থে মানুষকেই নিয়ে যাচ্ছে আরও ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডিতে।"[৩২]

গল্পটিতে ঘটনা সামান্যই। কিন্তু সেই সামান্য ঘটনার সূত্রে গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্রটির নানা ভাবনার মধ্য দিয়ে গল্পকার সমকালীন সন্ত্রাসের রাজনীতির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ধিক্কার ব্যক্ত করেছেন। শুধু তাই নয়, বিজন সম্পর্কে গল্পের ঘাতক চরিত্র তিনটির নানা ভাবনাকে তুলে ধরে তাঁর মধ্যে দিয়েও গল্পকার আন্দোলনকারীদের পারস্পরিক রেষারেষি ও ঈর্ষার কদর্য রূপটিকে ফুটিয়ে তুলেছেন। বলাবাহুল্য, নকশাল আন্দোলনকারীদের দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ও আত্মোৎসর্গের কাহিনি নিয়ে রচিত অজস্র গল্পের পাশাপাশি এই আন্দোলনের ধ্বংসাত্মক রূপটিকে নিয়ে রচিত গল্পগুলির গুরুত্বও অপরিসীম, কেননা এই দু'ধরনের গল্পের সম্মিলিত পাঠের মধ্যে দিয়েই আমরা নকশাল আন্দোলনের সামগ্রিক স্বরূপ ও গতিপ্রকৃতিকে যথাযথভাবে অনুধাবন করতে পারি।

নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে যে সমস্ত গল্প রচিত হয়েছে সেগুলোতে এভাবেই বারবার উঠে এসেছে সমকালীন রক্তগর্ভ পরিস্থিতির চিত্র। সাতের দশকের মধ্যলগ্ন থেকেই এই আন্দোলন ক্রমশ পথ হারিয়ে ফেলে। কিন্তু যজ্ঞ সমাপ্ত হওয়ার পরেও হোমকুণ্ডের নীচে যেমন অনেকসময় থেকে যায় আগুনের সুপ্ত লেলিহান শিখা, তেমনি নকশাল আন্দোলনের সমাপ্তির পরেও স্বামীহারা কিছু অসহায় নারী, সন্তানহারা কিছু পিতা বা জননী কিংবা পিতৃহারা কিছু সন্তানের বুকের অভ্যন্তরে তেমনি হয়তো থেকে গিয়েছিল প্রতিহিংসার সুপ্ত আগুন। বারিদবরণ চক্রবর্তীর 'সবুজ দ্বীপের মাঝি' আর শংকর সেনগুপ্তের 'অন্যমুখ' গল্পে যথাক্রমে আমরা দেখতে পাই তেমনি এক পিতৃহারা সন্তান নকুল হালদার ও সন্তানহারা জননী রেখাকে। নকশাল আন্দোলনের সময়ে নকুল হালদারের পিতা নিতাই হালদার খুন হয়। দীর্ঘকাল পরে পিতার খুনি বিভাস চক্রবর্তীকে হাতের মধ্যে পেয়েও প্রতিশোধ নিতে পারে না নকুল তার সবুজ দ্বীপকে মনের

মতো করে গড়ে তোলার ইচ্ছার কারণে। ভয়ার্ত বিভাসকে নকুল তাই বরফের ন্যায় শীতল-কঠিন কণ্ঠে বলে—

> "জানেন, আপনাকে চেনার পর থেকেই আমার মধ্যে কী ঝড়তুফান শুরু হয়ে গেছে। দু-পা এগোচ্ছি তো চার পা পিছিয়ে যাচ্ছি। কিছুতেই ভুলতে পারছি না বাপের সেই খুনিটাকে, আবার কিছুতেই ভুলতে পারছি না চর নোয়াপাড়ার ওই সবুজ স্বপ্নটাকে। ভুলতে পারছি না, ওই নতুন দ্বীপটাকে গড়ে তোলার কাজে আমি নিজেকে একেবারেই বিলিয়ে দিয়েছি—এমন কিছু কাজ আমি করতে পারি না যাতে ওই গড়ার কাজ একটা দিনের জন্য হলেও থমকে যায়।"[৩৩]

একইভাবে নিজের বিপ্লবী পুত্রের হত্যাকারী, পুলিশ অফিসার গোপেন মল্লিককে একান্তে সম্পূর্ণ অনুকূল পরিবেশে পেয়েও তাকে হত্যা করতে পারেন না তীর্থঙ্করের মা রেখা। একদিকে মাতৃসত্তা, অন্যদিকে নার্স হিসাবে দীর্ঘ পেশাগত জীবনের সেবিকাসত্তা—এ দুয়ের মধ্যে রেখার মধ্যে শেষপর্যন্ত সেবিকাসত্তাই জয়ী হয়। নকশাল আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে খুন, জখম, প্রতিহিংসা, পুলিশি অত্যাচার—এসবের রক্তাক্ত,পঙ্কিল ইতিহাস নিয়ে লেখা গল্পগুলির বিপ্রতীপে দাঁড়িয়ে সেই একই আন্দোলনের ক্যানভাসে ভিন্ন রং তুলিতে ফুটিয়ে তোলা 'সবুজ দ্বীপের মাঝি' কিংবা 'অন্যমুখ'-এর মতো গল্পগুলি শেষপর্যন্ত মনুষ্যত্বের বৃহত্তর সরণীতে পাঠককে এনে দাঁড় করায়, কবি জীবনানন্দের ভাষায় বলা যায়, শাশ্বত রাত্রির বুকে এনে দেয় অনন্ত সূর্যোদয়ের আভাস।

নকশাল আন্দোলনকে নিয়ে লেখা বাংলা ছোটোগল্পের অন্দরমহলে অনুসন্ধানী দৃষ্টি নিয়ে প্রবেশ করলে দেখা যায়, এভাবেই সেখানে বারবার সমাজের বিভিন্ন শ্রেণির মানুষেরা স্থান করে নিয়েছে। আন্দোলনের অভিঘাতে এদের কারো হয়তো সুখী গৃহকোণ রচনার স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে গেছে। নিয়তির হাতে মার খাওয়া সেইসমস্ত মানুষগুলোর ক্রন্দন আর হাহাকার বাংলা ছোটোগল্পের আকাশকে বেদনাভারাতুর করে তুলেছে। আবার এর পাশাপাশি নকশাল আন্দোলন বাংলা ছোটোগল্পকে উপহার দিয়েছে এমন কিছু চরিত্র, যারা মহতী সংগ্রামী চেতনায় ঋদ্ধ হয়ে বাংলা কথাসাহিত্যে চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে। সেইসঙ্গে এই আন্দোলনে একদিকে রাষ্ট্রশক্তির সঙ্গে আন্দোলনকারীদের বিরোধ ও অন্যদিকে আন্দোলনকারীদের নিজেদের মধ্যেকার অন্তর্দ্বন্দ্ব-এই দুইয়ের ফলশ্রুতিতে খুন-জখম, রক্তপাতে বিধ্বস্ত নগর কলকাতা ও গ্রামবাংলার যে চিত্র বাংলা ছোটোগল্পের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে, তা যেন আমাদের পরিচিত কল্লোলিনী তিলোত্তমা ও সুজলা-সুফলা পশ্চিমবঙ্গকে নতুন ভাবে চিনিয়ে দেয়। সর্বোপরি নকশাল

আন্দোলনকে নিয়ে লেখা বাংলা ছোটোগল্পগুলিতে এই আন্দোলন তথা রাজনীতি ও সমাজের সঙ্গে বাংলার বিভিন্ন শ্রেণির মানুষের ব্যক্তিগত এবং পারিবারিক সম্পর্ক ও স্বার্থের যে বহুকৌণিক সমীকরণের দিক ফুটে উঠেছে, তার প্রতি যদি আলাদা করে অভিনিবেশ করা যায় তাহলে হয়তো পরিবর্তমান বাঙালি জীবনের একটি বিশেষ অধ্যায়কে চিনে নেওয়া যেতে পারে—শুধুমাত্র বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসেই নয়, বাংলার সমাজ-ইতিহাস আলোচনাতেও যার গুরুত্ব অপরিসীম।

তথ্যসূত্র :

১। বিজিত ঘোষ, 'সম্পাদকের কৈফিয়ৎ', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮

২। নির্মল ঘোষ, 'নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, করুণা, আষাঢ় ১৩৮৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪০১), পৃষ্ঠা : ২০৪

৩। দিব্যেন্দু পালিত, 'মানুষের মুখ', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ২২৮

৪। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৩৩

৫। অসীম রায়, 'অনি', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.) 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৭৮

৬। প্রলয় সেন, 'তপু চলে যাচ্ছে', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.) 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৫৩

৭। তদেব, পৃষ্ঠা : ১৫৩

৮। মহাশ্বেতা দেবী, 'রং নাম্বার', 'মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, প্রমা, বৈশাখ ১৩৫১, পৃষ্ঠা : ১৪৮

৯। ব্রজেন মজুমদার, 'খোদহাটির ডাক', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১১৬

১০। সনৎ বসু, 'মৃত্যুহীন', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুযারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৬০৪

১১। অনিল ঘড়াই, 'চৌকিদার', 'দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৬৮৫

১২। তদেব, পৃষ্ঠা : ৬৮৬

১৩। মহাশ্বেতা দেবী, 'ধীবর', 'মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, প্রমা, বৈশাখ ১৩৫১, পৃষ্ঠা : ১৩১

১৪। মহাশ্বেতা দেবী, 'পিণ্ডদান', 'মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম সস্করণ, কলকাতা, প্রমা, বৈশাখ ১৩৫১, পৃষ্ঠা : ১৩৬

১৫। মৃণাল চৌধুরী, 'রৌদ্রদীপ্ত', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.) 'নকশাল আন্দোলনের গল্প' দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১০০

১৬। জয়া মিত্র, 'স্বজন বিজন', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুযারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৪৮০
১৭। সুভাষ মুখোপাধ্যায়, 'সুন্দর', 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা', চতুর্দশ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ, মাঘ ১৪২২, পৃষ্ঠা : ৪৩-৪৪
১৮। সুমিতা চক্রবর্তী, 'ছোটগল্প : সত্তর-আশির দশক', 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়', প্রথম প্রকাশ, কলকাতা, পুস্তক বিপণি, জুন ২০০৪, পৃষ্ঠা : ৭৭
১৯। স্বর্ণ মিত্র, 'প্রসব', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৪১৩
২০। অমর মিত্র, 'ডাইন', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৪৮৭
২১। মহাশ্বেতা দেবী, 'শরীর', 'মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প', প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, প্রমা, বৈশাখ ১৩৫১, পৃষ্ঠা : ১২১
২২। মহাশ্বেতা দেবী, 'দ্রৌপদী', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৬৭
২৩। শুকদেব চট্টোপাধ্যায়, 'তরাইয়ের মা', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ২৫০
২৪। বিজিত ঘোষ, 'সম্পাদকের কৈফিয়ৎ', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮
২৫। নবারুণ ভট্টাচার্য, 'খোঁচড়', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৪৩৯
২৬। বিমল কর, 'নিগ্রহ', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৩০
২৭। মণি মুখোপাধ্যায়, 'গণতন্ত্র এবং গোপাল কাহার', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ২৩৮
২৮। তদেব, পৃষ্ঠা : ২৪১
২৯। সুরজিৎ সেনগুপ্ত, 'পরিচয়হারা', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৬৫
৩০। মিহির আচার্য, 'লোহার খুর', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৮৮
৩১। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, 'পলাতক ও অনুসরণকারী', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ১৫৮
৩২। স্বপন সেন, 'সাদা রুমাল', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৬৪৫-৬৪৬
৩৩। বারিদবরণ চক্রবর্তী, 'সবুজ দ্বীপের মাঝি', দ্র. বিজিত ঘোষ (সম্পা.), 'নকশাল আন্দোলনের গল্প', দ্বিতীয় সংস্করণ, কলকাতা, পুনশ্চ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা : ৩৩৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি :

১। অনিল আচার্য (সম্পা.)। 'সত্তর দশক'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। অনুষ্টুপ। জানুয়ারি ১৯৯১। দ্বিতীয় খণ্ড।

২। নির্মল ঘোষ। 'নকশাল আন্দোলন ও বাংলাসাহিত্য'। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। করুণা। আষাঢ় ১৩৮৮ (দ্বিতীয় মুদ্রণ মাঘ ১৪০১)।

৩। বিজিত ঘোষ (সম্পা.)। 'নকশাল আন্দোলনের গল্প'। দ্বিতীয় সংস্করণ। কলকাতা। পুনশ্চ। জানুয়ারি ২০০৮।

৪। মহাশ্বেতা দেবী। 'মহাশ্বেতা দেবীর শ্রেষ্ঠ গল্প। প্রথম সংস্করণ। কলকাতা। প্রমা। বৈশাখ ১৩৫১।

৫। সুভাষ মুখোপাধ্যায়। 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা'। চতুর্দশ সংস্করণ। কলকাতা। দে'জ। মাঘ ১৪২২।

৬। সুমিতা চক্রবর্তী। 'ছোটগল্পের বিষয়-আশয়'। প্রথম প্রকাশ। কলকাতা। পুস্তক বিপণি। জুন ২০০৪।

লেখক পরিচিতি :

এম. ফিল গবেষক, বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

গৌড়মল্লার : বাংলার সমাজ-সংস্কৃতি

সরমা বিশ্বাস

সারাংশ : "যে জাতির ইতিহাস নাই তাহার ভবিষ্যৎ নাই।"[১] বঙ্কিমচন্দ্রের এই কথাটি শরদিন্দু মনে প্রাণে বিশ্বাস করতেন। তিনি লেখনীর মাধ্যমে বাঙালি জাতির মনে অতীত ইতিহাসের গৌরবময় দিনগুলির ভাবনা সঞ্চারিত করতে চেয়েছিলেন। প্রাচীন বাংলা দেশের ইতিহাস নিয়ে গল্প লেখার ইচ্ছা শরদিন্দুর মনে অনেক দিন ধরে ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুকুমার সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে প্রাচীন বাংলার সমাজ ও শব্দ ভাণ্ডার বিষয়ক খুঁটিনাটি নানা তথ্য সংগ্রহ করার পর তিনি সেই ইচ্ছা বাস্তবায়িত করলেন 'গৌড়মল্লার' উপন্যাসে। গৌড়েশ্বর শশাঙ্কের মৃত্যুর পর গৌড়ের সিংহাসনকে কেন্দ্র করে মাৎস্যন্যায়ের বিষবাষ্পে গৌড়তন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। গৌড়ের প্রাণ সামুদ্রিক-বাণিজ্য অন্তর্বিপ্লব ও আরব জলদস্যুদের আক্রমণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হতে থাকে, এর প্রভাব এসে লাগে গ্রাম ও শহরের সাধারণ মানুষের ওপর। এইরকম অরাজকতা সুদীর্ঘ একশো বছর ধরে চলেছিল। পরবর্তীকালে জনগণ দ্বারা নির্বাচিত রাজা গোপাল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হন। এই প্রেক্ষাপটের ওপর ভিত্তি করে শরদিন্দু গৌড়ের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ ও সেখান থেকে বিংশ ক্রোশ দূরে বেতস নামক গ্রামের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের রীতি-নীতি, আচার-অনুষ্ঠান,জাতি-ধর্ম, খাদ্যাভ্যাস, আমোদ-প্রমোদ প্রভৃতি বর্ণনার মাধ্যমে তৎকালীন সময়ের প্রাচীন বাংলার গ্রাম্য ও নাগরিক জীবনের সমাজ-সংস্কৃতির সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তুলে ধরেছেন।

মূল শব্দ : সমাজ-সংস্কৃতি, বাংলার ইতিহাস, জন-জীবন

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নবজাগরণের জোয়ার বাংলার সমাজ-সাহিত্যে নূতন আলোড়ন সৃষ্টি করে। যার প্রভাবে বাঙালি মনীষীগণ নিজের ইতিহাস জানতে ও বলতে আগ্রহী হয়ে ওঠেন। নতুন নতুন গবেষণার ফলে ইতিহাসের নানান দিগন্ত উন্মোচিত হতে থাকে, তার দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে যে সব ঔপন্যাসিক অতীতের প্রেক্ষাপটে সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার চিত্র তুলে ধরেছিলেন ঐতিহাসিক উপন্যাসের মাধ্যমে, তাঁদের মধ্যে শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম অগ্রগণ্য। এই প্রসঙ্গে শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন:

"আধুনিক যুগে নানা নূতন গবেষণা ও তথ্যসংগ্রহের ফলে যে ঐতিহাসিক চেতনা উদ্বুদ্ধ হইয়াছে, তাহারই প্রেরণায় তরুণ ঔপন্যাসিকগোষ্ঠীর মধ্যে কেহ

কেহ ইতিহাসাশ্রিত উপন্যাস-রচনার দিকে ঝুঁকিয়াছেন। এই সাম্প্রতিক ঐতিহাসিক উপন্যাস কিন্তু অতীত যুগের আদর্শকে অনুসরণ না করিয়া ভিন্ন পথে চলিয়াছে। ইহাতে যুদ্ধ-বিগ্রহের উন্মাদনা নাই বা রোমান্সের চকিত অভাবনীয়তাও দীপ্তি বিকিরণ করে না। কোন ইতিহাসবিশ্রুত নায়কও ইহার কেন্দ্রস্থলে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইহার ঘটনার রশ্মিজাল ও ভাবকল্পনার উর্ধ্বচারিতাকে নিয়ন্ত্রণ করে না। এগুলি নিতান্তই তথ্যসংকলন ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতি-রচনার সাহায্যে যুগের বাস্তব পরিচয়টি পরিস্ফুট করিতে চেষ্টা করে। বর্তমান যুগের ইতিহাস ব্যক্তিকেন্দ্রিক নহে, জনসাধারণের জীবনযাত্রার রীতি ও অর্থনৈতিক মানের বিবরণ। কাজেই ইতিহাসের পরিবর্তনের সহিত সমতা রক্ষা করিয়া ঐতিহাসিক উপন্যাসও এখন মাটির কাছাকাছি নামিয়া আসিয়াছে।”[২]

পূর্ববর্তী ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথাগত অভিজাত নায়ককেন্দ্রিক যুদ্ধ-বিগ্রহ বা রোমান্সধর্মী কাহিনি থেকে সরে এসে সাধারণ মানুষের কথা শোনালেন শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় ‘গৌড়মল্লার’ উপন্যাসে। বাংলা সাহিত্যে প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস লেখার প্রয়াস গ্রহণ করেন ভূদেব মুখোপাধ্যায়। তাঁর ‘অঙ্গুরীয়-বিনিময়’ ইতিহাসের উপাদান নিয়ে রচিত হলেও ঐতিহাসিক উপন্যাসের সাধারণ কিছু লক্ষণ তাতে দেখা গিয়েছে। যথার্থ ঐতিহাসিক উপন্যাস আমরা পাই বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনীতে, তিনি স্কটের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে লেখা শুরু করেন। তাঁর অধিকাংশ উপন্যাসই ইতিহাসাশ্রয়ী, শুধুমাত্র ‘রাজসিংহ’ কে তিনি ঐতিহাসিক উপন্যাস হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছেন। বঙ্কিম পরবর্তী এই ধারা এগিয়েছে রমেশচন্দ্র দত্তের ‘মহারাষ্ট্র জীবন-প্রভাত’, ‘রাজপুত জীবন-সন্ধ্যা’, হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ‘বেণের মেয়ে’, ‘কাঞ্চনমালা’, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘শশাঙ্ক’, ‘ধর্মপাল’ প্রভৃতি উপন্যাসের ওপর নির্ভর করে। রাখালদাসের মৃত্যুর পর ভাটা পরে যাওয়া ধারাটি আবার জাগ্রত হয় শরদিন্দু ও তাঁর সমসাময়িক লেখকদের হাতে। সাহিত্যের আবহে বেড়ে ওঠা শরদিন্দুর, মাইকেল-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ছেলেবেলার সাথী। বিজলীপ্রভা দেবী ছেলেকে ‘মেঘনাদবধ’ কাব্য পাঠ করে শোনাতেন, মাতার সাহিত্যের প্রতি গভীর ভালোবাসা ছেলের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল, ফলে একে একে তিনি ‘আনন্দমঠ’, ‘মহারাষ্ট্র’ জীবন-প্রভাত পড়ে ফেলেছিলেন। অতীতের গৌরবময় দিনের ইতিহাস তাঁকে বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করত। বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের মতন স্বদেশ প্রীতি ও জাতীয়তাবাদী মনোভাব শরদিন্দুর ভিতরে তৈরি হয়েছিল। আসলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী দুর্ভিক্ষ, রক্তক্ষয়ী ভয়াবহতা, অর্থনৈতিক মন্দা, স্বার্থলোভী মানুষের জীবন-যাত্রা তাঁর মধ্য প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল, এই প্রভাব উপন্যাসে কখনও প্রত্যক্ষ ভাবে কখনও পরোক্ষ ভাবে ছায়াপাত করেছে। সময়ের চাপ অনুভব করে

শরদিন্দু ইতিহাসের প্রেক্ষিতে সমসাময়িক সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, ভাঙা-গড়ার চিত্র ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন। চারিপাশে মনের মত কোন আদর্শ খুঁজে না পাওয়ার কারণে তিনি অতীত বিচরণ করেছেন। যদিও সমসাময়িক লেখকরা বিভিন্ন মতাদর্শের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কমিউনিস্ট ও তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় গান্ধীজির আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। ইতিহাসাশ্রয়ী কতকগুলি তথ্য অবলম্বন করে তার ওপর কল্পনার রঙ ফলিয়ে অসাধারণ কাহিনি রচনার দক্ষ শরদিন্দু পাঠকদেরকে পাঁচটি উপন্যাস ও সতেরোটি গল্প উপহার দিয়েছেন। প্রথম উপন্যাস 'কালের মন্দিরা'। প্রেক্ষাপট গুপ্তযুগ। এটি লেখার মাঝখানে তিনি কর্মসূত্রে বোম্বাই চলে যান, বেশ কিছু বছর পর ফিরে এসে বাকি টুকু শেষ করেন। জীবনের নানান জটিলতা ও বয়স বৃদ্ধির কারণে আর দীর্ঘ গল্প লিখবেন না ভেবেছিলেন, কিন্তু প্রাচীন বাংলা নিয়ে লেখার একটা তীব্র বাসনা মনের মধ্যে পালিত হয়েছিল, সেটি উপযুক্ত তথ্যের অপ্রাচুর্যে অধরাই ছিল। নীহাররঞ্জন রায়ের 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' গ্রন্থ পাঠ করে এবং আচার্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুকুমার সেন ও সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ মনীষীর থেকে প্রয়োজনীয় বাংলা শব্দ ভাণ্ডার ও তথ্যের সাহায্য নিয়ে ইচ্ছার বাস্তব রূপ দিলেন গৌড়মল্লারে। শুরুতে এটির নাম ছিল 'মৌরী নদীর তীরে', কিছু পরিচ্ছেদ লেখার পর লেখক নাম পরিবর্তন করেন। গৌড়মল্লারের শুরুতে লিখেছেন :

"আমার কাহিনী শশাঙ্কের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে আরম্ভ হইয়া তাহার বিংশ বৎসর পরে শেষ হইয়াছে। এই সময়ে বাঙালীর চরিত্র সংস্কৃতি গ্রাম্য জীবন নাগরিক জীবন কিরূপ ছিল তাহা অঙ্কিত করিবার চেষ্টা করিয়াছি।"[৩]

আসলে বাংলার ইতিহাসের মধ্যে নিহিত আছে সমাজ-সংস্কৃতির ধারা, এই বিষয় আলোচনা করার আগে বাংলার ইতিহাস নিয়ে কিছু কথা বলা প্রয়োজন। প্রাচীন বাংলা নিয়ে রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাঙ্গালার ইতিহাস' নামক গ্রন্থ রচনা করেন, এটি তৎকালীন সময়ে গুণীজন মহলে স্বীকৃতি লাভ করে। বাংলার ইতিহাস জানার ব্যাপারে বইটি কে প্রামাণ্য হিসেবে ধরা হয়। এরপর রমেশচন্দ্র মজুমদার, নলিনীকান্ত ভট্টশালী, রাধাগোবিন্দ বসাক, গিরীন্দ্রমোহন সরকার প্রমুখ বিখ্যাত পণ্ডিতের একনিষ্ঠ প্রচেষ্টা ও গবেষণার ফলে ইতিহাস সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা লাভ করা যায়। নীহাররঞ্জন রায় 'বাঙ্গালীর ইতিহাস' বইয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করে বলেছেন, উপযুক্ত উপাদানের অভাব আমাদের দেশে ইতিহাস রচনায় বাধা তৈরি করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য:

"বাঙলার রাষ্ট্র ও রাজবংশাবলীর ইতিহাস যতটুকু আমরা জানি তাহার বেশির ভাগ উপাদান যোগাইয়াছে প্রাচীন লেখমালা। এই লেখমালা, শিলালিপিই

হউক আর তাম্রলিপিই হউক, ইঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে হয় রাজসভাকবি রচিত রাজার অথবা রাজবংশের প্রশস্তি, কোনও বিশেষ ঘটনা উপলক্ষে রচিত বিবরণ, বা কোনও ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিল, অথবা কোনও মূর্তি বা মন্দিরে উৎকীর্ণ উৎসর্গলিপি। ভূমি দান-বিক্রয়ের দলিলগুলিও সাধারণত রাজা অথবা রাজকর্মচারীদের নির্দেশে রচিত ও প্রচারিত। এই লেখমালার উপাদান ছাড়া কিছু কিছু সাহিত্য জাতীয় উপাদানও আছে; ইহাদের অধিকাংশই আবার রাজসভার সভাপণ্ডিত, সভাপুরোহিত, রাজগুরু অথবা রাষ্ট্রের প্রধান কর্মচারীদের দ্বারা রচিত স্মৃতি, ব্যবহার ইত্যাদি জাতীয় গ্রন্থ।”[৪]

উক্ত তথ্য ছাড়া বিদেশ থেকে আগত পর্যটকদের লেখা বিবরণীর ওপর নির্ভর করে আমাদের ইতিহাসচর্চা করতে হয়। ইতিহাস, সমাজ ও সংস্কৃতি প্রভৃতির মূলে আছে মনুষ্যজাতি। মানুষ সামাজিক প্রাণী। সমাজকে কেন্দ্র করে মানুষ বেঁচে থাকার রসদ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান জোগাড় করে। দলবদ্ধ প্রচেষ্টায় কিছু নিয়ম কানুনের মাধ্যমে মানুষ যে বসবাসের উপযোগী পরিবেশ গঠন করে তাকে সমাজ বলে। সামাজিক মানুষের জীবন-যাপন, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, ধর্মবিশ্বাস, আমোদ-প্রমোদ, শিক্ষা-দীক্ষা, খাদ্যাভ্যাস ইত্যাদির মিলিত রূপই সংস্কৃতি। এই সংস্কৃতি সম্পর্কে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ‘সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস’ গ্রন্থে বলেছেন:

“ঘরবাড়ি, যন্ত্রপাঁতি, সুসংবদ্ধ, জীবন-রীতি— প্রভৃতির অতিরিক্ত আর একটা কিছু জাতির জীবনে পাওয়া যায়, যেটা তার বাহ্য সভ্যতার ভিতরের ব্যাপারে রূপে প্রতিভাত হয়। সেটা একদিকে তার বাইরের সভ্যতার আভ্যন্তর প্রাণ বা অনুপ্রেরণা বটে, আর একদিকে তার বাহ্য সভ্যতার প্রকাশও বটে। সভ্যতার এই আভ্যন্তর অথচ তার বাইরেও প্রকাশমান এই অতিরিক্ত বস্তুটির নামকরণ হ’য়েছে ইংরেজি প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় ভাষায় Culture (জর্‌মানে Kultur ‘কুল্‌তুর’) শব্দ রূপে।”[৫]

লাতিন শব্দ Cultura থেকে Culture শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে। বাংলাতে প্রতিশব্দ রূপে ‘সংস্কৃতি’ ব্যবহার করা হয়। যদিও আগে Culture এর বাংলা রূপ হিসাবে ‘কৃষ্টি’ শব্দের প্রচলন ছিল। ‘কৃষ্টি’র উল্লেখ বৈদিক ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্যে পাওয়া গেছে, যার অর্থ কৃষি । রবীন্দ্রনাথের এই শব্দটি পছন্দ ছিল না, পরিবর্তে ‘সংস্কৃতি’ শব্দের সন্ধান পেয়ে তিনি আনন্দিত হয়েছিলেন। বাঙালি সংস্কৃতি প্রসঙ্গে সুনীতিকুমার আরও জানিয়েছেন, ‘বাঙ্গালীর সংস্কৃতির ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলে, প্রথমেই বাঙ্গালী জাতির উৎপত্তি ধরিয়াই আরম্ভ করিতে হয়।’[৬] বর্তমানে বঙ্গ বা বাংলা বলতে আমরা যা বুঝি প্রাচীন বাংলার সাথে তার

অনেকাংশে অমিল ঘটেছে, রাজনৈতিক কারণে ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে। বাংলা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে, একটি আলাদা রাষ্ট্র বাংলাদেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এবং অপরটি ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য হিসেবে পরিচিত হয়েছে। দেশভাগের পূর্বে দুটির মিলিত রূপ ছিল বাংলা। মুঘল সম্রাট আকবরের রাজসভায় আগত পর্যটক আবুল ফজল 'আইন-ই-আকবরী'-তে বাঙ্গালা নামের ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তখন বাঙলা সুবা নামে পরিচিত ছিল। এই প্রসঙ্গে নীহাররঞ্জনের বক্তব্য :

"বাঙলার বিভিন্ন জনপদরাষ্ট্র তাহাদের প্রাচীন পুন্ড্র-গৌড়-সুহ্ম-রাঢ়-তাম্রলিপ্ত-সমতট-বঙ্গ-বঙ্গাল-হরিকেল ইত্যাদির ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয় স্বাতন্ত্র্য বিলুপ্ত করিয়া এক অখণ্ড ভৌগোলিক ও রাষ্ট্রীয়ঐক্য-সম্বন্ধে যখন আবদ্ধ হইল, যখন বিভিন্ন স্বতন্ত্র নাম পরিহার করিয়া এক বঙ্গ বা বাঙলা নামে অভিহিত হইতে আরম্ভ করিল, তখন বাঙলার ইতিহাসের প্রথম পর্ব অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে।"[৭]

শশাঙ্কের আমলে অন্য জনপদগুলি একত্রে গৌড়ের মধ্যে নিজেদের মিলিয়ে দিতে লাগল। পরবর্তীতে পাল ও সেন রাজারা নিজেদের গৌড়েশ্বর উপাধিতে ভূষিত করত। শুধুমাত্র গৌড়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বঙ্গ নিজের ক্ষমতা বজায় রেখেছিল, শেষে গৌড়কে হারিয়ে বঙ্গ বা বাঙলা ইংরেজ আমলে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এই বাংলার অধিবাসীরাই বাঙালি। অতীতে বাংলায় বহু জনগোষ্ঠীর সমাগমের ফলে জাতির মিশ্রণ ঘটেছে। জনগোষ্ঠীগুলির মধ্যে দ্রাবিড়, অষ্টিক, কিরাত, আর্য ও অনার্য প্রভৃতির মিলিত প্রবাহে বাঙালি জাতির উৎপত্তি হয়েছে।

শশাঙ্ক ৬০৬-৭ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ গৌড়ের সিংহাসন আরোহণ করেন। জীবনের সূচনা তিনি একজন মহাসামন্ত রূপে করেছিলেন। অনুমান করা যায় তিনি গুপ্ত রাজাদের অধীনে মহাসামন্ত ছিলেন, কারণ গুপ্ত বংশ পতনের পর গুপ্তদের পুরানো গৌরব ফিরে পেতে তিনি উত্তর ভারতের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির বিরুদ্ধে একা যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং সফলতা অর্জন করে কর্ণসুবর্ণে রাজধানী স্থাপন করেন। তাঁর আমলে গৌড় সমৃদ্ধির শিখর স্পর্শ করলেও মৃত্যুর পর গৌড়কে কেন্দ্র করে মাৎস্যন্যায়ের সূচনা হয়। ষড়যন্ত্রের বিষবাষ্পে গৌড়তন্ত্র নষ্ট হয়ে যায়। এই রকম অবস্থা দীর্ঘ একশো বছর চলেছিল। জনগণ দ্বারা নির্বাচিত রাজা গোপালের আমলে এই অরাজকাতার অবসান ঘটে। মাৎস্যন্যায়ের প্রেক্ষাপটে শরদিন্দু গৌড়মল্লারের কাহিনি বুনতে শুরু করেন। এখানে তিনি গ্রামের পাশাপশি নাগরিক জীবনের সমাজচিত্র তুলে ধরেছেন। আভীরপল্লীর, বেতসগ্রাম রাজধানী কর্ণসুবর্ণ থেকে বিশ ক্রোশ দূরে মৌরী নদীর তীরে অবস্থিত। এখানে অধিকাংশ অধিবাসীই গোপজাতি। এছাড়াও কর্মকার, তন্তুবায়, কুম্ভকার ইত্যাদি জাতের

মানুষ বসবাস করে। এদের জীবন-যাপনের মূলে আছে কৃষিকাজ। ধান, আখ ও গোধন এই তিনটি গ্রামের প্রধান সম্পদ। বাঙালিদের প্রধান খাদ্য ভাত আসে ধান থেকে, গ্রামে উৎপাদিত ধানই মানুষের খাদ্যের যোগান দেয়। গোধন থেকে আসে দুগ্ধজাত দ্রব্য। আর আখ থেকে উৎপন্ন গুড়ের খ্যাতি আছে সারা দেশে জুড়ে, গুড় থেকে স্থানের নাম গৌড় হয়েছে। এর ওপর নির্ভর করে আভীরপল্লীর মানুষ জীবিকা নির্বাহ করে।

"বাঙালী জীবন প্রধানত গ্রামকেন্দ্রিক, এবং বাঙালীর সভ্যতা ও সংস্কৃতি গ্রামীণ। গ্রামকে কেন্দ্র করিয়াই সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন এবং তাহার সমস্ত ভাবনা-কল্পনা আবর্তিত হইত।"[৮]

নদীমাতৃক দেশে নদীর ধারে উর্বর চাষের ভূমি ও দিগন্ত বিস্তৃত মাঠ শস্য ফলাবার পক্ষে উপযোগী, আভীরপল্লীগণ যৌথ উদ্যোগে এই ভূমিতে চাষ-আবাদ করে। প্রথম আখ মাড়াইয়ের দিন গ্রাম জুড়ে উৎসব পালিত হয়। ছেলে, মেয়ে, বুড়ো সবাই আনন্দে মেতে ওঠে। উৎসবে প্রৌঢ়াদের গানের সাথে যুবতীরা নাচ করে ও ছেলেরা বাঁশি বাজায়। গ্রামের সমাজ ব্যবস্থা গোষ্ঠীবদ্ধও পরিবারকেন্দ্রিক, অবশ্যই মোড়ল-মাতব্বদের আদেশ মাথার ওপর থাকলেও শাসনব্যবস্থা অনেকটা শিথিল।

"সকলেই ভূমিজীবী; অবসরকালে জাতিধর্ম পালন করে। গ্রামে জাতিভেদ বেশি প্রখর নয়, সকলে একত্রে পানাহার করে; তবে বিবাহের সময় জাতি দেখিতে হয়। তাহাতেও খুব বেশি কড়াকড়ি নাই; কদাচিৎ অসবর্ণ সংযোগ ঘটিয়া গেলে গ্রামপতিরা ঈষৎ ভ্রূকুটি করিয়া বা দুই চারি পণ দণ্ড লইয়া ক্ষান্ত হন, কঠিন শাস্তির বিধান নাই। এইরূপ শৈথিল্যের কারণ, সে-সময়ের কথা সে সময়ে জাতের বন্ধন বাঙালীর সর্বাঙ্গে এমন নাগপাশ হইয়া বসে নাই। বিশেষত এই প্রান্তিক পল্লীতে উচ্চবর্ণের কেহ বাস করে না। যাহারা বাস করে তাহাদের শ্যামল দেহে আর্য রক্তের সংস্রব যেমন অতি অল্প, তাহাদের মনে আর্যনীতির প্রভাবও তেমনি শিথিলমূল, বৈদিক সংস্কার এখনও তাহাদের প্রাণে শিকড় গাড়িতে পারে নাই।"[৯]

শশাঙ্কের পর তাঁর পুত্র মানবদেব সিংহাসনে বসেন। পিতার মতন দুর্মদ বীর ও পরাক্রমশালী হওয়ার সত্ত্বে সরল স্বভাবের জন্য ষড়যন্ত্রের শিকার হন তিনি। কামরূপরাজ ভাস্কর বর্মা গৌড় আক্রমণ করলে পরাজয় আসন্ন দেখে মানবদেব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করে বেতসগ্রামে এসে উপস্থিত হন এবং গোপকন্যা রঙ্গনাকে বিবাহ করে প্রভাতে গ্রাম ত্যাগ করে আবার যুদ্ধক্ষেত্রে ফিরে যান। রঙ্গনার প্রধান অবলম্বন মাতা গোপার হঠাৎ মৃত্যু, পুত্র সন্তানের জন্ম, চাতক

ঠাকুর কর্তৃক বজ্রদেবের নামকরণ, ঠাকুরের সাহচর্যে বজ্রের পড়াশোনা, সাঁতার কাটা, মাছধরা, গ্রামের দুষ্ট বালক মধুর কাছ থেকে গুঞ্জাকে রক্ষা করে বাড়িতে নিয়ে আসা, বজ্রের বড় হয়ে ওঠা, সবকিছুর মধ্যে দিয়ে ধীরে ধীরে গ্রাম পরিবির্তত হতে থাকে। এতদিন গ্রাম নগরের রাজনীতি, রাজাদের সিংহাসনে আগমন, পতন সমস্ত বিষয় থেকে দূরে সরে নিজস্ব স্বাতন্ত্র্য রূপ ধরে রাখতে সক্ষম ছিল। নগরের খবর পল্লীর মানুষের কাছে আসতো মাঝে মধ্যে কাজের সূত্রে নগরে যাওয়া লোকের কাছ থেকে। কিন্তু দীর্ঘদিন ধরে অরাজকতা ও আরব দস্যুর আক্রমণে গৌড়ের বাণিজ্য ডুবতে বসল। এই অবক্ষয়ের কারণে গুড়ের চাহিদা কমে গেল। সোনা, রূপার বদলে কড়ির মুদ্রা প্রচলন হল, যার আঁচ গ্রামে এসে লাগল। সমুদ্রবাণিজ্য ছিল গৌড়ের প্রাণ। হড়াহা গ্রামের লিপিতে গৌড়গণকে 'সমুদ্রাশ্রয়াণ' বলা হয়েছে। নাগরিকের কথাতেও সমুদ্র-বাণিজ্যের দুর্গতির কাহিনি ফুটে উঠেছে।

"বরুণ দত্ত পুরুষানুক্রমে সমুদ্রগামী ব্যবসায়ী, পূর্বকালে তাহাদের অনেকগুলি বহিত্র ছিল, গৌড়বঙ্গের পণ্য লইয়া বহুদূর পর্যন্ত যাত্রা করিত। দক্ষিণে সিংহল অতিক্রম করিয়া ভরুকচ্ছ যাইত, কখনও পারসীকদের দেশ যাইত। পূর্বদিকে মলয় যবদ্বীপ সুবর্ণভূমিতে যাইত। শতাব্দীর পর শতাব্দী এইভাবে চলিয়াছে, গৌড়বঙ্গ পুন্ড্রমগধের পণ্যসম্ভার দেশ দেশান্তরে সঞ্চারিত হইয়া স্বর্ণ রৌপ্যের আকারে প্রত্যাবর্তন করিয়াছে। প্রায় বিশ বছর পূর্বে হঠাৎ এক নিদারুণ বাধা উপস্থিত হইল, সমুদ্রে হিংস্রিকা দেখা দিল। এতকাল সমুদ্রে জলদস্যুর উৎপাত ছিল না, সকল দেশের বাণিজ্য-তরী স্বচ্ছন্দে সাগরবক্ষে বিচরণ করিত; এখান বনায়ু দেশের দস্যুরা সমুদ্রের পথ বিপদ-সঙ্কুল করিয়া তুলিল। নিরীহ নিরস্ত্র পণ্যবাহী জাহাজ লুঠ করিয়া ডুবাইয়া ছারখার করিয়া দিতে লাগিল। তাহাদের দৌরাত্ম্যে গৌড়বঙ্গের সাগরসম্ভবা লক্ষ্মী আবার সাগরে ডুবিতে বসিলেন।"[১০]

ধর্ম মানুষের জীবনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে। শরদিন্দু চাতক ঠাকুরকে হিন্দু ও বৌদ্ধের মিলিত রূপ হিসাবে অঙ্কন করেছেন। অতিথি বৎসল বেতসগ্রামে চাতক ঠাকুর পদার্পণ করেন একটি বুদ্ধদেব ও একটি বিষ্ণুদেবের মূর্তি সঙ্গে নিয়ে। দেবস্থান অশ্বত্থ গাছের নিচে বৌদ্ধ ও হিন্দুর উপাস্য দেবতার পাশাপাশি অবস্থান নিয়ে গ্রামবাসীর কোন আপত্তি ছিল না বরং তারা আনন্দিত হয়েছিল একসাথে দুইজনকে পেয়ে। চাতক ঠাকুর সাত্ত্বিক মানুষ, নিরামিষ আহার করেন, গ্রামবাসীর সাথে মিলে কাজ করেন। তিনি এক অদৃশ্য বন্ধনে গ্রামটাকে বেঁধে রেখেছিলেন। সবাই তাঁকে মান্য করে চলত। তৎকালীন ভারত ও বর্হিভারতে বৌদ্ধধর্মের প্রতিপত্তি দেখা যায়, রাজারা বৌদ্ধধর্ম প্রচারও প্রসারে উদ্যোগ নেন।

কিন্তু তার পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্য ধর্মও স্বমমিহায় বিরাজিত ছিল। অনেক সময় দেখা গেছে ব্রাহ্মণ রাজবংশীয় রাজা বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য সংঘ, চৈত মঠ নির্মাণ করে দিয়েছেন। য়ুয়ান-চোয়াঙের বিবরণীতে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ-শ্রমণ ও গৃহস্থোপাসক একসঙ্গে নির্বিবাদে বসবাসের কথা বলা হয়েছে, একই সাথে এখানে শশাঙ্ককে চরম বৌদ্ধ-বিদ্বেষী বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আসলে শশাঙ্ক ছিলেন শৈব আর তাঁর বিপরীত পক্ষ হর্ষবর্ধন ছিলেন বৌদ্ধ এই কারণে শশাঙ্ক বৌদ্ধদের প্রতি একটু বিরূপ ছিলেন কিন্তু তাঁকে চরম বৌদ্ধবিদ্বেষী বলা অতিরঞ্জিত। শরদিন্দু ইতিহাসের এই বিষয়গুলি খুঁটিয়ে দেখে মান্যতা দিয়েছেন। বজ্রদেবকে শীলভদ্র বলেছেন শশাঙ্ক বৌদ্ধধর্মের প্রতি অল্প-স্বল্প উৎপীড়ন আরম্ভ করলেও তার সাথে আলোচনার পর কোনদিন অন্য ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করেননি। লেখক কোন ধর্ম সংঘাতের মধ্যে না গিয়ে শান্তির পথে সাধারণ মানুষকে চালিত করেছেন। শরদিন্দু বলেছেন— "মানুষের জীবন বস্তুত কেমন বিশ্রী তার চিত্র না এঁকে মানুষের জীবন কেমন হলে ভাল হত সেই চিত্রই আঁকবার চেষ্টা করি।"[১১]

বজ্রদেব পিতার সন্ধানে কর্ণসুবর্ণতে যাবার পথে শবর কচ্ছুর সাথে তার পরিচয় হয়। রত্তি-মিত্ত নামে দুইজন স্ত্রী নিয়ে কচ্ছুর আদিম জীবনযাপন চর্যাপদের শবর-শবরীর কথা মনে করিয়ে দেয়। আরণ্যক পরিবেশে পশু-পাখিদের মত বিচরণ করা নর-নারী কোন সংস্কারের ধার ধারে না, উপকারে প্রতিদান স্বরূপ রত্তি ও মিত্তির বজ্রের সাথে রাত্রি যাপনেও দ্বিধা নেই। কর্ণসুবর্ণের কর্মব্যস্ত জনজীবন, হাতিঘাটে পণ্য ক্রয়-বিক্রয়, দোকান-বাজার, রাস্তা-ঘাট, মায়াবী ইন্দ্রজাল, অশ্বরথের ছোটাছুটি, অন্যদিকে বৌদ্ধবিহারে শ্রমণদের ত্যাগী জীবন সবকিছু মিলিয়ে বজ্রে মধ্যে নতুন আবেশ তৈরি হয়। নাগরিক কবি বিম্বাধরের পরিধানে মল্লের ধুতি, উত্তরীয়, মাথায় ফুলের মালা, হাতের নখে আলতার প্রলেপ, কানে শঙ্খের কর্ণফুল তৎকালীন রসিক বিলাসীদের পরিচয় বহন করে। প্রাচীন বাংলায় নাগরিক পুরুষরা ধুতি পরিধান করতেন এবং তার সাথে একখণ্ড বস্ত্র বা উত্তরীয় নিতেন। নারী ও পুরুষ উভয়ে কর্ণে দুল ব্যবহার করতেন। বাৎস্যায়ন বলেছেন— "গৌড়ীয় পুরুষেরা হস্তশোভী ও চিত্তগাহী লম্বা লম্বা নখ রাখিতেন এবং সেই নখে রং লাগাইতেন, বোধ হয় যুবতীদের মনোরঞ্জনের জন্য।"[১২]

নগরে ক্লেদাক্ত কুটিলজালে বজ্র জড়িয়ে যায়। বিম্বাধর ও বটেশ্বর চক্রান্ত করে বজ্রকে টাকার বিনিময়ে বিক্রয় করে দেয়, যদিও নিজেরা পরবর্তী কালে সেই জালে জড়িয়ে গেছে। কর্ণসুবর্ণের রাজপুরী হয়ে উঠেছে তীব্র ভোগবিলাসের কেন্দ্র। ভাস্কর বর্মার উত্তরাধিকার অগ্নিবর্মা গৌড়ের রাজা, বিলাসে মত্ত হয়ে চারিপাশের রাজনৈতিক কোনো খবর রাখেনি। রানি শিখরিণী ও তার পরিচারিকা কুহু কামকলায় সদা ব্যস্ত কিন্তু রানির মত কুহু পাপিষ্ঠা নয়,তার মধ্যে মানবিক গুণ আছে। বজ্রকে সিংহাসনে

বসানোর জন্য কোদণ্ড মিশ্রকে সে সাহায্য করেছে। গল্পের অনেকাংশে শরদিন্দু নর-নারী মিথুনের দৃশ্য ফুটিয়ে তুলেছেন। গবেষকের মতে:

"গৌড়মল্লারে গোপা-কপিলদেব, মানবদেব-রঙ্গনা, বজ্রদেব-গুঞ্জার কাহিনী গ্রামজীবনের আলোছায়ায় তৈরি হয়েছে। আর বজ্রদেব-কুহু-রাণী শিখরিণীর শহুরে রোমাঞ্চকর কামকলা চিত্রিত হয়েছে মাৎস্যন্যায়ের পটভূমিতে।"[১৩]

'গৌড়মল্লার' উপন্যাসে শরদিন্দু শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সাধারণ মানুষের চলমান জীবনের কথা শুনিয়েছেন। কালের প্রবাহে চরিত্রগুলির ভিতর অনেক পরিবর্তন এসেছে। এই চলার টানে মধুমথন বজ্রদেব হয়ে কর্ণসুবর্ণের সিংহাসনে বসেছে আবার শিকড়ের সেই টানে শেষপর্যন্ত সে গ্রামে ফিরেছে। কুহু নাগরিক জীবন ত্যাগ করে অজানা দেশে পাড়ি দিয়েছে। মানবদেব বলেছেন, "আমরা গৌড়দেশের সামান্য গ্রামবাসী, এই আমাদের পরিচয়। আমাদের রক্ত জনসাধারণের রক্তের সঙ্গে মিশে এক হয়ে যাবে, এই আমাদের গৌরব। রাজৈশ্বর্য চিরন্তন নয়, মনুষ্যত্ব চিরন্তন। আমাদের নাম লোকে ভুলে যাক ক্ষতি নেই, আমাদের মনুষ্যত্ব যেন যুগ-যুগান্তর ধরে গৌড়বঙ্গের অন্তরে বেঁচে থাকে।"[১৪]

এই কথাটি যেন বজ্রের মনের কথা। দস্যুরা গ্রাম লুণ্ঠন করে কুঠিরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছে। সবচেয়ে আশ্চর্যের বিষয় গ্রামের দুষ্টু বালক মধু যে কিনা ছোটবেলায় অকারণে সবাইকে মারত সে গ্রামের জন্য প্রাণ দিয়েছে। উপন্যাসের শেষে এসে প্রতিভাত হয়েছে মানুষের নতুন জীবনযাত্রার ছন্দ। এই নতুন চলেছে পুরাতনের সাথে হাত ধরাধরি করে তাকে সঙ্গে নিয়ে। রঞ্জনা, মানব, বজ্র ও গুঞ্জা যৌথভাবে নতুন ঘর বানিয়েছে, আবার চাষবাস শুরু করেছে। কালের নিয়মে সবকিছুই প্রবাহমান কোনও কিছু থেমে থাকার নয়, এই প্রবাহমানতাই মানব জীবনের চিরন্তন সত্য।

"হে চির-সারথি, যে-পথে তোমার রথ লইয়া চলিয়াছ কোথাও কি তাহার শেষ আছে?"[১৫]

তথ্যসূত্র :

১। শরদিন্দু অম্‌নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৩৭৮
২। বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রীকুমার, বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা, পৃষ্ঠা : ৩৯৫
৩। শরদিন্দু অম্‌নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩০
৪। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃষ্ঠা : ৪৮
৫। চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ৬
৬। চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার, সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, পৃষ্ঠা : ১৯
৭। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃষ্ঠা : ১২২
৮। রায় নীহারঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃষ্ঠা : ৮৬৭

৯। শরদিন্দু অম্‌নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ১৩৩
১০। শরদিন্দু অম্‌নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২০৬
১১। শরদিন্দু অম্‌নিবাস, দ্বাদশ খণ্ড, পৃষ্ঠা : ৪৭৫
১২। রায় নীহাররঞ্জন, বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদিপর্ব), পৃষ্ঠা : ৫৯০
১৩। দত্ত বিজিতকুমার, বাংলাসাহিত্যে ঐতিহাসিক উপন্যাস, পৃষ্ঠা : ৩০৫
১৪। শরদিন্দু অম্‌নিবাস, তৃতীয় খণ্ড,পৃষ্ঠা : ২৬২
১৫। শরদিন্দু অম্‌নিবাস, তৃতীয় খণ্ড, পৃষ্ঠা : ২৬৪

গ্রন্থপঞ্জি :

আকর গ্রন্থ :

১। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শরদিন্দু অম্‌নিবাস (তৃতীয়খণ্ড), দশম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, মাঘ ১৪২৬।
২। শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়—শরদিন্দু অম্‌নিবাস (দ্বাদশ খণ্ড), দশম মুদ্রণ, আনন্দ পাবলিশার্স, ভাদ্র ১৪২৫।

সহায়ক গ্রন্থ :

১। অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়—মধ্যাহ্ন থেকে সায়াহ্নে বিংশ শতাব্দীর বাংলা উপন্যাস, তৃতীয় সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, আশ্বিন ১৪২৪, কলকাতা।
২। জগদীশ ভট্টাচার্য—আমার কালের কয়েকজন কথাশিল্পী, তৃতীয় প্রকাশ, ভারবি, বৈশাখ ১৪১৫, কলকাতা ৭৩।
৩। নীহাররঞ্জন রায়—বাঙ্গালীর ইতিহাস (আদি পর্ব), সংযোজিত সাক্ষরতা সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, ১৩৮৭, কলকাতা।
৪। বিজিতকুমার দত্ত—বাংলাসাহিত্যে ঐতিহসিক উপন্যাস, পঞ্চম মুদ্রণ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, অগ্রহায়ণ, ১৪১৯।
৫। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালার ইতিহাস (অখণ্ড সংস্করণ), সপ্তম সংস্করণ, দে'জ পাবলিশিং, অগ্রহায়ণ ১৪২৬।
৬। শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বঙ্গসাহিত্যের উপন্যাসের ধারা, পুনমুদ্রণ, মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ২০১৯-২০২০।
৭। শ্রাবণী পাল—শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় (ভারতীয় সাহিত্যকার পুস্তকমালা), দ্বিতীয় মুদ্রণ, সাহিত্য অকাদেমি, ২০১৫।
৮। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়- সংস্কৃতি শিল্প ইতিহাস, চতুর্থ প্রকাশ, জিজ্ঞাসা পাবলিকেশন (প্রঃ) লি. জানুয়ারি ২০০৩।

লেখক পরিচিতি :
এম. ফিল. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে মাতৃত্বের নতুন রূপ

মনীষা নস্কর

সারসংক্ষেপ : মানুষ হয়েও তারা 'মানুষ' নয়, তারা 'ঊনমানুষ'। আঁতুড়ঘর আর হেঁশেলের গণ্ডীর ভিতরেই তাদের অবস্থান। পিতৃতন্ত্র তাদের রেখেছে 'অপর' করে। তোমাদের পক্ষে অমকুটা শোভা পায় না, তমুকটা করলে লোকে ভালো বলবে না—একরাশ 'না' তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তবু কুঁজোরও তো চিত হয়ে শুতে সাধ হয়। এই চাপিয়ে দেওযা অপরত্বের বেড়া ডিঙিয়ে পা ফেলার স্পর্ধা যুগে যুগে দেখিয়েছে এই ঊনমানুষেরা। তারা নারী। আজ যতটুকু ন্যায্য জমি তারা আদায় করে নিতে পেরেছে, তার পেছনে রয়েছে অনেকদিনের অনেক লড়াই আর যন্ত্রণা। সবচেয়ে মজার কথা হল, তাদের মধ্যে অনেকে বোঝেই না যে তারা তাদের ন্যায্য পাওনাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের না বলা কথাগুলো বলার জন্য কলম ধরেছেন বহু শুভবোধসম্পন্ন মানুষ। তেমনই একজন মানুষ সেলিনা হোসেন—আজকের সময়ে বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় এক অতিপরিচিত নাম। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়েছে 'না'-এর বেড়া ভাঙতে চাওয়া কিছু নারীচরিত্র। তারা প্রশ্ন করে, চিন্তা করে। 'অমুকটাই নিয়ম'—এটুকু বলে তাদের কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেওয়া যায় না। এমনই কিছু ছোটগল্প বেছে নেওয়া হল এই আলোচনার জন্য—'মতিজানের মেয়েরা', 'পারুলের মা হওয়া', 'দেখা', 'জেসমিনের ইচ্ছাপূরণ'।

সূচক শব্দ : মা, নারী, মাতৃত্ব, সন্তান, সেলিনা হোসেন

মানুষ হয়েও তারা 'মানুষ' নয়, তারা 'ঊনমানুষ'। আঁতুড়ঘর আর হেঁশেলের গণ্ডীর ভিতরেই তাদের অবস্থান। পিতৃতন্ত্র তাদের রেখেছে 'অপর' করে। তোমাদের পক্ষে অমকুটা শোভা পায় না, তমুকটা করলে লোকে ভালো বলবে না—একরাশ 'না' তাদের আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। তবু কুঁজোরও তো চিত হয়ে শুতে সাধ হয়। এই চাপিয়ে দেওয়া অপরত্বের বেড়া ডিঙিয়ে পা ফেলার স্পর্ধা যুগে যুগে দেখিয়েছে এই ঊনমানুষেরা। তারা নারী। আজ যতটুকু ন্যায্য জমি তারা আদায় করে নিতে পেরেছে, তার পেছনে রয়েছে অনেকদিনের অনেক লড়াই আর যন্ত্রণা। সবচেয়ে মজার কথা হল, তাদের মধ্যে অনেকে বোঝেই না যে তারা তাদের ন্যায্য পাওনাগুলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের না বলা কথাগুলো বলার জন্য কলম ধরেছেন বহু শুভবোধসম্পন্ন মানুষ। তেমনই একজন মানুষ সেলিনা হোসেন—আজকের সময়ে বাংলা কথাসাহিত্যের আঙিনায় এক অতিপরিচিত

নাম। তাঁর ছোটগল্পগুলির মধ্যে বারে বারে দেখা দিয়েছে 'না'-এর বেড়া ভাঙতে চাওয়া কিছু নারীচরিত্র। তারা প্রশ্ন করে, চিন্তা করে। 'অমুকটাই নিয়ম'—এটুকু বলে তাদের কণ্ঠস্বর থামিয়ে দেওয়া যায় না। এমনই কিছু ছোটগল্প বেছে নেওয়া হল এই আলোচনার জন্য—'মতিজানের মেয়েরা', 'পারুলের মা হওয়া', 'দেখা', 'জেসমিনের ইচ্ছাপূরণ'।[১]

"তুলি শির কহিলা বালক, 'ভগবান,/নাহি জানি কী গোত্র আমার। পুছিলাম/জননীরে, কহিলেন তিনি সত্যকাম,/বহুপরিচর্যা করি পেয়েছিলনু তোরে, /জন্মেছিস ভর্তৃহীনা জবালার ক্রোড়ে-/গোত্র তব নাহি জানি।/শুনি সে বারতা/ছাত্রগণ মৃদুস্বরে আরম্ভিল কথা,/মধুচক্রে লোষ্ট্রপাতে বিক্ষিপ্ত চঞ্চল/পতঙ্গের মতো। সবে বিস্ময়বিকল/কেহ বা হাসিয়া কেহ করিল ধিক্কার/লজ্জাহীন অনার্যের হেরি অহংকার।/উঠিলা গৌতম ঋষি ছাড়িয়া আসন/বাহু মেলি, বালকের করি আলিঙ্গন/কহিলে, অব্রাহ্মণ নহ তুমি তাত,/তুমি দ্বিজোত্তম, তুমি সত্যকুলাজাত।"[২]

ছান্দোগ্য উপনিষদের যুগ থেকে আজ পর্যন্ত অবস্থার হেরফের হয়েছে যৎসামান্য। পিতৃপরিচয়হীন সত্যকামদের সহ্য করতে হয় সমাজের চোখরাঙানি, ভর্তৃহীনা জবালাদের নিয়ে চলে কানাকানি। দৃষ্টিভঙ্গির বদলটুকু সীমাবদ্ধ কেবল সমাজের বিশেষ এক স্তরেই। অভিনেত্রী মাহি গিল অবিবাহিত এবং এক কন্যাসন্তানের গর্বিত মা। চিত্রপরিচালক একতা কাপুর সারোগেসির মাধ্যমে জন্ম দিয়েছেন এক পুত্রসন্তানের, তিনিও একজন সিঙ্গল মা। অভিনেত্রী সাক্ষী তনওয়ার ২০১৮ সালে দত্তক নেন ন'মাসের কন্যাসন্তানকে এবং এযাবৎ একাই তিনি তাঁর সন্তানের মা ও বাবার দায়িত্ব পালন করে আসছেন। ২০১৯ সালের ৯ নভেম্বর 'দি হিন্দু' সংবাদপত্রের এক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে জনৈক আইটি মার্কেটিং প্রফেশনাল শোভনা শেঠির বিবৃতি। "Just because I was not married, didn't mean I couldn't have a baby". একই প্রতিবেদনে মেলে আরও একজন সিঙ্গল মাদারের কাহিনি। অনিন্দিতা সর্বাধিকারী, পেশায় চিত্রনির্মাতা ও থিয়েটারকর্মী জানিয়েছেন তিনি বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ নন, একাই আইভিএফ পদ্ধতিতে মা হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।[৩]

কই, আমাদের মহান সমাজ তো এই মানুষগুলির দিকে আঙুল তুলতে সাহস পায় না! সমাজের সমস্ত ছি-ছি, ধিক্কারগুলো বরাদ্দ হয়তো সেই ভীতু, কোণঠাসা, নিজের মুখে নিজের ইচ্ছেগুলোর কথা বলতে না পারা অসহায় মেয়েদের জন্য। ঠিক যেন 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পের গুলনূর।[৪] ছেলের জন্মের দেড়বছরের মধ্যে বিধবা হওয়া গুলনূরকে 'শক্ত মেয়েমানুষ' হতে হয়েছিল খানিক দায়ে পড়েই। 'শক্ত' হতে হতে কবেই যে তার মনুষ্যত্ববোধটি খোয়া

গেছে, সে হিসেবে গুলনূর রাখেনি। সংসারে পুত্রবধূ মতিজান আসার পর প্রথমে পণের জন্য, পরে বংশরক্ষার অজুহাতে উঠতেবসতে তাকে খোঁটা দিয়েছে গুলনূর। অত্যাচারের সীমা গিয়েছিল ছাড়িয়ে। আসলে এসবই উপলক্ষ্য মাত্র। গুলনূর-রা এমন মানুষ, যারা অপেক্ষাকৃত দুর্বলের ওপর অত্যাচার করতে পছন্দ করে। এ এক অদ্ভুত মনস্তত্ব—অন্যকে ছোট করে,আঘাত দিয়ে, যন্ত্রণা দিয়ে নিজেকে শক্তিশালী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার ইচ্ছা। রক্ষণশীল সমাজের বেয়াড়া বিধিনিষেধগুলো যারা তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেওয়ার সাহস রাখে, সমাজ বাধ্য হয় সেই জেদের সামনে মাথা নোয়াতে। মতিজান প্রথমে ভয় পেয়েছে গুলনূরকে। কিন্তু দিনের পর দিন কোণঠাসা হতে হতে সে বেঝে তার যে কিছু হারাবার নেই। দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে মানুষ অবিশ্বাস্যভাবে বাড়তি জোর পায়। "সারারাত ও একফোঁটা ঘুমোতে পারে না। বিছানায় ছটফট করে, মেঝেতে গড়িয়ে নেয়। শান্ত থাকার চেষ্টা করেও পারে না।" তার স্বামী আবুল পরনারী আসক্ত, মাতাল, জুয়াড়ি। মতিজানের দিন এনে দিন খাওয়া বাবা এমন 'সোনার টুকরো' জামাইকে ঘড়ি-সাইকেল যৌতুক দিতে পারেননি। সেই 'অপরাধের শাস্তি' দেওয়া হচ্ছে মতিজানকে। কীভাবে? চুলের মুঠি ধরে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে, গলায় দড়ি দিয়ে ঘরের খুঁটির সঙ্গে বেঁধে রাখা হয় মতিজানকে। "সন্ধ্যায় গুলনূর দড়ি ধরে টেনে ডোবার ধারে নিয়েগিয়ে বলে, হামি আর তুমহাকে ভাত খ্যাওয়াবার প্যারমো না। খ্যাও, খ্যাও, ঘাস খ্যাও।" ধীরে ধীরে সংসারের সারসত্যটা বুঝে ফেলে মতিজান। এ রণক্ষেত্রে কেউ কাউকে একইঞ্চি জামি ছেড়ে দেয় না, নিজের জায়গা নিজেকেই করে নিতে হয়। নাকি কেনে নিতে হয়? মতিজান প্রতিবাদ করতে শেখে। সানকিতে রাখা ভাত-তরকারি ছিনিয়ে নিয়ে খেতে থাকে, "হামি তো এই বাড়ির কামের মানুষ। কাম করা ভাত খাই। বস্যা বস্যা ভাত খ্যাই না। হামাক ভাত দেয়্যা ল্যাগবি। মানষে কামের মানষক ভাত দ্যায় না?" মতিজানের প্রতিপক্ষের এ প্রথম পরাজয়। শানানো হয় নতুন অস্ত্র—"তুমহার ছাওয়াল হয় না ক্যানহে?" মতিজানের গাঁজাখোর স্বামীটি এ প্রসঙ্গে অস্বাভাবিকরকম উদাসীন। স্বামীর অশ্রাব্য গালিগালাজ, রাতের পর রাত ভালোবাসাহীন যৌনমিলনে ক্লান্ত, বীতস্পৃহ, অতৃপ্ত মতিজান সাড়া দেয় স্বামীর বন্ধু লোকমানের ডাকে। লোকমানের ঔরসে তার গর্ভে আসে সন্তান, তবু গুলনূর যুদ্ধে ক্ষান্ত দেয় না। গুলনূরের অভিযোগ, মতিজান কেন কন্যাসন্তানের জন্ম দিয়েছে? পুত্রসন্তান না হলে যে বংশরক্ষা হয় না! "বছর ঘুরতে আবার লোকমানের এবার একটি মেয়ের জন্ম দেয় মতিজান। গুলনূর সাতদিন চুপচাপ থাকে।তারপর ঘোষণা দেয়, যে বউ কেবল মেয়ে সন্তানের জন্ম দেয় তাকে সে সংসারে রাখবে না।

ছেলে বাড়ি এলে এইবউকে তালাক দিয়ে বাপের বাড়ি পাঠিয়ে দেবে।" যেদিন গুলনূর পাড়ার লোক জড়ো করে এ 'সাধু' সংকল্পটিকে কাজে রূপ দিতে যায়, মতিজান রুখে দাঁড়ায়। গুলনূর চেঁচিয়ে ওঠে, "আজ থিকা হামার সংসারে তুমহার ভাত ন্যাই। হামি হামার ছাওয়ালোক আবার বিয়া করামো। হামার বংশে বাত্তি লাগবে।" এইবার হাসিতে ফেটে পড়ে মতিজান। চূড়ান্ত বিদ্রূপের সঙ্গে সে প্রকাশ করে তার জীবনের অমোঘ সত্য—"বংশের বাত্তি? আপনের ছাওয়ালের আশায় থ্যাকলে হামি এই মাইয়া দুডাও প্যাতাম না।"

সুকুমারী ভট্টাচার্য তাঁর 'প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ' গ্রন্থের অন্তর্গত 'প্রাচীন ভারতে মাতৃত্ব' শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন—"বন্ধ্যাত্বের অপবাদ এড়াবার যে তীব্র বাসনা, সেটি সর্বজনীন ঘটনা। সারা পৃথিবীতে এবং যুগ থেকে যুগান্তরে মেয়েরা পুত্র কামনা করেছে এবং বন্ধ্যাত্ব ঘোচাবার জন্য তপস্যা করেছে; ব্রত পালন করেছে, পূজা করেছে, প্রার্থনা করেছে।

ভারতবর্ষে এই ব্রতগুলি সময়ের সঙ্গে সংখ্যায় বেড়েছে; পরবর্তী শাস্ত্রগ্রন্থে পুত্রসন্তান ধারণ করা ও প্রসব করার জন্য আরও অধিকসংখ্যক বিধান আছে।"[৫] সমাজের চোখে বন্ধ্যা নারী অশুভ, বন্ধ্যা পুরুষ কেন অশুভ নয় সে প্রশ্নের উত্তরে সমাজ কিন্তু নিশ্চুপ থেকেছে। প্রাচীনকাল থেকে মেয়েদের আসলে 'গর্ভ' ছাড়া কিছু ভাবাই হয়নি। এ প্রসঙ্গে বলা যায়, মৃগীরোগের কথা—যার ইংরেজি নাম হিস্টেরা, 'হিস্টিরিয়া' শব্দটি এসেছে গ্রিক শব্দ 'হিস্টেরো' থেকে, যার অর্থ জরায়ু! একসময়ম নে করা হত, রোগটা শুধু মেয়েদেরই হয়। মেয়েদের রোগ বলে 'গর্ভ' সম্পর্কিত একটা শব্দে রোগের নাম রেখে দেওয়া হল। নারী কেবল সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র—সন্তান প্রসব ছাড়া তাদের আর কোনও কাজ থাকতে পারে না। যে নারী এ কাজে পারদর্শিতা দেখাতে অক্ষম, সে সমাজের কোনও উপাকারেই আসবে না—এমনটাই ধরে নিয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু কেন এমনটা হল? উত্তর খানিকটা মেলে সুকুমারী ভট্টাচার্যের লেখায়। যাযাবর জীবন ছেড়ে মানুষ বসতি স্থাপন করল, নিজের নামে জমিজমা রাখতে শুরু করল। এরপর প্রশ্ন উঠল, সে মারা গেলে তার কষ্টে সঞ্চিত জমিগুলোর কী গতি হবে? অতএব, আনো উত্তরাধিকারী। সে উত্তরাধিকারী অবশ্যই হবে তার নিজের ঔরসজাত পুত্রসন্তান। পুত্রসন্তান ধারণ করবে মেয়েরা। সন্তানটি যথার্থই পুরুষটির ঔরসজাত তা সুনিশ্চিত করতে বসে গেল মেয়েদের ওপর নানান বিধিনিষেধ। কারণ, পরের ঔরসজাত সন্তানকে তো আর নিজের শ্রমে সঞ্চিত বিষয়আশয় ভোগ করতে দেওয়া যায় না! সুতরাং, যে যার সন্তানের মা'টিকে 'চোখে চোখে' রাখো, সে যেন কোনওভাবেই পরপুরুষের শয্যাসঙ্গিনী না হতে পারে। নিতান্তই

কোনও পুরুষ 'বন্ধ্যা' হলে, রয়েছে নিয়োগপ্রথা, যার অজস্র উদাহরণ ছড়িয়ে আছে পুরাণে, মহাকাব্যে। এক্স ক্রোমোজোম-ওয়াই ক্রোমোজোমের তত্ত্ব ছিল অজানা, পুত্রসন্তানের বদলে কন্যাসন্তান জন্মালে দোষ চাপানো হত মায়েরই ওপর। পিতৃতন্ত্র বেশ সুচারুভাবে তাদের চিন্তাগুলো ঢুকিয়ে দিয়েছে মেয়েদের মনে। যার ফলে মেয়েরাই হয়ে উঠেছে একে অপরের শত্রুস্থানীয়। 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পে গুলনূরও একজন মেয়ে, মতিজানও এক মেয়ে। মতিজানের গর্ভে সন্তান এলে গুলনূর 'বাঁকা চোখে তাকিয়ে রূঢ় কণ্ঠে বলে, মাইয়া ছাওয়াল বিয়াবার পারব্যা না।' কন্যাসন্তান ভূমিষ্ঠ হলে গুলনূর আরও বেশি হিংস্র হয়ে ওঠে।' 'মতিজান ভেতরে ভেতরে শক্ত হয়ে বলে আমি পারলে শত মেয়ের জন্ম দিতাম।'

মতিজানের মতোই আরও এক মেয়ে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের মুখের ওপর। সে হল পারুল বেগম। সেলিনা হোসেন অত্যন্ত সচেতনভাবেই গল্পের নাম রেখেছেন, 'পারুলেরমা হওয়া'। মা তো কত মেয়েই হয়, কিন্তু এই মেয়েটির কাহিনি একটু আলাদা। তার স্বামীটি কোনও এক অজ্ঞাত কারণে তাকে ফেলে রেখে পালিয়ে গিয়েছে। পারুল ভেবে কূলকিনারা পায় না, কেন তার 'সামাজিকভাবে কবুলপড়া স্বামী' এমন কাজ করল। নিজেকেই সে প্রশ্ন করে, তার প্রযোজন কেন ফুরালো? দেওয়ার মতো 'শরীর' তো তার ছিল। তবু কেন তাকে না বলে পালিয়ে গেল? যেতে চাইলে সে তো জোর করে ধরে রাখতো না। অপমানবোধের জ্বালা তাকে কুরে কুরে খেতে থাকে। অন্য কোনও সাধারণ মেয়ে হলে হয়তো দুটো দিন বিলাপ করে নিয়তিকেই মেনে নিত, হয়তো বা অন্য কোনও পুরুষকে অবলম্বন করে ফের জীবনখানা সাজিয়ে নিত, যে সাজ সমাজের চোখে 'শোভনীয়', যে সাজে সমাজের 'সায়' আছে। পারুল একদিন শুনতে পেল তার স্বামীটি অন্য এক নারীকে বিয়ে করে সংসার পেতেছে। বুকের ভেতরটা পুড়ে গেলেও হেসে বলে, 'ভালই কইচ্ছে'। পারুলও নিজের জীবন বইয়ে নিয়ে যায় অন্য খাতে। পারুল একদিন গর্ভবতী হয়। 'স্বামী ছাড়া মা হওয়া ভাল না মন্দ এ বোধ ওর মনেই আসে না। মা হয়েছে শুধু এই বোধ ওকে সম্পূর্ণ মানুষ করে দেয়।' তারার মায়ের বাঁকাচোখের প্রশ্নে সে সপাটে জবাব দিয়েছে, 'প্যাড হইতে স্বামী লাগেনি।' সন্তানের পিতৃপরিচয় সে দিতে চয় না, "বাপ লাউগব কীয়ের লাই। আঁই বাপ, আঁই মা।" প্রসঙ্গত মনে করা যেতে পারে, বুদ্ধদেব বসু'র কাব্যনাট্য 'প্রথম পার্থটির কথা। সে কাব্যনাট্যে কর্ণ চরিত্রটির কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে একই সুর—"আমারে মনে হয় মাতা একাই সন্তানের জন্ম দেন,/আমার মনে হয় আমরা সকলেই কুমারীর সন্তান---/পিতা শুধু

উপলক্ষ—গোত্রচিহ্ন।”[৬] সেলিনা হোসেনের পারুল বেগমও সগর্বে বলেছে, “আঁই হোলাহান মানুষ কউরুম। ভাত দিউম, কাপড় দিউম, বাপ দি করিউম কী? ওই তো আইতনরে স্বামী দু’গা হোলামাইরা খুব ভাগি গেছে। কী অইছে? বাপ ধুই হানি খাইবনি? যেগুনের বাপনাই হেগুন মানুষ হয় না?” মালেকা বেগম—বাংলাদেশের নারীমুক্তি আন্দোলনের অন্যতম একজন পুরোধা। ২০০৬ সাল নাগাদ একটি সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, এতদিন সন্তানের অভিভাবক হওয়ার অধিকার মায়েরা পেতেন না। কিন্তু বাংলাদেশ সরকার এখন মায়েদের অভিভাবক হওয়ার কথা ঘোষণা করেছে।[৭] পারুলকে কি যুদ্ধ করতে হয়নি? সমাজ তেড়ে এসেছে, চোখা চোখা বাক্যবাণে বিদ্ধ করেছে। পারুল কিন্তু নতিস্বীকার করেনি। এইখানে উল্লেখযোগ্য, পারুল কিন্তু স্বাবলম্বী। সে রাস্তায় মাটি কাটার কাজকরে, কাজের বিনিময়ে গম পায়। পারুলকে তাই খাওয়াপরার জন্য কারওর ওপর নির্ভরশীল হতে হয় না। সে স্বামীর অবর্তমানে নিজের পেটটুকু অনায়াসে চালিয়ে নিতে পারে, সন্তানের ভরণপোষণেও তার কোনও সমস্যা হবে না। পারুলের জেদ, আত্মবিশ্বাস, যুক্তির কাছে মাথা নেয়াতে বাধ্য হয়েছে তার সমাজ। দু’চারটি সন্তানসহ স্বামী পরিত্যক্তা মেয়েগুলি তাকে ‘গোপনে’ বাহবা দিয়েছে—“ভালা কইচ্ছছ। আমরা ময়মুরুব্বির ডরে কথা কইতাম হারি না।” লুকিয়েকেউ খাবার দিয়ে যায়, কেউ বা উপহার দিয়ে যায় ছেঁড়া শাড়ি। সমাজ ক্রমে ক্রমে নিশ্চুপ হলেও পারুলের ঘরে রাতের অন্ধকারে আসতে থাকে একেরপর এক পুরুষ, যারা কোনও না কোনও সময়ে পারুলের সঙ্গী হয়েছে। তাদের সবার প্রশ্ন একটাই, ‘পোলাডার বাপ কী আঁই?’ পারুল বোঝে, “পুরুষ মানুষগুলো পিতৃত্বের কর্তৃত্ব চায়। আর কিছু না সন্তানকে লালন-পালন নয়—ওকে নিজের কাছেও নেবে না—প্রকাশ্যে পরিচয় দিতে স্বীকারও করবে না। শুধু জেনে আনন্দ পেতে চায় যে পারুলের গর্ভে তারই সন্তান।” বলাইবাহুল্য, পারুল সেই আনন্দে কাউকেই দেয়নি। তার সোজাসাপটা যুক্তি, “আমি তো শরীরের কেনাবেচা করি না। আমি কারও কাছে টাকা চাই না—এটা আমার ব্যবসা না। অমি নিজের আনন্দের জন্য ভোগ করি—যাকে খুশি তাকে—যখন ইচ্ছে হয় তখন।...ওরা কে, যে সন্তানের পিতৃত্ব জানতে চায়?...কেউ জানবে না আমি কার সন্তানের মা—শুধু আমি, শুধু আমিই ঈশ্বর।”

দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকায় ২০১১-র ইদ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল সেলিনা হোসেনের একটি ছোটগল্প—‘দেখা’। ইসলামধর্মে বিশ্বাসকরা হয়, সন্তান আল্লাহর দেওয়া উপহার।[৮] দিনমজুর রহমত আলি আজ খেতে পেলে কাল কী খাবে

ভাবে দিশেহারা হয়, সে আল্লাহর উপহারে ঘর ভরিয়ে ফেলেছে। তার মেয়ে আটবছরের মোমেনাকে সে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল "ধৈর্য ধরো মা, ধৈর্য ধরো। পেট ভরা ভাত দিব একদিন।" আট পেরিয়ে মোমেনা এগারোতে পড়েছে, ঘরে বেড়েছে খাওয়ার মুখ, ভাতের অভাব তাদের ঘোচেনি। বছর বছর আঁতুড়ঘরে ঢোকার ফলে মা আমেনার শরীর গেছে ভেঙে, সংসারের সব কাজ গিয়ে পড়েছে ছোট্ট মোমেনের ঘাড়ে। 'সংসারে আর একটি বাচ্চা আসবে ভেবে ওর বুক ভার হয়ে যায়।' অতটুকু মেয়ে তার বাস্তববোধ থেকে প্রশ্ন তুলতে পারে, "আমাদের ঠিকমতো ভাত নাই। আবার একজন!" ছোটভাইটি জন্মালে সে লুকিয়ে কাঁদে শৈশব, কৈশোরের সমস্ত আনন্দ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে—"অনেক কাজ! কেবল কাজ! আমি খেলব না?" পরপর সন্তানের জন্ম দেওয়ার জন্য মা আমেনা মনে মনে গালি দেয়, তার স্বামীকে, "রাতের বেলা লোকটা একটা দস্যু হয়। মরণ, মরণ!" মোমেনা বড় হয়। একদিন তার মায়ের মনে হয়, মোমেনের বিয়ে দেওয়া দরকার। কারণ, সংসার থেকে 'খাওয়ার মুখ' কমাতে হবে। আল্লাহর 'উপহার'গুলি যে এখন তাদের 'গলার কাঁটা'! দিনমজুরের মেয়ে মোমেনের বিয়ে হয় এক দিনমজুরে সঙ্গেই। বিয়ের আগে বাবা রহমত আলি তাকে বলেছিল, "সংসার করার সময়ে মনে কোনও দুঃখ রাখবে না মা।" মোমেনা জিজ্ঞাসা করেছিল, "ভাতের দুঃখ বাজান?" জবাবে সে শুনেছিল, ভাতের দুঃখটি তার জীবনে ধ্রুবক। মোমেনা বলে, "না বাজান, আমার এখন আর ভাতের দুঃখ নাই। পেটে সব সয়ে গেছে।" স্বামী জমিরের সঙ্গে সংসার পাতে মোমেনা।

"মোমেনা ঘরে ঢুকে মুখ খোলে।

জিনিসটা কই?

আছে।

দাও। খাই।

পানি?

পানি তো সাঁঝের আগেই এনে রেখেছি।

জমির অবাক হয়ে বলে, আমি তোমার মতো পিলের কথা ভাবি নাই বউ। তোমার এত বুদ্ধি।

আমি মাকে দেখেছি। মায়ের মতো বোকা হব না।

তুমি কয়টা সন্তান চাও?

দুইটা।

তাই সই। জমির খুশি হয়ে বলে। বেশি নিয়ে লাভ নেই। কেবল কষ্ট।"

দিনমজুরের মেয়ে মোমেনার স্কুলে পড়া হয়ে ওঠেনি, ফ্যামিলি প্ল্যানিংয়ের

গুরুত্ব সে বুঝেছে নিজের জীবন থেকেই। প্রায় বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত পাশ্চাত্যে গর্ভনিরোধক ওষুধ বা contraceptive pill খাওয়াটা কিন্তু সহজ ছিল না। প্রথমত, রোমান ক্যাথলিক চার্চ মেয়েদের এ ধরনের ওষুধ খাওয়া সমর্থন করত না। দ্বিতীয়ত, ১৯৫০-এ আবিষ্কৃত হলেও এই ওষুধগুলি 'licensed drug'ছিল না। দশবছরের বেশি সময় ধরে বহু লড়াই, বহু বিতর্কের পর Amercian Food and Drug Adiminstration (FDA) গর্ভনিরোধক বড়িকে বৈধতা দেয়। একজন মেয়ে সন্তানের জন্ম দেবে কিনা সেটা সে নিয়ন্ত্রণ করবে, অন্য কেউ নয়—এই সহজ কথাটুকু বুঝতেই এতগুলো বছর লেগে গেছে। ২০১১ সালে লেখা এই ছোটগল্পে আমরা পাচ্ছি মুসলিম সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত এক মেয়ের আধুনিক ও বাস্তবসম্মত ভাবনা, যে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের বেড়াজাল ভেঙে বেড়িয়ে এসে তার আগামী প্রজন্মকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দিতে আগ্রহী।

সেলিনা হোসেনের সৃষ্টি আরও একজন অন্যরকম নারীচরিত্র জেসমিন। ২০০৬ সালে লেখা ছোটগল্প 'জেসমিনের ইচ্ছাপূরণ'—সমাজকে দাঁড় করায় আরও এক জটিল প্রশ্নের সামনে। চোদ্দবছরের কিশোরী জেসমিনের বিয়ে হয় এক লোকের সঙ্গে, গাঁজা-জুয়ার পাশাপাশি যার অন্যতম শখ ছিল কয়েকমাস অন্তর নতুন নতুন বিয়ে করা। জেসমিন সে লোকের পাঁচনম্বর স্ত্রী। বিয়েতে খুশি না হলেও সংসার করায় তার আপত্তি ছিল না। কিন্তু বিয়ে হওয়া ইস্তক স্বামী, শাশুড়ি, জা—কারওর ভালোবাসা, সহানুভূতি মেয়েটি পায়নি। যে বয়সে মেয়েরা পুতুল খেলে, স্কুলে যায়, সে বয়সে মেয়েটির বিয়ে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। হ্যাঁ, বিয়ে 'দেওয়া' হয়েছে। সে বিয়ে 'করেনি।' মাত্র চোদ্দবছর বয়সে 'শরীর' কী, তা বোঝার মানসিকতা তখনও জেসমিনের তৈরী হয়নি। তার মধ্যেই তাকে মা হতে হয়েছে। সেই অবস্থাতেও শারীরিক অত্যাচারের (পড়ুন, বৈবাহিক ধর্ষণ) হাত থেকে তার রেহাই মেলেনি। এমনকি সন্তানপ্রসবের দিনও সে কাউকে পাশে পায়নি। সারাদিন না খেয়ে পড়ে থেকে পেটে তার অসহ্য যন্ত্রণা। জা'কে বলেকয়ে খানিকটা গরম ভাতের ব্যবস্থা করলেও সে ভাত আর তার মুখে ওঠেনি। 'দুই মুঠা রোজগার করতে পারে সে খাইতে চায়?' যাও পাতিলে দুপুরের ভাত আছে ওইটা গিলে আসো'—শাশুড়ির হুকুমে জেসমিনকে দেওয়া হয় ঠাণ্ডা বাসি ডাল-ভাত। পেটের যন্ত্রণায় দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে জেসমিন সে বাসি ভাতের থালা ছুঁড়ে ফেলে দেয়। প্রবল ব্যথায় চিৎকার করতে করতে সে সন্তান প্রসব করে। অভিজ্ঞ কোনও মানুষ সে সময়ে তার কাছে ছিল না, কী করলে কী হতে পারে জেসমিন জানত না। নাভিরজ্জুটি ধরে জোরে টান দেওয়ার ফলে তার জরায়ুটি মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এরপর মেয়েটি জ্ঞান হারিয়ে ফেলে।

রাস্তার কুকুর বিড়ালও হয়তো এতটা কষ্ট পায় না। মাসছয়েক পর জেসমিনের পতিদেবতাটি ছ'নম্বর বিয়ে করে এবং জেসমিন তার ছেলেটিকে নিয়ে সে বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসে। শুরু হয় তার একক সংগ্রাম। প্রথম মাতৃত্বের অভিজ্ঞতা তার কাছে ভয়াবহ, তাই ইচ্ছে হলেও সে পারেনি নতুন করে কাউকে জীবনের সঙ্গী করে নিতে। 'দুঃখ পায় এই ভেবে যে, শরীরের সুখ ওর নিজের মতো করে পাওয়া হল না। ছেলেটা বড় হয়েছে, কোনও কোনও মানুষের আচরণ দেখে রাতের বেলা কেঁদে বুক ভাসিয়ে বলেছে, মা তুই বিয়ে করবি না, তুই না থাকলে আমি কার কাছে থাকব?' পরিস্থিতি আরও জটিল হল, যখন জেসমিন জানতে পারল তার ক্ষতিগ্রস্ত জরায়ুটি কেটে কটে বাদ না দিলে সে আর বাঁচবে না। অপারেশনের জন্য চাই অর্থের সংস্থান। ভরসা এই, পৃথিবীটা শুধুই খারাপ মানুষে ভর্তি নয়। জেসমিনকে বাঁচাতে হাত বাড়িয়ে দিলেন জেবুন্নাহার, যাঁর বাড়িতে জেসমিন পরিচারিকার কাজ করে। ডাক্তার মুনিরা, জেবুন্নাহার দুজনেই জেসমিকে প্রশ্ন করে, জরায়ু বাদ দেওয়ায় তার সম্মতি আছে কিনা? সম্মতি? জেসমিন আর মা হতেই চায় না। অপারেশনের পর জেসমিন বলে, "আজ থেকে আমি স্বাধীন'। কারণ তার যে আর মা হওয়ার ভয় নেই—"এই জীবনে যা কিছু পাইনি, তার সব এখন আমার চাই। আমরা সব ইচ্ছা পূরণ হবে। হাঃ আমি আর মা হব না।"

উৎসের সন্ধানে :

১। 'পঞ্চাশটি গল্প : সেলিনা হোসেন', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড,প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি, ২০১৪, দ্বিতীয় মুদ্রণ জানুয়ারি, ২০১৯

২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চিত্রা কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত 'ব্রাহ্মণ' কবিতাটির শেষ তিন স্তবকের কিয়দংশ।

৩। https://www.thehindu.com/society/meet-the-choice-mothers-signgle-women-whove-opted-for-parenthood-without-a-partner/article29920954.ece
NOVEMBER 09, 2019,16:09 IST
UPDATED : NOVEMBER 10,2019 15:55 IST

৪। সেলিনা হোসেন, ১৯৯৫ সালে প্রকাশিত 'মতিজানের মেয়েরা' গল্পগ্রন্থ

৫। সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতে নারী ও সমাজ, www.ebanglalibrary.com

৬। বুদ্ধদেব বসু, 'অনাম্নী অঙ্গনা ও প্রথম পার্থ: দুটি কাব্যনাট্য', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ : নভেম্বর ১৯৭০, প্রথম দে'জ সংস্করণ: কলকাতা পুস্তকমেলা জানুয়ারি ১৯৯১, পুনর্মুদ্রণ: নভেম্বর ২০১৭, পৃষ্ঠা : ৯১

৭। আফরোজা খাতুন, 'বাংলা কথাসাহিত্যে মুসলিম অন্তঃপুর', দে'জন পাবলিশিং,

প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০১১, পৃষ্ঠা : ২৪৬

৮। The Qur'an does not specifically refer to contraception or family planning, but in verses forbidding infacnticide, the Qur'an warns Muslims, "Do not kill your children for fear of want". "We provide sustenance for them and for you" (6:151,17:31). Some Muslims have interperted this as a prohibtuition aganist contraception as well, but this is not widely accepted veiw.
—'The View of Contraception and Abortion in Islam', Learn Religious, April 27, 2019.
Source : https://www.learnreligious,com/contraception-in-islam-2004440

লেখক পরিচিতি :

এম. ফিল. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

কথাসাহিত্যে চণ্ডীমণ্ডপ : নির্বাচিত পাঠ

রুমকী মণ্ডল

সারাংশ :

চণ্ডীমণ্ডপেই বাঙালি সকালে শুভঙ্করী থেকে সন্ধ্যায় মঙ্গলচণ্ডীর গীত গেয়েছে। পল্লীর পুকুর, নদী, খাল, বিল, সবুজ প্রান্তরের মতোই নিজস্ব একটি স্থান করে নিয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপ। মূলত ধর্মানুষ্ঠানের জন্য চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হলেও ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডি ছাড়িয়ে চণ্ডীমণ্ডপ সামাজিক স্তরে উন্নীত হতে পেরেছিল। বিচার, আলাপ-আলোচনা, আড্ডা, কথকতা, পঠনপাঠন—সবই সেখানে চলত। গ্রাম্য সংস্কৃতির সাথে চণ্ডীমণ্ডপের যোগ এমন যে বাঙালির অলস স্বভাবকে উপমায়িত করা হত 'চণ্ডীমণ্ডপগত অগাধ আলস্য' রূপে। গ্রাম্য জীবন নানা ধারায় প্রবাহিত হত এই চণ্ডীমণ্ডপকে কেন্দ্র করে। সময় পাল্টেছে কিন্তু বাংলার সামাজিক জীবন থেকে চণ্ডীমণ্ডপের ধারণা মুছে যায়নি। মধ্যযুগে উদ্ভূত হলেও নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে আধুনিক যুগেও সে থেকে গেছে অন্যরূপে, অন্য নামে। সাদামাটা এই স্থাপত্য দৃষ্টিনন্দন ও নান্দনিকও বটে। কোন কোন চণ্ডীমণ্ডপের খুঁটিতে দেখা যায় কাঠের উপর খোদাই করা কাজ। বিভিন্ন দেবদেবীর মূর্তি, পৌরাণিক ঘটনা, নকশা ইত্যাদি স্তম্ভের গায়ে, কড়িকাঠে শিল্পীদের হাতের ছোঁয়ায় জীবন্ত রূপ পেয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপগুলি পুরনো দিনের স্মৃতি বহন করে নিয়ে চলেছে। তাই পাঠশালা, বিচারশালা সময়ের সাথে সাথে স্থানান্তরিত হলেও অতীত বুকে নিয়ে দাঁড়িয়ে চণ্ডীমণ্ডপ এখনও গুরুত্ব হারায়নি।

চণ্ডীমণ্ডপ শুধুমাত্র বাংলার সমাজ জীবনকে প্রভাবিত করেনি, সাহিত্যেও এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়। বাংলা গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটক সবেতেই চণ্ডীমণ্ডপের উল্লেখ আছে। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর—কারও রচনা থেকেই চণ্ডীমণ্ডপের প্রসঙ্গ বাদ পড়েনি। চণ্ডীমণ্ডপকে তারা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন। কারো রচনায় ধরা পড়েছে চণ্ডীমণ্ডপের সনাতন রূপ আবার কারো রচনায় আছে চণ্ডীমণ্ডপের বিবর্তনের চিত্র।

মূল শব্দ : চণ্ডীমণ্ডপ—একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান।

"একদিন চণ্ডীমণ্ডপে আমাদের আখরা বসত, আলাপ জমত, পাড়াপড়শিদের জুটিয়ে।" "কালান্তর" প্রবন্ধে এভাবেই রবীন্দ্রনাথের চোখে ধরা দিয়েছে চণ্ডীমণ্ডপ। বাংলার গ্রামীণ জীবনের তথা সংস্কৃতির অন্যতম নির্দেশন হল চণ্ডীমণ্ডপ। মধ্যযুগের

নানা কাব্যের পাশাপাশি আধুনিক গল্প-উপন্যাসেও বারবার দেখা গেছে চণ্ডীমণ্ডপের অনুষঙ্গ। বাংলা সংস্কৃতিতে চণ্ডীমণ্ডপের উদ্ভব কিভাবে হল তা জানতে গেলে মধ্যযুগের কাব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করতে হবে। কবিকঙ্কন মুকুন্দরামের রচনায় 'মণ্ডপ'-এর উল্লেখ পাওয়া যায়—

"নগর চত্বর মাঝে শিবের মণ্ডপ সাজে
অনাথমণ্ডপ অতিথিশালা
বাসারে জনের তরে দীঘল মন্দির করে
প্রবাসীজনের তিথি মেলা।"[২]

রাজশেখর বসু তাঁর "চলন্তিকা" অভিধানে "মণ্ডপ" শব্দের অর্থ লিখেছেন—"ছাদযুক্ত চাঁদোয়া, পাণ্ডাল"[৩]। উদাহরণস্বরূপ সভামণ্ডপ, চণ্ডীমণ্ডপ,ছায়ামণ্ডপ, নাটমন্দির ইত্যাদির কথা উল্লেখ করেছেন অর্থাৎ মণ্ডপ সাধারণ ঘরের মতো চার দেওয়ালযুক্ত ছাদওয়ালা নয়, উপরে চাল বা ছাদ দেওয়া উন্মুক্ত প্রাঙ্গণ। চাল খড়েরও হতে পারে আবার পাকা ছাদও হতে পারে। শিবের মণ্ডপ, অনাথ মণ্ডপের পাশাপাশি চণ্ডী ঠাকুরের অবস্থান যেখানে সেখানে যদি কোন চালওয়ালা মণ্ডপ তৈরি করা হয় তবে তাকে চণ্ডীমণ্ডপ বলা যেতেই পারে।

দেবী চণ্ডী ও চণ্ডীমণ্ডপের সম্পর্ক নির্ণয় এক্ষেত্রে আবশ্যক। বাংলাদেশের লৌকিক দেবীদের মধ্যে চণ্ডী প্রাচীন। বাংলাদেশের ব্রত আরাধনায় চণ্ডী ও মঙ্গলচণ্ডী নামই বেশি পাওয়া যায়। এছাড়াও দেবী চণ্ডী পরিচিত একাধিক নামে—উড়ন চণ্ডী, নাটাই চণ্ডী, গোর চণ্ডী, কুলুই চণ্ডী, শুভ চণ্ডী বা সুবচনী, কলাই চণ্ডী, ওলাই চণ্ডী, ঢেলাই চণ্ডী, সঙ্কটা চণ্ডী প্রভৃতি। ডক্টর আশুতোষ ভট্টাচার্য "বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস" গ্রন্থে প্রভূত তথ্যের সমন্বয়ে প্রমাণ করতে চেয়েছেন বাঙালী ও নিকটবর্তী অনার্যবর্গের মানুষরা দেবী চণ্ডীর ন্যায় লোকদেবতার পূজা করত। এ প্রসঙ্গে তিনি ওঁরাওদের শিকার ও যুদ্ধের দেবীর কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে—

"কালকেতুর কাহিনিতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে এই চণ্ডী প্রকৃতই পশুকুলের অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং ব্যাধজাতির আরাধ্যা। কিন্তু ধনপতির গল্পের মধ্যে চণ্ডীর সহিত পশুকুলের সংস্রব নাই। এখানে তিনি যোষিতামিষ্ট দেবতা। তিনি এখানে প্রধানত হারানো জিনিস ফিরিয়া পাইবার দেবতা। কালকেতু ব্যাধ কাহিনির চণ্ডীর যেমন একটি বন্য পরিচয় আছে, ধনপতি সদাগর কাহিনির চণ্ডীর তেমনই একটি স্বতন্ত্র গার্হস্থ্য পরিচয় আছে। মনে হয় স্বতন্ত্র দেব পরিকল্পনা হইতে এই উভয় কাহিনির ভিত্তি পরবর্তীকালে আসিয়া একসূত্রে গ্রথিত হইয়াছে।"[৪]

ডক্টর সুকুমার সেনও চণ্ডীদেবীর লোক উৎসকে সমর্থন করেছেন—"চণ্ডীমঙ্গলের

অধিদেবতা দুর্গা অরণ্যানী বা বিন্ধ্যবাসিনী। তবে তিনি মহিষাসুরবিনাশিনী নহেন, তিনি অভয়া।...বন্দনীয় রূপে এই বনদেবতা বৈদিক সাহিত্যের শেষকালে দেখা দিয়েছেন। ঋকবেদের দশম মণ্ডলের শেষের দিকে (সূক্ত ১৪৬) তাহার একটি স্তব আছে। সেখানে তাহার নাম অরণ্যানী অর্থাৎ অরণ্যের পুণ্য অধিকারিণী। ঋকবেদের সূক্তটি ভালো করিয়া পড়িলে কোন সন্দেহ থাকে না যে এই অরণ্যানী বহু শত শতাব্দীর ইতিহাস বাহিয়া নানা কবিকল্পনার রঙে ডুবিয়ে ও বিচিত্র ভাবনার পাকে জড়াইয়া পুরনো বাঙ্গালা সাহিত্যের চণ্ডীমণ্ডপে অধিদেবী মঙ্গলচণ্ডী রূপে দেখা দিয়েছিলেন।"[৫]

অপরদিকে পৌরাণিক তান্ত্রিক দেবমণ্ডল চণ্ডীর উৎস খুঁজতে গিয়ে পৌরাণিক বিভিন্ন নারীদেবতা, হিন্দু তন্ত্রোক্ত নানা দেবী ও বৌদ্ধতন্ত্রের কোন কোন দেবীর প্রসঙ্গে কেউ কেউ পৌঁছে গিয়েছেন। শ্রীসুধীভূষণ ভট্টাচার্য "মঙ্গলচণ্ডীর গীত" বইয়ের ভূমিকায় লিখেছেন—

"সরস্বতী মূর্তির কাঠামোর ওপর যথাক্রমে মহিষমর্দিনী, লক্ষ্মী ও উমা মূর্তির প্রলেপ দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর প্রতিমা নির্মিত হইয়াছে...অন্ততপক্ষে ১০ম-১১শ শতক হতে পৌরাণিক দেবীরূপেই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা এদেশে চলিয়া আসিতেছে এবং চণ্ডীমঙ্গলের কবিগণ এই দেবীর পরিকল্পনার জন্য পুরাণের নিকটেই ঋণী ছিলেন। তাহারা কোন অপৌরাণিক ধর্ম জগৎ হইতে মঙ্গলচণ্ডীকে গ্রহণ করেন নাই"[৬]

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের দুটি কাহিনি পাওয়া যায়। প্রথম কাহিনির প্রধান চরিত্র কালকেতু ও ফুল্লরা। এই কাহিনির মঙ্গলচণ্ডী বন্যপশুর অধিষ্ঠাত্রী দেবী। গোধিকা তার বাহন। ওঁরাওদের চাণ্ডীদেবীর মতোই উল্লেখিত চণ্ডী দেবীও বিচিত্র রূপ ধারণে পারদর্শী। দ্বিতীয় কাহিনির প্রধান চরিত্র ধনপতি ও খুল্লনা। ধনপতি খুল্লনার মঙ্গলচণ্ডী গৃহপশুপালিনী দেবী। তিনি মূলত হারানো জিনিস ফিরে পাওয়ার দেবতা। খুল্লনা এই দেবীর পূজা করে প্রথমে হারানো ছাগল ও পরে নিরুদ্দিষ্ট স্বামী ও পুত্রকে ফিরে পায়। এখানে দেবী চণ্ডীর পূজোর প্রতীক ঘট বা ঝারি এবং উপকরণ আটগাছি দূর্বা ও আটটি ধান। এই কাহিনি দুটির মধ্যে দৃষ্টিপাত করলে দেবী চণ্ডীর রূপান্তরটি স্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হয়। যাযাবর শিকারিদের স্তর থেকে পশুপালন ও কৃষির স্তরে দেবী রূপান্তরিত হয়েছেন। অনেক দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের পর তিনি উচ্চবিত্ত সমাজে গৃহীত হন— চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে সেটি স্পষ্ট দেখা যায়। খুল্লনাকে দেবী চণ্ডীর পূজা করতে দেখে ধনপতির কাছে লহনাকে বলতে শোনা যায়—

"তোমার মোহিনী বালা শিখিয়া ডাইনি কলা
নিত্যপূজে ডাকিনী দেবতা"[৭]

ধনপতি আর্য সমাজের প্রতিনিধি। স্ত্রীর সঙ্গে তার এই বিরোধ মূলত আর্য-অনার্য সংস্কৃতির ঘাত-প্রতিঘাত। দীর্ঘ এই ঘাত-প্রতিঘাতের ফলে এবং আর্য-অনার্য সংস্কৃতির লেনদেনের মধ্য দিয়েই পরবর্তীকালে চণ্ডী বৃহত্তর সমাজে গৃহীত হয়েছে। আরো পরে গিয়ে এই চণ্ডীই সতী, দুর্গা, সর্বমঙ্গলাতে পরিণত হয়েছে। তার প্রমাণ দুর্গোৎসবের মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া যায়। দুর্গোৎসবের সময় এখনো দেবীর সামনে মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী পাঠ করা হয়।

দেবী চণ্ডী যতটা প্রাচীন চণ্ডীমণ্ডপ ততটা প্রাচীন নাও হতে পারে। চণ্ডীমঙ্গলের কোথাও চণ্ডীমণ্ডপের উল্লেখ পাওয়া যায় না। সুতরাং মনে করে নেওয়া যেতে পারে যে রাত জেগে মঙ্গলচণ্ডীর গীত গাওয়া বা শোনার জন্য পরবর্তীকালে চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হয়। তবে ঠিক কোন সময় প্রথম চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হয় তা জানা যায় না। তবে সাহিত্যিক প্রমাণের দিকে লক্ষ্য রেখে বলা যায়, পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে চণ্ডীমণ্ডপ ছিল। ড: সুকুমার সেন বলেছেন—"পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষের দিকে অবস্থাপন্ন লোকের বাড়িতে চণ্ডীমণ্ডপ থাকিত এবং ঘটা করে দুর্গোৎসব হইতো"[৮]। প্রমাণ হিসাবে বৃন্দাবন দাসের "চৈতন্য ভাগবত"-এর কথাও বলা যেতে পারে। সেখানে বলা হয়েছে—

(১) "ধর্ম-কর্ম লোকে সভে এই মাত্র জানে
মঙ্গলচণ্ডীর গীত করে জাগরণে।"[৯]

(২) "প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত
করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত।।
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাউঁ
সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাউঁ।।"[১০]

—এর থেকে অনুমান করে নেওয়া যায় এই সময়ে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতকে চণ্ডীপূজার বহুল প্রচলন ছিল এবং মঙ্গলচণ্ডীর গীত শোনার জন্য চণ্ডীমণ্ডপও ছিল। লক্ষণ সেনের আমলে অর্থাৎ দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকেও চণ্ডী পূজার প্রচলন ছিল। তার প্রমাণ পাওয়া যায় ড: সুকুমার সেনের উক্তিতে—"প্রথম দুর্গাচণ্ডীর পূজা শিক্ষিত ব্রাহ্মণের স্বীকৃতি পাইয়া মুসলমান অধিকারের অনেক আগেই স্মার্ত বিধিতে স্থান পাইয়াছিল। লক্ষণ সেনের মহা ধর্মাধিকরণিক হলায়ুধ তাহার 'ব্রাহ্মণ সর্বস্ব'-এ চণ্ডী পূজা ব্রাহ্মণের নিত্যকর্মের মধ্যে ধরিয়েছিলেন"[১১]।

মূলত ধর্মানুষ্ঠানের জন্য চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হলেও এর কার্যাবলী শুধুমাত্র ধর্মানুষ্ঠানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। চণ্ডীমণ্ডপের আরো অনেক বিশেষত্ব আছে। চণ্ডীমণ্ডপেই বসত গ্রামীণ সভা, মজলিস ও আড্ডা। অতিথিশালা, পাঠশালা,

বিচারালয় হিসেবেও ব্যবহৃত হত চণ্ডীমণ্ডপ। চণ্ডীমণ্ডপের এই লৌকিক বিশেষত্বের সাথে অনেকটাই মিল খুঁজে পাওয়া যায় নাগাদের মোরুং এর সাথে। নাগা গ্রামের সর্বসাধারণের গৃহকে মোরুং বলে—ক্লাবঘর, উৎসবগৃহ, অতিথিশালা, আলোচনাগৃহ সবই বলা চলে। কোন কোন নৃবিজ্ঞানী আবার বলেছেন—"ক্ষয়িষ্ণু মোরুং হল ক্ষয়িষ্ণু নাগা গ্রামের প্রতীক"[১২]। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপ সম্বন্ধেও এ কথা খাটে। বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের মতো আসামে দেখা যায় নামঘর। বৈষ্ণব সাধু শংকরদেব পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দীতে প্রথম নামঘর নির্মাণ করেন। মহাদেব চক্রবর্তী রচিত "আসামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)" গ্রন্থে বলা আছে—

"একসময় নামঘরগুলি কীর্তনঘর হিসেবেই পরিচিত ছিল এবং বেশিরভাগই ছিল বাঁশ, মাটির দেওয়াল ও খড়ের চালের। কিন্তু ক্রমে টিনের চাল, পাকা মেঝে ইত্যাদি প্রবর্তিত হয় এবং ভাওনা নাটক, শাস্ত্রীয় ও লোকনৃত্য থেকে শুরু করে গ্রামের যাবতীয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান নামঘরেই পরিবেশিত হত। সাদামাটা নামঘরের স্থাপত্য শুধু যে দৃষ্টিনন্দন বা নান্দনিক তাই নয়, একটি গ্রামের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য নামঘর-এর মাধ্যমেই প্রতিফলিত হয়। সাধারণত সন্ধ্যাবেলায় (যদিও প্রতিদিন নয়) গ্রামের সকলে নামঘরে সমবেত হয়ে এই সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা উপভোগ করে"[১৩]।

উড়িষ্যার ভাগবত ঘরের সাথেও বাংলার চণ্ডীমণ্ডপের মিল পাওয়া যায়। বিনয় ঘোষের "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব" গ্রন্থ থেকে জানা যায়—"ভাগবত ঘর কারো ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, সর্বসাধারণের সম্পত্তি। সকলের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করে ঘর তৈরি করা হয়েছে। এখানে অবসর-বিনোদন, খেলাধুলা, আড্ডা তো চলেই, উৎসব-পার্বণেও এঘর সকলে ব্যবহার করতে পারে। গ্রামের কারো ঘরে বিবাহাদি হলে অতিথি অভ্যাগতদের এ ঘরে আশ্রয় দেওয়া হয়। বাইরের অতিথিরাও এ ঘরে থাকতে পারে"[১৪]। চণ্ডীমণ্ডপের সাথে অনেক সাদৃশ্য থাকলেও ভাগবত ঘর চণ্ডীমণ্ডপের থেকে কিছুটা আলাদা। ভাগবতঘর জনসাধারণের অর্থে নির্মিত হয় কিন্তু চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামের জমিদার বা সম্ভ্রান্ত কোন ব্যক্তির অর্থে নির্মিত হত যা সর্বসাধারণে ব্যবহার করতে পারত। ব্যক্তিগত উদ্যোগেও চণ্ডীমণ্ডপ নির্মিত হত তবে তাতে সর্বসাধারণের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হত না।

বাংলার লৌকিক ও গ্রামীণ সংস্কৃতির বিভিন্ন ধারা বিচিত্র উৎসব থেকে প্রবাহিত হয়ে এসে বাংলার চণ্ডীমণ্ডপে মিলিত হয়েছিল একদিন। চণ্ডীমণ্ডপ মধ্যযুগে উদ্ভুত হলেও আধুনিক কথাসাহিত্যে বারংবার তার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বাংলা ছোটগল্প, উপন্যাসে কীভাবে চণ্ডীমণ্ডপের প্রসঙ্গ উঠে এসেছে তা এখানে আমরা আলোচনা করব—

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত একটি উল্লেখযোগ্য ছোটগল্প হল "পড়ে পাওয়া"। এই গল্পে দুবার চণ্ডীমণ্ডপের প্রসঙ্গ এসেছে। গল্পকথক ও বাদল নামের এক বালক সন্ধ্যার অন্ধকারে ঝড় জলের রাত্রে নদীর ধার দিয়ে বাড়ি ফেরার পথে চাবি বন্ধ করা একটি টিনের বাক্স কুড়িয়ে পায়। টিনের বাক্সের প্রকৃত মালিককে খুঁজে পাওয়ার জন্য কথক, বাদল, বিধু, সিধু, নিধু, তিনুদের মধ্যে অনেক জল্পনা-কল্পনা হয় এবং শেষে তিনখানা কাগজে বাক্স কুড়িয়ে পাওয়ার কথা লিখে নদীর ধারের রাস্তায় ভিন্ন ভিন্ন গাছে আঠা দিয়ে মেরে দেওয়া হয়। তিন দিন পর একজন কালো মতো রোগা ভদ্রলোক বাক্সের খোঁজে এসে কথকদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে দাঁড়ালো। এই প্রথম গল্পে চণ্ডীমণ্ডপের উল্লেখ। লেখকের বয়ানে তো ধরা দিয়েছে এভাবে—"তিনদিন পরে একজন কালো মতো রোগা লোক আমাদের চণ্ডীমণ্ডপের সামনে এসে দাঁড়াল। আমি তখন সেখানে বসে পড়ছি।"[১৫]

এখানে 'আমাদের চণ্ডীমণ্ডপ' কথাটি চণ্ডীমণ্ডপের সার্বজনীনতাকে নষ্ট করেছে। বোঝাই যাচ্ছে, গল্পে উল্লেখিত চণ্ডীমণ্ডপটি গ্রামের কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির অর্থে নির্মিত ব্যক্তিগত চণ্ডীমণ্ডপ। দ্বিতীয়বারও আমরা এই একই চণ্ডীমণ্ডপকে দেখি কিন্তু তার কার্যাবলী ভিন্ন—"একদিন বিকেলে আমাদের চণ্ডীমণ্ডপে একটা লোক এল। বাবা বসে হাতবাক্স সামনে নিয়ে জমা জমির হিসেব দেখছেন"[১৬] অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে চণ্ডীমণ্ডপে বসে কাছারির হিসাব নিকাশের কাজও করা হত।

চণ্ডীমণ্ডপে ধর্মীয় উৎসব অনুষ্ঠান ব্যতীত আরো অনেক কিছুই হত। জনসাধারণের আলাপ-আলোচনার পাশাপাশি বিচারকার্যও সম্পন্ন করা হত চণ্ডীমণ্ডপে। "পুঁইমাচা" গল্পে সহায়হরির বিচার হতে দেখা যায় চণ্ডীমণ্ডপে। সহায়হরির বড় মেয়ে ক্ষেন্তির প্রথম বিবাহ আশীর্বাদের পর ভেঙে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিচার সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সহায়হরির স্ত্রী অন্নপূর্ণার জবানিতে আমরা এই বিচার সম্পর্কে জানতে পারি—

"এক ঘরে করবে গো তোমাকে এক ঘরে করবে। কাল চৌধুরীদের চণ্ডীমণ্ডপে এসব কথা হয়েছে। আমাদের হাতের ছোঁয়া জল আর কেউ খাবেনা।"[১৭]

এরপর আরো একবার কালিময়ের চণ্ডীমণ্ডপে বিকেলবেলা সহায়হরির ডাক পড়েছিল এবং সংক্ষিপ্ত ভূমিকার পরে উত্তেজিত সুরে তাকে সমাজের রীতি-নীতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছিল—

"পাত্র আশীর্বাদ হয়ে গেল, তুমি বেঁকে বসলে কী জন্যে শুনি? ও তো একরকম উচ্ছুগণ্ড করা মেয়ে। আশীর্বাদ হওয়াও যা বিয়ে হওয়াও তা, সাতপাকের যা বাকি, এই তো? সমাজে বসে এসব কাজগুলো তুমি যে করবে আর আমরা বসে বসে দেখব এ তুমি মনে ভেবো না। সমাজের বামুনদের যদি জাত মারবার ইচ্ছে না থাকে, মেয়ের বিয়ের বন্দোবস্ত করে ফেল।"[১৮]

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "সিঁদুরচরণ" গল্পে একবার মাত্র চণ্ডীমণ্ডপের প্রসঙ্গ পাওয়া যায় এবং এই একবারের অবতারণাতেই চণ্ডীমণ্ডপের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যটি উন্মোচিত হয়। গ্রামের সর্বসাধারণের আলোচনা সভা হিসাবে আমরা গল্পে চণ্ডীমণ্ডপকে দেখতে পাই। গল্পের প্রধান চরিত্র সিঁদুরচরণ। গ্রাম্য, সরল, সাদাসিধে সিঁদুরচরণের ঘণ্টাখানেক ট্রেনে চড়ে বিশ্ব দর্শনের এক অসাধারণ চিত্র এঁকেছেন লেখক। সিঁদুরচরণ মালিপোতার বাসিন্দা। তবে এটি তার আদি বাসস্থান নয়। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মহাশয়সহ গ্রামের অন্যান্য ব্যক্তিদের সেই আলোচনাতেই মশগুল থাকতে দেখা যায় চণ্ডীমণ্ডপে—"সেদিন রায়দের চণ্ডীমণ্ডপে সিঁদুরচরণ কোথা থেকে এসেছে তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। বৃদ্ধ ভট্টাচার্য মশাই তামাক টানতে টানতে বললেন—কে সিঁদুরচরণ? ওর বাড়ি ছিল কোথায় কেউ জানে না। তবে এর আগে ও খাবরাপোতায় প্রায় ১০ বছর ছিল। তার আগে অন্য গাঁয়ে ছিল"[১৯]।

এক গৃহবধূর সাহসিকতা ও বুদ্ধিমত্তার জন্য বাইশ-চব্বিশ বছর বয়সের ঔষধের মাদুলি বিক্রেতার জীবন রক্ষা পাওয়ার ঘটনাকে অবলম্বন করে লেখা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের "বামা" গল্পটি। বর্ধমান জেলার মেমারি স্টেশন থেকে মাখমপুর যাবার পথে গল্পকথককে ফাঁসুড়ে ডাকাতের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হয়। বাড়িটির বর্ণনায় এসেছে চণ্ডীমণ্ডপের প্রসঙ্গ। সেই বাড়ির উঠোনে সারি সারি তিনটে বড় বড় ধানের গোলা। গোলার সঙ্গে প্রকাণ্ড গোয়ালঘর, বলদ ও গাইয়ে প্রায় কুড়ি বাইশটা। অন্তঃপুরের দিকে চারখানা বড় বড় আটচালার ঘর। বাইরের দিকে আছে চণ্ডীমণ্ডপ ও তার পাশে আর একখানা কুঠুরি। চণ্ডীমণ্ডপ এখানে পারিবারিক স্বচ্ছলতার প্রতীক হয়ে উঠেছে এবং চণ্ডীমণ্ডপ যে অন্দরমহলের বাইরে নির্মিত হত শেষবাক্যটি থেকে তাও স্পষ্ট বোঝা যায়।

চণ্ডীমণ্ডপকে অতিথিশালা হিসেবে ব্যবহার করারও রীতি ছিল। কথককেও থাকতে দেওয়া হয়েছিল চণ্ডীমণ্ডপের পাশের কুঠুরিতে। সেটি চণ্ডীমণ্ডপের অংশবিশেষ, কারণ এটা একটা সরু রোয়াকের দ্বারা চণ্ডীমণ্ডপের পেছনের দিকে সংলগ্ন। আলাপ আলোচনার স্থান রূপেও চণ্ডীমণ্ডপকে ব্যবহার করতে দেখা গেছে গল্পে। বামার শ্বশুরকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে লোকজনের সাথে কথা বলতে দেখা যায়।

চণ্ডীমণ্ডপে আড্ডার পাশাপাশি যাত্রার আখড়াই ও রিহার্সালও হত। এমনই একটা চিত্র পাওয়া যায় বিভূতিভূষণের "মৌরীফুল' গল্পে। সুশীলার স্বামী কিশোরী জমিদারের কাছারিতে চাকরি করে সন্ধ্যেবেলা ফিরে এসে প্রতিদিনই যোগ দিত চণ্ডীমণ্ডপের আখড়াই-এ—

"ও পাড়ায় রায়বাড়ির চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের নিষ্কর্মা যুবকদিগের যাত্রার আখড়াই ও রিহার্সেল চলিত—সেইখানে অনেকক্ষণ কাটাইয়া অনেক রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া আসা তাহার নিত্যকর্মের ভিতর"[২০]। খরচ বাঁচনোর জন্য গ্রামের অনেকেই সকাল-সন্ধ্যায় চণ্ডীমণ্ডপে আশ্রয় নিতেন। তেমনই এক ব্যক্তি ছিলেন সুশীলাদের প্রতিবেশী হরি রায়।

বিভূতিভূষণের অপর একটি গল্প "রূপো বাঙাল'—এ চণ্ডীমণ্ডপকে পাঠশালা হিসেবে ব্যবহার করতে দেখা গেছে। গল্পকথক রোজ সকালে উঠে সেই চণ্ডীমণ্ডপে হিরু মাস্টারের কাছে পড়তে যেতেন। "পড়ে পাওয়া" গল্পের মতো চণ্ডীমণ্ডপে মহাজনী খাতা খুলে হিসাব-নিকাশ করবার উল্লেখও আছে গল্পে।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় রচিত "গণদেবতা" উপন্যাসটি "বিংশ শতাব্দীর প্রথম অর্ধের বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যেরই একটি যুগ পরিচায়ক উপন্যাস"[২১]। উপন্যাসটি ধারাবাহিকভাবে ভারতবর্ষ পত্রিকায় "চণ্ডীমণ্ডপ" নামে ১৩৪৭ বঙ্গাব্দের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ১৩৪৮ বঙ্গাব্দের চৈত্র মাস পর্যন্ত সময়কালে প্রকাশিত হয়েছিল। সেটি ১৩৪৯ বঙ্গাব্দের ২০ কার্তিক "গণদেবতা" নামাঙ্কিত হয়ে শক্তিরঞ্জন সোম কর্তৃক প্রকাশিত হয়। "গণদেবতা" উপন্যাসের "পঞ্চগ্রাম" অংশটি ১৩৫০ বঙ্গাব্দে উপন্যাসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে প্রকাশিত হয়।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলার সমাজ ব্যবস্থাকে গভীরভাবে বিশ্লেষণ করেছেন এই উপন্যাসে এবং বাংলার সমাজ-সংস্কৃতিতে চণ্ডীমণ্ডপের প্রভাব ব্যাখ্যা করেছেন। উপন্যাসে তারাশঙ্কর কালান্তরের নতুন দেবতাকে আবাহন করেছেন। এ দেবতা কোন পৌরাণিক দেবতা নন, এ দেবতা গণদেবতা। উপন্যাসে—"চণ্ডীমণ্ডপের সমাজ শাসনের অন্যায় অবিচার এর সমালোচনা তিনি করেননি, এমনকি চণ্ডীমণ্ডপের শাসন শক্তির উপর তেমন প্রচণ্ড রকম গুরুত্বও আরোপ করেননি। চণ্ডীমণ্ডপের শাসন যে অস্বীকার করেছে সেও চণ্ডীমণ্ডপের বহির্ভূত নয়। চণ্ডীমণ্ডপের গোষ্ঠীসমাজের বিরুদ্ধে ব্যক্তি বিবেকের বিদ্রোহের ইঙ্গিতও তারাশঙ্কর দেননি"[২২]। বরং তিনি দেখিয়েছেন—"চণ্ডীমণ্ডপকে আশ্রয় করে ব্যষ্টিজীবন গোষ্ঠীজীবনে পরিণত হয়েছে। চণ্ডীমণ্ডপ আশ্রিত গোষ্ঠীজীবন এবং গোষ্ঠীজীবনের বিলয়, উগ্র ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের উদ্ভব, শহরকেন্দ্রিক নূতন সামাজিক Institution এর আবির্ভাব।

Agricultural Economy-র পরিবর্তে Industrial Economy-র প্রাধান্য"[২৩]। এই চণ্ডীমণ্ডপটি ছিল গ্রামের হৃৎপিণ্ড, সমস্ত জীবনী শক্তির কেন্দ্রস্থল। পূজা-পার্বণ, আনন্দ উৎসব, অন্নপ্রাশন, বিবাহ, শ্রাদ্ধ সবই অনুষ্ঠিত হত এই চণ্ডীমণ্ডপে। অন্যায়-অবিচার, বিশৃঙ্খলা, ব্যাভিচার, পাপ গ্রামের মধ্যে দেখা দিলে এই চণ্ডীমণ্ডপেই বসত পঞ্চায়েত। এই আসরে বসে বিচার হত এবং শাসন করে সে সমস্ত দূর করা হত। গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত চণ্ডীমণ্ডপ থেকে হাঁক দিলে গ্রামের সমস্ত ঘর থেকে সেটা শোনা যায়—সেই ডাক উপেক্ষা করার সামর্থ্য কারো ছিলনা। উপন্যাসে বেশ কয়েকবার চণ্ডীমণ্ডপে মজলিস বসার বর্ণনা আছে। প্রথম অধ্যায়ে অনিরুদ্ধ ও গিরিশের বিচার করার জন্য মজলিস বসে চণ্ডীমণ্ডপে। অনিরুদ্ধ কামার ও গিরিশ ছুতোর জংশন শহরে গিয়ে দোকান দেওয়ায় গ্রামের লোকের অসুবিধার শেষ নেই। তাই পাশাপাশি অবস্থিত দুখানা গ্রামের লোক একত্রিত হয়ে তাদের একটি নির্দিষ্ট দিন জানিয়ে চণ্ডীমণ্ডপে ডেকে পাঠায়। এখানে চণ্ডীমণ্ডপের যে বিবরণ আছে তা থেকে চণ্ডীমণ্ডপ—এর গঠন সম্পর্কে জানা যায়—"চণ্ডীমণ্ডপ বহুকালের এবং এক কোণ ভাঙ্গা হইয়া আছে, মধ্যে নাটমন্দির। তার চাল কাঠামো হাতিশুঁড়—ষড়দল-তীরসাঙা প্রভৃতি হরেক রকমের কাঠ দিয়ে যেন অক্ষয় অমর করিবার উদ্দেশ্যে গড়া হইয়াছিল। নীচের মেঝেও সনাতন পদ্ধতিতে মাটির। চণ্ডীমণ্ডপের এই নাটমন্দির বা আটচালায় শতরঞ্জি, চাটাই, চট প্রভৃতি বিছাইয়া মজলিস বসিল"[২৪]। এই মজলিসে গিরিশ ও অনিরুদ্ধর উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, যারা চণ্ডীমণ্ডপের শাসনকে অস্বীকার করে তারাও কিন্তু এর বাইরে নয়।

ধর্মীয় উৎসবের সাথেও ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে চণ্ডীমণ্ডপ। দেবনাথ ও জগন ডাক্তার মিলে নবান্নের দিন চণ্ডীমণ্ডপে উৎসবের ব্যবস্থা করে, সন্ধ্যায় ভাসান গানেরও আয়োজন করা হয়। চণ্ডীমণ্ডপে নবান্ন উৎসবের কিছুটা বর্ণনা তুলে ধরা যেতে পারে—

"ছেলেমেয়েরা সকালবেলাতেই সব স্নান সারিয়া ফেলিয়াছে। অগ্রহায়ণের তৃতীয় সপ্তাহে শীতও পড়িয়াছে; তবুও নবান্নের উৎসাহে ছেলেরা পুকুরে জল ঘোলা করিয়া তবে উঠিয়াছে। তাহারা সব এখনও চণ্ডীমণ্ডপের আঙিনায় রোদে দাঁড়াইয়া খোঁড়া পুরোহিতের কঙ্কালসার ঘোড়াটাকে লইয়া কলরব করিতেছে। বুড়ো শিব এবং ভাঙ্গা কালীর মন্দিরে ভোগ না হইলে নবান্ন আরম্ভ হইবে না। কুমারী কিশোরী মেয়েরা ভিজা চুল পিঠে এলাইয়া দিয়া, নতুন বাটিতে নতুন ধরনের আতপ চাল, চিনি, মণ্ডা, দুধ, কলা, আখের টিকলি, আদাকুচি, মুলাকুচি সাজাইয়া দক্ষিণাসহ মন্দিরের বারান্দায় নামাইয়া দিতেছে। অধিকাংশই চার পয়সা,

কেহ দুপয়সা, কেহ এক পয়সা, দু-চার জনে দিয়েছে দু আনা। যাহাদের বাড়িতে কুমারী মেয়ে নাই তাহাদের ভোগ সামগ্রী প্রবীণরা লইয়া আসিতেছে।"[২৫]।

ইতুলক্ষ্মী পর্বের সাথেও পূর্বকালে চণ্ডীমণ্ডপের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ছিল। লক্ষ্মী পূজার শেষে সমস্ত গ্রামের মেয়েরা চণ্ডীমণ্ডপে সমবেত হয়ে সুপারি হাতে গ্রামের প্রবীণাদের কাছে ব্রত কথা শুনত। বর্তমানে সে সম্বন্ধ অনেকটাই শিথিল। তবে এখনো মেয়েরা প্রাতঃকালে স্নান করে চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম না করে লক্ষ্মী পাতে না। ইতুলক্ষ্মীর দেড় মাস পরে আসে পৌষ সংক্রান্তি। সেদিনও গ্রামের বধূরা চণ্ডীমণ্ডপে যায় পৌষ আগলানোর আলপনা দিতে। চৈত্রের কুড়ি তারিখ থেকে চণ্ডীমণ্ডপে গাজনের ঢাক বাজা শুরু হয়, বুড়োশিব চণ্ডীমণ্ডপ জাঁকিয়ে বসেন। গাজনের মেলার দোকান বসে চণ্ডীমণ্ডপের আশপাশ দিয়ে।

চণ্ডীমণ্ডকে চিকিৎসাকেন্দ্র ও পাঠশালা হিসাবে ব্যবহার করার কথাও আছে উপন্যাসে। নিজস্ব বৈঠকখানা তৈরির আগে জগন ডাক্তারের পিতামহ চণ্ডীমণ্ডপে রোগী দেখত এবং পাঠশালা প্রতিষ্ঠার প্রথম দিন থেকে চণ্ডীমণ্ডপ পাঠশালার জন্য নির্দিষ্ট স্থান। পূর্বে চণ্ডীমণ্ডপে কালী ও শিবের নিত্য পূজার ব্যবস্থা ছিল এবং ওই পূজক ব্রাহ্মণ ছিল পাঠশালার পণ্ডিত। গ্রামের অনেকেই জীবনের যত সুখস্মৃতি-সে সমস্তই আহরণ করেছে এই চণ্ডীমণ্ডপ থেকে। তাই এখানে এসে সেই কথাগুলি তাদের মনে পড়ে যায়। এই মমত্ববোধ ও শ্রদ্ধাবোধ থেকেই প্রবীণা রাঙাপিসি রোজ তেল মেখে ঝাঁটা হাতে এসে চণ্ডীমণ্ডপ ঝাঁট দিয়ে যায়, নবান্নের দিন পূজোর থালা ফেরত পাঠানোর পরও কামার বউ দূর থেকে চণ্ডীমণ্ডপে প্রণাম করে যায়।

চণ্ডীমণ্ডপের ক্রমবির্তনের চিত্রও উপন্যাসে পাওয়া যায় এবং ব্যক্তিগত বৈঠকখানা যে চণ্ডীমণ্ডপের ঐতিহ্যকে ক্ষুণ্ণ করেছে সে ইঙ্গিতও আছে উপন্যাসে—

"তিরিশ বছর পূর্বেও এই আটচালা ও চণ্ডীমণ্ডপ এমনই ভাবে নিত্য সন্ধ্যায় জমজমাট হইয়া উঠিত। গ্রাম্য বিচার হইত, সংকীর্তন হইত, পাশা দাবাও চলিত। কালগতিকে ধুলার অবলেপনে অবলুপ্তপ্রায় বহু বসুধারার চিহ্ন এখনও শিবমন্দিরের দেওয়ালে এবং চণ্ডীমণ্ডপের থামের গায়ে অঙ্কিত দেখা যায়। তখন গ্রামে ব্যক্তিগত বৈঠকখানা বা বাহিরের ঘর কাহারও ছিল না। জগন ডাক্তারের পূর্বপুরুষ-পিতামহই কবিরাজ হইয়া বাহিরের ঘর বা বৈঠকখানার পত্তন করিয়াছিল...কবিরাজ, ঔষধালয় ও বৈঠকখানা তৈয়ারী করিয়া ঔষধালয় খুলিল। এবং সেখানে পান তামাকের সাচ্ছল্যে মজলিস জমাইয়া চণ্ডীমণ্ডপের মজলিসে ভাঙন ধরাইয়া দিল"[২৩]। তারপর ক্রমে ক্রমে গ্রামের অনেকের বাড়িতেই একটা করে বাইরের ঘরের পত্তন হয়েছে

এবং সেগুলিকে কেন্দ্র করে সমগ্র গ্রামজুড়ে এখন ছোট ছোট অনেকগুলি মজলিস বসে।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে জীবনবোধের যে পরিবর্তন দেখা গিয়েছিল তার ঢেউ পল্লীজীবনকেও দোলায়িত করেছিল। উপন্যাসে সেকাল-একালের দ্বন্দ্ব ঘনীভূত হয়েছে চণ্ডীমণ্ডপকে ঘিরে। গ্রামের পাঠশালার পণ্ডিত দেবু যেমন একদিকে চেয়েছে চণ্ডীমণ্ডপের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনতে অন্যদিকে তেমনি পাঁচ গায়ের লোকের কাছে সম্মানীয় ন্যায়রত্ন মহাশয়ের পৌত্রবিশ্বনাথ দেবুকে চণ্ডীমণ্ডপ-এর পরিবর্তে কো-অপারেটিভ ব্যাংক খোলার পরামর্শ দিয়েছে। লেখক দেখিয়েছেন গ্রামীণ সভ্যতার নিয়ামক সজীব চণ্ডীমণ্ডপ এখন মৃতপ্রায়। একসময় চণ্ডীমণ্ডপের বন্ধনে শাসন ও ক্ষমতা ছিল। এখন সেই বন্ধন ছিন্ন। মানুষ তাই বিপর্যস্ত ও দিকভ্রান্ত। উপন্যাসে দেবুর চোখ দিয়ে দেখানো হয়েছে কিভাবে গ্রামীণ সমাজের প্রাণশক্তি চণ্ডীমণ্ডপের মজলিস ভেঙে যাচ্ছে—"গ্রামের কেহই কাহাকেও মানেনা সামাজিক আচার-ব্যবহার সব লোপ পাইতে বসিয়াছে। মানুষ মরিলে সহজে মরা বাহির হয় না, সামাজিক ভোজনে একই পংক্তিতে ধনী-দরিদ্র ভেদাভেদ দেখা দিয়াছে। সম্প্রতি কামার, ছুতার, বায়েন কাজ ছাড়িল; দাই, নাপিত চিরকেলে বিধান লঙ্ঘনে উদ্যত হইল। যাহার মাসে পাঁচ টাকা আয় সে দশ টাকা খরচ করিয়া বাবু সাজিয়া বসিয়াছে"[৪১]।

"বিভূতিভূষণে চণ্ডীমণ্ডপের যে চকিত রূপ উদ্ভাসিত তাতে সনাতনী ধারার প্রকাশ—তারাশঙ্করে বিবর্তনের উঁচু-নিচু রেখা"[২৮]—মন্তব্যটি "গণদেবতা" উপন্যাসের ক্ষেত্রে সার্থক হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসের নামই যেখানে "পল্লীসমাজ" সেখানে পল্লী সমাজের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ চণ্ডীমণ্ডপের প্রসঙ্গ থাকবে না সেটা ভাবায় বাহুল্য। সামাজিক অনুষ্ঠান বা যে কোনো ধর্মানুষ্ঠানের সাধারণ গৃহ হিসাবে ব্যবহৃত হত চণ্ডীমণ্ডপ। উপন্যাসে রমেশের বাবার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানের আয়োজন করতে দেখা যায় চণ্ডীমণ্ডপেই—

"কাঙ্গালীদের বস্ত্র দেওয়া হইবে—চণ্ডীমণ্ডপের ও ধারের বারান্দায় অনুগত ভৈরব ভট্টাচার্য থান ফারিয়া পাট করিয়া গাদা করিতেছিল"[২৯]। ষোড়শ অধ্যায়ে দেখা যায় রমাকে ঘটা করে দুর্গোৎসবের আয়োজন করতে। পুজোর প্রথম দিন থেকেই গ্রামের সকলকে ভোজন করানো হত। এই পূজোর সমস্ত আয়োজনই করা হত চণ্ডীমণ্ডপ ও চণ্ডীমণ্ডপ সংলগ্ন প্রাঙ্গণে। সম্ভ্রান্ত পরিবার বা প্রত্যেক জমিদার বাড়িতেই থাকত নিজস্ব চণ্ডীমণ্ডপ যেখানে গ্রাম্য-আলোচনার মজলিস বসত। এক সন্ধ্যায় তেমনই এক মজলিস বসেছিল বেণীর চণ্ডীমণ্ডপে।

শরৎচন্দ্রের "রসচক্র" গল্পেও চণ্ডীমণ্ডপের উল্লেখ পাওয়া যায়। "বিরাজ বৌ" উপন্যাসে চণ্ডীমণ্ডপ হয়ে উঠেছে অবসর যাপনের স্থান। উপন্যাসে নীলাম্বরকে চণ্ডীমণ্ডপে বসে তামাক খেতে দেখা যায়।

সুতরাং, বলা যেতে পারে চণ্ডীমণ্ডপ শুধু একটা সুদৃশ্য মণ্ডপ বা গ্রামের মধ্যে উৎকৃষ্ট সর্বসাধারণের গৃহ নয়। "চণ্ডীমণ্ডপ একটা ইনস্টিটিউশন বিশেষ"[৩০]। দেবী চাণ্ডী যখন সাধারণ হিন্দু সমাজের দেবী চণ্ডীরূপে পূজিত হতে শুরু করেন এবং রাত জেগে নানা স্থানে মঙ্গলচণ্ডীর গান গাওয়া শুরু হয় তখন থেকেই চণ্ডীমণ্ডপের উদ্ভব। অষ্টাদশ শতক থেকে উনিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত চণ্ডীমণ্ডপ গ্রামীণ সংস্কৃতির আধার ছিল কিন্তু উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে গিয়ে চণ্ডীমণ্ডপ গুরুত্বহীন হয়ে উঠতে থাকে। তবে চণ্ডীমণ্ডপের ধারণা বাঙালির মানসপট থেকে কোনোদিনই মুছে যায়নি। চণ্ডীমণ্ডপের ইতিহাস গ্রাম্য সংস্কৃতির, গ্রাম্য জীবনের ইতিহাস।

তথ্যসূত্র :

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। "কালান্তর"। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা : ৩

২। ঘোষ, বিনয়। "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব"। অরুণা প্রকাশনী। ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬। আশ্বিন ১৩৮৬। পৃষ্ঠা : ১৪৭

৩। বসু, রাজশেখর। "চলন্তিকা : আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান"। এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। সপ্তম সংস্করণ। পৃষ্ঠা : ৪৪৮

৪। ক্ষেত্র গুপ্ত। "বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস"। গ্রন্থনিলয়। ৫১/১ বি। পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯। জুলাই ২০০৭। পৃষ্ঠা : ১৩৩

৫। সেন, সুকুমার। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)"। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড। ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা ৭০০০০৯। মে ২০১৫। পৃষ্ঠা : ৪১২

৬। ক্ষেত্রগুপ্ত। "বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস"। গ্রন্থ নিলয়। ৫১/১ বি পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০০০৯। জুলাই ২০০৭। পৃষ্ঠা : ১৩৩

৭। ঘোষ, বিনয়। "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব"। অরুণা প্রকাশনী। ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬। আশ্বিন ১৩৮৬। পৃষ্ঠা : ১৪৯

৮। সেন, সুকুমার। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)"। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০০০৯। মে ২০১৫। পৃষ্ঠা : ৪১৩

৯। ক্ষেত্রগুপ্ত। "বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস"। গ্রন্থনিলয়। ৫১/১ বি পটুয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০০০০৯। জুলাই ২০০৭। পৃষ্ঠা : ১৩২

১০। প্রাগুক্ত।
১১। সেন, সুকুমার। "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)"। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড।৪৫ বেনিয়াটোলা লেন। কলকাতা-৭০০০০৯। মে ২০১৫। পৃষ্ঠা : ৪১৩
১২। ঘোষ, বিনয়। "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব"। অরুণা প্রকাশনী। ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬। আশ্বিন ১৩৮৬। পৃষ্ঠা : ১৪৭
১৩। চক্রবর্তী, মহাদেব। "আসামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)"। প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স। ৩৭ এ কলেজ স্ট্রীট। কলকাতা-৭৩। পৃষ্ঠা : ১০৪৪
১৪। ঘোষ, বিনয়। "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব"। অরুণা প্রকাশনী। ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬। আশ্বিন ১৩৮৬। পৃষ্ঠা : ১৫৬
১৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। "নীলগঞ্জের ফালমন সাহেব"। বিভূতি প্রকাশন,২২ এ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট। কলিকাতা-১২। আশ্বিন-১৩৬৬। পৃষ্ঠা : ১০২
১৬। প্রাগুক্ত। পৃষ্ঠা : ১০২
১৭। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প"। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭৩। আষাঢ়-১৩৭১। পৃষ্ঠা : ১৭২
১৮। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ১৭৫
১৯। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প"। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭৩। আষাঢ়-১৩৭১। পৃষ্ঠা : ১১১
২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ। "বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প"। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭৩। আষাঢ়-১৩৭১। পৃষ্ঠা : ২৫
২১। তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ। "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১৪০৪"। বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড। কলকাতা। ১৯৯৭। পৃষ্ঠা : ৩৯
২২। মুখোপাধ্যায়, তারাপদ। মলাট। "গণদেবতা : পঞ্চগ্রাম"। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১০,শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০৭৩। ফাল্গুন ১৪১৬।
২৩। প্রাগুক্ত।
২৪। বন্দ্যোপাধ্যায় তারাশঙ্কর। "গণদেবতা : পঞ্চগ্রাম"। মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ। ১০ শ্যামাচারণ দে স্ট্রীট। কলকাতা-৭০০০৭৩। পৃষ্ঠা : ৩
২৫। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪২
২৬। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ২৩
২৭। প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা : ৪১
২৮। মজুমদার, উজ্জ্বল কুমার (সম্পাদিত)। "তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য"। মডার্ণ বুক এজেন্সি ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৭৩। চৈত্র ১৩৬৫। পৃষ্ঠা : ২৩৪

২৯। চট্টোপাধ্যায়, শরৎচন্দ্র। "পল্লীসমাজ"। স্পেকট্রাম অফসেট। ৫ বি কুণ্ড লেন, কলকাতা-৭০০০০৩৭। ফাল্গুন ১৪২৩। পৃষ্ঠা : ৭

৩০। ঘোষ, বিনয়। "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব"। অরুণা প্রকাশনী। ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা-৬। আশ্বিন ১৩৮৬। পৃষ্ঠা : ১৫৭

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী :

১. উজ্জ্বল কুমার মজুমদার (সম্পাদিত), "তারাশঙ্কর : দেশ কাল সাহিত্য", মডার্ণ বুক এজেন্সি, ১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭০০০০৭৩।

২. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, "গণদেবতা : পঞ্চগ্রাম", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০৭৩।

৩. তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ (সম্পাদিত), পশ্চিমবঙ্গ, "তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় সংখ্যা ১৪০৪", বসুমতি কর্পোরেশন লিমিটেড, কলকাতা।

৪. বিনয় ঘোষ, "বাংলার লোকসংস্কৃতির সমাজতত্ত্ব", অরুণা প্রকাশনী, ৭ যুগলকিশোর দাস লেন, কলকাতা ৬।

৫. বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়,"বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ গল্প", মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩।

৬. মহাদেব চক্রবর্তী, 'আসামের ইতিহাস (দ্বিতীয় খণ্ড)", প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, ৩৭ এ কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩।

৭. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, "কালান্তর", বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা।

৮. রাজশেখর বসু, "চলন্তিকা : আধুনিক বঙ্গভাষার অভিধান", এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪, বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট, কলিকাতা-১২, সপ্তম সংস্করণ।

৯. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, "পল্লীসমাজ",স্পেকট্রাম অফসেট, ৫ বি কুণ্ড লেন, কলিকাতা-৭০০০৩৭।

১০. সুকুমার সেন, "বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (প্রথম খণ্ড)", আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০৯।

১১. ক্ষেত্রগুপ্ত "বাংলা সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাস", গ্রন্থনিলয়, ৫১/১ বি পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০০০০৯।

লেখক পরিচিতি :

এম. ফিল. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

বাংলা সাহিত্যে রাধা : এক চিরন্তন মানবীসত্তা

মাধবী বিশ্বাস

সারাংশ : "রাই জাগো গো
জাগো শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই" (প্রভাতী সংগীত)

বাঙালির প্রভাত হয় 'শ্যামের মনমোহিনী বিনোদিনী রাই'কে জাগিয়ে। শ্যাম এর মনমোহিনী রাই বা রাধিকা বাঙালির প্রিয়। তাই বাঙালি দিনের শুরুতেই পবিত্র রাই বা রাধার নাম উচ্চারণ করে। বলা যায় কৃষ্ণের থেকেও রাধা বাঙালির কাছে বেশি আদৃত। রাধা এতটাই প্রিয় যে বাঙালির ঘরের মেয়ের নামকরণের ক্ষেত্রেও ভাবা হয় রাই, রাধিকা, রাধা, বিনোদিনী ইত্যাদি নামগুলি। আধুনিক যুগের সোশ্যাল মিডিয়ার সদা ব্যস্ত জেন-ওয়াই এর কাছেও রাধা প্রিয়। তাই রাধাকৃষ্ণ প্রেম বিশেষত কৃষ্ণপ্রেমে পাগলিনী রাধাকে নিয়ে তৈরি নিত্যনতুন গানে মজে আধুনিক প্রজন্ম। আধুনিক যুগের সাহিত্যের ক্ষেত্রেও দেখা যায় কবিতা, গল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি নানাক্ষেত্রে রাধা প্রসঙ্গ।

এক দৈবীসত্তা যাঁকে বলা হয় গোলকের শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর শক্তি তথা লক্ষ্মীর অবতার তাঁকে নিয়ে মধ্যযুগ থেকে শুরু করে আজকের প্রযুক্তিতে উন্নত সমাজ ও সাহিত্যে এত চর্চা দেখে বিস্মিত হতে হয়। হিন্দু ধর্মে ও সাহিত্য সীতার মত পতিপরায়ণা,দ্রৌপদীর মতো বীর নারী এছাড়াও এরকম অজস্র নারী চরিত্রের নিদর্শন থাকা সত্ত্বেও রাধা চরিত্রটির জনপ্রিয়তার মূল কারণ চরিত্রটির মানবিক গুণ। তিনি সর্বকালের প্রেমিকা নারীর প্রতিমূর্তি। আসলে নারীর জীবনে প্রেমই তাকে রাধা করে তোলে। তাই প্রেমিকা রাধার দুঃখ-বেদনার সাথে সাধারণ মানুষ সহজেই নিজেকে একাত্ম করে নেয়। সামাজিক দৃষ্টিতে পরকীয়া প্রেম অপরাধ হলেও রাধার পরকীয়া প্রেম উপেক্ষিত হয়নি। কারণ, রাধা শুধুমাত্র একটি নাম বা দৈবী চরিত্র নয়। বলা যায় রাধা একটি প্রতিষ্ঠান বা মতবাদ। রাধা আসলে হৃদয়ের অনুভূতি। রাধা বলতে বোঝায় প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ স্বীকার করার বিনিময়ে বঞ্চনা ও অসহায়তা প্রাপ্তি। আধুনিক কবি রাধার বিষয়ে বলতে গিয়ে বলেছেন—"Mrs. Radha"। হ্যাঁ, রাধাকে একজন সাধারণ নারী হিসেবেই দেখেছেন আধুনিক সাহিত্যিকগণ। তাই বাংলা সাহিত্যে রাধা চরিত্রটিকে নিয়ে চর্চার অন্ত নেই।

মূল শব্দ : রাধা-রাধাভাবনা-চিরন্তন মানবীসত্তা

মূল প্রবন্ধ : বাঙালি সমাজ ও জীবনের এক অতি প্রিয় ও বহুচর্চিত নাম

রাধা। বৈষ্ণবীয় ধর্মসাধনা থেকে বাংলা সাহিত্যের নায়িকা সবেতেই রাধা। আজও বাঙালির ঘরে ভিক্ষা নিতে আসা ভিখারিটি বলে 'জয় রাধে'। আবার বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যযুগে সমাজ ও সাহিত্যে প্রভাব বিস্তারকারী এক অন্যতম ব্যক্তিত্ব শ্রীচৈতন্যকে বলা হয় 'রাধাভাব সমন্বিত'। যাঁর প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে জোয়ার আসে। বৈষ্ণব পদাবলীর চর্চা প্রবলভাবে হয়। এই বৈষ্ণব পদাবলীর প্রধান অবলম্বন রাধা ও কৃষ্ণ। এখানে কিন্তু কৃষ্ণের পরিবর্তে রাধারই শ্রেষ্ঠত্ব। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রধান নিয়ন্ত্রক, দুষ্কৃতের বিনাশ ও ধর্মের স্থাপনার জন্য যুগে যুগে আবির্ভূত হন যিনি সেই আরাধ্য কৃষ্ণের পরিচয় যাঁর নামের দ্বারা হয় তিনি শ্রীরাধিকা। রাধা কৃষ্ণের যুগল নাম উচ্চারণ করতে গিয়ে আমরা বলি 'রাধাকৃষ্ণ'। কখনই কৃষ্ণ-রাধা বলি না। বাঙালির কাছে রাজনৈতিক বোধসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ও বিশ্বরূপ প্রদর্শনকারী ভগবান কৃষ্ণের বদলে বাঁশি বাজানো রাধার প্রেমিকারূপী কৃষ্ণই অধিক সমাদৃত। বাঙালির কাছে কৃষ্ণ তো রাধার রমণ। শুক-সারির দ্বন্দ্বে আছে—

> "শুক বলে, আমার কৃষ্ণ মদন মোহন।
> সারী বলে আমার রাধা বামে যতক্ষণ।" (গোবিন্দ অধিকারীর গান)

রাধাই সব। রাধা বিনা কৃষ্ণ শুধুই 'মদন'। 'মদনমোহন' নন। কৃষ্ণের মাথায় যে ময়ূর পাখা তাতেও রাধার নাম। কৃষ্ণ জগতের গুরু। আর রাধা হলেন বাঞ্ছাকল্পতরু। অর্থাৎ, কৃষ্ণের মাহাত্ম্য যেন রাধার পাশে কিছুটা ম্লান।

কিন্তু কে এই রাধা? কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে অর্জুনকে বিশ্বরূপ দর্শন করান যিনি, ভীষ্মের মত ব্যক্তি যাঁর কাছে নত হন সেই পরমপুরুষ কৃষ্ণের নামের সাথে যে নামটি একসাথে উচ্চারিত হয় তাঁর পরিচয় তিনি কৃষ্ণপ্রাণাধিকা। তবে কৃষ্ণের নামের সাথে রাধা নামের যোগসূত্র খুব প্রাচীন নয়। মহাভারতে যে রাধার নামোল্লেখ আছে তিনি কর্ণের পালিতা মাতা অধিরথ জায়া। কৃষ্ণের প্রেমিকা নন। কোনও অভিজাত পুরাণেও রাধাকৃষ্ণ লীলার উল্লেখ নেই। প্রাচীন সাহিত্যের মধ্যে মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে রচিত ও হালের সংকলিত 'গাথাসপ্তশতী'তে রাধাকৃষ্ণলীলার প্রথম স্পষ্ট উল্লেখ পাওয়া যায়—

> "মুহ মারুএণ তং কণহ গোরঅং রাহিআএঁ অবনেন্তো।
> এতাণ বল্লবীণং অণ্ণাণ বি গোরঅং হরসি।"[১]

এখানে রাধার নামোল্লেখের পাশাপাশি অন্যান্য গোপিনীদের তুলনায় রাধার উৎকর্ষ প্রকাশিত হয়েছে। যদিও এর আগে বিভিন্ন লোকগানে কৃষ্ণ ও কোনও

এক অনামী গোপিনীর প্রেমকথা প্রচলিত ছিল। পরবর্তীকালে রাধাই সেই গোপিনীর স্থান নেন। 'গাথাসপ্তশতী'র পরে শৌরসেনী প্রাকৃত ও অপভ্রংশে রচিত ছন্দগ্রন্থ 'প্রাকৃতপৈঙ্গল' এ নৌকালীলার প্রসঙ্গ ও পৌরাণিক দেবী হিসেবে রাধা চরিত্রকে স্থান দেওয়া হয়েছে। এরপরে 'সুভাষিতরত্নকোষ' ও 'সদুক্তিকর্ণামৃত' নামক সংস্কৃত শ্লোক গ্রন্থেও রাধার উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও রাধাকৃষ্ণলীলার গান কাব্যের আকারে আমরা প্রথম পাচ্ছি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ' এ। স্বয়ং শ্রী চৈতন্যদেব এই কাব্য আস্বাদন করতেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মেও গ্রন্থটি আদৃত হয়। গ্রন্থটিতে রাধার শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশিত হয়েছে। তবে জয়দেব রাধাকে দেবীত্বের মর্যাদা দেননি। জয়দেবের পরে রাধা চরিত্রের রূপকার হলেন—বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস। বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের রাধা বাংলা সাহিত্যের প্রথম পরিপূর্ণা মানবী চরিত্র। আবার বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস তাঁদের পদগুলিতে রাধা চরিত্রটিকে যেভাবে উপস্থাপন করেছেন তাতেও রাধা চরিত্রের মানবী রূপটিই প্রকাশিত হয়েছে। যে চরিত্রের বিকাশ হয়েছে ধীরে ধীরে। এই মর্তমানবী রাধার সাথে কোনও দৈবী মহিমার যোগ নেই। যদিও চৈতন্যের আবির্ভাবের পরবর্তী সময়ে পদাবলীতে চরিত্রটিতে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া লাগে। মধ্যযুগে বৈষ্ণব পদাবলীর ধারাস্রোত অতিক্রম করে এসে আধুনিক যুগের সাহিত্যের বিভিন্ন ধারাতে রাধা চরিত্রটি নানাভাবে ও নানারূপে বারবার এসেছে। তবে, একালের সাহিত্যিকগণ রাধা চরিত্রের আধ্যাত্মিক দিকের তুলনায় মানবী রাধিকা চরিত্রটির দ্বারা বেশি আকর্ষিত হয়েছেন। তাইতো আধুনিক যুগের কবির কলমে তিনি 'Poor Lady of Braja' (মধুসূদন দত্ত)। তিনিই আবার 'মালতীবালা বালিকা বিদ্যালয়' (জয় গোস্বামীর কবিতা) এর প্রেমিকা মেয়েটি। রাধা নামের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে ইতিহাস, পৌরাণিক চেতনা ও দর্শন। বাংলাসাহিত্যে রাধা শুধুমাত্র একজন দেবী নন। তিনি একজন চিরন্তন মানবীর প্রতিমূর্তি। সর্বকালের প্রেমময়ী নারীসত্তার প্রতীক। বাংলা সাহিত্যের প্রথম মানবীসত্তা রাধা চরিত্রের দৈবীসত্তাকে বাদ দিয়ে তাঁর মানবিক রূপ তথা রাধা ভাবনা বাংলা সাহিত্যে কীভাবে রূপায়িত হয়েছে সেটিই আলোচ্য বিষয়।

আনুমানিক খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতকে জয়দেব তাঁর 'গীতগোবিন্দ' কাব্যে বারোটি সর্গে রাধাকৃষ্ণলীলার গান সর্বপ্রথম কাব্যের আধারে আমাদের উপহার দিয়েছেন। এখানেই প্রথম পূর্ণ কাব্যের নায়িকা চরিত্র হিসাবে রাধা চরিত্রকে পাওয়া যায়। যদিও গ্রন্থটিতে মানবীয় আধারে আধ্যাত্মিক রসের প্রকাশ হয়েছে কিন্তু জয়দেবই প্রথম রাধা চরিত্রকে নতুন রূপে উপস্থাপন করলেন। এই রাধাই পরবর্তীকালে সাহিত্যের এক অন্যতম চরিত্র। জয়দেবের পরবর্তী সময়ে বড়ু চণ্ডীদাস জয়দেবের

কাব্যের দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে আধ্যাত্মিক ছোঁয়া বর্জিত মানবী রাধাকে সাহিত্য নিয়ে আসেন। বড়ুর 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের রাধাই বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম একটি পূর্ণাবয়ব লৌকিক ও বাস্তবিক চরিত্র। তিনি এক চিরন্তন নারীসত্তার প্রতীক। কাব্যটিতে কবি কৃষ্ণের প্রতি বিরূপ নায়িকা রাধা থেকে কৃষ্ণ অনুরাগিণী রাধাতে পরিণত হবার এক মনস্তাত্ত্বিক রূপান্তর ঘটিয়েছেন। কাব্যে চরিত্রটি এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে শঙ্করীপ্রসাদ বসু 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যটিকে 'রাধাসর্বস্ব' বলেছেন। কাব্যে সাগর গোয়ালার ঘরে জন্ম ও পোদুমা মাতার কন্যা রাধার রূপের বর্ণনা কবি চমৎকারভাবে দিয়েছেন—

"তিনভুবনজনমনমোহিনী
রতিরসকামদোহিনী।।
শিরীষকুসুমকোঁঅলী।
অদভুত কনকপুতলী"।।[২]

কৃষ্ণ রাধার রূপের বর্ণনা শুনে মুগ্ধ হয়ে বড়ায়িকে দিয়ে রাধার জন্য প্রেমের উপহার অর্থাৎ ফুল, তাম্বুল পাঠিয়েছেন। কিন্তু রাধিকা সেই উপহার কেন নেবেন? তাঁর একটি সামাজিক পরিচয় আছে। তিনি আইহন পত্নী। তাঁর পতি সর্বাঙ্গ সুন্দর। ঘরে আছে এক শাশুড়ি। আইহন পত্নীর সামাজিক মর্যাদা বা সামাজিক শান্তি কোনও কিছুরই অভাব নেই। তাহলে তিনি কৃষ্ণের মত গোপালক বালকের প্রেমের প্রস্তাব গ্রহণ করবেন কেন? রাধার বক্তব্য—

"ঘরের স্বামী মোর সর্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণ দেহা।
নান্দের ঘরের গরু রাখোয়াল তা সমে কি মোর নেহা।।"[৩]

কিন্তু এই কৃষ্ণবিরূপা মেয়েটিই যে একদিন তার সামাজিক পরিচয়, লোক-লজ্জা, কূলমর্যাদাকে উপেক্ষা করে কৃষ্ণপ্রেমে মাতোয়ারা হয়ে উঠবে তা কে জানত? বড়ু চণ্ডীদাস সেই অসাধ্যসাধন করেছেন। আর এই কাজটি করতে গিয়ে তিনি রাধা চরিত্রের বিভিন্ন স্তর এঁকেছেন। তাম্বুলখণ্ডে যে রাধা কৃষ্ণের পাঠানো কর্পূর, ফুল 'পেলাইল পাএ' সেই রাধাই দান, নৌকা, ভার, ছত্র, যমুনা, হার,বাণ ইত্যাদি খণ্ডগুলির সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে বংশীখণ্ডে এসে বলেছে—

"কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি কালিনি নইকুলে।
কে না বাঁশি বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে।।
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশির শবদেঁ মো আউলাইলঅঁ রান্ধন।।[৩]

রাধা চরিত্রের এই অভিনব রূপান্তর আমাদের অবাক করে। মানবচরিত্র সম্পর্কে জ্ঞান বা নারী মনস্তত্ত্বে ওয়াকিবহাল বড়ু চণ্ডীদাস রাধা চরিত্রের যে

রূপান্তর ঘটিয়েছেন তা অভিনব। এ রাধা কোনও দেবীর অবতার নন। এই রাধা তো আমাদের ঘরের মেয়ে। যে সামাজিক সংস্কার সম্পর্কে সচেতন। যার অনুভূতির বদল ঘটে। তাম্বুলখণ্ডের পরে দানখণ্ডে দানীরূপী কৃষ্ণ নানাভাবে রাধার আলিঙ্গন প্রার্থনা করলে রাধা তাঁকে নানা উপায়ে বিরত করতে চান। কখনও স্বামী আইহনের বীরত্বের কথা বলেন। আবার কখনও দুজনের সামাজিক সম্পর্কের কথা মনে করিয়ে দেন। একজন হিন্দু ঘরের মেয়ে হওয়ার তাঁর মনে সতীত্ববোধ গাঁথা। তাই কৃষ্ণের প্রস্তাবে তিনি রেগে গিয়ে বড়ায়িকে তাড়িয়ে দেবেন তা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এখানেই চরিত্রটির অগ্নিদীপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু নানাভাবে কৃষ্ণকে বিরত করতে ব্যর্থ হয়ে শেষপর্যন্ত তাঁকে কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতেই হয়। আত্মদান করতে হয়। তবে দানখণ্ডে কৃষ্ণের কাছে আত্মদানে ছিল আত্মরক্ষার মানসিকতা। সেখানে ছিল না হৃদয় সম্পর্কের বালাই। তাই আত্মদানের পূর্বে তিনি কৃষ্ণকে দিয়ে প্রতিজ্ঞা করিয়ে দেন—

"মাথার মুকুট কাহ্নাঞিঁ ভাগি জুণি জাএ।
যোড় হাথ করি কাহ্ন বোলোঁ তার পাএ।।
ছিগি জুণি জাএ কাহ্নাঞিঁ সাতেসরী হারে।
আড় নঠ না করিহ সব আলংকারে।।"[৫]

দেখো হার না ছেঁড়ে, মুকুটে না ভাঙে, অলংকার না নষ্ট হয়, শরীরে আঘাত না পায়। সুতরাং রাধার এই আত্মদান কামোন্মত্ত পুরুষের হাত থেকে অসহায় এক নারীর আত্মরক্ষা। এই আত্মদানে তিনি অপমানে, লজ্জায়-কান্নায় ভেঙে পড়েন। তাই বড়ায়িকে কৃষ্ণের বর্বর আচরণের কথা তিনি অকপটে বলে দেন। তবে নৌকাখণ্ডে রাধার মানসিক ও চারিত্রিক পরিবর্তন দেখা যায়। এই খণ্ডেও কৃষ্ণের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয় তাঁকে। কিন্তু এই খণ্ডে কৃষ্ণের সাথে মিলনে রাধার মধ্যে ভয় ও লজ্জার সঞ্চার হয়েছে। কবির ভাষায়—

"রাধার মনত তবেঁ জাগিল মদন।"[৬]

প্রথম দেখসুখ উপলব্ধি করে কৃষ্ণের প্রতি তাঁর মনে প্রেম সঞ্চার হয়েছে। যে রাধা দানখণ্ডে বড়ায়ির কাছে কৃষ্ণের বর্বর আচরণের কথা অকপটে বলে দেন সেই রাধাই নৌকাখণ্ডে এসে বড়ায়ির কাছ সব কথা গোপন করেন। কারণ, কৃষ্ণের আচরণ আর তাঁর কাছে অত্যাচার বলে মনে হয়নি। দৈহিক মিলনে কৃষ্ণের প্রতি যে প্রেমের সঞ্চার রাধার হৃদয়ে হয়েছে তা থেকেই এসেছে লজ্জাবোধ। তাই আত্মগোপনের চেষ্টা। মানব চরিত্র এমনই বিচিত্র। রাধা চরিত্রের এই পরিবর্তনই তাকে মানবী করে তোলে। মানুষের জীবনে দৈহিক চাহিদা স্বাভাবিক ব্যাপার। আর এই চাহিদাকে অস্বীকার করেননি বড়ু চণ্ডীদাস। কোনওরকমে

পূর্বরাগ ছাড়াই নপুংসক স্বামীর স্ত্রী রাধার মনে প্রেমের সঞ্চার ঘটিয়েছে। তবে দেহাশ্রিত প্রেমকে তুলে ধরায় কাব্যটির বিরুদ্ধে অশ্লীল অভিযোগ আসলেও এই দেহবোধের জন্যই রাধা একজন মানবী হয়ে উঠেছে। বড়ুর রাধিকা একজন সাধারণ মানুষ না হলে দৈহিক মিলন তার চারিত্রিক ও মানসিক পরিবর্তন ঘটাতে পারত না। তাই ভার ও ছত্র খণ্ডে প্রেমিকা রাধা বেশ পরিণত। মিলনের আশা দিয়ে তিনি কৃষ্ণকে দিয়ে দধি-দুধের ভার বহন করান। ছত্র ধারণ করান। এরপর বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা সকলের থেকে আলাদা করে কৃষ্ণকে উপভোগ করতে চেয়েছেন। তাঁর মধ্যে দেখা দিয়েছে মান। প্রেমের এক পরিণত অবস্থা হল মান। যা অধিকারবোধ থেকে জন্মায়। বৃন্দাবনখণ্ডে রাধা সেই মান পর্যায়ে উপনীত হয়েছেন। তবে কালীয়দমন খণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধার আর্তি অনাবৃত হয়ে সকলের সামনে প্রকাশিত হয়েছে। কালীয়ানাগের বিষে কৃষ্ণ জর্জরিত হলে রাধা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি ভুলে বিলাপ করে বলেছেন—

"কি করিব ধন জন জীবন ঘরে।
কাহ্ন তোহ্মা বিণি সব নিফল মোরে"।[৭]

বস্ত্র, যমুনা, হার খণ্ডে কৃষ্ণের প্রতি রাধাকে বিরূপ মনে হলেও তা আসলে মানেরই পর্যায়। আর মান হল প্রেমের গভীর পর্যায়। বংশীখণ্ডে রাধার প্রেম পরিণতি লাভ করেছে। দেখা দিয়েছে বিরহ ও আকুলতা। কৃষ্ণের বাঁশি মধুর শব্দে রাধার প্রতিক্রিয়া—

"বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী"।।[৮]

কৃষ্ণের বাঁশির শব্দে বিরহবেদনায় কাতর রাধিকা চুরি করেন কৃষ্ণের বাঁশিটি। এরপরে রাধাবিরহ অংশে কৃষ্ণের প্রতি রাধার বিরহ চরম আকার নেয়। শয়নে-স্বপ্নে-জাগরণে সবেতেই কৃষ্ণ। তাঁর কাতর আর্তনাদ—

"চতুর্দ্দিশ চাহোঁ কৃষ্ণ দেখিতেঁ না পাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ।।"[৯]

কৃষ্ণ বিনা রাধার জীবন অসাড়। তাই রাধা গজমুক্তার হার ছিঁড়ে ফেলতে চান। মুছে ফেলতে চান তাঁর সিঁথির সিঁদুর। যোগিনী হয়ে দেশান্তরে যেতে চান।

একসময়ে নিজের অঙ্গের প্রতি কৃষ্ণের দৃষ্টি যাঁর কাছে পাশবিক বলে মনে হয়েছিল সেই রাধাই কৃষ্ণকে ছাড়া নিজের ধনযৌবনকে তুচ্ছ বলে মনে করেছেন। এই রাধা পরবর্তী সময়ের মহাভাবময়ী রাধা নন। তিনি একজন সাধারণ মেয়ে। পুরুষের কাছে যার অনুভূতি মূল্যহীন। একসময়ে যে নারীকে তীব্রভাবে কামনা

করে তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাকে ভোগ করেছে এক পুরুষ। পরবর্তীকালে সেই নারীহৃদয়ে ঐ পুরুষটির প্রতি অনুরাগ তীব্র আকার ধারণ করে তখন সেই নারীকে প্রত্যাখ্যান করে সেই পুরুষ। কোমল হৃদয়ের নারীর অনুভূতি এভাবেই অপমানিত হয়। তাই রাধার অনুভূতি তার একার অনুভূতি নয়। তিনি আমাদের ঘরের মেয়ের প্রতীক। তাঁর বিরহবেদনা শুধুমাত্র তাঁর একার না থেকে দেশ-কালের গণ্ডী ভেদ করে সর্বকালের মানব হৃদয়কে ছুঁয়ে যায়। তাই বড়ুর রাধিকা আধুনিক সাহিত্যিকের কাছে আকর্ষণীয়।

চণ্ডীদাসের পরে রাধা চরিত্র নির্মাণ করেছেন বিদ্যাপতি। তিনি রাধার বয়ঃসন্ধি থেকে মাথুরবিরহ পর্যন্ত এক পরিপূর্ণ চিত্র এঁকেছেন। রাধার বয়ঃসন্ধির পদগুলি রচনার ক্ষেত্রে তিনি পূর্ববর্তী সংস্কৃত ও প্রাকৃত কবিতার ধারা অনুসরণ করলেও সৌন্দর্য সৃষ্টির ক্ষেত্রে নিজের কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছেন। তাঁর রচিত পদগুলি বাংলায় রচিত না হলেও তা বাঙালির কাছে আদৃত। বিদ্যাপতি রচিত বৈষ্ণবপদের সংখ্যা প্রায় পাঁচশত এবং তাঁর রাধা বাঙালির প্রিয়। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিদ্যাপতির রাধা চরিত্রের মধ্যে তিনটি স্তর লক্ষ্য করেছেন—

১। বয়ঃসন্ধি

২। অভিসার-মিলনসম্ভোগ-মান

৩। মাথুর বা বিরহ

একজন বালিকার কিশোরী থেকে যুবতীতে পরিণত হওয়ার সময় তার শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনকে সুনিপুণভাবে তুলে ধরেছেন বিদ্যাপতি। শৈশব গত হয়ে নবযৌবনের আবির্ভাবে নিজের দৈহিক পরিবর্তন পুলকিত বিদ্যাপতির রাধা বলেন—

'আওল যৌবন শৈশব গেল।"[১০]

কৃষ্ণকে প্রথম দেখে রাধার দেহে ও মনে জোয়ার আসে। অভিসারের জন্য তিনি নিজের প্রিয় অলঙ্কারগুলি বর্জন করে। বিদ্যাপতির অভিসারিকা রাধা একান্তই মানবী। তিনি তাঁর প্রেমিক পুরুষকে পেতে ত্যাগ স্বীকার করেন। তবে বিদ্যাপতি তাঁর রাধাকে চূড়ান্ত দক্ষতায় এঁকেছেন বিরহের পর্যায়ে। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে—

'বিদ্যাপতির মাথুর বা বিরহের পদে রাধা চরিত্র সম্পূর্ণ হইয়াছে"[১১]

এই পর্যায়ে কৃষ্ণকে ছাড়া বৃন্দাবনে রাধার মনে হয়েছে—

"গোকুল-মাণিক কো হরি নেল"।[১২]

এখানে রাধা আমাদের পরিচিতি মানুষদেরই একজন। যিনি প্রিয়জনের বিচ্ছেদে পূর্বস্মৃতি মনে করে চোখের জল ফেলেন। বিদ্যাপতির বিরহিনী রাধার

কাতরতা কৃষ্ণের অভাবে ভোগবিলাসের অপূর্ণতার জন্য। তাই ভাদ্রমাসের বর্ষণমুখর রাতে সারা পৃথিবী প্রবল বর্ষণে প্লাবিত ও মেঘগর্জনে মুখরিত হলে রাধার মনে পড়ে প্রবাসী কৃষ্ণের কথা—

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভারা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর।।"[১৩]

বর্ষণমুখর পরিবেশে প্রিয়াসঙ্গবিহীন পরিবেশে বিরহে কাতর হন রাধা। এ প্রেম দেহসর্বস্ব হলেও প্রেমের গভীরতা তাতে লাবণ্য সঞ্চার করেছে। আবার ভাবসম্মিলনে রাধা হয়ে উঠেছেন প্রেম পুজারিনি। প্রিয় ফিরে এলে তাকে বরণ করবেন কীভাবে ভেবেছেন তিনি—

"পিয়া যব আওব এ মঝু গেহে
মঙ্গল যতহুঁ করব নিজ দেহে"।[১৪]

রাধার দেহসর্বস্ব প্রেম ভাবসম্মিলন পর্যায়ে দেবপুজার তুল্য হয়ে উঠেছে। বিদ্যাপতির রাধা ক্রমবিকশিত হয়েছেন। যে রাধা আমাদের বহু পরিচিত নারী।

বড়ু চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস চৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্বে এই তিনজন মানবী রাধাকে নিয়ে পদ রচনা করেছেন। তাঁদের রাধা রক্তমাংসের মানুষ। কিন্তু চৈতন্যের আবির্ভাবের পরে রক্তমাংসের মানবী রাধা আধ্যাত্মিকতার স্তরে উন্নীত হন। হয়ে ওঠেন পরমব্রহ্মের হ্লাদিনী শক্তি। রাধা ও কৃষ্ণের কোনও ভেদ নেই এই ধারণা থেকে আসে অচিন্ত্যভেদাভেদ তত্ত্ব। এই তত্ত্বের মূল কাণ্ডারী স্বয়ং চৈতন্যদেব। যিনি রাধাভাবসম্পন্ন ছিলেন। সুতরাং বোঝাই যাচ্ছে রাধার একটি তাত্ত্বিক রূপ গড়ে উঠল। তাই চৈতন্যের সমসাময়িক ও চৈতন্যের পরবর্তীকালের পদাবলীর রাধা পদকর্তাদের ইষ্ট দেবী। শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁর 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি রাধার গুণের কথা বলেছেন। চৈতন্য সমসাময়িক মুরারী গুপ্ত, বংশীবদন প্রমুখ এবং চৈতন্যের পরবর্তীকালে বলরাম দাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ শ্রীরাধার রূপ বর্ণনা করেছেন। তবে তা হয়ে উঠেছে বৈষ্ণবীয় প্রেমলীলা। তাতে রয়েছে আধ্যাত্মিকতার ছোঁয়া। অষ্টাদশ শতকের পদাবলীতেও মহাভাবময়ী রাধার ছবি।

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা থেকে বাংলা সাহিত্যে আনুষ্ঠানিকভাবে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। এই সময়ে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে বাঙালির সমাজজীবন ও সাহিত্যে এক বিপুল পরিবর্তন আসে। রামমোহনের উদ্যোগে সতীদাহ প্রথা ও অনান্য সামাজিক কুপ্রথার রদ হয়। বিদ্যাসাগরের

প্রচেষ্টায় বিধবা বিবাহের প্রচলনও নারী শিক্ষার বিস্তার হয়। এই ধরনের সামাজিক সংস্কারগুলি বাঙালির জনমানসে প্রভাব ফেলে। সমাজে লিঙ্গ বৈষম্যের কারণে পিছিয়ে পড়া শ্রেণি অর্থাৎ, নারী দুর্দশারও কিছুটা লাঘব হয়। এর পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে সৃষ্টি হয় মানবতাবাদের। এই মতবাদ কোনও দেবশক্তির বদলে মানুষকে প্রাধান্য দেয়। সাহিতেও মানবতাবাদের প্রভাব পড়ে। যার ফলে মধ্যযুগের দৈবী নির্ভর সাহিত্যের পরিবর্তে মানুষের কথাই প্রধান হয়ে উঠল। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ও দেশীয় কুপ্রথার বিরোধী নব্যবঙ্গ গোষ্ঠীর সৃষ্টি হল। পুরাতন ও নূতনের মধ্যে দ্বন্দ্ব ও তার মেলবন্ধনও ঘটতে থাকল। এইরকম সামাজিক পরিস্থিতিতে নব্য শিক্ষায় শিক্ষিত গোষ্ঠীর অন্যতম মধুসূদন দত্ত বাংলা সাহিত্যে আবির্ভূত হন। তিনি প্রাচীন ও নবীনের এক অসম্ভব মেলবন্ধন ঘটালেন সাহিত্যে। মানবতাবাদের প্রভাবেই তিনি বৈষ্ণব পদাবলীর রাধাকৃষ্ণ লীলার কৃষ্ণের পরিবর্তে মানবী গুণসম্পন্না রাধাকেই বেছে নিলেন তাঁর কাব্যের নায়িকা হিসেবে। রচিত হল 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্য। কাব্যটিতে রাধার স্বরূপ সম্পর্কে সহজেই ধারণা পাওয়া যায় রাজনারায়ণ বসুকে কবির লেখা চিঠি থেকে। ১৮৬০ সালের ২৪ শে এপ্রিল তিনি 'ব্রজাঙ্গানা' কাব্যটি সম্পর্কে লিখেছেন—

"...I have a small volume of odes in the press. They are all about poor old Radha and her বিরহ।"[১৫]

''poor old Radha'' শব্দগুলির মধ্যে দিয়েই বোঝা যায় যে তিনি কোনও তাত্ত্বিক রাধাকে নয় প্রেমে বঞ্চিতা এক সাধারণ নারীকে নিয়ে লিখেছেন। এছাড়াও তাঁর কাব্য নায়িকা রাধা সম্পর্কে বলতে গিয়ে আরও বলেছেন—

"I think you are rathr cold towards the poor lady of Braja. Poor man! when you sit down to read poetry, leave aside all religious bias. Besides, Mrs. Radha is not such a bad woman after all".[১৬]

মধুসূদন তাঁর রাধাকে 'Mrs. Radha' ও 'Poor lady of Braja' বলেছেন। এই শব্দগুলিই তাঁর রাধার পরিচয়। ব্রজের রাধার দুঃখ—বেদনা তথা মানবিক গুণই আধুনিক যুগের কবিকে কলম ধরিয়েছে 'ব্রজাঙ্গনা' লেখার জন্য। কাব্যের মোট আঠেরোটি বিরহ সঙ্গীতে কবি বিবাহিতা রাধার পরকীয়া প্রেমের জন্য সর্বস্ব ত্যাগের পরিবর্তে বঞ্চিত ও বেদনার্ত রূপকে তুলে ধরেছেন। মধুসূদনের সময়ে দেবতার জায়গা নিয়েছিল মানুষ। কবি নিজেও রামের পরিবর্তে রাবণের গুণগান করেছেন। অর্থাৎ কোনও দেবতার বদলে মনুষ্য গুণেই মুগ্ধ হয়েছেন তিনি। তাই তাঁর রাধা তো বৈষ্ণব পদাবলীর রাধা নন। এই রাধাতে কোনও তত্ত্ব নেই। আছে শুধু এক মানবীর প্রেম, বিরহ ও যন্ত্রণা। যা সর্বকালের নারীর

অনুভূতির সমান।

শুধুমাত্র মধুসূদনই নন পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে বর্তমান সময় পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানাভাবে রাধা এসেছেন কখনও পদাবলীর রাধা হয়ে কখনো আবার রাধার Concept হয়ে। রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং রাধাকৃষ্ণ প্রেমলীলা দ্বারা মুগ্ধ হয়ে ব্রজবুলী ভাষায় লেখেন 'ভানুসিংহের পদাবলী'। এই পদাবলীতে রাধার হৃদয় বেদনা ছুঁয়ে যায় আমাদের মনকে। 'ভানুসিংহের পদাবলী' ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আরও বেশ কিছু কবিতায়, প্রবন্ধে রাধার প্রসঙ্গ এসেছে। কবি তাঁর 'সোনার তরী' কাব্যগ্রন্থের 'বর্ষাযাপন' কবিতায় বলেছেন—

"সত্য করে কহ মোহে হে বৈষ্ণব কবি,
কোথা তুমি পেয়েছিলে এই প্রেমচ্ছবি,
কোথা তুমি শিখেছিলে এই প্রেমগান
বিরহ-তাপিত। হেরি কাহার নয়ান,
রাধিকার অশ্রু-আঁখি পড়েছিল মনে"?[১৭]

মানবী রাধার প্রেম ও বেদনা কবি অনুভব করতে সক্ষম হয়েছিলেন বলেই এরকম কবিতা রচনা করতে পেরেছেন। রবীন্দ্রোত্তরকালে আলক সরকার, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, শিবাশীষ মুখোপাধ্যায়, প্রমুখ কবি রাধাকে তথা রাধাভাবনাকে নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। যেখানে রাধাভাবের প্রেম বা মানবীয় প্রেমই মুখ্য। পূর্ণেন্দু পত্রী বড়ু চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' অবলম্বনে আধুনিক যুগের উপযোগী করে রচনা করেছেন 'রাধাকৃষ্ণর পদাবলী'। কাব্যটিতে মোট পাঁচটি খণ্ডে কবি রাধাকৃষ্ণের কাহিনিকে নতুন আঙ্গিকে প্রকাশ করেছেন। কাব্যের শুরুতে বড়াই এর মুখে রাধার রূপ বর্ণনা শুনে মুগ্ধ কৃষ্ণ বড়াই এর কাছে রাধাকে প্রার্থনা করে কর্পূর-গন্ধী পান এবং মল্লিকা, মালতী, যূথী ফুলের উপহার দিয়ে প্রেমের প্রস্তাব দিলে রাধা তা প্রত্যাখ্যান করেন। তবে এই কাব্যের রাধা সম্পূর্ণরূপে আধুনিকা ও ব্যক্তিত্বময়ী। তিনি বড়াইকে বলেছেন—

"তার সঙ্গে দেখা হলে বোলো
ভালোবাসা হাটে-হাটে ফেরি-করা
দই-দুধ ক্ষীর-ননী নয়।
ভালোবাসা স্বর্ণলতা
একটি গাছকেই শত আলিঙ্গনে ঘিরে
তার আত্মনির্মাণ ও আত্মসমর্পণ!"[১৮]

বনমধ্যে দানীরূপী কৃষ্ণকে রাধা বলেছেন—

"নারী তার নিজস্বতা, নিজের সংসার শ্রম,

উৎপাদন, উপার্জন, উন্নয়ন ইত্যাদির চেয়ে
পুরুষের সাময়িক মনোবিকারের
সুলভ সুখাদ্য হোক
এই ত প্রার্থনা?"[১৯]

এ যেন বর্তমান সমাজের কোনও সাধারণ মেয়ে। যে মেয়ে ব্যক্তিত্বপরায়ণা। এক বখাটে ছেলে তার প্রেমপ্রার্থী হয়ে পথরোধ করলে সে তাকে বাক্যবাণে তিরস্কার করেছে। কৃষ্ণ তার কাছে লম্পট। কারণ রাধার শরীর কৃষ্ণের মনে কামতৃষ্ণা জাগায়। কিন্তু রাধা উৎপাদন ও উপার্জন সক্ষম। সে কেন এক পরপুরুষের বিকৃত চাহিদা মেটাবে। আধুনিক আত্মপ্রত্যয়ী নারীর কিছু আদর্শ তাঁর মধ্যে রয়েছে। তাঁর কাছে ভালোবাসা স্বর্ণলতা। আর এই ভালবাসার স্বর্ণলতা তো স্বামী আয়ানরূপ একটি বৃক্ষকে আলিঙ্গন করে রয়েছে। তবে এই রাধারই অন্তরে একসময়ে কৃষ্ণের জন্য প্রেম জাগে। কালীদহের কালীয় এর অগ্নিবাষ্প থেকে বৃন্দাবনের ঘরে ঘরে মৃত্যু রুখতে কৃষ্ণ কালীয় এর দমন করলে কৃষ্ণের প্রতি রাধার প্রেমে জাগ্রত হয়। সর্বস্ব দিয়ে তিনি কৃষ্ণকে ভালোবাসেন। কৃষ্ণকে না পেয়ে বিরহকাতরা রাধার কাছে নিজের সাজানো সংসার লোহার বাসর বন্দীশাল' বলে মনে হয়েছে।

রাধা ও কৃষ্ণের প্রথম অনুরাগ মিলনে কাব্যটি শেষ হয়েছে। এই কাব্যে রাধা মরণাপন্নের উদ্ধারকর্তাকে ভালবেসেছেন। কাব্যের বিষয় পুরাতন হলেও পূর্ণেন্দু পত্রীর রাধা আধুনিক যুগের আধুনিক মনোভাবাপন্ন মেয়ে।

কবিতাই শুধু নয় আধুনিক উপন্যাসেও রাধা ও রাধা ভাবনা এসেছে। তারাশঙ্করের 'রাধা' উপন্যাস যার মধ্যে অন্যতম। উপন্যাসটিতে রাধা চরিত্রটি প্রত্যক্ষভাবে না থাকলেও রাধাভাবনা রয়েছে। উপন্যাসের কাহিনিতে মাধবানন্দের প্রতি মোহিনী প্রেম ও ঐশ্বর্য্যে মহাভাবময়ী রাধা হয়ে উঠেছে। মাধবানন্দ পরকীয়াবাদকে ব্যাভিচার মনে করে রাধাকে বাদ দিয়ে কংসারি শ্রীকৃষ্ণের আরাধনা করে বীর্যভাব ফিরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তিনি নারীসঙ্গ বর্জন করে সন্ন্যাস ব্রত অবলম্বন করেন। তাই মোহিনীর প্রেমকে প্রত্যাখ্যান করে তাকে আধ্যাত্মিক মার্গে স্থাপন করার জন্য পরামর্শ দেন—

"মানুষ তোমার কেউ নয়।...ভজনা তোমার গোবিন্দের। অন্য যাকে ভজতে যাবে মহাপাপ হবে।"[২০]

কিন্তু মোহিনী কোনও ঈশ্বরের নয় মানুষের আরাধনা করে। তার আরাধ্য প্রেম মাধবানন্দ। মোহিনীর দীক্ষাদাত্রী তাকে পথ দেখাতে বলেছিলেন—

"পাস না পাস তার জন্য প্রাণপাত করবি, মরবি, তখন আপনি আসবে ভগবান।"[২১]

এই মন্ত্রকে নিয়েই গোবিনজীর মঠ স্থাপনা করে মোহিনীর সাধনা শুরু হয়। মোহিনীর প্রেম পৌঁছায় রাধাবাদের কাছে। উপন্যাসের শেষ অংশে ষোলো বছর পরে প্যারেবাঈ এর রূপে এক নতুন মোহিনীকে আমরা পাই। প্যারেবাঈ বলেছে—

"...লোকে আমাকে বলে প্যারে, আমার মধ্যে তারা নাকি দেখে রাধাভাবের ছায়া; আমার সাধনাও সেই রাধাভাবের।"[২২]

ত্যাগে, প্রতীক্ষায় মোহিনী রাধা হয়ে উঠেছে। ষোলো বছর ধরে সে তার শ্যামের জন্য প্রতীক্ষা করেছে। তাঁর নির্দেশ পালনের জন্য আহত প্রেমিকের (মাধবানন্দের) সেবা করার সময়েও নিজের মুখ দেখায়নি। কিন্তু মোহিনীর প্রেমকে শেষপর্যন্ত উপেক্ষা করতে পারেননি মাধবানন্দ। মোহিনীর উদ্দেশ্য তাকে বলতে হয়েছে—

"তুমি রাধা-আমার রাধা!"[২৩]

এক সাধারণ নারীর প্রেম তার ধৈর্য্য ও ত্যাগের দ্বারা রাধার প্রেমের তুল্য হয়ে উঠেছে। আসলে নিজের সর্বস্ব দিয়ে প্রেম, প্রেমের জন্য সাধনা, প্রেমের জন্য বেদনা সবই রাধা নামের সঙ্গে সম্পর্কিত। তারাশঙ্করের 'রাধা' উপন্যাসের মোহিনীর প্রেম তাই রাধার প্রেম। এক মানবীর প্রেম।

'রাধা' উপন্যাসটি ছাড়াও তারাশঙ্করের 'রাইকমল' ও 'কবি' উপন্যাসে এবং 'রসকলি' ও 'বেদেনী' গল্পে রাধাভাবনা রয়েছে। দীপক চন্দ্রের 'যদি রাধা না হত', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রাধাকৃষ্ণ' উপন্যাস, গজেন্দ্রকুমার মিত্রের 'রাই জাগো রাই জাগো', 'সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের 'শ্রীমতী রাধার শেষ সংবাদ' ইত্যাদি নানা উপন্যাসে রাধা প্রসঙ্গে ও রাধা ভাবনার প্রেম নবরূপে এসেছে। বাংলা সাহিত্যে কথাসাহিত্য ছাড়াও নাটক, প্রবন্ধ ও লোকসাহিত্যেও রাধাভাবনা ও রাধা প্রসঙ্গ বারবার এসেছে। আসলে আধুনিক সাহিত্যিকগণ কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তিকে নয় এক মানবীয় প্রেম ও তার দুঃখ-বেদনা তথা অনুভূতি দ্বারা আলোড়িত হয়েছেন। তাই অন্য কোনও দৈবী চরিত্রের বদলে রাধাই তাঁদের কাছে আকর্ষক। তাইতো তাঁরা সেই রাধাকেই তাঁদের মত করে নির্মাণ করেছেন ও করে চলেছেন।

উপসংহার : রাধা আসলে বহুভাবনা মিশ্রিত একটি concept বা ধারণা। এই ধারণাগুলির মধ্যে একটি হল আধ্যাত্ম ভাবনা যা থেকে রাধার একটি তাত্ত্বিক রূপ গড়ে উঠেছে। এই ভাবনা অনুযায়ী রাধা হলেন কৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তি। আবার রাধাকে জীবাত্মাও বলা হয়। যিনি পরমাত্মার প্রতি গমন করেন। গৌড়ীয় বৈষ্ণবেরা অবশ্য রাধাকৃষ্ণের অচিন্ত্য ভেদের কথা বলেছেন। এই ধারণাকে সমৃদ্ধ করেন শ্রীচৈতন্য। এই ধারণা অনুযায়ী রাধাকে বাদ দিয়ে মাধব অপূর্ণ। রাধার তাত্ত্বিক ধারণার সূত্রপাত চতুর্দ্দশ থেকে পঞ্চদশ শতাব্দী এবং চূড়ান্ত

বিকাশ ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্তীকালে।

তাত্ত্বিক ভাবনার পাশাপাশি রাধার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে প্রেমভাবনা। রাধার তাত্ত্বিক রূপ প্রকাশের অনেক আগেই লোক কাহিনি ও লোকগাথায় এই ভাবনা প্রচলিত ছিল। এই ভাবনা অনুযায়ী রাধা প্রেমে বঞ্চিত হতভাগ্য নারীর প্রতীক। যে নারীর স্বামী থাকা সত্ত্বেও সমাজ-সংস্কার সবকিছু বিসর্জন দিয়ে পরপুরুষকে ভালবাসে। কিন্তু প্রতিদানে বেদনা আর যন্ত্রণা পায়। কৃষ্ণবিহীন বেদনায় জর্জরিত রাধার অনুভূতি বাঙালির মনকে আকৃষ্ট করে। ধর্ম ও দর্শনের পাশাপাশি রাধার প্রেমিকাসত্তা তথা মানবীসত্তা বাঙালী মনকে টানে। তাই আধুনিক যুগে এসেও রাধাকে নিয়ে চর্চা হয়। রচিত হয় সাহিত্য।

তথ্যসূত্র :

১। গিরি, সত্যবতী। বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ : দে'জ পাবলিকেশান, ২০১৭। পৃষ্ঠা নং : ৪১

২। ভট্টাচার্য, অমিত্রসূদন। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৮। পৃষ্ঠা নং : ২০২

৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ২১১

৪। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৩৮০

৫। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ২৭৯

৬। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ২৯৬

৭। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৩৩৯

৮। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৩৮৬

৯। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৪১৮

১০। বন্দ্যোপাধ্যায়, অসিত। বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড)। ১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা পৃষ্ঠা নং : ৭০০০৭৩: মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড, ১৯৮২। পৃষ্ঠা নং : ৪১৪

১১। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৪১৯

১২। গিরি, সত্য। বৈষ্ণব পদাবলী। ৫৫ ডি, কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০০৯ : রত্নাবলী, ২০১০। পৃষ্ঠা নং : ৩০৬

১৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৩১২

১৪। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৩২০

১৫। দত্ত, মধুসূদন। মধুসূদন রচনাবলী। ৩২ এ. আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, কলকাতা ৭০০০০৯ : সাহিত্য সংবাদ, ২০১৭। পৃষ্ঠা নং : ৩৫

১৬। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ৩৬

১৭। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্র রচনাবলী। কলকাতা ১৭ : বিশ্বভারতী, মাঘ ১৪২০। পৃষ্ঠা নং : ৩৪

১৮। পত্রী, পূর্ণেন্দু। রাধাকৃষ্ণের পদাবলী। ১৩ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ : দে'জ পাবলিকেশন, ২০১৬। পৃষ্ঠা নং : ১২
১৯। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ২১
২০। বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর। রাধা। ১০ শ্যামচারণ দে স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০০৭৩ : মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, ২০১৭। পৃষ্ঠা নং : ১৬১
২১। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ২০৭
২২। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ২০৩
২৩। তদেব, পৃষ্ঠা নং : ২০৬

গ্রন্থপঞ্জী :

১। অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য, বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র, দে'জ পাবলিকেশন
২। অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (প্রথম খণ্ড), মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
৩। তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, রাধা, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স
৪। নরেশচন্দ্র জানা, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনচর্চা, দে পাবলিকেশনস
৫। পূর্ণেন্দু পত্রী, রাধাকৃষ্ণের পদাবলী, দে'জ পাবলিকেশান
৬। মধুসূদন দত্ত, মধুসূদন রচনাবলী, সাহিত্য সংসদ
৭। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী
৮। শ্রীশশিভূষণ দাশগুপ্ত, শ্রীরাধার ক্রমবিকাশ দর্শনে ও সাহিত্যে, এ মুখার্জী অ্যান্ড কোং প্রাঃ লিঃ
৯। সত্য গিরি, বৈষ্ণব পদাবলী, রত্নাবলী
১০। সত্যবতী গিরি, বাংলা সাহিত্যে কৃষ্ণকথার ক্রমবিকাশ, দে'জ পাবলিকেশান

লেখক পরিচিতি :
এম. ফিল. গবেষক বাংলা বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

Call for paper

Department of Bengali, Rabindra Bharati University invites research articles from the teachers and research scholars of the said department for **33, 34th** joint issue of the **Bengali Departmental Journal (2020-21).** The last date of submission is **01.03.22.**

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার জন্য লেখা আহ্বান

বাংলা বিভাগীয় পত্রিকার ৩৩, ৩৪তম যুগ্ম সংখ্যার (২০২০-২১) জন্য রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক এবং গবেষকদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি তাঁরা যেন অতি সত্বর তাঁদের লেখা প্রবন্ধ জমা দেন। ১লা মার্চ ২০২২ লেখা জমা দেওয়ার শেষ দিন।

প্রবন্ধ জমা দেওয়ার নিয়মাবলী—

১. প্রবন্ধ অনধিক ৪০০০ শব্দের মধ্যে হতে হবে।
২. প্রবন্ধের শুরুতে অনধিক ২০০-২৫০ শব্দের একটি সারাংশ (abstract) দিতে হবে।
৩. সারাংশের পরে থাকবে মূল শব্দ (key word), ৩-৬ টি।
৪. প্রতিটি প্রবন্ধের শেষে যথাযথ তথ্যসূত্র থাকতে হবে। MLA Format অনুসরণ করলে ভালো হয়।
৫. প্রবন্ধকার নিজের নাম, পদ এবং অন্যান্য পরিচয় প্রবন্ধের সঙ্গে না দিয়ে আলাদা ভাবে দেবেন। মূল প্রবন্ধের মধ্যে যেন লেখকের পরিচয় জ্ঞাপক কোনো কিছু না থাকে।
৬. আলাদা ভাবে প্রবন্ধকার নাম, পদ, বিভাগ, সংযুক্তি (affiliation) ইত্যাদি দেবেন। যোগাযোগের জন্য ফোন নম্বর এবং email address দিতে হবে।
৭. প্রবন্ধ টাইপ করে দিতে হবে। ১৪/১৬ point এ টাইপ করতে হবে। নিম্নলিখিত email address এ মেইল করবেন এবং একটি করে hard copy বিভাগে জমা দেবেন।
৮. প্রবন্ধ PDF File করে পাঠাবেন। যাঁরা Unicode এ টাইপ করবেন তাঁরা PDF File এবং Word File দুটিই পাঠাবেন।

লেখা পাঠানো এবং যোগাযোগ :
bengdpt.journal2021@gmail.com
9874921972, 7439016447

সুমনা দাস সুর
বিভাগীয় প্রধান

Peer Review Format

গবেষণা নিবন্ধের শিরোনাম (Tittle of the research article):

শিরোনাম বিষয়োপযোগী কিনা (Is the title adequate to the subject of the article?):

বিষয়ের অভিনবত্ব ও মৌলিকতা (Dose the content have uniqueness?):

ভাষা ও উপস্থাপনা সম্পর্কিত মন্তব্য (Comments on language and presentation):

অনুচ্ছেদ পরিরল্পনা, বানান, তথ্যসূত্র ইত্যাদি সম্পর্কে অভিমত (Comments on paragraph development, punclution, spelling & notes):

সংশোধনের নির্দেশ, প্রয়োজন সাপেক্ষে (Suggested corrections, if necessary):

প্রবন্ধটি কি পত্রিকায় প্রকাশের উপযুক্ত বলে বিবেচিত হবে (Whether the article will be considered suitable to publish in the Journal)?

- বিবেচিত হবে (Accepted)
- বিবেচিত হবে না (Not Accepted)
- সংশোধন সাপেক্ষে বিবেচিত হবে (May be accepted after correction)

আবেক্ষকের স্বাক্ষর
(Reviewer’s Signature)

☆☆
প্রয়োজনে অতিরিক্ত পৃষ্ঠা সংযুক্ত করা যেতে পারে